অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

তৃতীয় খন্ড

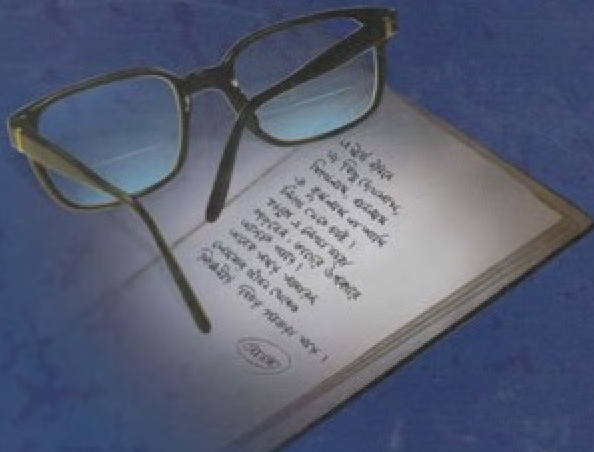

জীবনে যা দেখলাম

তৃতীয় খণ্ড

(১৯৬২-১৯৭২)

অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

তৃতীয় খণ্ড

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

সপ্তম : ডিসেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৪

জীবনে যা দেখলাম (তৃতীয় খণ্ড) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব : লেখক ❖ প্রচ্ছদ : দি ডিজাইনার, বাংবাজার, ঢাকা ❖ মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
৪২৩ ওয়ারলেস রেল গেট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র

ISBN 984 8285 05 9

সূচিপত্র

একটি কৈফিয়ৎ /১৩
ঢাকা শহরে অন্তরীণ হলাম /১৩
অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহার /১৪
দেওয়ান আবদুল বাসেতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক /১৪
নাখাল পাড়ায় জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস স্থাপন /১৫
ব্যাপক সাংগঠনিক সফর /১৬
লাহোরে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন ১৯৬৩ /১৬
সম্মেলন পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন /১৮
সম্মেলনের কার্যক্রম /১৮
লাহোর সম্মেলনের ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি /২০
মজলিসে শূরায় মাওলানার নিরাপত্তা ইস্যু /২০
১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে জামায়াত বেআইনী ঘোষিত /২১
লাহোর জেলে পৌছলাম /২২
মাওলানার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দু'মাস /২৩
মাওলানার দারস /২৪
জেলে আমার ব্যক্তিগত কর্মসূচি /২৪
নাশতা ও খাবার উৎসব /২৫
জেলে রোযার মাস /২৭
লাহোর জেলে মজলিসে শূরার অধিবেশন /২৭
একটি ছোট্ট ঘটনা /২৯
বিচারপতির সামনে হাজির হলাম /৩০
ঢাকা রওয়ানা /৩০
ঢাকা জেলে পৌছলাম /৩২
জেলে স্থান পরিবর্তন /৩৩
জেলে পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ /৩৪
ঢাকা জেলে সাড়ে পাঁচ মাস /৩৫
আটকাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির অমানবিক পদ্ধতি /৩৫
জেলে আমরা ৪ ভাই /৩৬
কারাগার নয়; শিক্ষাগার /৩৬
জেলে অধিকার আদায় /৩৭
কারাগারের হাসপাতালে /৩৮
জেল থেকে মুক্তি /৩৯

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ঐক্য /৩৯
সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়ন /৪০
জামায়াতের সামনে বিরাট সমস্যা /৪১
জামায়াতের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের রায় /৪২
সারা পাকিস্তানে ইউনিয়ন নির্বাচনের তোড়জোর /৪৩
ইউনিয়ন নির্বাচনের দৃশ্য /৪৩
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন /৪৪
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন /৪৫
পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর /৪৫
প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান /৪৬
মোনায়েম খানের শাসনামল /৪৮
ছাত্র অঙ্গনে সন্ত্রাসের সূচনা /৫২
'৬৫ সালের একটি ঘটনা /৫৩
আত্মীয়তার সম্পর্ক /৫৪
তাসখন্দ ঘোষণা /৫৫
কাশ্মীর সমস্যা /৫৫
তাসখন্দে আইয়ুব খানের কূটনৈতিক পরাজয় /৫৬
আইয়ূব-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন /৫৬
পিডিএম গঠন /৫৮
পিডিএম প্রশ্নে পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগে দ্বিধাবিভক্তি /৫৯
পিডিএম-এর ৮ দফা /৬০
শেখ মুজিবের দৃষ্টিভঙ্গি /৬২
শেখ মুজিবের ৬ দফা /৬৩
৬ দফা ও মাওলানা ভাসানী /৬৪
পিডিএম-এর সাংগঠনিক কাঠামো /৬৪
পিডিএম-এর ৮ দফা ভিত্তিক আন্দোলন /৬৪
পিডিএম-এর প্রচারাভিযান /৬৫
কুমিল্লায় সুধী বৈঠক /৬৫
কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সফর /৬৭
পূর্ব-পাকিস্তানে চরম রাজনৈতিক বিক্ষোভ /৬৮
আইয়ূব খানের দশ বছরের স্বৈরশাসনের প্রতিক্রিয়া /৬৯
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা /৭০
১৯৬৮ সালে পিডিএম-এর উদ্যোগে আমার পশ্চিম-পাকিস্তান সফর /৭১
জনসভায় আমার যুক্তি /৭৩
১৯৬৮ সালের আন্দোলন /৭৩

ঢাকায় DAC গঠন /৭৪
DAC-এর ৮ দফা /৭৫
আন্দোলন তুঙ্গে উঠলো /৭৬
আইয়ূব খানের আত্মসমর্পণ /৭৭
রাউন্ডটেবল কনফারেন্স /৭৮
গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিতদের তালিকা /৭৮
গোলটেবিল বৈঠক শুরু /৭৯
একসাথে ঢাকা প্রত্যাবর্তন /৮০
৮ মার্চ লাহোরে ডাকের বৈঠক /৮০
মাওলানা মওদূদীর সাথে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎ /৮১
অনিশ্চিত অবস্থায়ই রাওয়ালপিণ্ডি গমন /৮৩
রাউন্ডটেবিল কনফারেন্সের বিবরণ /৮৪
সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়লাম /৮৫
হলে ফিরে এলাম /৮৫
গোলটেবিলের শেষ বৈঠক /৮৬
গোলটেবিল বৈঠকের চরম ব্যর্থতা /৮৬
মাওলানা মওদূদীর সাথে বৈঠক /৮৭
ঢাকায় ফিরে এলাম /৮৮
আইয়ূব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর /৮৮
ইয়াহইয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ /৮৯
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য /৮৯
একজন ৬ দফা প্রণেতার দাবি /৯০
শেখ মুজিবের সাথে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ /৯২
ইয়াহইয়া খানের রাজনৈতিক ঘোষণা /৯৪
১১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের জনসভা /৯৪
পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভার প্রস্তুতি /৯৫
তখনকার পল্টন ময়দান /৯৬
১৮ তারিখের জনসভা /৯৭
একজন সাংবাদিক এলেন /৯৯
শহর অফিসে গমন /১০০
হাসপাতালে /১০১
১৯ তারিখের পত্রিকা /১০২
১৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ /১০৩
বর্ষব্যাপী নির্বাচনী অভিযান /১০৩
নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত /১০৪

জামায়াতের নমিনী বাছাই /১০৫
অন্যান্য দলে প্রার্থী বাছাইয়ের পদ্ধতি /১০৬
জামায়াতের বাছাই করা আসন সংখ্যা /১০৭
নির্বাচনী অভিযানের অভিজ্ঞতা /১০৭
নির্বাচনে অন্যান্য দলের হাল /১০৯
ভোট কেন্দ্রের হাল /১০৯
নির্বাচনী ফলাফল /১১০
সারা পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলাফল /১১১
নির্বাচনী মুবারকবাদ /১১১
ইয়াহইয়া খানের গড়িমসি /১১২
এ গড়িমসির আসল কারণ /১১৩
সমাধানের একটি মহৎ প্রচেষ্টা /১১৪
নির্বাচন পরবর্তী পৌনে তিন মাস /১১৬
জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচনোত্তর প্রথম বৈঠক /১১৭
৩ মার্চ ঢাকায় আহূত গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বানের প্রতিক্রিয়া /১১৯
ঢাকা অধিবেশন মুলতবি করার প্রতিক্রিয়া /১১৯
ঢাকায় ২ মার্চের হরতাল /১২০
৩ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল /১২১
পূর্ব-পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে /১২২
৭ মার্চ রেসকোর্সে শেখ মুজিব /১২২
সামরিক শাসনকর্তা ও গভর্নর পরিবর্তন /১২৩
জামায়াতে ইসলামীর দাবি /১২৩
পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪০ জন জাতীয় সংসদ সদস্য /১২৪
ইয়াহইয়া-মুজিব ঐতিহাসিক সংলাপ /১২৪
সংলাপের খবর সংগ্রহ /১২৬
সংলাপের শেষ পর্যায় /১২৭
অবস্থা জানার আরও চেষ্টা /১২৮
সংলাপের কতক গুরুত্বপূর্ণ খবর /১২৮
শেখ মুজিব কী ভাবছিলেন? /১২৯
পঁচিশের দিবাগত রাত /১৩০
২৬ মার্চ সকালে /১৩১
শহরের অবস্থা দেখতে গেলাম /১৩২
এখন কী করি? /১৩৪
দেশের অবস্থা কী? /১৩৫
চরম অস্বস্তিতে দিন কাটছে /১৩৫

মৌলভী ফরিদ আহমদ এলেন /১৩৭
জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ /১৩৮
মুরাদ সাহেবের সাথে পরামর্শ /১৪১
জনাব নূরুল আমীনের ভাষণ /১৪১
মৌলভী ফরিদ আহমদের ভাষণ /১৪২
ভাষণের পর্যালোচনা /১৪২
শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম /১৪৩
জনসেবার একটি উদাহরণ /১৪৪
ইয়াহইয়া সরকারের রেযাকার বাহিনী গঠন /১৪৫
জনগণের মনোভাব /১৪৭
আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া /১৪৯
'৭১-এর বড় বড় দুটো ভুল /১৫২
শান্তি কমিটি গঠন /১৫৪
শান্তি কমিটির তৎপরতা /১৫৭
শান্তি কমিটির কারো কারো অপতৎপরতা /১৫৮
বিদেশ সফর /১৫৮
এ সফর শুরু হলো বাহরাইন থেকে /১৫৯
সাফার সাথে দেখা হলো কিন্তু ধরা দিলো না /১৬১
বাহরাইনের ভিসা সংগ্রহ /১৬২
বাহরাইনে আমার প্রোগ্রাম /১৬৩
ঢাকায় ফিরে এলাম /১৬৫
বাহরাইনে মোল্লা সাহেবের কথা /১৬৬
বাহরাইনে আমার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম /১৬৭
সৌদী আরব রওয়ানা /১৬৯
সৌদী আরব সফরের উদ্দেশ্য /১৭০
এ কাজে কেন হাত দিলাম? /১৭০
অনুবাদের কাজ শুরু হলো /১৭২
নিরিবিলি লেখার পরিবেশ /১৭৩
ভিসা-সমস্যায় পড়লাম /১৭৪
হজ্জ উপলক্ষে জেদ্দার বাইরে ২১ দিন অবস্থান /১৭৫
অনুবাদে পূর্ণ মনোযোগ দিলাম /১৭৬
মদীনা শরীফ যিয়ারত /১৭৭
মসজিদের দুটো প্রধান আকর্ষণ /১৭৯
মসজিদে নববী /১৭৯
মসজিদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য /১৮০

রাসূল (স)-এর মাযার শরীফ /১৮১
বাবে জিবরীল /১৮১
আসহাবে সুফফা /১৮২
রাসূল (স)-এর কবরের পাশে আরও দু'জনের কবর /১৮৩
কবর যিয়ারত /১৮৪
এক ইহুদীর চক্রান্ত /১৮৫
শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার আগের ও পরের অবস্থা /১৮৬
মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা /১৮৭
বেসামরিক গভর্নর নিয়োগ /১৮৭
ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্ত /১৮৮
১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালন /১৮৯
৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সংহতি দিবস পালন /১৯১
'৭১-এর শেষদিকে /১৯১
এবারের হজ্জ /১৯২
ভিসার জটিলতায় পড়লাম /১৯২
মক্কায় অবস্থান /১৯৩
হজ্জ উদযাপনের বিশেষ ব্যবস্থা /১৯৪
ইজতিমায়ী হজ্জ /১৯৪
মিনায় রওয়ানা /১৯৫
এবারের ইজতিমায়ী হজ্জ /১৯৬
হাজীদের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনা /১৯৭
হজ্জ সমাধা হলো /১৯৮
সুস্থ-সবল অবস্থায়ই হজ্জ করা উচিত /২০০
হজ্জ ধনীদের কী শেখায় /২০০
যাকাত ধনীকে শিক্ষা দেয় /২০১
হজ্জ ধনীকে শেখায় /২০১
সৌদী আরবে বাংলাদেশী /২০২
ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশী /২০৩
সৌদী আরবে বাংলাদেশীদের সান্নিধ্য /২০৪
জামায়াতের কর্মপরিষদে আমার রিপোর্ট /২০৫
প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়ার সাথে সাক্ষাৎ /২০৭
মীমাংসার প্রচেষ্টা /২০৮
ড. জি. ডব্লিউ চৌধুরী /২০৮
অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোর ভূমিকা /২১১
ঢাকা রওয়ানা হলাম /২১৩

কলম্বো বিমান বন্দরে অবতরণ /২১৪
জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ /২১৫
হোটেলে অবস্থান /২১৬
মাওলানা শারকী /২১৯
হারামের সীমানায় পৌঁছার আগে হুদাইবিয়া /২২০
হুদূদে হারামে পৌঁছলাম /২২১
মাসজিদুল হারামে পৌঁছলাম /২২২
ওমরাহ্ করা হলো /২২৩
আমার ওমরাহ্ করা সমাপ্ত হলো /২২৬
যমযমের পানি /২২৬
যমযমের পানির প্রাচুর্য /২২৭
যমযমের পানি পানের বিশেষ নিয়ম /২২৯
জেদ্দায় আমার মেহমানদারী /২২৯
মদীনা শরীফ /২৩০
মেহমানখানার কাহিনী /২৩১
একটি শিশুর হৃদয়বিদারক মৃত্যু /২৩২
জেদ্দার পথে বিমানে /২৩৩
করাচীতে একদিন /২৩৪
পাকিস্তানে কোথায় থাকবো /২৩৪
পূর্ব-পাকিস্তানের খবর /২৩৫
পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা /২৩৬
১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর /২৩৭
১৬ ডিসেম্বর /২৩৮
ভারতীয় পার্লামেন্টে ইন্দিরা গান্ধীর বিজয় ভাষণ /২৩৮
আওয়ামী লীগের আদর্শিক অধঃপতন /২৩৯
১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস /২৪০
১৬ ডিসেম্বর আমার অনুভূতি /২৪১
দেশের খবর না পাওয়ার অস্থিরতা /২৪২
ইয়াহইয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ /২৪৩
পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া /২৪৪
সশস্ত্র বাহিনীতে প্রতিক্রিয়া সম্বলিত একটি বই /২৪৪
সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিক্রিয়া /২৪৬
১৯৭১-এর শেষ পরিস্থিতি /২৪৭
পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর নেতৃত্বে বিভেদ /২৪৮
১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর /২৫০

সামরিক শাসক মি. ভুট্টো /২৫১
দুটো বড় সমস্যা /২৫১
কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন /২৫৪
মাওলানা মওদূদী ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন /২৫৫
আমীরে জামায়াতের নির্বাচন পদ্ধতি /২৫৫
নির্বাচনের জন্য প্যানেল গঠন /২৫৬
পাকিস্তানে আমার ব্যাপক সফর /২৫৭
আমার লন্ডন যাবার প্রচেষ্টা /২৫৮
পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব /২৫৯
আযাদ-কাশ্মীর সফর /২৬০
রেডিও থেকে আমার বক্তৃতা /২৬২
প্রেসিডেন্টের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ /২৬২
চীফ-সেক্রেটারির সাথে ইসলামাবাদে সাক্ষাৎ /২৬২
পাকিস্তান থেকে বের হবার ধান্দা /২৬৫
হজ্জের প্রস্তুতি /২৬৬
এ খবরের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া /২৬৮
মাওলানা কাওসার নিয়াজী /২৬৯
কাওসার নিয়াজীর অধঃপতন /২৭০
মি. ভুট্টোর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ গমন /২৭২
আমার নাম ভুলবার রোগ /২৭২
মি. ভুট্টোর সাথে সাক্ষাৎ /২৭৪
মাওলানা মওদূদীর সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ /২৭৬
মাওলানা থেকে বিদায় নিলাম /২৭৭
স্টিমারে আরোহণ /২৭৮
স্টিমারে ৭ দিন /২৮০
স্টিমারে আমার প্রথম বক্তৃতা /২৮১
দ্বিতীয় বক্তৃতা /২৮২
ইয়ালামলামে ইহরাম বাঁধা /২৮২
জেদ্দা বন্দরে অবতরণ /২৮৩
মক্কায় মুআল্লিমের আস্তানায় /২৮৪
বাংলাদেশ থেকে আগত হাজী /২৮৫
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক উদ্যোগ /২৮৭
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর জন্য আমার করণীয় /২৮৮

৯১.

একটি কৈফিয়ৎ

আত্মজীবনী লেখার আমার কোন পরিকল্পনা ছিলো না বলে 'আমার জীবনে যা দেখলাম' তার রেকর্ড রাখিনি। স্মৃতিসাগর মন্থন করেই আমাকে লিখতে হচ্ছে। রাজনৈতিক তথ্যাবলি কয়েকটি বই থেকে সংগ্রহ করি। আর বাকি সবই স্মৃতির উপর নির্ভর করে লিখি।

১৯৩০ সালে যখন আমার বয়স ৮ তখন থেকে লেখা শুরু করে আমার লেখা এ পর্যন্ত ১৯৬৪ সালে পৌঁছেছে। কিন্তু স্মৃতিনির্ভর হওয়ায় কোন বিষয় বাদ পড়ে গেলে আবার পেছনের কথাও উল্লেখ করা হয়। ১৯৬২ সালের বিশেষ একটি বিষয় উল্লেখ করছি, যা আগে লেখা হয়নি।

ঢাকা শহরে অন্তরীণ হলাম

১৯৬২ সালের এপ্রিলে জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভার নির্বাচনের পর সরকার আমার চলাফেরার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলো। ঢাকা শহরের বাইরে আমার যাওয়া নিষিদ্ধ করা হলো। কারণ ১৯৬১ সালে আইয়ূব খান ইসলামের পারিবারিক আইন পরিবর্তন করে যে অর্ডিন্যান্স জারি করেন, এর বিরুদ্ধে আমি কুরআন ও হাদীসের যুক্তি দিয়ে তীব্র প্রতিবাদমূলক বক্তব্য রাখতাম। বিভিন্ন জেলা-শহরের জনসভায় এ বিষয়ে আমার বক্তৃতা বন্ধ করাই সরকারের উদ্দেশ্য ছিলো।

মাওলানা মওদূদীর উদ্যোগে পশ্চিম-পাকিস্তানের ১৪ জন নেতৃস্থানীয় আলেমের বিবৃতি উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদ করে পূর্ব-পাকিস্তানের আলেমগণের দস্তখত সংগ্রহ করে পুস্তিকাকারে প্রচার করা হয়। ইসলামের পারিবারিক আইনের উপর এ জঘন্য হামলার প্রতিবাদে উক্ত বিবৃতিতে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা হয় যে, আইয়ূব খানের ফ্যামিলি ল' অর্ডিন্যান্স কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বিরোধী।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে জনাব আব্বাস আলী খান এ অর্ডিন্যান্স বাতিলের জন্য বিল পেশ করেছিলেন। কিন্তু আইয়ূব খানের অনুগত মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি এ বিলের উপর আলোচনা করতেই দেয়নি।

ঢাকা শহরে অন্তরীণ করার আগে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিসে নিয়ে আমাকে একটি প্রশ্নমালা দিলো। প্রশ্নগুলোর মধ্যে বেশ ক'টি নীতিগত থাকায় আমি জওয়াব দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। দেশের আইন ও শাসন সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ হিসেবেই আমি লিখিত বক্তব্য পেশ করলাম। প্রশ্নগুলো ইংরেজিতে ছিলো বলে জওয়াবও ইংরেজিতে দিলাম। আমার

জওয়াবের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আমার নিকট পৌঁছেনি। আমি অনুভব করলাম যে, সরকার সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও আদর্শবাদী লোকের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে চায় না। শক্তি প্রয়োগ করে আদর্শের প্রতিরোধ করাই সরকারি নীতি। আমি যা লিখেছি, তা খণ্ডন করা সম্ভব নয় বলে আমাকে জনগণের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার কুমতলবে আমার উপর অন্তরীণাদেশ জারি করা হলো।

আমার কর্মস্থল ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ হয়ে গেলো। জনসভায় বক্তৃতা করা নিষিদ্ধ হয়ে গেলো। তবে ঢাকা শহরে আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। অবশ্য সব সময় তাদের কেউ আমার পেছনে লেগে থাকতো। আমি প্রতি শুক্রবারে বিভিন্ন বড় মসজিদে বক্তব্য পেশ করতাম। সপ্তাহে দু'টো মসজিদে দারসে কুরআন অব্যাহত ছিলো।

অন্তরীণাদেশ প্রত্যাহার

প্রাদেশিক আইন সভায় মাওলানা আবদুস্ সুব্হান বিরোধী দলের ডিপুটি লিডার ছিলেন। দেওয়ান আবদুল বাসেত লিডার অব দি হাউজ ছিলেন। ১৯৬৩ সালে মাওলানা আবদুস্ সুব্হান আইন পরিষদে আমার অন্তরীণাদেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, "চোর, ডাকাত ও দুষ্ট লোকদের দমন করার সাধ্য সরকারের নেই। কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযমের মতো চরিত্রবান ও আদর্শবাদী লোককে ঢাকা শহরে আটক করে রাখার কী যুক্তি থাকতে পারে? তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা অন্তরীণাদেশ কেন অব্যাহত রাখা হয়েছে, তা দেশবাসী জানতে চায়।"

লিডার অব দি হাউজ দেওয়ান আবদুল বাসেত সঙ্গে সঙ্গে জওয়াবে বললেন, "আমি অবিলম্বে এ বিষয়টা দেখবো এবং আগামীকালই হাউজে এ বিষয়ে বক্তব্য দেবো।" পরের দিন দেওয়ান বাসেত পরিষদের বৈঠকের শুরুতেই ঘোষণা করলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযমের উপর থেকে সরকার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।" যদি আইন পরিষদে আমার পক্ষে কথা বলার কেউ না থাকতো তাহলে হয়তো ঐ নিষেধাজ্ঞা অনেকদিন বহাল থাকতো।

দেওয়ান আবদুল বাসেতের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

দেওয়ান সাহেবের বাড়ি মৌলভীবাজার। আমি সাংগঠনিক সফরে সেখানে গেলাম। দেওয়ান সাহেব আমার সাথে দেখা করে তাঁর বাড়ি যাবার দাওয়াত দিলেন। সন-তারিখ মনে নেই। তখন তিনি সরকারি দায়িত্বে ছিলেন না। কথা-বার্তায় এমন শরীফ মানুষ কমই দেখা যায়। দেখতেও অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। মন্ত্রী থাকাকালেও তাঁর দাড়ি ছিলো। গায়ের রংও ছিলো উজ্জ্বল ফর্সা। তিনি এমন মহব্বতের সাথে দাওয়াত দিলেন যে, সাথে সাথেই কবুল না করে পারলাম না। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক এভাবেই শুরু হলো এবং এর উদ্যোগ তাঁরই। আমি মৌলভীবাজার গেলে এবং তিনি বাড়িতে থাকলে তাঁর বাড়িতে যেতেই হতো।

১৯৭৪ সালে তিনি মক্কা শরীফ যেয়ে স্থায়ীভাবে থাকার চেষ্টা করেন। তখন আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবন চলছে।

আমার অবস্থান লন্ডনভিত্তিক ছিলো। প্রতিবছর হজ্জের মওসুমে লন্ডন থেকে সৌদী আরব যেতাম। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের দায়িত্বশীল ও ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সভাপতি হজ্জ উপলক্ষে যেতেন। ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে মতবিনিময় ও পরামর্শের জন্য আমাদের সমবেত হবার এটাই একমাত্র সহজ সুযোগ ছিলো। মক্কা শরীফে দেওয়ান আবদুল বাসেত আছেন জেনে দেখা করবার সিদ্ধান্ত নিলাম। বাসা চেনা নেই বলে চিন্তিত হলাম। আল্লাহর মেহেরবানীতে এক নামাযে কাবা শরীফেই দেখা হয়ে গেলো। তিনি এক রকম জোর করেই তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর অকৃত্রিম মহব্বত ভুলবার নয়। জানতে চাইলাম, দেশে যাবেন কিনা। বললেন, "সেখানে মনে মোটেই শান্তি পাই না। এখানে দেশের জন্য দোয়া করে শান্তি বোধ করি।" জানতে চাইলাম, সময় কাটে কিভাবে? বললেন, "যেসব বাংলাদেশী ফ্যামিলি এখানে থাকে ওদের বাচ্চাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা নেই। আরবী ও বাংলা শেখাবার জন্য ছোট্ট একটা স্কুল পরিচালনা করি।"

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতি হজ্জের সময় মক্কা শরীফে তাঁর সাথে দেখা হতো। একবার তিনি দেশে চলে আসায় দেখা হয়নি। এ মানুষটিকে আমি আল্লাহর প্রিয় বান্দা মনে করেই মহব্বত করতাম।

আমার নাগরিকত্ব মামলা যখন হাইকোর্টে চলে তখন আমি জেলে। বেঞ্চের দু'জন বিচারপতি দু'রকম রায় দেওয়ায় তৃতীয় বিচারপতির কোর্টে মামলা চললো। তৃতীয় বিচারপতির রায় আমার পক্ষে হওয়ায় হাইকোর্টে আমি জিতে গেলাম। জেল থেকে বের হবার পর জানতে পারলাম যে, ঐ তৃতীয় বিচারপতি আনওয়ারুল হক চৌধুরী দেওয়ান আবদুল বাসেত সাহেবের জামাতা। আমার মামলায় এ বিচারপতি তৃতীয় জজ হিসেবে নিয়োগের খবর পত্রিকায় পড়ে কয়েকজন জেল কর্মকর্তা আমাকে মুবারকবাদ জানিয়ে বললেন, "এ বিচারপতির নিকট সুবিচার পাবেন।" এ বিচারপতি সম্পর্কে পূর্বে আমার কিছুই জানা ছিলো না।

নাখাল পাড়ায় জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস স্থাপন

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে ২০৫ নং নওয়াবপুর রোডস্থ জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস সরকার সীল করে দেয়। বছর দু'এক পর ঐ ঘরের মালিক তদবীর করে তার মালিকানা বহাল করতে সক্ষম হয়। দু'বছর বেচারা ভাড়া পায়নি। মালিককে ঘর বুঝিয়ে দেবার সময় জামায়াতের বই, ফাইল ও আসবাবপত্র সরকার সরিয়ে নেয়।

১৯৬২ সালের জুনে যখন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয় তখন জামায়াতের প্রাদেশিক অফিস স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রাদেশিক আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ১৯৬০ সালে নাখাল পাড়ায় একটি সেমিপাকা বাড়ি কিনে বসবাস করছিলেন। ঢাকা শহর জামায়াতের রুকন জনাব মাহবুবুর রাহমান গুরহা এর আগেই সেখানে বসতি স্থাপন করেন। তিনিই মাওলানাকে বাড়ি কেনায় সহযোগিতা করেন।

তাদের দু'জনের উদ্যোগ ও চেষ্টায় নাখাল পাড়ায় এক খণ্ড জমি কিনে সেমিপাকা ঘর তুলে প্রাদেশিক অফিস স্থাপন করা হয়। আমি সাইকেলে মগবাজার থেকে অফিসে যেতাম। নিকটে কোন মসজিদ না থাকায় একটি কামরা পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য রাখা হয়। অফিস সেক্রেটারি ছিলেন জনাব মাহবুবুর রাহমান, যিনি বর্তমানে ঢাকার রামপুরা এলাকায় বসবাস করেন এবং হোমিও ডাক্তারি করেন।

ব্যাপক সাংগঠনিক সফর

সামরিক শাসনকালে জামায়াতের নামে প্রকাশ্যে যে কোন কর্মতৎপরতা বেআইনি ছিলো। কিন্তু ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম হিকমতের সাথে পালন করায় একদিকে যেমন সংগঠনভুক্ত সবাই কাজ করার সুযোগ পেয়েছে, অপরদিকে সাংগঠনিক কাঠামোও বহাল রাখা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী আন্দোলনের প্রভাববলয় সম্প্রসারিত হয়েছে। ইসলামী সেমিনার, সীরাতুন্নবী সম্মেলন, তাফসীর মাহফিল ইত্যাদির ব্যানারে এ সব আয়োজনে জামায়াতের লোকেরাই উদ্যোগী ভূমিকা পালন করেছে। জামায়াতের সাথে পূর্বে জড়িত ছিলো না এমন অনেক লোক আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। উদ্যোক্তাদের নেতৃত্বে এসব লোক ইসলামের কাজে নিয়োজিত থাকায় পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে।

জামায়াত নতুনভাবে প্রকাশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করলে দায়িত্বশীলদের সাথে পরিচিত ঐ সব লোককে সহজেই সংগঠনভুক্ত করা গেলো। কয়েক মাসের মধ্যেই সামরিক শাসনের পূর্বের কর্মী সংখ্যার দ্বিগুণ, কোথাও তিনগুণ নতুন কর্মী যোগাড় হলো।

সেমিনার, সম্মেলন ও মাহফিলে জামায়াতের যে কয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দারস ও বক্তৃতা দিয়েছেন, হাজার হাজার শ্রোতা তাদের নাম জেনেছেন ও তাদের বক্তব্যে আকৃষ্ট হয়েছেন। এ পরিচিত বক্তাগণের নামে জামায়াতের জনসভা অনুষ্ঠানের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সামরিক শাসনের পূর্বের তুলনায় এ সব জনসভায় অনেক বেশি জনসমাগম হতে থাকে।

এ কর্মসূচি সফল করার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক সেক্রেটারি হিসেবে আমাকে সারাদেশে ব্যাপক সফর করতে হয়। প্রাদেশিক আমীর মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম জামায়াতের সাহিত্য উর্দু থেকে বাংলায় অনুবাদে বেশি সময় দিতেন বলে সিদ্ধান্তক্রমেই তাঁর সফর এতো বেশি সম্ভব হয়নি।

লাহোরে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলন ১৯৬৩

সামরিক শাসন প্রত্যাহারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদীর নির্দেশে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সর্বত্র সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয়। ১৯৬২ সালের জুন থেকে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দাওয়াত ও সংগঠন বিস্তার লাভ করতে থাকে। কেন্দ্রীয় জামায়াত ১৯৬৩ সালের আক্টোবরে লাহোরে নিখিল পাকিস্তান সম্মেলনের আয়োজন করে।

আইয়ূব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জামায়াতের বলিষ্ঠ বক্তব্য ও '৬১ সালে জারি করা ফ্যামিলি ল' অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি করায় আইয়ূব খান জামায়াতের উপর ক্ষিপ্ত হন। তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ খান জামায়াতের বিরুদ্ধে জঘন্য আক্রমণাত্মক বিবৃতি দিতে থাকেন। এ আশঙ্কা দেখা দিলো যে, জামায়াতের সম্মেলন হতে দেবে কিনা।

জামায়াতের পক্ষ থেকে সম্মেলনের জন্য যেসব ময়দানের অনুমতি চাওয়া হয় এর কোনটায়ই অনুমতি দিলো না। জামায়াত লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডি মহাসড়কের পাশে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকায় সম্মেলনের আয়োজন করতে বাধ্য হয়। ঐ স্থানটি প্রস্থে খুব কম থাকায় দৈর্ঘ্যে এতো লম্বা এলাকা জুড়ে তাঁবু খাটাতে হয়েছে। সম্ভবত সরকারের ধারণা ছিলো যে, এমন অবাস্তব ও অসুবিধাজনক স্থানে সম্মেলনের অনুমতি দিলে জামায়াত সম্মেলন করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু জামায়াত যখন সম্মেলনের আয়োজন করেই ফেললো, তখন এটাকে ব্যর্থ করার জন্য সরকার মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করলো।

এ জাতীয় অনুমতি দেবার ইখতিয়ার প্রাদেশিক সরকারের। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশকে 'পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশ' নাম দিয়ে একটি প্রদেশে পরিণত করা হয়। ঐ সময় সে প্রদেশের গভর্নর ছিলেন আইয়ূব খানের বংশবদ নওয়াব আমীর মুহাম্মদ খান নামক এক বিরাট জমিদার। কেন্দ্রে যেমন প্রেসিডেন্ট আইয়ূব সকল ক্ষমতার মালিক ছিলেন, তেমনি প্রাদেশিক গভর্নরও প্রদেশে পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করতেন।

আমীর মুহাম্মদ খান অত্যন্ত সংকীর্ণমনা ও হিংস্র প্রকৃতির ছিলেন। জামায়াতের প্রতি দুশমনি করার যে নির্দেশ তার প্রভু আইয়ূব খান থেকে পেলেন তা তিনি জঘন্যভাবেই পালন করলেন। জামায়াতকে সম্মেলনের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও মাইক ব্যবহার করার অনুমতি না দেওয়াটা কত নিকৃষ্ট মনের পরিচয় বহন করে তা অনুমেয়।

ঐ সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আমরা মাত্র ১০৩ জন যোগ দিতে সক্ষম হই। সম্মেলনের চিত্র এখনো আমার চোখে ভাসে। সম্মেলনস্থলেই প্রতিটি সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো। মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও আমি ঐ পরিষদের সদস্য ছিলাম। গভর্নরের গুণ্ডা বাহিনী যে কোন সময় আক্রমণ করতে পারে বলে আশঙ্কা থাকায় সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও উপজাতি এলাকার স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদের লাইসেন্সধারী বন্দুক ও পিস্তল নিয়ে পাহারা দিচ্ছেন। নিরস্ত্র লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবকগণ বিরাট সম্মেলন এলাকা ঘেরাও করে রেখেছেন। পরিস্থিতি দেখে আমার মনে হলো যেন যুদ্ধের ময়দানে আছি।

সম্মেলন পরিচালনার নীতিমালা প্রণয়ন

সম্মেলন সফল করার উদ্দেশ্যে আমীরে জামায়াতের নেতৃত্বে কর্মপরিষদে সিদ্ধান্ত নেবার সময় মাওলানার বিস্ময়কর সাহস ও দৃঢ়তা এবং প্রতিটি সমস্যার কার্যকর সমাধান দেবার যোগ্যতা দেখে আমার অন্তরে প্রত্যয় সৃষ্টি হলো যে, আল্লাহ তাআলা এ মানুষটিকে একটি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনার যাবতীয় যোগ্যতাই দান করেছেন। কর্মপরিষদের বিভিন্ন বৈঠকে তাঁর প্রস্তাবিত ও কর্মপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের কয়েকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. সম্মেলনে হামলা করতে আসলে স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদেরকে ঘেরাও করে পুলিশে সোপর্দ করবেন। নিজেরা তাদেরকে মারবেন না। তাদের উদ্দেশ্য সম্মেলন পণ্ড করা। তাদেরকে মারলেই পুলিশ তাদের পক্ষ হয়ে হামলা করবে। সম্মেলন সফল করতে হলে চরম ধৈর্যের সাথে এ সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

২. সম্মেলনের ডেলিগেটগণ নিজ নিজ প্যান্ডেলে আসন গ্রহণ করবেন। অন্যত্র যা-ই ঘটুক মঞ্চের পক্ষ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সবাই আসনে অবস্থান করবেন। কেউ নিজের সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে যাবেন না। সম্মেলনের শৃঙ্খলার জন্য এ নির্দেশ পালন করা বিশেষভাবে জরুরি।

৩. স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজ নিজ কমান্ডারদের নির্দেশ ব্যতীত কোন কিছু করবেন না। ডেলিগেটরদের কেউ নিজেই স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করবেন না। স্বেচ্ছাসেবকগণকে বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কোন গ্রুপ নিজেদের দায়িত্বের বাইরে কিছু করবেন না।

এসব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মাইক ছাড়াই সংশ্লিষ্ট সবাইকে কেমন করে পৌঁছানো সম্ভব হলো আমার নিকট এখনো তা মহাবিস্ময়। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বৈঠকে আমি ছিলাম বলে আমার সরাসরিই জানা সম্ভব ছিলো। কত বড় সাংগঠনিক শৃঙ্খলা থাকলে এসব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্ভব তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আমার মনে হয়েছে যে, আমরা যুদ্ধাবস্থায় ছিলাম। মাওলানা মওদূদীর মতো সেনাপতির পক্ষেই এমন জটিল পরিস্থিতিতে নিজের সৈনিকদেরকে সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা সম্ভব ছিলো।

সম্মেলনের কার্যক্রম

সম্মেলনের প্রথম কাজই ছিলো আমীরে জামায়াতের উদ্বোধনী ভাষণ। তিনি পূর্বের রাতেই ভাষণটি লিখে রাতের মধ্যেই কয়েকশ কপি ছাপিয়ে নেবার ব্যবস্থা করলেন। সকাল ১০টায় উদ্বোধনী ভাষণ দেবার কথা। ডেলিগেটগণ বিভাগভিত্তিক বিভিন্ন প্যান্ডেলে অবস্থান করছেন। প্রতিটি প্যান্ডেলের মাঝখানে একটা করে টেবিল রাখা হয়। মাওলানার মুদ্রিত ভাষণ টেবিলে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনাবার ব্যবস্থা হলো। মঞ্চে যখন মাওলানা ভাষণ দেন সে সময়ই একযোগে সকল প্যান্ডেলে সবাই ভাষণ যাতে শুনতে পারে, সে উদ্দেশ্যেই এমন অদ্ভুত আয়োজন।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে যারা গিয়েছিলাম তাদের সংখ্যা কম হওয়ায় মঞ্চের কাছে কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের সাথেই আমাদের বসার ব্যবস্থা হলো। মাওলানা মওদূদীর কণ্ঠের আওয়াজ উচ্চ ছিলো না। মাইক ছাড়া তিনি যথাসম্ভব উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ শুরু করলেন।

কয়েক মিনিট পরই আমাদের বরাবর মহাসড়কের পাশের তাঁবুতে আগুন দেখা গেলো এবং গুলীর শব্দ শুনা গেলো। সম্মেলনস্থলে চলাফেরা করার জন্য যে রাস্তা রাখা হয়েছে, সে রাস্তা ধরে ১০/১২ জন লোক দৌড়ে মঞ্চের ৪০/৫০ হাত কাছে এসে হৈ চৈ শুরু করে দিলো। লক্ষ্য করলাম যে, স্বেচ্ছাসেবকগণ তাদেরকে ঘেরাও করে ঐ রাস্তা ধরেই তাদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হৈ-হাঙ্গামা করার সময় পাঞ্জাবী ভাষায় একটা কথা শুনা গেলো 'মওদূদী তুসী গাদ্দার এ্যায়' (মওদূদী তুমি গাদ্দার)।

মাওলানা দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন, মাওলানার নিরাপত্তায় নিযুক্ত ব্যক্তি চিৎকার করে বললেন, 'মাওলানা বসে যান'। কিন্তু মাওলানা ভাষণ চালু রাখতে গিয়ে বললেন, "আমিই যদি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?" মাওলানা ভাষণদান অব্যাহত রাখলেন।

হাঙ্গামাকারীদেরকে ঘেরাও করে রাস্তায় টহলরত পুলিশের হাতে দেওয়া হলো। যদি এদেরকে মারপিট করা হতো তাহলে সম্মেলন শান্তিপূর্ণভাবে চলতে পারতো না। আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম, যে তাঁবুতে আগুন লাগানো হয়েছিলো, সে তাঁবুর ডেলিগেটরাও অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে যায়নি। স্বেচ্ছাসেবকরা আগুন নিভিয়ে ফেললো। আর সবাই মাওলানার ভাষণ ঐ প্যান্ডেলের পাঠকদের মুখে শুনতে থাকলো।

গুলীর আওয়াজ সম্পর্কে জানা গেলো যে, আল্লাহ বখশ নামে একজন কর্মী শহীদ হয়েছেন। ঘাতককে স্বেচ্ছাসেবকগণ ধরে পুলিশের হাতে দিয়ে দিলেন। শহীদের স্ত্রীও পাশের মহিলা-ক্যাম্পে ছিলেন। স্বামী শহীদের মর্যাদা পাবেন জেনে তিনি একদম শান্ত হয়ে গেলেন বলে শুনেছি। উদ্বোধনী অধিবেশনের পর বিরতির সময় আমি অনুমতি নিয়ে শহীদকে দেখতে গেলাম। সেখানে ভিড় করতে দেওয়া হয়নি বলে সহজেই দেখা গেলো। আমার কান্না এলো এবং মৃদু আওয়াজে কাঁদতে লাগলাম। দু'জন আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে কান্না থামিয়ে দিলেন।

আমীরে জামায়াতের নির্দেশে শহীদের জন্য ডেলিগেটদের মধ্য থেকে এক লাখ রুপিয়ার তহবিল সংগ্রহ হয়ে গেলো। তিনি ঘোষণা করলেন যে, এ খুনের মামলা তিনি আল্লাহ তাআলার কোর্টে পেশ করেছেন। আসল বিচার তো আখিরাতেই হবে। দুনিয়াতে গভর্নর আমীর মুহাম্মদ খানের অত্যন্ত অপমানজনক মৃত্যু হয়। তার ছেলেই তাকে হত্যা করে লাশ গ্যারেজে ফেলে রাখে। তার এ পরিণতির কথা জেনে মাওলানা কোন মন্তব্য করেননি।

৯২.

লাহোর সম্মেলনের ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি

জামায়াতে ইসলামীর সম্মেলনে ঐতিহ্যগতভাবে যেসব কর্মসূচি থাকে এ সম্মেলনে মাইক ব্যবহার করতে না দেওয়ায় সে ধরনের কিছুই করা সম্ভব হয়নি। সম্মেলনে দারসে কুরআন, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বক্তৃতা, বার্ষিক রিপোর্ট, প্রস্তাবাবলি গ্রহণ ও সমাপনী ভাষণ ইত্যাদি কোনটাই সম্ভব হয়নি। একমাত্র উদ্বোধনী ভাষণ যে অভিনব পদ্ধতিতে পরিবেশন করা হয়েছে, অন্যান্য কর্মসূচি সেভাবে পালন করা একেবারেই অবাস্তব।

তিন দিনব্যাপী সম্মেলন দু'দিনেই সমাপ্ত করা হলো। সম্মেলনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্যে সম্মেলনের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক বৈঠক ডাকা হয়, যেখানে সকল জেলার আমীরগণ উপস্থিত হন। আমীরে জামায়াতের সমাপনী ভাষণের মুদ্রিত কপি জেলা আমীরদের হাতে দেওয়া হয়, যাতে জেলা থেকে আগত ডেলিগেটদেরকে শুনিয়ে দেওয়া যায়।

সম্মেলনের দু'দিন রোজ ৪ ঘণ্টা সময় এক ব্যতিক্রমধর্মী কর্মসূচি পালন করা হয়। প্রথম দিন উদ্বোধনী অধিবেশনের পর এবং দ্বিতীয় দিন সকাল ৯টা থেকে এ কর্মসূচি শুরু হয়। হাজার হাজার ডেলিগেটদেরকে লাহোর শহরে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে যেয়ে দাওয়াত দেবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৮/১০ জনের এক-একটি গ্রুপ গঠন করে লাহোর শহরে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমিও এক গ্রুপের আমীর ছিলাম।

সম্মেলন শহরের পাশে মহাসড়কে হওয়ায় শহরবাসীর কৌতূহল তো ছিলোই; সম্মেলনের সাথে সরকারের বৈরী আচরণের কথা পত্রিকার মাধ্যমে অনেকেরই জানা ছিলো। ফলে দাওয়াতী গ্রুপ সর্বত্রই সহানুভূতি পেয়েছে। আমার ছিলো এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। আমরা কোথাও বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইনি। জনগণ আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছে। কোথাও কোথাও আপ্যায়ন করে আমাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে।

দাওয়াতে আমরা তিনটি কথা বলেছি। জামায়াতে ইসলামী কী চায়? সরকার কেন জামায়াতকে বরদাশত করতে চায় না? জামায়াত যা চায় তা যদি আপনারা চান তাহলে জামায়াতের সমর্থক হোন। দু'দিনে লাহোর শহরে মোট দেড় লাখ লোক জামায়াতের মুত্তাফিক (সমর্থক) হন।

গোটা শহরে জামায়াত জনগণের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। সম্মেলনের এ গণ-দাওয়াতের কর্মসূচি সম্মেলনের আসল সাফল্য বলে গণ্য হয়।

মজলিসে শূরায় মাওলানার নিরাপত্তা ইস্যু

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে সরকারি গুণ্ডাবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ সম্পর্কে সন্ধ্যায় সম্মেলনস্থলেই মজলিসে শূরার অধিবেশন বসে। বৈঠকে আমীরে

জামায়াতের নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনা হয়। প্রস্তাব করা হয় যে, রাতের বেলাটা মাওলানা নিজের বাড়িতে কাটান, পরদিন সকালে আবার সম্মেলনস্থলে আসবেন। মাওলানা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, "আমি এখানেই আপনাদের সাথে থাকবো। সম্মেলনের বাইরে যেয়ে আমি মনে মোটেই শান্তিবোধ করবো না।"

সম্মেলনের পর মজলিসে শূরার অধিবেশন জামায়াত অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। এখানে আবার মাওলানার নিরাপত্তামূলক কী কী ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সে বিষয়ে আলোচনা চলে। মাওলানা বলেন, "আমার জন্য যদি আল্লাহ কোন গুলী নির্দিষ্ট করেই থাকেন তাহলে আপনাদের কোন ব্যবস্থাই কাজে আসবে না। আপনারা কি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার চেয়েও বেশি কার্যকর ব্যবস্থা করতে পারবেন? তাই অস্বাভাবিক কিছুই করার প্রয়োজন নেই।" এর কিছুদিন পূর্বেই প্রেসিডেন্ট কেনেডি বুলেট প্রুফ গাড়িতে বসা অবস্থায় গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। কোন কারণে ঐ গাড়ির জানালা সামান্য খোলা ছিলো। নির্ধারিত গুলীটি ঐ ফাঁক দিয়ে এসে কেনেডিকে হত্যা করলো। যা হোক এরপর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে সাবধানতামূলক কিছু ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারিতে জামায়াত বেআইনী ঘোষিত

১৯৬৪ সালের ৪ জানুয়ারি আমি ও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলার (নির্বাহী পরিষদ) বৈঠকে যোগদানের জন্য লাহোর গেলাম। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাবীবুল্লাহ খানের জামায়াতবিরোধী আক্রমণাত্মক বক্তব্য কয়েক দিন থেকে পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় এ ধারণা প্রবল হয়ে উঠল যে, জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করতে পারে।

১২ সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে আমেলার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, অবিলম্বে জেলা পর্যায় পর্যন্ত সংগঠনের দায়িত্বশীলগণকে কতক প্রয়োজনীয় বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দিতে হবে। জামায়াতের রুকনদের তালিকাসহ জরুরি ফাইলপত্র জামায়াত অফিস থেকে সরিয়ে রাখা, বায়তুল মালের টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেওয়া এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও জেলা আমীরগণকে গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়।

জানুয়ারির ৫ তারিখ শেষ রাত তিনটার সময় কেন্দ্রীয় অফিস থেকে বায়তুল মাল সেক্রেটারি জনাব ফকীর হোসাইন এসে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে জানালেন যে, পুলিশের বিরাট বাহিনী জামায়াতের অফিস এলাকা ঘিরে রেখেছে। কর্মকর্তা থেকে জানা গেলো যে, সরকার জামায়াতকে ৬ জানুয়ারি থেকে বেআইনী ঘোষণা করেছে এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সকল সদস্যকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে।

আমার ও মাওলানা আবদুর রহীমের নামও তাদের তালিকায় আছে বলে জানা গেলো। তাই আমরাও জেলে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। ঢাকা থেকে সফরের জন্য যা এনেছিলাম, তা সুটকেসে গুছিয়ে নিলাম।

আমীরে জামায়াতের পক্ষ থেকে পুলিশ কর্মকর্তাকে জানানো হলো যে, ফজরের নামাযের সময় হলেই আমরা জামাআতে নামায পড়ে তাদের গাড়িতে উঠবো। মাওলানার ইমামতীতে নামায হলো। কেন্দ্রীয় অফিসের সবাই জামাআতে শরীক হলেন। মাওলানা পয়লা রাকাআতে সূরা বুরূজ এমন আবেগের সাথে তিলাওয়াত করলেন যে, এখনো এর প্রতিক্রিয়ার কথা স্মরণে আছে। এ সূরার শুরুতে মুমিনদের আগুনে পুড়িয়ে চরম নির্যাতনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মাওলানার মুখে তিলাওয়াত শুনে মনে সান্ত্বনা বোধ করলাম যে, আমি তো শুধু গ্রেপ্তার হচ্ছি। যাদেরকে পুড়িয়ে যালিমরা মজা উপভোগ করেছে তাদের তো এ অপরাধই ছিলো, যে অপরাধে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করছে। ১৯৫২ ও ১৯৫৫ সালে জেল পাস করার পর জেলের ভয় তো মনে ছিলোই না; বরং দীনের কারণে গ্রেপ্তার হওয়ায় মনে রূহানী তৃপ্তি বোধ করলাম।

লাহোর জেলে পৌছলাম

মাওলানা মওদূদীসহ আমরা ৮ জন লাহোর জেলে পৌছলাম। জানুয়ারির প্রচণ্ড শীতে পুলিশের জিপে ওভারকোট গায়ে দিয়েই বসলাম। তখন বৃষ্টি হচ্ছিলো। ঠাণ্ডা বাতাসে শীতের তীব্রতা বোধ করলাম।

লাহোর জেলের একতলা এক দালানে নিয়ে আমাদেরকে উঠালো। আর যারা আমাদের সাথে ছিলেন তারা হলেন, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, প্রখ্যাত কবি নাঈম সিদ্দিকী, লাহোর শহরের আমীর হাফেয মাওলানা নাসরুল্লাহ খান আযীয, শহর সেক্রেটারি চৌধুরী গোলাম জিলানী ও কেন্দ্রীয় শূরায় লাহোর শহর থেকে নির্বাচিত সদস্য মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ।

ঐ দালানে ৪টি কামরা। একটি কামরায় এটাস্ট বাথরুম ও কমড থাকায় আমীরে জামায়াতের জন্য ঐ কামরাটিই বরাদ্দ করা হলো। জেলের ডাক্তার ছাত্র জীবনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ছিলেন বলে আমাদের সাথে খোলামেলা আলাপ করতেন। তার কাছ থেকে জানা গেলো যে, এ কামরায় অনেক রাজনৈতিক নেতা বিভিন্ন সময় ছিলেন। তিনি দু'জনের নাম বললেন, সীমান্ত গান্ধী নামে পরিচিত খান আবদুল গাফফার খান ও সীমান্ত প্রদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খান আবদুল কাইয়ুম খান।

এর পাশের কামরায় আমি, মাওলানা আবদুর রহীম ও মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ এবং বাকি দু'কামরায় দু'জন করে রইলেন। কয়েক দিন পর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদকে মুলতান জেলে অপসারণের পর মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ মিয়া সাহেবের স্থানে চলে গেলে আমরা দু'জন করে প্রতি কামরায় রইলাম।

রাতে প্রত্যেক কামরায় তালা লাগানো হতো না। বারান্দায় লোহার সিক দেওয়া ছিলো। তাতেই তালা লাগানো হতো। তাই আমরা ৪ কামরার সবাই রাতেও জামাআতে নামায আদায় করা, একসাথে খাওয়া, বারান্দায় পায়চারি করা, অবাধে আলাপ-সালাপ করার সুযোগ পেতাম।

মাওলানার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে দু'মাস

৬ জানুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ণ দু'মাস লাহোর জেলে ছিলাম। মাওলানা মওদূদীর দুর্লভ সান্নিধ্য আমার জীবনের এক বিরাট অর্জন। মজলিসে আমেলার বৈঠক শেষে ঢাকা ফিরে আসার কথা ছিলো। লাহোরে আটক হয়ে পড়ায় প্রথম ক'দিন খারাপই লেগেছে। কিন্তু মাওলানার সাহচর্যে কয়েকদিন পরই অনুভব করলাম যে, এটা আমার জন্য এক মহাসুযোগ। জেল ছাড়া এমন সুযোগ পাওয়া আর কোনভাবেই সম্ভব হতো না।

কিছুদিন পর জনাব নাঈম সিদ্দীকীকেও অন্যত্র নিয়ে যাবার পর আমরা ৬ জন একসাথে ছিলাম। আমাদের ২৪ ঘণ্টার রুটিন ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১. মাওলানার কামরায় ফজরের জামাআত। শীতের রোদে যোহর ও আসরের জামাআত। মাগরিব ও ইশার জামাআতও মাওলানার কামরায়। আমি মুয়ায্যিন আর মাওলানা ইমাম।

২. সকাল আটটার পর নাস্তা ও যোহরের একঘণ্টা পর দুপুরের খাবার বারান্দায় একসাথে। আর রাতের খাবার শীতের কারণে মাওলানার কামরায়।

৩. যোহরের নামাযের পর মাওলানা দারসে কুরআন পেশ করতেন। আর আসরের পর, কোন দিন মাগরিবের পর দারসে হাদীস দিতেন।

৪. ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত মাওলানা বাইরে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে রোদ উপভোগ করতেন। এ সময় অনুমতি নিয়ে পাশে চেয়ারে বসে মাওলানার সাথে কথা বলার সুযোগ নিতাম। আমি প্রশ্ন করতাম, আর তিনি জওয়াব দিতেন। আমার আগ্রহ দেখে তিনি দরদের সাথেই জওয়াব দিয়ে আমাকে তৃপ্ত করতেন। মনোযোগী ছাত্র পেলে ভালো শিক্ষক যেমন যত্নের সাথে শেখাবার চেষ্টা করে, মাওলানা তেমনি আচরণ করতেন। আমার প্রশ্নের বিষয়ের কোন সীমাসংখ্যা ছিলো না। ইসলাম, কুরআন, হাদীস, রাসূল (স), ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী আন্দোলন, দেশের রাজনীতি, আন্দোলনের ভবিষ্যৎ, বিশ্ব পরিস্থিতি, জামায়াতের সাংগঠনিক বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে আমি প্রশ্নের তালিকা তৈরি করে নিতাম। আমার প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কোন ইস্যু তিনি নিজেও তুলতেন।

উপর্যুক্ত সব বিষয়েই মাওলানার লেখা প্রচুর বই পড়েছি। কিন্তু শুধু বই পড়ে পূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া যায় না। পড়ার সময়ও মনে প্রশ্ন জাগে। বইকে তো প্রশ্ন করা যায় না। মাওলানার সান্নিধ্য পেয়ে আমি অনুভব করলাম যে, শুধু বই-ই যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন করে মনের খোরাক পাওয়ার মতো জ্ঞানীর সঙ্গ না পেলে মন তৃপ্ত হয় না। শুধু বই পড়েই যদি জ্ঞানের পূর্ণতা অর্জন করা সম্ভব হতো তাহলে আল্লাহ তাআলা কিতাব নাযিল করাই যথেষ্ট মনে করতেন, নবী পাঠাবার প্রয়োজন বোধ করতেন না। কিতাব ও নবী দুটোই আবশ্যক।

মাওলানার দারস

দারসে কুরআনের সময় মাওলানা কুরআন শরীফের ব্যক্তিগত কপি সামনে রাখতেন। মোটা কাপড়ে মোড়ানো বিরাট গ্রন্থটি কাছে থেকে দেখলাম। কুরআনের আয়াতের তিন পাশে (উপরে, নিচে ও পাশে) ৪/৫ ইঞ্চি প্রশস্ত খালি জায়গা। ফরমাশ দিয়ে তৈরি করা কিনা জানি না। ঐ খালি জায়গা সবটুকু ছোট অক্ষরে হাতের লেখায় পূর্ণ। বিভিন্ন তাফসীর অধ্যয়ন করে পয়েন্ট নোট করে রেখেছেন। এটা নিশ্চয়ই দীর্ঘ সাধনার ফসল। তাফহীমুল কুরআন রচনার জন্য এভাবে তিনি প্রস্তুতি নেন।

হাদীসের দারসের জন্যও তিনি একটি গ্রন্থ সামনে রাখতেন। উভয় দারসের পর তিনি ঐ সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নের জওয়াব দিতেন। দারসের এ মাহফিল আমার নিকট সব চাইতে আকর্ষণীয় মনে হতো।

জেলে আমার ব্যক্তিগত কর্মসূচি

সামষ্টিক রুটিনের বাইরে আমার মাত্র দু'দফা নিয়মিত কর্মসূচি ছিলো। একটা হলো তাফহীমুল কুরআন পড়া, অপরটি হলো বাছাই করা সূরাগুলো মুখস্থ করা। মাঝে মাঝে জেল লাইব্রেরী থেকে মাওলানা আবুল কালাম আযাদের বই নিয়ে পড়েছি।

জেলে আলো কম থাকায় রাতে পড়া কষ্টকর ছিলো। তাই কুরআনের যেটুকু মুখস্থ করা হতো তা রাতে বারান্দায় হেঁটে হেঁটে আওড়ায়ে সময়টা কাজে লাগাতাম। কুরআন মুখস্থ করার চেয়ে মুখস্থ রাখাই বেশি কঠিন। তাই বেশি বেশি সময় নিয়ে আওড়ানোরত থাকা জরুরি। শেষ রাতে নামাযে মুখস্থ করা সূরাগুলো পড়তে থাকলে মুখস্থ রাখা সহজ হয়। জেলের অবকাশ ছাড়া কর্মজীবনে কুরআন মুখস্থ করা এবং নামাযে ও নামাযের বাইরে আবৃত্তি করার সময় পাওয়া কঠিন।

কুরআনের যেসব সূরা এবং বিভিন্ন সূরার বাছাই করা অংশ আমার মুখস্থ করার সৌভাগ্য হয়েছে, এর শতকরা ৮০ ভাগই জেলের সঞ্চয়। ১৯৯২ ও ৯৩ সালে 'বিদেশী নাগরিক' হিসেবে ১৬ মাস ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে থাকাকালীন অবকাশে আমার হিফয করা সবটুকু যাতে স্মৃতিতে তাজা থাকে সে উদ্দেশ্যে একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করলাম।

আমার মুখস্থ করা সূরাগুলো এবং বিভিন্ন সূরার অংশসমূহ তিন ভাগে ভাগ করলাম, লম্বা কিরাআত, মাঝারি কিরাআত ও ছোট কিরাআত। তাহাজ্জুদের সময় লম্বা কিরাআত এবং সুন্নাত ও নফল নামাযে মাঝারি ও ছোট কিরাআতের তালিকা তৈরি করলাম। অর্থের দিক দিয়ে মিল করে জোড়া জোড়ায় সাজালাম। দু' দু' রাকাআত নামাযের জন্য এক এক জোড়া নামাযে পড়তে থাকলে মুখস্থ করা কোনো অংশই সম্পূর্ণ ভুলে যাবার আশঙ্কা থাকে না। জেলে তৈরি ঐ নোট আমার পকেটেই থাকে। মাসখানেকের মধ্যে নামাযে সব পড়া হয়ে যায়। এ সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আটকে গেলে কুরআন দেখে নিতে হয়। মুখস্থ রাখা সত্যিই কঠিন। হাফেয সাহেবরা রমযানে সালাতুত্ তারাবীর মধ্যে কুরআন শুনিয়ে হিফযকে তাজা করে নেন।

রাসূল (স) বলেছেন, "বেঁধে রাখা উট যেমন পালিয়ে যেতে চায়, কুরআন স্মৃতি থেকে এর চেয়ে দ্রুত পালায়। তাই কুরআনের বিশেষ যত্ন নাও।"

জেলের সাথী মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ উর্দু ও ফারসি ভাষার শিক্ষক ছিলেন। এ কথা যখন জানলাম তখন মাসখানিক সময় চলে গেছে। ফারসি ভাষা শেখার সুযোগটা কাজে লাগাতে পারলাম না। বিলম্বে হলেও শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ বইটি (উর্দু তরজমাসহ) বাইরে থেকে আনালাম। ছোট সময় থেকে ওয়ায়েযদের মুখে ফারসি বয়াত শুনে এ ভাষাটি খুব মিষ্টি বলে ধারণা ছিলো। শিখতে শুরু করলাম। ব্যাকরণ সহজই মনে হলো। কিন্তু জেলে দু'মাস শেষ হতেই আমাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়ায় ফারসি ভাষা আর শেখা হলো না।

নাশতা ও খাবার উৎসব

আমাদের ৬ জনের নাস্তা ও দু'বেলার খাবার একসাথেই দিয়ে যেতো। সবাই একসাথে বসে খাবার সময় অনেক খোশগল্প হতো। হালকা রসিকতার সাথে সাথে কখনো কখনো জ্ঞানের কথাও চর্চা করা হতো। এ তিন সময় ছাড়া সবাই একসাথে বসে আলাপ-সালাপ করার আর কোনো উপলক্ষ ছিলো না।

খাবার পরিবেশন করার দায়িত্ব আগ্রহের সাথে হাতে নিলেন চৌধুরী গোলাম জিলানী। তাঁকে কেউ এ দায়িত্ব নিতে বলেনি। ৬ জনের মধ্যে তিনি বয়সে কনিষ্ঠ ছিলেন। মাওলানা তাকে উজীরে তাআম (খাদ্যমন্ত্রী) উপাধি দিলেন। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে ও পরিপাটি সহকারে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করা দায়িত্বটি পালন করেন। তাঁর যোগ্যতার মূল কারণ এটাই ছিলো যে, তিনি সবচেয়ে কম পরিমাণ খেতেন। বিরাট বপুর অধিকারী লোকটি এতো কম খেয়ে কিভাবে তৃপ্ত ছিলেন, তা আমার নিকট বিস্ময়ের বিষয়ই ছিলো। সবার দিকে খেয়াল রেখে না চাইতেই তিনি খাবার বণ্টন করে দিতেন। তাঁর এ আন্তরিক খিদমতে সবাই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলো।

জেলের খাবার মান মোটামুটি ভালোই ছিলো। মাঝে মাঝে জামায়াতের লোকদের পক্ষ থেকে জেলে ফল আসতো। আমি ও মাওলানা আবদুর রহীম ছাড়া বাকি চারজনই সপরিবারে লাহোরে বসবাস করতেন। তাঁদের বাড়ি থেকেও খাবার আসতো। এ সবই আমরা এক সাথে ভাগ করে খেতাম।

হালকা রসিকতা ও খোশগল্পের কারণেই আমাদের খাবার মাহফিলটাকে 'খাবার উৎসব' শিরোনামে লিখছি। লাহোরের শহর আমীর মাওলানা নাসরুল্লাহ খান আযীযই এ উৎসবের মধ্যমণি ছিলেন। অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে তিনি বক্তব্য রাখতেন। তাসনীম পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিলো। তিনিই আমাদের খাদ্য মাহফিলকে প্রাণবন্ত করে রাখতেন। হালকা রসিকতা মাহফিলেই হারিয়ে যায়। স্মৃতিতে তা ধরে রাখা হয় না বা রাখা যায় না। সমান্য যা মনে পড়ছে লিখছি।

তিনি উর্দু ভাষার এক প্রফেসরের গল্প বললেন। ঐ প্রফেসর অত্যন্ত সিরিয়াসলি দাবি করতেন যে, ইংরেজি ভাষার বহু শব্দ উর্দু থেকে চয়ন করা হয়েছে। একটি উদাহরণ

মনে আছে। Decoration শব্দটি নাকি 'দেখ-রে-শান' শব্দ থেকে বানানো হয়েছে। এ রকম আরো কতক শব্দের কথা শুনে আমরা মজা নিয়ে হাসলাম। তিনি বললেন যে, তার মুখে এসব কথা শুনে তার ছাত্ররা হাসলেও তিনি গম্ভীরভাবেই বলতেন।

মসজিদে জুতা চুরির চমৎকার এক ঘটনা শুনালেন। এক ব্যক্তি তার জুতাজোড়া ভাঁজ করে মসজিদের দেয়ালের সাথে রেখে একটু পিছিয়ে নামায পড়ছেন। জুতা তার সামনেই সিজদার জায়গা বরাবর রাখা আছে। এক লোক জোরে কথা বলতে বলতে ঐ জুতা উঠিয়ে পেছনে নিয়ে রাখলো এবং রাখার আওয়াজও পাওয়া গেলো। নামায শেষে দেখা গেলো যে, ঐ লোকও নেই, জুতাও নেই। জুতা উঠাবার সময় লোকটি বলছিলেন, "নামায পড়তে এসেছেন, না জুতাকে সিজদা করতে এসেছেন"।

মাওলানা নাসরুল্লাহ খান আযীয মাঝে মাঝে মূল্যবান জ্ঞানের কথা বলতেন। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে উদ্ভট মতামত প্রকাশের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, "এক সের ইলম ঠিক মতো বুঝাবার জন্য পাঁচ সের আকল-বুদ্ধি দরকার। কম আকলের লোকের জন্য ইলম বিপজ্জনক।"

মাওলানা মওদূদীর রসিকতার ধরন সম্পূর্ণ ভিন্ন। কবি নাঈম সিদ্দিকী বলেন, "আলোচনার আকাশে, কথার মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মাওলানার রসিকতার বিদ্যুৎ চমকায়।" অর্থাৎ তিনি পূর্বের তৈরি কোন রসিকতার গল্প করেন না। কথার ফাঁকে কোন প্রসঙ্গে তিনি হালকা কথার অবতারণা করেন। যেমন খাবার পর ফল খাবার কথা। আপেল ও কমলা সবাই খোসামুক্ত করে একপাত্রে জমা করছি। অন্য পাত্রে খোসা রাখা হলো। হঠাৎ মাওলানা খাবার পাত্রটি দু'হাতে তুলে এ বলে এগিয়ে দিলেন, "মাতা-উল লাকুম" এবং খোসাভর্তি পাত্রটি দেখিয়ে বললেন, "ওয়ালি-আনআ-মিকুম"। কুরআনে ফসল ও ফলাদির উল্লেখ করে সূরা আন-নাযিআতে বলা হয়েছে, "মাতাউল লাকুম ওয়ালি-আন আ-মিকুম"। অর্থাৎ এসব জিনিস তোমাদের জন্য ও তোমাদের পালিত পশুর জন্য। মাওলানা চিহ্নিত করে দেখালেন যে, এটা তোমাদের, আর ওটা পশুদের।

আমি চা খাই না। চায়ের অভ্যাস নেই। আর সবাই চা'য়ে এমন অভ্যস্ত যে, চা না পাওয়া পর্যন্ত নাশতাই যেন হলো না। চায়ের জন্য যে পরিমাণ দুধ দেয়, তাতে এককাপ দুধ থেকে যায়। আমি বললাম, দুধটুকু আমাকে দিতে পারেন। পরের দিন চা পরিবেশনের সময় চৌধুরী গোলাম জিলানীকে মাওলানা বললেন, "দুধের বাচ্চাকে আগে দিন।" শুনে সবাই হেসে উঠলেন।

এক সময় মুলতানের আমীর বাকের খান লাহোর জেলে এলেন। বাইরে থেকে বাকেরখানী রুটি এলো। খাবার সময় মাওলানা তিনটি রুটি আলাদা নিয়ে বাকের খানকে দিয়ে বললেন, "আপনার তিন বাকেরখানী।" সবাই ইঙ্গিত বুঝে মজা করে হাসলেন। কারণ বাকের খানের তিন স্ত্রী ছিলেন।

৯৩.

জেলে রোযার মাস

লাহোর জেলে দু'মাস থাকাকালেই রমযান মাস এলো। মাওলানার কামরায়ই তারাবীহের নামায পড়া হয়। এদ্দিন ইমামতী করেছেন স্বয়ং মাওলানা। কিন্তু তিনি তারাবীহের ইমামতী করতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। চৌধুরী গোলাম জিলানী মাওলানা নাসরুল্লাহ খান আযীযকে তারাবীহতে কুরআন শুনাবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি যে হাফেয তা আমার জানা ছিলো না। দু'দিন এক পারা করে শুনালেন। আটকে গেলে বা ভুল হয়ে গেলে লুকমা দেবার জন্য পেছনে কোন হাফেয নেই। দু'এক জায়গায় মাওলানা লুকমা দিলেন। এক জায়গায় আটকে যাওয়ায় রুকূতে চলে গেলেন। সালাম ফিরাবার পর কুরাআন দেখে নিলেন। তৃতীয় দিন আর সাহস পেলেন না।

কে তারাবীহ পড়াবেন এ নিয়ে ঠেলাঠেলি চললো। মাওলানা আবদুর রহীমকে কিছুতেই রাজি করা গেলো না। মাওলানাকে প্রায়ই বিষণ্ন দেখা যেতো। দু'জন এক কামরায়ই থাকি। কিন্তু কথাবার্তা কমই হয়। তিনি বেশি সময় শুয়েই কাটান। খুব বেশি পড়তেও দেখি না। মাওলানা ওয়ালীউল্লাহও রাজি হলেন না। শেষ পর্যন্ত মাওলানা আমাকে আদেশ করলেন। আমি আদেশ পালন করা কর্তব্য মনে করলাম।

আমার পুঁজি বেশি ছিলো না। ছাত্র জীবনে সূরা বুরূজ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত মুখস্থ ছিলো। ছোট সময় দাদা সূরা ইয়াসীন মুখস্থ করিয়ে দিয়েছিলেন। '৫৫ সালে রংপুর জেলে দু'মাস থাকাকালে সূরা আর-রাহমান, সূরা মুয্যাম্মিল ও আরো কয়েকটি সূরা মুখস্থ করেছিলাম। লাহোর জেলে আর কয়টি সূরা যোগ হয়।

চান্দিনার মসজিদে আব্বার নির্দেশে মাঝে মাঝে তারাবীহ পড়াতে হতো। তাই আমার সাহস হলো। প্রথমে সূরা ইয়াসীন খণ্ড খণ্ড করে পড়ে বিশ রাকাআত পড়ালাম। মাওলানা খুব পছন্দ করলেন। নামাযে আয়াতগুলো ভাগ করে পড়ায় অভ্যস্ত হওয়ায় অসুবিধা হয়নি।

সূরা তারাবীতে কুরআনের শেষের দশটি সূরা দু'বার পড়ার ব্যাপক রেওয়ায আছে। এটাকে আমি দায়সারা নামায মনে করি। তাই যে কয়দিন আমি ইমামতি করলাম, আমার মুখস্থ করা সব ক'টা সূরা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। মাওলানার পছন্দের কারণে সূরা ইয়াসীন ও সূরা আর-রাহমানই বেশি দিন পড়েছি। মাঝে মাঝে খান সাহেব ও মাওলানা ওয়ালীউল্লাহ ইমামতি করেছেন।

লাহোর জেলে মজলিসে শূরার অধিবেশন

যে জননিরাপত্তা আইনে আমাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সে আইন অনুযায়ী দু'মাসের মধ্যেই হাইকোর্টের বিচারপতির সামনে বন্দিকেই হাযির করতে হয়। বিনাবিচারে এভাবে আটক রাখতে হলে বিচারপতির সম্মতি প্রয়োজন। তাই

জামায়াতের সকল বন্দিকেই লাহোরে সমবেত করা হয়। আমরা যে দালানে ছিলাম তার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। যতটুকু মনে পড়ে, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য সংখ্যা তখন ত্রিশের বেশি নয়। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মাত্র দু'জন। ঘটনাক্রমে আমরা সেখানে হাযির। পশ্চিম-পাকিস্তানের সকল শূরা সদস্যকে লাহোরে জমায়েত করায় মজলিসে শূরার অধিবেশন করাও সম্ভব ছিলো।

মাওলানার সভাপতিত্বে বা-কায়দা কোন অধিবেশন করা না হলেও সবার উপস্থিতিতে বৈঠক হওয়ায় উপরে এ শিরোনাম দিলাম। বৈঠকে মাওলানার নির্দেশেই অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ বক্তব্য রাখার দায়িত্ব নিলেন।

আলোচ্য বিষয় হলো, আমাদেরকে গ্রেপ্তার করার পর এক সপ্তাহের মধ্যে জামায়াতের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে যে অভিযোগ লিখিত আকারে দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে জামায়াতের বক্তব্য কী হওয়া উচিত। ঐ অভিযোগপত্রে দুটো অভিযোগ করা হয়েছে ঃ

১. জামায়াতের আমীর মাসিক তারজুমানুল কুরআনের সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইরান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দু'দেশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছেন।

২. জামায়াত একটি জঙ্গি সংগঠন। কর্মীদেরকে বিপ্লবের ট্রেনিং দেওয়া হয়, যাতে শক্তি প্রয়োগ করে দেশের সরকারি ক্ষমতা দখল করা যায়।

প্রথম অভিযোগের ভিত্তি হলো, মাসিক তারজুমানুল কুরআনে মাওলানার দু'টো লেখা। মহররমের শিক্ষা নামক প্রবন্ধে ইয়াজিদের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের আপত্তির বিষয়টি এমন চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন, যা আইয়ূব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে হুবহু মিলে যায়। আইয়ূব খানের কথা সরাসরি উল্লেখ করা না হলেও এর আঘাত প্রত্যক্ষভাবে তার উপর পড়ে। পাঠকদের পক্ষে এ কথা বুঝতে বেগ পাওয়ার কথা নয়। সরকারি অভিযোগপত্রে এ প্রবন্ধের উল্লেখ নেই বটে; কিন্তু এতে ক্ষিপ্ত হয়েই যে জামায়াতকে বেআইনী করা হয়েছে তা স্পষ্ট।

অভিযোগপত্রে মাওলানার সম্পাদকীয়টির উল্লেখ করা হয়েছে। এতে মাওলানা ইরান সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ইরানের ইসলামী আন্দোলনের উপর দমননীতি চালু করায় এবং আন্দোলনের নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার সমালোচনায়ই মাওলানা লিখেছেন। পাকিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়িয়ে দু'দেশের সম্পর্ক বিনষ্ট করার অভিযোগটি সরকার গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন।

দ্বিতীয় অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হলেও জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করার মতো কঠোর পদক্ষেপকে জায়েয করার প্রয়োজনে এমন গুরুতর অভিযোগ তুলতে হয়েছে।

এ দু'টো অভিযোগের জওয়াব লিখিত আকারে তৈরি করার দায়িত্ব অধ্যাপক খুরশীদ আহমদের উপর ছিলো। তিনি করাচি জেলে ছিলেন।

লাহোর জেলে সমবেত শূরা সদস্যগণের বৈঠকে খুরশীদ সাহেব এ লেখাটাই পড়ে শুনালেন। মাওলানাসহ সবাই লেখাটি চমৎকার হয়েছে বলে মন্তব্য করলেন। কয়েকজন কিছু পয়েন্ট যোগ করার প্রস্তাব দিলেন, খুরশীদ সাহেব তা সাদরে গ্রহণ করলেন।

জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণার বিরুদ্ধে ঢাকা ও করাচী হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। আইয়ূব খানের নির্দেশে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকার জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করে। তাই দু'সরকারের বিরুদ্ধে দু'হাইকোর্টে মামলা করা হয়। জামায়াতের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযোগের জওয়াবে হাইকোর্টে জামায়াতের বক্তব্য পেশ করার উদ্দেশ্যেই ঐ লেখাটি তৈরি করা হয়।

একটি ছোট্ট ঘটনা

জেলের ৪ কামরায় আমরা মাত্র ৬ জন ছিলাম। সব শূরা সদস্যকে এখানে আনায় তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। যারা একটু বয়স্ক বা যাদের ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা তাদেরকে তিন কামরায় গাদাগাদি করে থাকতে হয়। আমাদের কামরায়ও বেশ কয়েকজন এলেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দু'জন হলেন, সীমান্ত প্রদেশের আমীর খান সরদার আলী খান এবং অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ।

আমার বিছানার কাছে খান সাহেবের বিছানা এবং এর পরই খুরশীদ সাহেব। ঘুমের মধ্যে খুরশীদ সাহেবের নাক ডাকার আওয়াজ এতো বেশি যে, আমারও কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেলো। যতবারই ঘুম ভেঙেছে লক্ষ্য করলাম, সরদার আলী খান জায়নামাযে হয় দাঁড়িয়ে, না হয় বসে আছেন। তাঁকে শোয়া অবস্থায় দেখলাম না। ফজরের সময় জিজ্ঞেস করলাম, "সারা রাতে একবারও বিছানায় শোয়া অবস্থায় আপনাকে দেখিনি।" জওয়াবে বললেন, "আপনারা কামরায় মহিষ জবেহ করে রেখেছেন, এ বিকট আওয়াজে বিছানায় কি ঘুমানো সম্ভব?"

সন্ধ্যার বৈঠকে সরকারের অভিযোগের জওয়াবে খুরশীদ সাহেবের বক্তব্য শুনে খান সাহেব এতো সন্তুষ্ট হলেন যে, কামরায় ফিরে এসেই আমাকে বললেন, "গতরাতের দুঃখ ভুলে গেলাম, ভাই খুরশীদকে মাফ করে দিলাম।" একথা বলেই জোরে হাসলেন।

আমার নিকট এটা এক রহস্যই মনে হয়। এতো জোরে যার নাকে আওয়াজ হয়, তিনি কী করে ঘুমান? এ আওয়াজ কি তার কানে ঢুকে না? এর ব্যাখ্যা এখনও আমার অজ্ঞাত।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ঘুমে নাক ডাকার চমৎকার ব্যাখ্যা দেন। তাঁরও নাকি নাক ডাকে। জোরে, না আস্তে ডাকে তা আমার জানার সুযোগ হয়নি। তিনি বলেন, "সাউন্ড স্লিপ" মানে 'স্লিপ উইথ সাউন্ড'। নাক ডাকা মানে কি তাহলে গভীর ঘুম? যাদের নাক ডাকে না তারা কি গভীর ঘুম থেকে বঞ্চিত?

বিচারপতির সামনে হাজির হলাম

আমাদের প্রত্যেককে পৃথক পৃথকভাবে লাহোর হাইকোর্টের বিভিন্ন বিচারপতির সামনে হাজির করা হলো। আমাকে বিচারপতি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার আটকাদেশ সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকলে বলুন।" আমি ইংরেজি ভাষায়ই বক্তব্য রাখলাম। ভেবে ঠিক করেছিলাম যে, আটকাদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে কোন লাভ হবে না। হাইকোর্টে মামলা যদ্দিন চলবে তদ্দিন জেলেই থাকতে হবে। আমি বললাম, "আমার কর্মস্থল পূর্ব-পাকিস্তান। ওখানকার সরকার আমাকে গ্রেপ্তার করলে আইন অনুযায়ী প্রতি ১৫ দিনে একবার আমার পরিবারের লোকেরা জেলে দেখা করতে পারতো। গত দু'মাস আমি ও আমার পরিবার আইনের দেওয়া এ অধিকার থেকে বঞ্চিত। সরকার এ আইন অমান্য করে চরম অন্যায় করেছেন। আমি এর প্রতিকার চাই। প্রতি ১৫ দিনে একবার ঢাকা থেকে আমার পরিবারকে এনে আমার সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হোক।"

আমার বক্তব্য শুনে বিচারপতি সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন, "অধ্যাপক গোলাম আযমকে অবিলম্বে ঢাকায় পাঠাতে হবে।"

জেলে ফিরে এসে জানা গেলো যে, অপর এক বিচারপতি মাওলানা আবদুর রহীমের ব্যাপারেও অনুরূপ আদেশ দিয়েছেন।

ঢাকা রওয়ানা

১৯৬৪ সালের ৬ জানুয়ারি আমি ও মাওলানা আবদুর রহীম লাহোরে গ্রেপ্তার হই। ৫ মার্চ দু'মাস পূর্ণ হয়। পরদিন ৬ মার্চ আমাদের দু'জনকে ঢাকা ফেরত পাঠাবার কথা। লাহোর জেলে শেষের ২/৩ দিন মনের এমন অবস্থা ছিলো, যা দুনিয়ার জীবনের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। ঢাকা জেলে গেলে আব্বা-আম্মা, স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন ও অন্যান্য আপনজনদের দেখা পাওয়ার খুশি, অপরদিকে মাওলানার সান্নিধ্য থেকে মাহরূম হওয়ার বেদনা আমার মনে অস্থিরতা সৃষ্টি করলো। একই কারণে আনন্দ ও বেদনার মিশ্র অনুভূতি এই প্রথম। এ জাতীয় অভিজ্ঞতা ইতঃপূর্বে হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

আব্বা-আম্মার জীবনে এ জাতীয় ঘটনার কথা মনে পড়ে। মেয়েকে সুপাত্রে বিয়ে দিতে পেরে দু'জনকেই খুব আনন্দিত ও তৃপ্ত দেখেছি। কিন্তু কন্যাকে বিদায় করার সময় দু'জনের কান্না আমাকে বিস্মিত করেছে। একই ঘটনা তাদের জন্য একদিকে আনন্দ ও অন্যদিকে বেদনার কারণ।

যা হোক, ৬ মার্চ মাওলানা মওদূদী থেকে বিদায় নেবার সময় আমার চোখে পানি এলো। মাওলানা সান্ত্বনা দিলেন, "ইনশা-আল্লাহ আবার দেখা হবে। দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। দোয়া করুন, যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বেহেশতে একত্রিত করেন। ওখানে স্থায়ী মিলন, সেখানে বিচ্ছেদ নেই।"

আমাকে ও মাওলানা আবদুর রহীমকে লাহোর জেল থেকে সরাসরি বিমানবন্দরে

নিয়ে গেলো। ইতঃপূর্বে কখনো সরকারি গাড়িতে চড়িনি। এখন আমরা সরকারি মেহমান। বিমানে বসিয়ে দেবার পর হাতে টিকেট তুলে দিলো। করাচীতে প্লেন বদল হবে। বিমানের সিঁড়ি থেকেই দু'জন সরকারি লোক আমাদেরকে নিয়ে ঢাকাগামী প্লেনে উঠিয়ে দিলো। লক্ষ্য করলাম, তারা নিচে অপেক্ষা করছেন। বিমান আকাশে উড়ার জন্য রওয়ানা দেবার পর হয়তো তাদের ডিউটি সমাপ্ত হবে।

দু'মাস বাধ্যতামূলক আটক থাকার পর ঢাকা যাচ্ছি। এটা অবশ্যই খুশির বিষয়। কিন্তু আমরা জানতাম যে, আমরা মুক্তি পাইনি। ইতঃপূর্বে বহুবার করাচী থেকে বিমানে ঢাকা এসেছি। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। অন্য সময় ঢাকা বিমান বন্দরে নেমে বাড়ি যাই। এবার বাড়ির বদলে ঢাকার জেলেই যেতে হবে, সে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম। তাই ঢাকা যাচ্ছি বলে যে আনন্দবোধ করার কথা এর কোন লক্ষণই মনে তালাশ করে পেলাম না। পি আই এ'র বিমানে আগেও এসেছি। কিন্তু এবারের অনুভূতির সাথে আগের কোন মিল নেই। অথচ একই বিমান। একই অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও মনের অবস্থার পরিবর্তনে অনুভূতি অবশ্যই বদলে যায়।

প্লেনে বসে আছি স্থির হয়ে, কিন্তু মনে কতো কথা যে ঘুরপাক খাচ্ছে তার হিসাব নেই। দু'মাস থেকে বাড়ির সাথে যোগাযোগ নেই। কে কেমন আছে জানি না। বিশেষ করে ছোট ছেলে দেড় বছরের নোমানের কথা বেশি মনে পড়লো। পূর্ব-পাকিস্তানের জামায়াত নেতাদের কে কে গ্রেপ্তার হলেন তা সঠিক জানা নেই। জামায়াত অফিস তো নিশ্চয়ই সিল করা হয়েছে। এসব কথা বসে বসে ভাবছি।

হঠাৎ দেখলাম, মুয়ায্যাম হুসাইন চৌধুরী সিএসপি মাঝের প্যাসেজ দিয়ে এগিয়ে আসছেন। সম্ভবত টয়লেটে যাচ্ছিলেন। আমার কাছে আসতেই দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালাম। আমাকে দেখেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়নে তিনি ভিপি ছিলেন আর আমি জিএস। স্বাভাবিকভাবে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তিনি ইসলামাবাদে কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব। ছুটিতে যাচ্ছেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, আমি জেলে আছি। কিন্তু কোথায় আছি তা জানতেন না। তাকে বললাম যে, আমাকে বিমান-বন্দর থেকেই জেলে নিয়ে যাবে। আপনি আব্বাকে ফোন করে জানালে অনুমতি নিয়ে জেলে দেখা করতে আসবেন। বাড়ির ফোন নম্বর নোট করে নিলেন।

ঢাকায় বিমান থেকে বের হবার সাথে সাথেই সরকারি মেযবানরা আমাদেরকে অভ্যর্থনা করে দু'জনকে দু'গাড়িতে তুললেন। এসবি পুলিশের যারা গাড়িতে ছিলেন তাদের পরিচয় নিলাম। জামায়াত কী চায় ও কেন জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করা হলো তা বললাম। আরও বললাম যে, আপনারা আমাকে ধরে নিয়ে এলেন বলে আমি মনে কিছু করি না। আপনারা আপনাদের ডিউটি করছেন। আপনাদেরকে দোষ দেই না। এভাবে পরিবেশ গড়ে উঠলে তারাও আমার বাড়ি-ঘরের খবর জানতে চাইলেন। তাদেরকে বললাম যে, আমাকে বাড়িতে একটু ফোন

করার সুযোগ দেন, যাতে তারা জানতে পারে যে, আমি ঢাকা জেলে আছি। তারা জেলগেট থেকেই আমাকে ফোন করার সুযোগ করে দিলেন।

ঢাকা জেলে পৌঁছলাম

জেলের ভেতরেও জেল আছে। এর নাম সেল। ১০ সেল নামক দালানে দু'জনকে দু'সেলে থাকার ব্যবস্থা করা হলো। সেল মানে ছোট একটা কামরা। তাতে একটা বিছানা। পড়ার জন্য একটা চেয়ার ও টেবিল। রাতে পেশাব-পায়খানার জন্য কামরার ভেতরেই ৩/৪ ফুট উঁচু দেয়াল ঘেরা জায়গা। কামরায় ঢুকবার জায়গায় কোন দরজা নেই। লোহার সিকের তৈরি গেট আছে, যাতে সন্ধ্যার আগেই তালা লাগায়। সকালে বেশ ফর্সা হওয়ার পর তালা খুলে দেয়।

ঐ সময় দশটি সেলের মধ্যে দু'টোতে জামায়াতের দু'নেতাকে পেলাম, ঢাকা শহর আমীর ইঞ্জিনিয়ার খুর্‌রাম মুরাদ ও প্রাদেশিক শূরার সদস্য অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ হেলালুদ্দীন। আমরা দু'জন দু'সেল দখল করলাম। বাকি ৬টি সেল তখন খালি।

জেলের বিভিন্ন এলাকা উঁচু দেয়ালে ঘের দেওয়া আছে, যাতে এক এলাকার বন্দিরা অন্য এলাকায় যেতে না পারে। আমাদের দশ সেল বাকি জেলখানা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দশ সেলের প্রধান গেটে পাহারা থাকে। সেখানেও রাতে তালা লাগানো হয়। রাতে জেল পুলিশ সেলের বাইরে টহল দেয়। সেলের ভেতরে বন্দিরা কী করে না করে তা যাতে বাইরে থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, সে জন্যই সেলে কোন দরজা নেই।

মুরাদ সাহেব ও হেলাল সাহেব থেকে জানা গেলো যে, পূর্ব-পাকিস্তানে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ১১ জনের কেউ কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন না। তাঁরা প্রাদেশিক শূরার সদস্য ছিলেন। পশ্চিম-পাকিস্তানে শুধু কেন্দ্রীয় শূরার সদস্যদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে প্রাদেশিক শূরার সদস্যদেরকেও আটক করা হয়।

পূর্ব-পাকিস্তানের তিনজন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য এমএনএ হওয়ায় গ্রেপ্তার থেকে বেঁচে গেলেন। তাঁরা হলেন, জনাব আব্বাস আলী খান, জনাব শামসুর রাহমান ও মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ।

পূর্ব-পাকিস্তানের জামায়াত নেতাদের যে ১১ জন গ্রেপ্তার হলেন তাদের নাম সংগ্রহ করতে মাস্টার সফীকুল্লাহ ও মাওলানা সিফাতুল্লাহর সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের ১০ জনের নাম জনাব খুর্‌রাম মুরাদ, মাওলানা হেলালুদ্দীন, মাস্টার শফীকুল্লাহ, মাওলানা সিফাতুল্লাহ, অধ্যাপক ওসমান রময্ (কুষ্টিয়া), মাস্টার আবদুল ওয়াহেদ (যশোর), জনাব আবদুল খালেক, মাওলানা আবদুর রহমান ফকীর, জনাব শামসুল হক (সিলেট) ও মাওলানা মীম ফযলুর রহমান। আর একটি নাম সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যায়নি। তিনি হয় রংপুর জেলা আমীর মাওলানা আবদুল গফুর, আর না হয় অন্য কেউ।

জেলে স্থান পরিবর্তন

আমি ও মাওলানা আবদুর রহীম ১০ সেলে এক মাস ছিলাম। মুরাদ সাহেব ও মাওলানা হেলালুদ্দীনের সাথে দিনের বেলা একসাথেই খেতাম। রাতে যার যার সেলে তালাবদ্ধ। বিকালে মাওলানা হেলালুদ্দীনের সাথে রিং খেলে বা খালি হাতে ব্যায়াম করে কাটাতাম। একদিন রিং ধরতে মাওলানার আঙুলে ব্যথা পাওয়ায় বেশ ক'দিন খেলা হয়নি।

আর যারা জেলে ছিলেন তারা অন্য জায়গায় থাকায় তাদের সাথে দেখা হতো না। একমাস পর জনাব আবদুল খালেক ও মাওলানা আবদুর রহমান ফকীর ছাড়া অন্য ৯ জনকে মুক্তি দেওয়া হলো। প্রথমে দু'মাসের জন্য আটকাদেশ দেওয়া হয়। এরপর একমাস একমাস করে আটকের মেয়াদ বাড়ানো হয়। কারো কারো মেয়াদ একসাথে দু'মাস বা তিন মাস বাড়ানো হয়ে থাকে। তিন মাস মেয়াদ শেষ হবার পর ৯ জন মুক্তি পেলেন। লাহোর থেকে আসা আমরা দু'জন ও ঐ দু'জনকে একত্র করা হলে আমরা ৪ জন একসাথ হলাম। এদ্দিন দালানে ছিলাম, এখন যেখানে আনা হলো এটা দেয়ালের উপর ৪ চালা একটা বড় ঘর। এর নাম ছিলো 'দেওয়ানি'। ব্রিটিশ আমল থেকে এ নাম চালু রয়েছে। ফৌজদারি আইনে যারা সাজা পায় তারা সশ্রম কয়েদী। দেওয়ানি আইনে যারা সাজা পায় তাদের জেল হলেও জরিমানা দিয়ে মুক্তি পেতো। জরিমানা দিতে অক্ষমদেরকে এ ঘরে রাখা হতো। তারা নিজের খরচে থাকতো। দেওয়ানি মামলা হয় সম্পত্তি নিয়ে। তাই আসামিরা গরীব নয়। তাই জরিমানা দিয়ে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যেতো।

আমরা দেওয়ানি'তে উঠবার পর জেল কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা গেলো যে, এ ঘরটিতে মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন সময় ছিলেন। '৭২ সালে শেখ মুজিব ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এ ঘরটিকে খালি করে 'মুজিব-স্মৃতি' হিসেবে রাখা হয়। বর্তমানে ঘরটি কী অবস্থায় আছে জানা নেই।

৬ এপ্রিলে আমরা এ ঘরটিতে উঠি। ১০ সেলে দেয়ালে ঘেরা ছিলাম বলে বাইরে কিছুই দেখতে পেতাম না। দেওয়ানি দেয়াল ঘেরা নয়। ঘরের সামনে জেলখানার অভ্যন্তরীণ রাস্তা। রাস্তার অপর পাশে দেয়াল ঘেরা পাগলাগারদ। সারারাত পাগলদের চিৎকার ও হৈচৈ শুনা যায়। দেওয়ানির নিজস্ব আঙিনায় ছোট্ট সুন্দর একটি বাগান আছে। বাগানের সীমানা পার হলেই বেশ বড় সবুজ মাঠ, যার পাশে ২০ সেলের অবস্থান।

আমাদের ঘরের মেঝে বেশ উঁচু। বিছানার পাশে চেয়ার-টেবিল। বসলে বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত জেলের এলাকা দেখা যায়। সকাল-বিকাল বাগানে একটু দৌড়াই, খালি হাতে ব্যায়াম করি। প্রশস্ত বারান্দায় যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায জামাআতে পড়ি। ইশা ও ফজর ঘরে তালাবদ্ধ অবস্থায় জামায়াতে আদায়

করি। একসাথে খাই। নাস্তা ও খাবার সময় প্রচুর সময় নিয়ে আলাপ-সালাপ চলে। আলাপে খালেক সাহেবই সবার চেয়ে পটু। তিনি আমাদের মজলিস জমিয়ে রাখেন।

জেলে পরিবার-পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ

লাহোর থেকে ঢাকা জেলে পৌঁছার ৩/৪ দিন পরই আব্বা, আমার স্ত্রী ও দেড় বছরের ছেলে নোমানকে নিয়ে, কারাগারে আসলেন। আব্বা লাহোরে আমার গ্রেপ্তারী ও জেলে দু'মাস থাকার কাহিনী শুনলেন। আমি ৬ মার্চ জেলগেট থেকেই আব্বার সাথে কথা বলেছি। আব্বা জানালেন যে, মুয়ায্যাম হোসেন চৌধুরী সিএসপিও পরের দিন ফোন করে জানিয়েছেন। চৌধুরী সাহেব কথা রাখায় খুব খুশি হলাম।

নোমানকে আদর করে কোলে নিতে চাইলাম। সে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো। কিন্তু কোলে আসতে কিছুতেই রাজি হলো না। মাত্র দু'মাসেই সে আমাকে ভুলে গেলো? বেশ খারাপ লাগলো। ছোট সন্তানই বেশি আদরের হয়। সে আদর নিতে রাজি না হওয়ায় বিস্ময়ের চেয়ে বেদনাই বেশি বোধ করলাম।

আব্বার সাথেই বেশি কথা হলো। পুলিশের লোক সাক্ষাতের সময় উপস্থিত থাকলেও আমি সরকারের বিরুদ্ধে বলার থাকলে বলে যাই। তাদের নোট করার থাকলে করবে, অভিযোগ করতে চাইলে করবে, কিন্তু আমার কোন কথায় আপত্তি করার কোন অধিকার আমি স্বীকার করি না। জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করা ও আমাদের সকল নেতাকে গ্রেপ্তার করা যে সরকারের জঘন্য অপরাধ, সে কথা আব্বার সামনে বলে আশা প্রকাশ করলাম যে, হাইকোর্টে মামলায় আমরা ইনশা-আল্লাহ্ বিজয়ী হবো। ঘণ্টাখানিক পর তারা বিদায় হয়ে গেলেন। কিছু খাবার ও ফল দিয়ে গেলেন। ১৫ দিন পর আবার আসবেন বলে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।

যে আইনে আমি গ্রেপ্তার হই, সে আইন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আত্মীয়-স্বজন এসে দেখা করতে পারে। সে হিসেবে নিয়মিত সাক্ষাৎ হতো। প্রতিবারই স্ত্রী ও ছোট ছেলে আসতো। অন্যদের মধ্যে আব্বা, আম্মা, ছেলেরা, ভাই-বোন, শ্বশুর-শাশুড়ি, শালা-সম্বন্ধীরা আসতে পারতো। তবে এক সাথে ৫ জনের বেশি নয়। বন্দিদের জন্য এ সাক্ষাতের দিনটি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক। একবার সাক্ষাতের দিন দশেক পরই দিন গণনা শুরু হয়। নির্দিষ্ট তারিখটি এলে প্রতি মুহূর্তে অপেক্ষায় থাকি কখন খবর আসবে।

আমরা রাজবন্দি। তাই আমাদের মর্যাদা আলাদা। জেল কর্তৃপক্ষ ও জেল পুলিশ (ওয়ার্ডেন) আমাদের সাথে অন্যায় আচরণের সাহস পায় না। কিন্তু সাধারণ কয়েদীদের সাথে তাদের আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে এলে ঘুষ বাধ্যতামূলক। কিছু খাবার নিয়ে এলে ঘুষের পরিমাণ বাড়ে। তাই পাহারাদাররা গেটে ডিউটি পেলে সবচেয়ে খুশি।

৯৪.

ঢাকা জেলে সাড়ে পাঁচ মাস

১৯৬৪ সালের ৬ মার্চ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে আগস্টের মাঝামাঝি মুক্তি পাই। প্রায় সাড়ে ৫ মাস এ জেলে কাটাই। এর মধ্যে প্রথম ১ মাস ১০ সেলে ছিলাম। বাকি সাড়ে ৪ মাস 'দেওয়ানি'তে ৪ জন এক সাথে থাকি।

সম্ভবত জুন মাসে ঢাকা হাইকোর্ট জামায়াতের পক্ষে এবং লাহোর হাইকোর্ট সরকারের পক্ষে রায় দেয়। তাই সরকার ঢাকা হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টে আপীল করে এবং জামায়াত লাহোর হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে।

ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুরশিদ জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করাকে আইনের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে বলিষ্ঠ রায় দেন। এ রায়ের পর ঢাকা হাইকোর্টে আমাদের ৪ জনের আটকাদেশের বিরুদ্ধে হেবিয়াস কর্পাস মামলা হয়। হাইকোর্ট মুক্তির আদেশ দিলে আমাদের কারাজীবনের অবসান হয়।

আটকাদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির অমানবিক পদ্ধতি

তথাকথিত নিরাপত্তা আইনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিনা বিচারে আটক করা নিঃসন্দেহে অমানবিক। বাংলাদেশে এ জাতীয় কালা-কানুনের নাম হলো স্পেশাল পাওয়ারস অর্ডিন্যান্স, যা শেখ মুজিব ১৯৭৪ সালে রাজনৈতিক বিরোধীদেরকে দমনের উদ্দেশ্যে চালু করেন। এরশাদের আমলে, এরপর বিএনপি আমলে, এরপর আওয়ামী লীগ আমলে এবং বর্তমান জোট সরকার আমলেও বিনা বিচারে ঐ আইনে আটকের ঐতিহ্য বহাল আছে। বিরোধী দলে থাকাকালে সব দলই এ আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। ক্ষমতায় গেলে আবার সব দলই এ আইনটির ফযীলত উপলব্ধি করে।

এ অমানবিক আইনের প্রয়োগে আরো অমানবিক আচরণ করা হয়। প্রথমে এক মেয়াদের জন্য আটকাদেশ দেবার পর মেয়াদ শেষ হবার এক বা দু'দিন পূর্বে আবার মেয়াদ বৃদ্ধির আদেশ দেওয়া হয়। বন্দি যখন প্রবল আশায় মুক্তির দিনক্ষণ গুনছে তখন হঠাৎ মেয়াদ বৃদ্ধির খবর দিয়ে মন ভেঙে দেবার ব্যবস্থা করা হয়। সপ্তাহ দু'সপ্তাহ আগে জানালে এ মানবিক যাতনা থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো। মেয়াদ শেষ হবার কাছাকাছি সময় বন্দি মুক্তির জন্য যখন আশান্বিত হয় তখন আশা ভঙ্গ করে সরকারি কর্মকর্তারা হয়তো মজা উপভোগ করেন।

আমাদের ৪ জনের এ তিক্ত অভিজ্ঞতাই হয়েছে। ঢাকা জেলে প্রথমে দু'মাসের আটকাদেশ দেওয়া হলো। এরপর উপরিউক্ত পদ্ধতিতেই আবার দু'মাস মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলো। হাইকোর্টের রায় জামায়াতের পক্ষে হওয়ায় ৪র্থ মাস শেষ হলে মুক্তি পাবো বলে খুবই আশান্বিত হলাম। কিন্তু মেয়াদ শেষের আগের দিন আবার দু'মাসের আদেশ পেলাম। তাই মুক্তির জন্য শেষ পর্যন্ত হেবিয়াস কর্পাস মামলার আশ্রয় নিতে হলো।

জেলে আমরা ৪ ভাই

একই আদর্শে বিশ্বাসী, একই আন্দোলনের দায়িত্বশীল এবং একই জীবনধারায় অভ্যস্ত আমরা ৪ জন সাড়ে ৪ মাস একঘরে এমনভাবে কাটালাম, যা কখনো আপন ভাইদের সাথেও সম্ভব হয়ে উঠে না। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মধ্যে গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিলো। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কল্যাণকামী। মেজাজ ও অভ্যাসে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য তো থাকেই। এ কারণে আমাদের মধ্যে কোন সমস্যা দেখা দেয়নি।

আমি ও খালেক সাহেব সমবয়সী। মাওলানা আবদুর রহীম ও মাওলানা আব্দুর রহমান ফকীর আমাদের চেয়ে যথাক্রমে ৫ ও ৩ বছরের বড়। খালেক সাহেব রসিক মানুষ ছিলেন। আমি তাঁর রসিকতায় পূর্ণরূপে শরীক হতাম এবং অবদানও রাখতাম। ফকীর সাহেব রসিকতা উপভোগ করতেন, অবদান রাখতেন না। মাওলানা আবদুর রহীম গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমাদের রসিকতায় কখনো বিরক্ত হতেন না। ছোট ভাইদের বাচালতা মনে করে একটু হাসতেন। মাওলানার সাথে রসিকতা করে সাড়া পাওয়া যায় না বলে তাকে আমরা বিরক্ত করতাম না। সাংগঠনিক দিক দিয়ে তো তিনি আমাদের আমীর এবং বয়সের দিক দিয়েও মুরুব্বী। দীনের ইলমের ব্যাপারে তাকে উস্তাদ হিসেবেই শ্রদ্ধা করতাম। খালেক সাহেব ছিলেন আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

বিকালে উভয় মাওলানা বাগানে কিছুক্ষণ পায়চারি করতেন। খালেক সাহেব বিকালের খেলার সাথীও ছিলেন। ব্যাডমিন্টন খেলার মতো প্রশস্ত মাঠ থাকলে আমরা দু'জন খেলতে পারতাম। একমাত্র রাবারের রিং আদান-প্রদানের মধ্যে আমাদের দু'জনের খেলা সীমাবদ্ধ ছিলো। জেলে কোন পরিশ্রমের কাজ না থাকায় রাজবন্দিরা মোটা হয়ে যায়। তাই আমি সকাল-বিকাল নিয়মিত ব্যায়াম করতাম ও দৌড়াতাম। বাটা কোম্পানির কাপড়ের স্পোর্টস জুতা পরে, সাদা হাফ সার্ট ও পায়জামা পরে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত শরীরচর্চা করতাম।

মাওলানা আবদুর রহীম খাওয়ায় বেশ আগ্রহী ছিলেন। তাই তরিতরকারি প্রথমে তার সামনে দেওয়া হতো। তিনি নেবার পর আমরা নিতাম। জেলের ডাক্তার মাওলানাকে চর্বি খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু মাওলানা বেছে বেছে চর্বিগুলোই পয়লা নেন। আমি ডাক্তারের দোহাই দিলে তিনি বলেন, "ডাক্তাররা এমন বলেই থাকে। যেটা মজা লাগে সেটাই স্বাস্থ্যের জন্য ভাল মনে করি।"

ঐ সাড়ে ৪ মাসের কারাজীবনের স্মৃতি আমার নিকট এখনও অম্লান রয়েছে। আমাদের পারস্পরিক গভীর ভালোবাসার পবিত্র ভাব আজও আমি অনুভব করি। আমরা অপরাধী হিসেবে জেলে ছিলাম না। আমাদেরকে অন্যায়ভাবে আটক রেখে সরকারই অপরাধ করেছে; এ মনোভাব আমাদের জেল জীবনে প্রেরণা যুগিয়েছে।

কারাগার নয়; শিক্ষাগার

রাজবন্দিদেরকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদীর মর্যাদা দেওয়া হয়। সবাই সম্মান করে।

ভালো মানের খাবার ও থাকার ব্যবস্থা করা হয়। অথচ ২৪ ঘণ্টাই অবসর। কেউ যদি এ অবসর সময়টাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে তাহলে এমন কিছু অর্জন করা সম্ভব, যা অন্য কোনভাবে সহজ নয়।

১৯৯২-৯৩ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৬ মাস থাকাকালে সময়টা যেভাবে কাজে লাগিয়েছিলাম, পূর্বে সেভাবে পারিনি বলে আমি আফসোস করি। ঐ সময় ইসলামী ছাত্রশিবিরের ছেলেরা বারবার গ্রেপ্তার হচ্ছিলো। মেস থেকে ধরে নিয়ে জেলে আটক করছিলো। এদের তো জেলের কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাই ওদের কথা খেয়াল করেই একটি চটি বই লিখলাম। নাম রাখলাম 'মুমিনের জেলখানা'। কোন মুমিন যে কোন কারণেই হোক, যদি বন্দি জীবনযাপনে বাধ্য হয় তাহলে জেল জীবন কিভাবে কাটালে ভাল হয়, এ বিষয়ে পুস্তিকাটিতে যথেষ্ট পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কারাগারকে শিক্ষাগারে পরিণত করা সম্ভব। বিশেষ করে রাজনৈতিক কারণে যারা বন্দি থাকে তাদের এ বাধ্যতামূলক অবকাশ দেশ ও জাতির জন্য মূল্যবান অবদান রাখার সুযোগ দেয়। ব্যাপক অধ্যয়ন ও বই লেখার জন্য প্রচুর সময় পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য সেখানে সাধনার নিরঙ্কুশ সুযোগ রয়েছে। জেলে লেখাপড়া করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেবার উদাহরণ অনেক আছে।

জেল জীবনের সেরা অর্জন আল্লাহ তাআলার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপলব্ধি। আপনজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এমন একজনকে আপন বলে অনুভব করা যায়, যাকে নির্জনেই কাছে পাওয়া সম্ভব। অসহায় অবস্থায় তো তিনিই একমাত্র সহায়। বিপদে পড়লেই তো তাকে প্রাণভরে ডাকা হয়। ৬৪ সালে চারজন একসাথে থাকায় নির্জনতার স্বাদ তেমন পাওয়া যায়নি। ৯২-৯৩ সালে ১৬ মাস একটানা সেলে একা থাকায় নির্জনতা উপভোগ করার সৌভাগ্য হলো।

জেলে অধিকার আদায়

জেল কোডে আমাদের জন্য আইনগতভাবে যেসব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া আছে, তা দেবার ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষ যাতে কোন ত্রুটি না করে সেদিকে আমার সজাগ দৃষ্টি ছিলো। এর জন্য কোন চাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয়নি। কোড চেয়ে নিয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় নোট নিয়ে ফেরত দিলাম। কোড থেকে সব কথা জানা গেলো বলে দাবি করা ছাড়াই সবকিছু পেতাম। মাঝে মাঝে শুধু স্মরণ করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু একটি বিষয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট বার বার জোর দাবি জানাতে হয়েছে।

'দেওয়ানি' ঘরে আমরা ৬ এপ্রিল উঠলাম। গরম পড়া শুরু হয়ে গেছে। দুপুরে ফ্যানের প্রয়োজনবোধ হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র সচিবকে লিখলাম ৪ জনের জন্য ৪ টি সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা করতে। জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জানানো হলো যে, প্রথম শ্রেণীর কয়েদীদের জন্যও ফ্যান দেবার বিধান নেই। তাই দরখাস্ত মঞ্জুর করা সম্ভব হলো না।

আবার লিখলাম। যুক্তি দিলাম যে, আমরা সবাই ফ্যান ব্যবহারে অভ্যস্ত। তাই

গরমে খুব কষ্ট পাচ্ছি। আমরা সাজাপ্রাপ্ত কয়েদী নই। সরকার নিজস্ব প্রয়োজনে আমাদেরকে আটক রেখেছেন। আমাদেরকে গরমে দৈহিক নির্যাতন ভোগ করতে বাধ্য করা অত্যন্ত আপত্তিকর।

এবার সুফল দেখা গেলো। ফ্যানের ব্যবস্থা হয়ে গেলো। জেল কর্মকর্তাদের থেকে জানা গেলো যে, মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিব ও আমরা ছাড়া ইতঃপূর্বে আর কেউ ফ্যান আদায় করতে পারেনি। এতে জেল কর্তৃপক্ষের নিকটও আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। আর কোন অধিকারের জন্য দাবি জানাবার প্রয়োজন হয়নি।

আমরা জেল কর্মকর্তাদের সাথে সম্পর্ক মধুর রাখার চেষ্টা করতাম। আমাদেরকে শরীফ মানুষ হিসেবেই তারা সম্মান করতেন। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার সাথে সামান্য তিক্ততা দেখা দিলো। দেওয়ানি ঘরটির এলাকায় রাস্তার পাশে কয়েকটি ফল গাছ আছে। একটি গাছ লাগাবার মতো খালি জায়গা থাকায় আমি বাড়ি থেকে একটা জাম গাছের চারা আনালাম। আমার সাথে সাক্ষাতের জন্য আসা আমার স্ত্রী সুন্দর চারাটি আমাকে দেবার সময় উপস্থিত ডেপুটি জেলার বললেন যে, ডিআইজি সাহেবের অনুমতি নিয়ে পরে দেবেন। এ কথা বলে চারাটি নিয়ে নিলেন। আব্বা মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, "তুমি গাছ লাগাও, তোমার ছেলেরা যাতে তোমার মতো জেলে এসে ফল খেতে পারে।"

বাগানে মালির দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েদীকে দিয়ে চারাটি লাগাবার জায়গা গর্ত করে রেডি করা হলো। কিন্তু জেল অফিস থেকে চারাটি দিচ্ছে না। কারণ জানা গেলো, কারাগারে কোন রাজবন্দির লাগানো গাছ তার স্মৃতি বহন করুক, তা সরকার চায় না বলে ব্রিটিশ আমল থেকেই নাকি এভাবে গাছ লাগাবার অনুমতি দেওয়া হয় না। সমস্যায় পড়ে গেলাম।

সপ্তাহে একবার ডিআইজি সাহেব পরিদর্শনে আসলে আমাদের সাথেও দেখা করে যান। আমি তার আগমনের অপেক্ষায় রইলাম। ডিআইজির সাথে তর্ক যুদ্ধের পর তিনি গাছটি লাগাবার অনুমতি দিলেন। আমার নিয়মিত যত্নে চারাটি বেশ বেড়ে উঠতে লাগলো। মাস দু'য়েক পর জেল থেকে মুক্তি পেলাম। পরে খবর নিয়ে জানলাম, চারাটি তুলে ফেলা হয়েছে। হয়তো অনুমতি দেবার সময় ফেলে দেবার এ সিদ্ধান্ত নিয়েই আমার অনুরোধ রক্ষা করা হয়।

কারাগারের হাসপাতালে

সম্ভবত জুলাই মাসে আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হলো। বহুবার এ জ্বরে ভুগেছি। কিন্তু এমন তীব্র ব্যথা কখনো হয়নি। জেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। ডাক্তার বললেন, এটা ঢাকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জ্বর। সারা শরীরে এমন প্রচণ্ড ব্যথা যে, মনে হয় হাড় পর্যন্ত গুড়িয়ে দিচ্ছে। মাথা তো তোলাই যায় না। হাসপাতালে ডাক্তার সাহেব খুব যত্ন নিলেন। তিন দিনের মধ্যেই উপশম বোধ করলাম। হাসপাতালে নামাযের জন্য একটু জায়গা থাকলেও এ কয়দিন যেতে পারিনি। বিছানায়ই নামায আদায় করতে

বাধ্য হয়েছি। কিছুটা সুস্থবোধ করায় নামাযের জায়গায় গেলাম। অলি আহাদ সাহেবের সাথে দেখা হলো। তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় যা জানতাম তাতে তিনি নামায পড়েন বলে ধারণা ছিলো না। ৩/৪ দিন হাসপাতালে এক সাথে নামায আদায়ের সুযোগে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অগ্রসর করার ব্যাপারে মতবিনিময় হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে জনাব অলি আহাদ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ মর্যাদা হাসিল করেন। তাঁর সাথে ইতঃপূর্বে আমার তেমন পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমার সমসাময়িক ছাত্র ছিলেন কিনা মনে পড়ছে না। যা হোক জেলেই তাঁর সাথে আমার প্রথম ঘনিষ্ঠতার সুযোগ হয়। আমার মুক্তির মাস খানিক পর তিনি জেল থেকে মুক্তি পান।

জেল থেকে মুক্তি

১৯৬৪ সালের আগস্টের মাঝামাঝি হাইকোর্টের নির্দেশে আমরা ৪ জন মুক্তি পাই। দু'মাস লাহোরে এবং সাড়ে পাঁচ মাস ঢাকায় মিলে প্রায় সাড়ে ৭ মাস কারা ভোগের পর বাড়িতে ফিরে এলাম। সবচেয়ে খুশি হলেন আম্মা। এটাই মায়ের বৈশিষ্ট্য। আম্মা সম্ভবত একবার মাত্র জেলে গিয়েছিলেন। আম্মার অসুস্থতা উপলক্ষে একবার কয়েক ঘণ্টার জন্য 'পেরোলে' বাড়িতে এসেছিলাম। পেরোলের অনুমতি পেতে বিলম্ব হওয়ায় বাড়িতে এসে আম্মাকে সুস্থ পেয়ে বেশি আনন্দ পেলাম। কয়েক ঘণ্টার অবিরাম সাক্ষাতে ছোট ছেলে নোমান আমাকে চিনতে শুরু করে। জেলে থাকাকালে ওর নিকট থেকে পিতার স্বীকৃতি পাইনি।

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ঐক্য

আমরা জেলে আটক থাকাকালেই ২০ জুলাই (১৯৬৪) ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দীনের বাসভবনে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), নেযামে ইসলাম পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধিদের বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন জামায়াতের ৪ জন এমএনএ। এ প্রথম বৈঠকে মাওলানা ইউসুফ অংশগ্রহণ করেন। আর কে কে জামায়াতের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন তা মাওলানা স্মরণ করতে পারলেন না। বৈঠকে ঐ ৫টি দলের সমন্বয়ে COP (Combined Opposition Parties) নামে একটি ঐক্যমঞ্চ গঠন করা হয় এবং নয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

এ ঐক্যের উদ্দেশ্য ছিলো আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া। আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালে ২ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন, মার্চে জাতীয় পরিষদ ও এপ্রিলে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দেন। উক্ত ৫ দল জোটবদ্ধ হয়ে এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

আমরা জেল থেকে বের হয়ে আসার পর COP-তে প্রাদেশিক জামায়াতের

প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। প্রতি দল থেকে ৫ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। পাকিস্তান জাতীয় কমিটিতে প্রত্যেক দলের ৬ জন প্রতিনিধি রাখার সিদ্ধান্ত হয়। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে মাওলানা আবদুর রহীম, আমি ও মাওলানা ইউসুফ জামায়াতের প্রতিনিধি নিযুক্ত হই।

প্রাদেশিক কমিটিতে আহ্বায়কের দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় যে, এক মাস করে এক-এক পার্টির প্রতিনিধি এ দায়িত্ব পালন করবে। সে হিসেবে জামায়াতের পক্ষ থেকে আমি এক মাস এ দায়িত্ব পালন করি। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ূব খান বিজয়ী হওয়ার পর COP-এর তৎপরতা স্তব্ধ হয়ে যায়।

সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী মনোনয়ন

১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর করাচীতে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খানের সভাপতিত্বে জাতীয় কমিটির বৈঠক বসে। আওয়ামী লীগের অবিসংবাদিত নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালের ৫ ডিসেম্বর বৈরুতের এক হোটেলে পরলোক গমন করেন। তাঁর মতো একজন বড় নেতা নির্জনে বিদেশের হোটেলে এভাবে মৃত্যুবরণ করা স্বাভাবিক মনে হয়নি। তাঁর সাথে আত্মীয়-স্বজন দূরে থাক, দলীয় কোন ব্যক্তিও ছিলেন না। এটা সত্যিই রহস্যময়। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর নওয়াবযাদা আওয়ামী লীগের সভাপতি হন।

উক্ত বৈঠকে জামায়াতের পূর্ব-পাক প্রতিনিধি হিসেবে মাওলানা আবদুর রহীম ও আমি উপস্থিত ছিলাম। জামায়াতের মামলা তখন সুপ্রিমকোর্টে চলছে। মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াতের অনেক নেতা তখনো কারাগারে। করাচী শহর জামায়াতের আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ পশ্চিম-পাকিস্তান জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রথমে জেনারেল আযম খানের নাম প্রস্তাব করা হয়। কোন্ পার্টির পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবটি আসে তা স্মরণ করতে পারছি না। তবে যে যুক্তিতে এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করা হয়, এর ওজন অনেকেই স্বীকার করেন। আযম খান পূর্ব-পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় গভর্নর হিসেবে সেখানকার ভোট আইয়ূব খান থেকে অনেক বেশি পাবেন বলে ধারণা। আর সীমান্তের আইয়ূব খান থেকে পাঞ্জাবের আযম খান পশ্চিম-পাকিস্তানেও যথেষ্ট ভোট পেতে পারেন।

ন্যাপ নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এর প্রতিবাদে বলেন যে, আযম খান দেশে সামরিক শাসন কায়েমে আইয়ূব খানের দোসর ছিলেন। তাই নীতিগতভাবে এ প্রস্তাব সমর্থন করা উচিত নয়। মাওলানার এ যুক্তি খণ্ডনের কেউ চেষ্টা করেননি। মাওলানা ভাসানী কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তার ঘনিষ্ঠ সাথী ফাতেমা জিন্নাহর নাম প্রস্তাব করেন। আলোচনায় দেখা গেলো যে, জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর সব দলের

প্রতিনিধিগণ একে একে এ প্রস্তাবের পক্ষে মতামত প্রকাশ করতে থাকেন। আইয়ূব খানকে পরাজিত করার জন্য ফাতেমা জিন্নাহ ছাড়া আর কোন ব্যক্তিত্ব পাকিস্তানে নেই বলে আমরাও অনুভব করলাম। নাশতার বিরতির সময় জামায়াতের প্রতিনিধিগণ পৃথকভাবে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলো যে, এ বিষয়ে চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ নিম্ন বক্তব্য বৈঠকে পেশ করবেন।

"এ বিষয়ে আমরাও একমত যে, মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু তিনি মহিলা হওয়ায় আমাদেরকে শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের মতামত নেবার জন্য একদিন সময় দেওয়া হোক। আজ বৈঠক মুলতবি হোক। আগামী দিনের বৈঠকে জামায়াতের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে মতামত পেশ করা হবে।"

সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান এ যুক্তি মেনে নিয়ে বৈঠক মুলতবি করতে সম্মত হলেন। আরও একটি কারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া এখনি সম্ভব নয়। মুহতারামা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কিনা তা আমাদের জানা নেই। তাই আমাদের পক্ষ থেকে একটি ডেলিগেশন আজই মুহতারামার সাথে সাক্ষাতের জন্য যাওয়া আবশ্যক। নওয়াবযাদার নেতৃত্বে একটি ডেলিগেশন গঠন করা হয়। পরদিন সকাল ১০টা পর্যন্ত বৈঠক মুলতবি হয়। দুপুর দেড়টায় বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করা হয়। ডেলিগেশনে জামায়াতের কোন প্রতিনিধি ছিলো কিনা মনে পড়ছে না।

জামায়াতের সামনে বিরাট সমস্যা

৫ দলীয় সম্মিলিত বিরোধী দলের (COP) ৪ দলই মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাবার পক্ষে একমত হয়ে গেছে। নেযামে ইসলাম পার্টিও কোন অসুবিধা বোধ করেনি। কিন্তু শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের মতামত না নিয়ে আমাদের পক্ষে চূড়ান্ত রায় দেওয়া সম্ভব হলো না। মাওলানা মওদূদী জেলে আটক থাকায় আমরা মহা-সমস্যায় পড়লাম।

চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুহাম্মদ শফীর সাথে রাত ৯টায় সাক্ষাতের সময় নিলেন। রাতের মধ্যেই জেলে অবস্থানরত মাওলানা মওদূদীর রায় যোগাড় করার ব্যবস্থা নিলেন।

সন্ধ্যার আগেই সম্মিলিত বিরোধী দলের ডেলিগেশন ফাতেমা জিন্নাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর সম্মতি সংগ্রহ করেছেন। তিনি একটি শর্তে নির্বাচনে প্রার্থী হতে সম্মত হয়েছেন। শর্তটি হলো, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৫ বছর মেয়াদ পূর্ণ করে দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। এক বছরের মধ্যে আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করতে হবে। আমি স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনে দেশকে ফিরিয়ে আনার জন্য মাত্র এক বছর দায়িত্ব পালন করতে রাজি আছি।

রাত ৯টায় চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদের নেতৃত্বে আমি ও মাওলানা আবদুর রহীমসহ ৫ সদস্যবিশিষ্ট এক ডেলিগেশন মুফতী সাহেবের বাসভবনে পৌঁছলাম। সমস্যাটা তিনি বুঝলেন। ফাতেমা জিন্নাহ যে শর্ত আরোপ করেছেন, এটা তিনি অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করলেন। প্রায় ঘণ্টাখানিক সময় মতবিনিময় চলার পর তিনি রায় দিলেন যে, মুহতারামা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ৫ বছর রাষ্ট্র পরিচালকের দায়িত্ব নিতে চান না। স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসনে প্রত্যাবর্তনের জন্য একটি মধ্যবর্তী সরকার প্রধানের ভূমিকা পালন করতে সম্মত হয়েছেন। তাই আর কোন বিকল্প নেই বলে তাঁকে এটুকু দায়িত্ব দিলে দেশে নারী নেতৃত্ব কায়েম করা হচ্ছে বলে বলা যায় না। এটা একটা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা (Transitional Arrangement) মাত্র। আপনারা এ প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন।

আমরা পরদিন সকালে COP-এর বৈঠক শুরু হবার পূর্বেই জেল থেকে মাওলানা মওদূদীর রায়ও পেয়ে গেলাম। আমরা বিস্ময় ও আনন্দের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, তিনিও মুফতী মুহাম্মদ শফীর মতো একই যুক্তিতে এ প্রস্তাব সমর্থন করা যায় বলে জানালেন। বৈঠকে চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ মুফতী শফী ও মাওলানা মওদূদীর মতামত প্রকাশ করলে সকলে এক বাক্যে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আনন্দ প্রকাশ করলেন। অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। পরদিন সকল পত্রিকায় ৮ কলামব্যাপী খবর বের হলে ব্যাপক সাড়া পড়ে গেলো।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান চলাকালে মাওলানা মওদূদীর একটি মন্তব্য পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত হয় ঃ

"পুরুষ হওয়া ছাড়া আইয়ূব খানের আর কোন গুণ নেই। আর মহিলা হওয়া ছাড়া ফাতেমা জিন্নাহর আর কোন দোষ নেই।"

৯৫.

জামায়াতের পক্ষে সুপ্রীম কোর্টের রায়

আগেই বলেছি যে, পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা সম্পর্কিত মামলা তখনো চলছে। প্রখ্যাত আইনবিদ এ.কে. ব্রোহী জামায়াতের পক্ষে উকালতি করছিলেন। আরো ৫৩ জন আইনজীবী ব্রোহী সাহেবের সাথে সহযোগিতা করছিলেন। রাজনৈতিক মহলে এ মামলাটি বেশ গুরুত্ব বহন করছিলো।

সম্ভবত ১৯৬৪ সালে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করা হয়। প্রধান বিচারপতি কর্নেলিয়াস তাঁর রায়ে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় বলেন, "জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করাটাই বেআইনী ছিলো।" এ রায় প্রকাশিত হবার পর মাওলানা মওদূদীসহ জামায়াতের সকল নেতা কারামুক্ত হন।

বিচারপতি কর্নেলিয়াস জাতিতে ইংরেজ এবং ধর্মে খ্রিস্টান ছিলেন। ইংরেজ আমলেই তিনি বিচারপতি হন। পাকিস্তান কায়েম হবার পর তিনি নিজ দেশে চলে না গিয়ে পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। যোগ্য ও ন্যায়বিচারক হিসেবে তিনি

যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবসর গ্রহণের পরও তিনি জন্মভূমিতে ফিরে যাননি। পাকিস্তানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ এডভোকেট এ.কে. ব্রোহীর মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন যে, বিচারপতি কর্নেলিয়াস ইসলামী আইন অধ্যয়ন করে সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, অন্য কোন আইনই এর সমকক্ষ নয়। ইসলামী আইনের খিদমতের আশা নিয়েই তিনি পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু মুসলিম নামধারী রাজনৈতিক নেতাদের কারণেই ইসলামী আইন বাস্তবে চালু হতে পারেনি এবং তিনি কাঙ্ক্ষিত খিদমতের সুযোগ পাননি।

সারা পাকিস্তানে ইউনিয়ন নির্বাচনের তোড়জোর

স্থানীয় সরকার হিসেবে ইউনিয়ন কাউন্সিল নির্বাচন ব্রিটিশ আমল থেকে চালু আছে। এ দেশে ইউনিয়ন বোর্ড বলা হতো। পশ্চিম-পাকিস্তানে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিলো। আইয়ূব খান আমলে গোটা পাকিস্তানে ইউনিয়ন কাউন্সিল নাম চালু করা হয়। ১৯৬৪ সালে ইউনিয়ন নির্বাচন একটি বিশেষ কারণে শহর-বন্দর-গ্রামের সকল শ্রেণীর নারী-পুরুষের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। অক্টোবর মাসে এ নির্বাচন হয়।

পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে ৪০ হাজার করে মোট ৮০ হাজার ইউনিয়ন মেম্বার জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবার পর তারা বিডি মেম্বার (Basic Democracy Member) হিসেবে প্রেসিডেন্ট, জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভোট দেবেন। ১৯৬২ সালে আইয়ূব খান প্রণীত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচনে জনগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিতে পারবে না। জনগণ ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোট দিয়ে ৮০ হাজার ইলেক্টরেল কলেজ সদস্য নির্বাচিত করবে। এরা একদিকে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। অপরদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদেরকে নির্বাচিত করবেন।

এ ব্যবস্থার ফলে ইউনিয়ন নির্বাচনই জাতীয় নির্বাচনের মর্যাদা পেলো। ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন নির্বাচনে সকল রাজনৈতিক দল সরাসরি ভূমিকা রাখা প্রয়োজন মনে করলো। ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট পদে আইয়ূব খান ও ফাতেমা জিন্নাহর প্রার্থী হবার কথা প্রকাশ পাওয়ার পর সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল জনগণকে উদ্বুদ্ধ করলো যে, স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পেতে হলে এবং জনগণের ভোটাধিকার পুনর্বহাল করতে হলে এমন লোকদেরকে ভোট দিতে হবে, যারা ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেবার স্পষ্ট ওয়াদা করবে।

ইউনিয়ন নির্বাচনের দৃশ্য

ব্রিটিশ আমল থেকে জনগণ ইউনিয়ন নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। স্থানীয় নেতৃত্বের প্রাধান্যই সেসব নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ছিলো। রাজনৈতিক দলের সরাসরি কোন ভূমিকা তাতে দেখা যায়নি। কিন্তু এবারকার নির্বাচনের পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানের চিত্র সর্বত্র একই রকম ছিলো। যারা প্রার্থী তাদের

সবাইকে জনগণ প্রকাশ্যে ওয়াদা করতে বাধ্য করেছে যে, নির্বাচিত হলে তারা ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেবেন। নির্বাচনী সভা-সমাবেশের ওয়াদা যথেষ্ট মনে না করে জুমআর দিন মসজিদেও ওয়াদা নেওয়া হয়।

ঐ নির্বাচনে জনগণের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা তাদের রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে। তারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার আশায় এতোটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্তব্য মনে করেছে। কোন প্রার্থী আইয়ূব খানের সমর্থক দাবি করার সাহস করেছে বলে কোন প্রমাণ নেই।

সব প্রার্থীই ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থক দাবি করায় নির্বাচনে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার উত্তাপ লক্ষ্য করা যায়নি। কতক প্রার্থী যদি আইয়ূব খানের সমর্থক হিসেবে অভিযান চালাতো তাহলে রাজনৈতিক উত্তেজনা দেখা দিতো। সব প্রার্থীই রাজনৈতিক দিক দিয়ে একপন্থি হওয়ায় ভোটার জনগণ স্থানীয় বিবেচনায় প্রার্থীদের মধ্য থেকে বাছাই করার সুযোগ পেলো।

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে নির্বাচন সম্পন্ন হলো। নির্বাচিত সদস্যরা ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেবে বলে জনগণ নিশ্চিত হলো। নির্বাচিত সদস্যদের সরকারি পরিচয় হলো বিডি মেম্বার (Basic Democracy Member). বেসিক ডেমোক্রেসি বা বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্র হত্যার চমৎকার ব্যবস্থারই নাম।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

১৯৬৪ সালে নভেম্বরেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান শুরু হয়ে গেলো। কোটি কোটি জনগণের মধ্যে মাত্র ৮০ হাজার বিডি মেম্বারের ভোটে এ নির্বাচন হবে। প্রচারাভিযানের সরকারি ব্যবস্থাপনাও ছিলো। সরকার বিভাগভিত্তিক বা প্রদেশভিত্তিক বিডি মেম্বারদের সম্মেলনে প্রার্থীদেরকে বক্তব্য রাখা ও প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ দেওয়া হয়। এসব সম্মেলনে আইয়ূব খান ও ফাতেমা জিন্নাহ বক্তৃতা করেছেন এবং প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

আইয়ূব খান নির্বাচনী উদ্দেশ্যে জনসভা করার প্রয়োজন বোধ করেননি। শুধু বিডি মেম্বারদের সমাবেশকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। কিন্তু সম্মিলিত বিরোধী দল ফাতেমা জিন্নাহকে নিয়ে সকল প্রদেশে জনসভা করার মাধ্যমে বিডি মেম্বারদের উপর প্রবল জনমতের চাপ সৃষ্টি করা প্রয়োজন মনে করেছে।

আইয়ূব খান সরকারপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিডি মেম্বার সমাবেশে বক্তব্য ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ ধারণা দিতে সক্ষম হন যে, দেশ পরিচালনার জন্য তার যোগ্যতা ফাতেমা জিন্নাহর চেয়ে বেশি। সমাবেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় এমন সব প্রশ্ন তোলা হয়, যার সন্তোষজনক জওয়াব দেবার কোন অভিজ্ঞতা ফাতেমা জিন্নাহর থাকার কথা নয়।

বিরোধী দল জনগণের ভোটাধিকারকে নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে নিলেও আইয়ূব খানকে দেশ শাসনের যোগ্যতা বিবেচনার বিষয়কে ইস্যু বানান। এ বিবেচনায়

অবশ্যই আইয়ূব খান যোগ্যতর। কিন্তু আসল ইস্যু যে ভোটাধিকার সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ভোটারদেরকে বিভ্রান্ত করাই তার উদ্দেশ্য। ভোটাররাও নির্বাচনী ওয়াদা ভঙ্গ করার জন্য একটা অজুহাত পেলো। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা আইয়ূব খানকে ভোট দিয়েছেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়, নগদ প্রাপ্তির বিনিময়েই ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। ব্যতিক্রমী কেউ কেউ হয়তো থাকতে পারেন। ফাতেমা জিন্নাহ দেশ শাসনের দায়িত্ব নেবার জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হননি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও জনগণের ভোটাধিকার বহাল করার যে মহান উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ বয়সে তিনি নির্বাচনী ঝামেলা পোহাতে রাজি হয়েছেন, স্বার্থপর ভোটারদের নিকট এর কোন মূল্য নেই।

এ সত্ত্বেও ফাতেমা জিন্নাহ পূর্ব-পাকিস্তানে ১৮,৪২৪ ভোট ও পশ্চিম-পাকিস্তানে মাত্র ১০,২৪৪ ভোট পান। আর আইয়ূব খান পূর্ব-পাকিস্তানে ২১,০১২ ও পশ্চিমে ২৮,৯২১ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন।

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন

পরোক্ষ নির্বাচনে যে জনমতের সঠিক প্রতিফলন হয় না, সে কথা এমনভাবে প্রমাণিত হলো যে, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দাবি আরও জোরদার হলো। পরোক্ষ নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা কম থাকায় তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের স্বার্থের বিনিময়ে খরিদ করা সহজ হয়। প্রত্যক্ষ ভোটে রাজনৈতিক টাউট ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থের সহায়তায় ভোটারদের একাংশকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হলেও জনসাধারণকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না। বিশেষ করে জনগণ যখন কোন রাজনৈতিক ইস্যুকে বুঝে সমর্থন করে তখন তারা নির্বাচনে রায় দিতে ভুল করে না।

আইয়ূব খানের সামরিক শাসন জারির পূর্বে জনগণ নির্বাচনে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করে অভ্যস্ত ছিলো। বিরোধী দলগুলো সেদিকে জনগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হওয়ায়ই তারা ইউনিয়ন নির্বাচনে এমন বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে। আইয়ূব খান ও ফাতেমা জিন্নাহর এ নির্বাচনে যদি জনগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোট দেবার সুযোগ পেতো তাহলে ফাতেমা জিন্নাহ যে বিপুল ভোটে বিজয়ী হতেন এ কথা সবাই স্বীকার করতে বাধ্য। এ কারণেই আইয়ূব খান ক্ষমতায় স্থায়ী হবার কুমতলবে সর্বজনীন ভোটাধিকার ব্যবস্থা উৎখাত করে তথাকথিত বুনিয়াদী গণতন্ত্র চালু করেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর

১৯৬২ সালে বিডি সিস্টেমে নির্বাচনের পর আইয়ূব খান পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্যদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে সক্ষম হন এবং তাঁর অনুগত ও বিশ্বস্ত বেসামরিক সরকার কায়েম করেন। এতে কনভেনশন মুসলিম লীগ আইয়ূব খানের নেতৃত্বে সংহত হয় এবং তাঁর ক্ষমতাও নিরঙ্কুশ হয়।

জামায়াতে ইসলামী, আওয়ামী লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেযামে ইসলাম পার্টি ও ন্যাপ বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করতে থাকে।

আইয়ূবী শাসনামলে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির নামে যে ডিক্টেটরি শাসন চলছিলো তাতে প্রাদেশিক গভর্নরও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভোগ করতো। প্রেসিডেন্ট ছাড়া গভর্নরকে আর কারো কাছে জওয়াবদিহি করতে হতো না। ১৯৬২ সালে যখন নির্বাচন হয় তখন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জাঁদরেল আমলা গোলাম ফারুক। তিনি কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব না হওয়ায় প্রাদেশিক সরকার গতানুগতিকভাবেই চলছিলো।

ইতোমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানে বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। আইয়ূব খান পশ্চিম-পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে কালাবাগের নওয়াব আমীর মুহাম্মদের মতো পূর্ব-পাকিস্তানেও একজন জাঁদরেল গভর্নর নিযুক্ত করা প্রয়োজন মনে করেন। তখন জনাব আবদুল মোনায়েম খান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। কয়েক মাসেই মুনায়েম খান সম্পর্কে আইয়ূব খানের ধারণা হয় যে, রাজনৈতিক ময়দান নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে তাকেই গভর্নর করা প্রয়োজন। ১৯৬২ সালের অক্টোবরে তিনি গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযান

সিওপি-এর পরিচালনায় পূর্ব-পাকিস্তানে ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে বিরাট প্রচারাভিযান চলে। এ উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান সফরে আসেন। পূর্ব-পাকিস্তানের সাবেক জনপ্রিয় গভর্নর আযম খানও সাথে আসেন। ঐ প্রচারাভিযানের একটি খণ্ডচিত্র এখানে পেশ করছি।

সিদ্ধান্ত হয় যে, চট্টগ্রামগামী ঢাকা মেইল ট্রেনে ফাতেমা জিন্নাহ চট্টগ্রাম যাবেন এবং লালদিঘী ময়দানে জনসভায় ভাষণ দেবেন। ফার্স্ট ক্লাস ও সেকেন্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টগুলো রিজার্ভ করা হলো। আমি যে বগিতে ছিলাম তাতে আরও যারা ছিলেন তাদের মধ্যে শাহ আযীযুর রহমান, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, অলি আহাদের কথা মনে পড়ে। আমি নিরাপদে ঘুমাবার উদ্দেশ্যে বাংকে আশ্রয় নিলাম। রাত ১০ টায় ঢাকা থেকে গাড়ি রওয়ানা হলো।

কথা ছিলো, পথে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, কুমিল্লা ও ফেনীতে ফাতেমা জিন্নাহ প্লাটফর্মে নির্মিত মঞ্চ থেকে ভাষণ দেবেন। আমাদের কল্পনায়ও ছিলো না যে, জনগণ এতো উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ফাতেমা জিন্নাহকে দেখার জন্য রাতের বেলা সারাপথে ট্রেন আটক করতে থাকবে। ভৈরবে কোন প্রোগ্রাম দেওয়া হয়নি। কিন্তু গাড়ি পৌঁছার পর দেখা গেলো, হাজার হাজার মানুষ স্টেশন ও রেল লাইন দখল করে আছে। ফাতেমা জিন্নাহকে তারা দেখতে চায়। প্লাটফর্মে মঞ্চও তৈরি ছিলো। বাধ্য হয়ে ফাতেমা জিন্নাহ দু'মিনিট মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বললেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়াতে বিরাট জমায়েত। আযম খান মঞ্চে বক্তব্য রাখেন। জনগণও প্রচণ্ড উল্লাস প্রকাশ করে। ফাতেমা জিন্নাহ কয়েক মিনিটের জন্য মঞ্চে আসেন। অনির্ধারিতভাবে বিভিন্ন রেল-স্টেশনে সমবেত জনতা রেলপথ অবরোধ করে ট্রেন থামাতে বাধ্য করে। এভাবে কুমিল্লা পৌঁছাতেই রাত দু'টো বেজে যায়।

এ জাতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে ফাতেমা জিন্নাহর কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। জনগণ তাঁকে বিপুলভাবে সমর্থন করছে এ অনুভূতিতে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু এমন বিশৃঙ্খল পরিবেশ দেখে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন। কুমিল্লায় তিনি মঞ্চে যেতে বিলম্ব করায় আযম খান, শেখ মুজিব, শাহ আযীয এবং আরও কয়েকজন বক্তৃতা করেন। অনেক চেষ্টা করে ফাতেমা জিন্নাহকে মঞ্চে যেতে সম্মত করা গেলো এ শর্তে যে, আর কোথাও তিনি গাড়ি থেকে বের হবেন না।

আমি এ হাঙ্গামাময় পরিবেশে অসহায় বোধ করলাম। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোন উপায় নেই। জনগণের আবেগের নিকট যুক্তি পরাস্ত। বাংকে শুয়ে শুয়ে আমি সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু করণীয় কিছু নেই। শাহ আযীয আমাকে মঞ্চে বক্তৃতা করার জন্য যেতে বললে আমি সবিনয়ে অব্যাহতি চাইলাম। আমি আযম খানের অফুরন্ত জীবনীশক্তি দেখে মুগ্ধ হলাম। তিনি সব মঞ্চেই গেলেন এবং সারা পথেই ঝামেলা সইতে সক্ষম হলেন।

ট্রেন সকাল ৫টার বদলে ১টায় চট্টগ্রাম পৌঁছলো। চট্টগ্রাম স্টেশনের দৃশ্য বিস্ময়কর। যেদিকেই চোখ যায় শুধু মানুষের মাথা দেখা যায়। গাছে, দালানের ছাদে, রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ। ৩ টায় লালদীঘি ময়দানে জনসভা সত্ত্বেও এখানের মঞ্চেও ফাতেমা জিন্নাহকে উঠতে হলো। ট্রেন সকালে পৌঁছবে বলে এ মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিলো।

বিকেল ৩টায় জনসভার হাল বর্ণনাতীত। বিশাল মঞ্চে ৫ দলের কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। লালদীঘি ময়দান বিরাট নয়; তবু এর দু'দিকে রাস্তা, একদিকে নিচু পাহাড়, রাস্তার পাশে বহুদূর পর্যন্ত সকল দালানের ছাদে ও বারান্দায় মানুষ আর মানুষ। সকল দলের নেতারাই বক্তৃতা করেছেন। আমাকেও বক্তৃতা দিতে হয়। কিন্তু ঐ পরিবেশে শ্রোতাদের নীরবে বক্তৃতা শুনবার মুড থাকে না। তাছাড়া তারা ফাতেমা জিন্নাহকে দেখতে ও তার কথা শুনতে অধৈর্য হয়ে আছে।

ফাতেমা জিন্নাহর আগে জেনারেল আযম খান বক্তৃতা করেন। চট্টগ্রামে আযম খানের বিরাট নৈতিক প্রভাব ছিলো। বন্দরনগর ও চারপাশের বিরাট এলাকা ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে চরমভাবে বিধ্বস্ত হয়। দুর্গত মানুষের সেবায় আযম খান নিজে হাজির হয়ে যে কঠোর পরিশ্রম ও গভীর মানব দরদের পরিচয় দিয়েছেন, সে কথা কেউ ভুলতে পারে না। তাঁর এ মর্যাদার কারণে তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণের সময় জনগণ নীরব হয়ে শুনে।

মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহ যখন দাঁড়ালেন তখন ২/৩ মিনিট জনসমুদ্র উত্তাল হয়ে রইলো। স্লোগান ও শোরগোল করে তাঁকে স্বাগত জানালো। স্বল্পভাষী হিসেবেই তিনি খ্যাত। অল্প সময়েই তিনি মূল বক্তব্য উর্দু ভাষায় প্রকাশ করেন। মানুষ অত্যন্ত শান্তভাবে তার কথা শুনে। তিনি ভাষণ শেষ করলে আবার স্লোগানের আওয়াজে গোটা এলাকা মুখরিত হয়। তাঁর কথার সারাংশ ছিলো ঃ

"জনগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করেই পাকিস্তান কায়েম করেছিলো। পাকিস্তান শাসন করার অধিকার শুধু তাদের, যাদেরকে জনগণ নির্বাচিত করে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এ পদ্ধতিতে দেশ পরিচালিত হয়ে এসেছে। ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন হবার কথা ছিলো। সেনাপতি আইয়ুব খান দেশ রক্ষার দায়িত্বের পরিবর্তে দেশ শাসন করার অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোটের প্রহসন করে প্রেসিডেন্ট পদ দখল করে আছেন। তাঁর সকল অপকর্মের জঘন্যতম হলো জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া। যারা ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তান কায়েম করলো তারা নাকি শাসকদেরকে নির্বাচিত করার যোগ্য নয়। জনগণকে এভাবে অপমানিত করে তিনি ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিডি মেম্বারদের ভোট কব্জা করে আরও ৫ বছর ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে চান।

আমি এ বৃদ্ধ বয়সে আপনাদের ভোটাধিকার ফিরে পাওয়ার আন্দোলনে শরীক হতে বাধ্য হয়েছি। আমি পাকিস্তান আন্দোলনে কায়েদে আযমের সাথী ছিলাম। পাকিস্তানকে স্বৈরশাসকের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমার পক্ষে ঘরে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি দেশ শাসনের গুরুদায়িত্ব বহন করতে চাই না। আমি নির্বাচনে বিজয়ী হলে এক বছরের মধ্যে জনগণের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব তুলে দিতে চাই।"

আমি স্মরণ করতে পারছি না যে, ফাতেমা জিন্নাহ ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছাড়া আর কোথাও গিয়েছিলেন কিনা। অবশ্য এটুকু মনে পড়ে যে, হঠাৎ খাজা নাজিমুদ্দীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করায় সফর সংক্ষিপ্ত করেই ফাতেমা জিন্নাহ করাচী ফিরে যান।

খাজা নাজিমুদ্দীন সিওপি পরিচালিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেপথ্য নেতা হিসেবে গণ্য। তিনি সফরে না গেলেও সর্বদিক দিয়ে আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করছিলেন। হঠাৎ তাঁর ইন্তিকালে আমরা সবাই বিব্রত হয়ে পড়লাম। তাই ফাতেমা জিন্নাহর সফর অব্যাহত রাখা সমীচীন মনে করা হলো না। সুপ্রীম কোর্ট এলাকার যেখানে শেরে বাংলা ও শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কবর রয়েছে, সেখানেই খাজা সাহেবকে দাফন করা হয়। ওখানে দাফনে কোন কোন মহল থেকে আপত্তি তুললেও সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম নেতা হিসেবে তাঁকে ওখানে কবরস্থ করা সম্ভব হয়।

৯৬.

মোনায়েম খানের শাসনামল

১৯৬২ সালের অক্টোবরে আবদুল মোনায়েম খান পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মাত্র কয়েক মাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে তিনি আইয়ূব খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। '৬২ থেকে '৬৯-এর মার্চ পর্যন্ত তিনি ৭ বছর দাপটের সাথে রাজত্ব করেন।

পেশায় তিনি উকিল ছিলেন এবং মুসলিম লীগের জেলা পর্যায়ে সক্রিয় নেতা ছিলেন। আমলাদের মতো জনবিচ্ছিন্ন ছিলেন না। তিনি সংগঠক ছিলেন। তাই তিনি পূর্ববর্তী গভর্নরদের মতো সরকারি গতানুগতিক দায়িত্ব পালন করাই যথেষ্ট মনে করতেন না।

তিনি সারাদেশে সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করে তিনটি বিষয়ে জনমত গড়ে তুলবার সর্বাত্মক চেষ্টা করেন।

১. প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানকে জনপ্রিয় করা।

২. আইয়ূব খানের নেতৃত্বে পরিচালিত কনভেনশন মুসলিম লীগকে সংগঠিত করা।

৩. বিডি সিস্টেমকে কল্যাণকর বলে গ্রহণ করার জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। আইয়ূব খানের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বিনাদ্বিধায় ঘোষণা করতেন, "আইয়ূব খান প্রেসিডেন্ট আছেন বলে আমার মতো কৃষকের সন্তান গভর্নর হতে পেরেছে।"

তিনি এটা উপলব্ধি করতে পারেননি যে, দেশের রাজনীতি সচেতন মহল (ছাত্র সমাজসহ) আইয়ূব খানকে গণতন্ত্রের দুশমন মনে করতো। জনগণের ভোটাধিকার হরণ করে অন্যায়ভাবে তিনি স্বৈরশাসন চালু রেখেছেন। জনগণকে ভোট দেবার সুযোগ দিলে ফাতেমা জিন্নাহই প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। ব্রিটিশ আমল থেকে জনগণ ভোটাধিকার ভোগ করে এসেছে। তাদের ভোটেই পাকিস্তান কায়েম হয়েছে। অথচ বিডি সিস্টেম চালু করে স্বৈরশাসন নিশ্চিত করার হীন-উদ্দেশ্যে তিনি জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই গভর্নর মোনায়েম খানকে রাজনৈতিক মহল আইয়ূব খানের একনায়কত্বের এজেন্ট হিসেবেই গণ্য করেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যারা ফাতেমা জিন্নাহকে বিজয়ী করার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ের (বিডি মেম্বার) নির্বাচনে ব্যাপক তৎপরতা চালিয়েছে, সে বিরাট জনশক্তি গভর্নরের তিন দফা কর্মসূচির চরম বিরোধী হবারই কথা। সকল রাজনৈতিক দলের প্রচেষ্টায় জনগণ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে আইয়ূব খানের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির আশায় বিডি নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাই আইয়ূব খানকে জনপ্রিয় করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গণতন্ত্রমনা সবাইকে গভর্নর মোনায়েম খান বিক্ষুব্ধ করে তুলেন।

১৯৫৩ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত গভর্নর হাউজে ১৫ জন গভর্নরের এডিসি হিসেবে কর্মরত মেজর (অব.) এসজি জিলানী রচিত ইংরেজিতে লিখিত বইয়ের অনুবাদ থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। অনুবাদক মোস্তফা দৌলত। প্রকাশক সৌখিন প্রকাশনী। অনূদিত বইটির নাম 'বঙ্গভবনের ১৫ গভর্নর'। গভর্নর মোনায়েম খান সম্পর্কে লেখাটি হুবহু পেশ করছি ঃ

"কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মোনায়েম খান ময়মনসিংহ শহরের একজন অখ্যাত উকিল ছিলেন। তার গভর্নর হওয়াটা সকলের জন্যই বিস্ময়ের ব্যাপার

ছিলো। তিনি নিজে এ পদের জন্য আগ্রহী তো ছিলেনই না, বরং গভর্নর নিযুক্তির কথা শুনে তিনি বার বার আইয়ূব খানের কাছে ক্ষমা চাচ্ছিলেন, যাতে তাঁকে এ পদে নিযুক্ত করা না হয়।

আমি নির্দেশ অনুযায়ী নিযুক্তিপত্র, এক লাখ টাকা ভর্তি একটি ব্রিফকেস এবং ভীত সন্ত্রস্ত গভর্নরকে নিয়ে ২৭ অক্টোবর রাওয়ালপিণ্ডি থেকে করাচী চলে আসি। পথে মোনায়েম খান বেশ কয়েকবার ব্রিফকেসটি খুলে দেখে নিলেন, টাকাগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা। পরের দিন সকালে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করি। ঢাকা বিমানবন্দরে সরকারি কর্মকর্তা, কূটনীতিকবৃন্দ এবং কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতৃবর্গ তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

মোনায়েম খান তাঁর স্বাভাবিক সরকারি দায়িত্ব পালন ছাড়া নবপ্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং নবগঠিত কনভেনশন মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রদেশের সকল জেলায় সফর করার কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। তিনি আইয়ূব খানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। তাঁর সমস্ত কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ডের পেছনে একটা উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল, কীভাবে জেনারেল আইয়ূব খানের ভাবমূর্তিকে প্রদেশবাসীর অন্তর্লোকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেওয়া যায়।

১৯৬৪ সালের মার্চে প্রেসিডেন্ট পূর্ব-পাকিস্তান সফরে আসেন। মোনায়েম খান এবার ময়মনসিংহ, নীলফামারী এবং অন্যান্য জায়গায় বিরাট বিরাট জনসভার আয়োজন করেন, সর্বত্র আইয়ূব খানের জয়জয়কার ধ্বনিত হয়। কার্যত সমগ্র প্রদেশ মোনায়েম খান তথা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বলে পরিলক্ষিত হয়। এমনকি, চ্যান্সেলর হিসেবে গভর্নর মোনায়েম খান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে যোগদান করে সনদপত্র বিতরণ করেন। সেখানে কোন প্রতিবাদ বা গণ্ডগোল হয়নি। অবশ্য ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরে আইয়ূব-মোনায়েমের বিরুদ্ধে ছাত্ররা মাঝে মধ্যে শ্লোগান উচ্চারণ করতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনের তারিখ নির্ধারিত হয় ২২ মার্চ ১৯৬৪। স্থান কার্জন হল, সময় সকাল ১০টা। আধঘণ্টা আগে গভর্নর সাহেব পুলিশের নিরাপত্তাসহ কার্জন হলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। প্রধান গেটের সামনে কিছু ছাত্রের বিরূপ শ্লোগানের ধ্বনি শোনা গেলো। আমরা তাদের পাশ কাটিয়ে হলের কামরায় প্রবেশ করলাম। গভর্নর সেখানে কনভোকেশনের রেওয়াজ অনুযায়ী পোশাকাদি, গাউন, টুপি, ইত্যাদি পরে নিলেন। ছাত্রদের গতিবিধি, বিরূপ শ্লোগান ইত্যাদি দেখে-শুনে আমরা প্রমাদ গুনলাম। ভাইস চ্যান্সেলর ড. এম ও গনির চেহারা মলিন হয়ে উঠলো। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিআইজি এমএ হক এগিয়ে এসে গভর্নরকে প্যান্ডেলে যেতে নিষেধ করলেন এবং অনুষ্ঠান বাতিল করার জন্য পরামর্শ দিলেন। শুনে গভর্নর মোনায়েম খান দারুণ গোস্‌সা ও উষ্মা প্রকাশ করলেন। ডিআইজিকে বললেন, আপনারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছেন না। কনভোকেশন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য সকল বাধার মোকাবিলা করতে হবে।

এই বলে তিনি, ভাইস চ্যান্সেলর, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সমভিব্যাহারে প্যান্ডেলের দিকে রওয়ানা হলেন। আমি এবং গভর্নরের মিলিটারি সেক্রেটারি কর্নেল এমআই করিম তাঁর পেছনে পেছনে চললাম। প্যান্ডেলে প্রবেশ করতেই বুঝতে পারলাম অবস্থা বেগতিক। প্যান্ডেলের এক কোণ থেকে ছাত্ররা শ্লোগান দিতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ভাঙচুর শুরু করে দিলো। এই সঙ্গিন পরিস্থিতির মধ্যেই মোনায়েম খান চ্যান্সেলরের নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলেন। ভাইস চ্যান্সেলর ড. গনি তড়িঘড়ি উদ্বোধনী ভাষণ সারলেন। কেউ শুনলো কি শুনলো না, বুঝা গেলো না। চ্যান্সেলর মোনায়েম খান দাঁড়িয়ে তাঁর লিখিত ভাষণ পড়তে শুরু করলেন। উত্তেজিত ছাত্ররা বাইরের দিক থেকে প্রধান দরজা দিয়ে প্যান্ডেলে ঢোকার জন্য হুড়-হাঙ্গামা শুরু করলো। সশস্ত্র পুলিশ কোন রকমে তাদের ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলো। এক পর্যায়ে তারা লাঠিচার্জ করলো এবং শেষ পর্যন্ত টিয়ার গ্যাস ছুঁড়তে বাধ্য হলো। গ্যাসের প্রতিক্রিয়ায় প্যান্ডেলের ভেতরে অভ্যাগতদের রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে দেখা গেলো। ড. এম ও গনি আমাকে ডেকে বললেন, আমি যেন গভর্নরকে তাঁর ভাষণ সংক্ষেপ করতে বলি। আমি গভর্নরের কানের কাছে গিয়ে ভাইস চ্যান্সেলরের কথাটি বলতেই তিনি আমাকে এক রকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং ভাষণের শেষ শব্দটি পর্যন্ত পড়ে তারপর বসলেন। বাইরে তখনো হৈ-চৈ, হাঙ্গামা এবং শ্লোগান চলছিলো।

এ সময় আমাদের প্রধান কর্তব্য সাব্যস্ত হলো, গভর্নরকে প্যান্ডেল থেকে নিরাপদে বের করে গভর্নর হাউজে পৌঁছে দেওয়া। আমরা কয়েকজন গভর্নরের সামনে সামনে চললাম, যাতে ইট-পাটকেল যা কিছু আমাদের উপর দিয়ে যায়। আমার বাহুতে একটি এবং কর্নেল করিমের মাথায় আর একটি পাথরের টুকরা এসে পড়ে। ভাগ্যিস কর্নেলের মাথায় টুপি ছিলো, নইলে একটা 'খুন-খারাবি' হয়ে যেতো।

গভর্নর হাউজে পৌঁছেই মোনায়েম খান গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের শাস্তিবিধানের জন্য কঠিন আদেশ জারি করলেন। সুতরাং সেই রাতেই আন্দোলনের ঘাঁটি ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক হল) ঘেরাও করা হলো। ইউনিভার্সিটি বন্ধ করে দেওয়া হলো। ছাত্রদের মেরে-পিটিয়ে হল থেকে বের করে দেওয়া হলো। চারজন ছাত্রকে ইউনিভার্সিটি থেকে বহিষ্কার করা হলো এবং দুইজনের এমএ ডিগ্রি বাতিল করা হলো।

১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাসে ৮০ হাজার বিডি মেম্বারের ভোটে পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। একদিকে জেনারেল আইয়ুব খান এবং অন্যদিকে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহ। আইয়ুব খানের বিপুল ভোটে জয়লাভের ক্ষেত্রে গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান প্রভূত অবদান রাখেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে মোনায়েম খান প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি দুর্গত এলাকায় পৌঁছতেন। তার আমলে বেশ কয়েকবার ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক প্লাবন প্রদেশের উপর আঘাত হানে। ধ্বংসলীলার দিক থেকে ১১ মে ১৯৬৫-এর ঘূর্ণিঝড়ের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। এই তারিখে বরিশাল ও চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে

প্রাকৃতিক দুর্যোগের তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয়। গবাদিপশুসহ হাজার হাজার মানুষ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যায়। এক হিসেবে ১০,৯৪১ জন নিহত এবং ততোধিক আহত হয়। গভর্নর মোনায়েম খান জলোচ্ছ্বাসের পরবর্তী দু'মাস ধরে দুর্গত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ তদারক করেছেন। তিনি কখনো পরিশ্রান্ত হতেন না। ৭০ বছর বয়সেও, কী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ, কী রাজনৈতিক কাজ অথবা প্রশাসনিক কাজ, তিনি এক নাগাড়ে দিনভর চালিয়ে যেতে পারতেন।

মোনায়েম খান খানিকটা বদমেজাজি ছিলেন। এতদসত্ত্বেও আমি বলবো, তিনি ধর্মভীরু এবং দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি আন্তরিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের কল্যাণ কামনা করতেন।

১৯৬৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান দেশব্যাপী রাজনৈতিক গোলযোগ ও বিরূপ আন্দোলনের মুখে ঘোষণা করেন, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হবেন না এবং এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। ঘোষণাটি রেডিওতে শোনামাত্র গভর্নর মোনায়েম খান রাগে, গোস্সায় গরগর করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে 'ঝুটা মাবুদের' বিরুদ্ধে বিড়বিড় করলেন। এক পর্যায়ে স্পষ্ট করে বললেন, আইয়ূব খান আমাকে শেষ করে দিয়েছে। আমাকে জীবন্ত কবর দিয়েছে।

গভর্নর মোনায়েম খান অত্যন্ত প্রবল প্রতাপের সাথে ৭ বছর এ প্রদেশ শাসন করেন। তিনি অত্যন্ত কর্মঠ ও দৃঢ়সংকল্পের পরিচয় দেন। যা করতে চাইতেন, যে কোন উপায়েই হোক তা সম্পন্ন না করে ক্ষান্ত হতেন না। ১৯৬৯ সালের শেষদিকে তিনি আইয়ূব খানের শাসনের 'সাফল্যের এক দশক' অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে পালন আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হওয়ায় ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ূব খান পিছু হটতে বাধ্য হন। ফলে সাফল্যের দশক পালন ব্যর্থ হয়।"

ছাত্র অঙ্গনে সন্ত্রাসের সূচনা

গভর্নরের এডিসির লেখা থেকে জানা গেলো যে, মোনায়েম খানের মতে, বেয়াদব ছাত্রদেরকে শায়েস্তা করার জন্য ডাণ্ডা ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু শক্তি প্রয়োগ করে ছাত্রদের দমন করার নীতি মোটেই সঠিক নয়। জিয়াউর রহমানের সাথেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অভদ্র আচরণ করেছিলো। পুলিশ শক্তি প্রয়োগ করে দমন করতে চেয়েছিলো। তিনি পুলিশকে এগুতে না দিয়ে সৎ সাহসের পরিচয় দেন এবং ছাত্রদের কাছে একাই চলে গেলেন। ছাত্ররা আর বেয়াদবি করলো না।

গভর্নর স্বৈরশাসনবিরোধী ও গণতন্ত্রকামী ছাত্র সংগঠনগুলোর মোকাবিলার জন্য এনএসএফ (ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশন) নামে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলেন। এরাই সর্বপ্রথম লাঠি ও হকিস্টিক ব্যবহার করে শক্তি প্রয়োগের কুপ্রথা চালু করে। কয়েক বছর অন্যান্য ছাত্র সংগঠন তাদের সন্ত্রাসী নীতির দাপটে দমন হয়ে থাকে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তারা ক্যাম্পাসে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

স্বাভাবিক কারণেই এর প্রতিক্রিয়ায় প্রতিপক্ষ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন মনে করে। এভাবেই ছাত্র অঙ্গনে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালু হয়। তখন আগ্নেয়াস্ত্র সহজলভ্য ছিলো না এবং এর প্রচলনও শুরু হয়নি। '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আগ্নেয়াস্ত্র ছাত্রদের হাতে পৌঁছে। বর্তমানে লাঠি ও হকিস্টিক একেবারেই সেকেলে বলে গণ্য। সন্ত্রাস এখন অস্ত্রনির্ভর। কবে যে দেশ এ মুসীবত থেকে মুক্তি পাবে কে জানে? একটি কুপ্রথা চালু করা সহজ; কিন্তু বন্ধ করা বড়ই কঠিন। নিয়মিত ছাত্রদের মেজাজের সাথে অস্ত্র খাপ খেতে পারে না। তাই অস্ত্রনির্ভর ছাত্র সংগঠনে সশস্ত্র অছাত্রদের প্রয়োজন হয়। অস্ত্র পরিহার করতে পারলে অছাত্রদের কোন প্রয়োজন থাকবে না।

'৬৫ সালের একটি ঘটনা

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাহোর দখল করে শালিমারবাগে বিজয়োৎসব করার ঘোষণা দেয়। বিরাট ট্যাঙ্ক বাহিনী এগিয়ে আসে। পথে কোন নদী নেই বলে স্থলপথে সহজেই এগুচ্ছে। এতোবড় ট্যাঙ্ক বাহিনীর মোকাবিলার জন্য জেনারেল টিক্কা খান অভিনব ব্যবস্থা করলেন। ৫০ জন সৈনিক কোমরে ডিনামাইট বেঁধে রাস্তার দু'পাশের জঙ্গলে থাকবে এবং ট্যাঙ্ক বাহিনী আসার সাথে সাথে তারা ট্যাংকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এভাবে আত্মাহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি ঘোষণা দিলেন যে, তিনি নিজেও আত্মত্যাগ করবেন। সৈনিকরা জেনারেলকে বারণ করলেন এবং দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করতে সম্মত হলেন।

ভারতীয় ট্যাঙ্ক বাহিনী এ জাতীয় আক্রমণের কথা কল্পনাও করেনি। সম্মুখের দিকের ৫০টি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়ে গেলে দ্রুত ধাবমান পেছনের ট্যাঙ্কগুলো একটার উপর আর একটি হুমড়ি খেয়ে পড়লো। ট্যাঙ্কে অবস্থানরত ভারতীয় সৈনিক বিরাট সংখ্যায় নিহত হলো। লাহোর বিজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেলো।

অক্টোবর মাসে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় যোগদানের উদ্দেশ্যে লাহোর গেলে আমরা অনেকেই ঐসব বিধ্বস্ত ট্যাঙ্ক দেখেছি। আরও যেসব এলাকায় যুদ্ধ হয়েছে সেখানেও আমরা গিয়েছি। ঐ যুদ্ধে বাংলাদেশী সেনা-অফিসার ও জোয়ানরা যোগ্যতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে।

১৭ দিন যুদ্ধ চলার পর জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় ২২ সেপ্টেম্বর দিবাগত শেষরাতে যুদ্ধবিরতি সম্ভব হয়। চীনের ভয়ে ভারত পূর্ব-পাকিস্তানের উপর হামলা চালায়নি। হামলা করলে ভারতের মোকাবিলা করার জন্য পূর্ব-পাকিস্তানে কোন সামরিক প্রস্তুতি ছিলো না।

যুদ্ধ চলাকালে গভর্নর মোনায়েম খান সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে গভর্নর হাউজে সমবেত করেন। যুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করার জন্য এবং ভারতের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করার জন্য তিনি আবেদন জানান। ভারতের আক্রমণের বিরুদ্ধে সব

দলই ইতোমধ্যে বিবৃতি দিয়েছে। ভারতবিরোধী প্রচারণা আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যেই গভর্নর সাহেব আহ্বান জানান।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে বেশ কয়েকজন তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বললেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই কেন? যদি ভারত পূর্ব-পাকিস্তানে হামলা চালায় তাহলে কি পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে এর মোকাবিলা করা সম্ভব? এ কথা তখন প্রচলিত ছিলো যে, আইয়ুব খান ও পশ্চিম-পাকিস্তানি জেনারেলদের প্রতিরক্ষা নীতি এটাই ছিলো যে, পূর্ব-পাকিস্তানে হামলা করলে পশ্চিম থেকে ভারতে হামলা করে তা ঠেকানো যাবে। এ ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে সেখানে বিক্ষুব্ধ মতামত প্রকাশ করা হয়। গভর্নর অত্যন্ত অসহায়ত্ববোধ করেন এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য দিতে সক্ষম না হওয়ায় তাকে বেশ বিব্রত মনে হয়।

ক্ষোভ প্রকাশকারীদের সবার নাম মনে নেই। শেখ মুজিবই সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলেন। এ বিষয়ে আমিসহ সব দলের নেতারাই একই রকম বক্তব্য রাখেন। গভর্নরের ঐ অসহায় অবস্থায় আমি বললাম, "যুদ্ধে পাকিস্তান বিজয়ী হোক এটা আমরা সবাই চাই। আমরা বুঝি যে, এ মুহূর্তে গভর্নর সাহেব আমাদের ক্ষোভের প্রতিকার করার পজিশনে নেই। কিন্তু প্রেসিডেন্টের নিকট আমাদের দাবি অবিলম্বে যথাযথ গুরুত্বের সাথে তুলে ধরবেন বলে আশা করি।"

আমার বক্তব্যের ব্যাপারে কেউ কোন আপত্তি তুলেননি বটে; কিন্তু এতে মোনায়েম খানকে অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে মনে করে কেউ কেউ অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে ভাবভঙ্গিতে বুঝা গেলো।

এ ঘটনার পর গভর্নর সাহেব টেলিফোনে আমার পরামর্শ চাইতেন। আমিও কোন কোন সময় ফোনে কথা বলতাম। কোন বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি গুরুত্ব দিতেন।

আত্মীয়তার সম্পর্ক

আরমানিটোলাস্থ তারা মসজিদ সংলগ্ন শরফুদ্দীন মনযিলের জনাব জাহাঙ্গীর মুহাম্মদ আদিল মোনায়েম খানের জামাতা। আর আদিল সাহেবের আপন দু'চাচাতো বোনের স্বামী আমার দু'ভাই। এ সুবাদে গভর্নর সাহেবের সাথে আব্বার বেহাই সম্পর্ক। দূরসম্পর্ক হলেও গভর্নর সাহেব বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আব্বাকে দাওয়াত দিতেন এবং সুযোগমতো একান্তে আলাপ করতেন।

আব্বার কাছ থেকে জানলাম যে, একটু অনুযোগের সুরে গভর্নর সাহেব আমার সম্বন্ধে মন্তব্য করলেন, "মনে হয় গোলাম আযম নিজেকে বড় মনে করে। সে কোন সময় আমার কাছে আসে না। আমার কত দূরসম্পর্কের আত্মীয় এসে কত সুযোগ সুবিধা নিয়ে যায়।"

শুনে আব্বাকে বললাম, "যদি আমি তাঁর দয়ার কাঙাল হতাম তাহলে তাঁর নিকট আমার কোন মূল্যই থাকতো না। দেশের স্বার্থে সরকারের সমালোচনামূলক কোন বিবৃতি দেওয়াও আমার সম্ভব হতো না। আমি যে আন্দোলন করি তা আমাকে

কারো অনুগ্রহ ভিক্ষা করার অনুমতি দেয় না।" এ কথা শুনে আব্বা মৃদু হাসলেন।

তাসখন্দ ঘোষণা

পাক-ভারত যুদ্ধ ২৩ সেপ্টেম্বর বন্ধ হলেও যুদ্ধের পরিণতিতে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, এর মীমাংসার জন্য তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট কোসিগিন সে ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে মধ্য-এশিয়ার মুসলিম দেশ উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে (তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিলো) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করেন।

উভয় পক্ষে যুদ্ধবন্দি রয়েছে। যুদ্ধে উভয় পক্ষই অপর দেশের কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছে। যে কাশ্মীর সমস্যা পাক-ভারত বিরোধের মূল কারণ, সে বিষয়ে সমঝোতা প্রয়োজন। এসব বিষয়ে ১৯৬৬ সালের ৬ থেকে ১০ জানুয়ারি কোসিগিনের মধ্যস্থতায় যে চুক্তি হয় তা 'তাসখন্দ ঘোষণা' নামে প্রচারিত হয়। এ ঘোষণায় স্বাক্ষরদানের পরপরই লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তাসখন্দেই হার্টফেল করে মৃত্যুবরণ করেন।

এ ঘোষণা সম্পর্কে পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সকল বিরোধী দল যেসব মন্তব্য করে এর সারকথা হলো, সশস্ত্র বাহিনী ও জনগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইয়ূব তাসখন্দে ভারতের নিকট পরাজয় স্বীকার করে এসেছেন।

এ মন্তব্যের যুক্তি অত্যন্ত স্পষ্ট। কাশ্মীর ইস্যু ১৯৪৮ সাল থেকেই জাতিসংঘের মাধ্যমে মীমাংসার বিষয়। পণ্ডিত নেহরুর প্রস্তাব অনুযায়ীই কাশ্মীর দখল নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি কার্যকর করে জাতিসংঘ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের সিদ্ধান্ত দেয়। তাসখন্দ ঘোষণায় ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার কথা উল্লেখ থাকায় কূটনৈতিক দিক দিয়ে ভারতের সাফল্য ও পাকিস্তানের ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়।

কাশ্মীর সমস্যা

বিষয়টি সবার নিকট সুস্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর সমস্যাটি তুলে ধরা প্রয়োজন বোধ করছি। আমাদের নতুন প্রজন্মের নিকট বিষয়টি একেবারেই অস্পষ্ট। ফিলিস্তিন সমস্যার চেয়ে কাশ্মীর সমস্যা মুসলিম উম্মাহর জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টো স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যেসব প্রদেশে মুসলিমদের সংখ্যা বেশি সে প্রদেশগুলো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার কথা। সে হিসেবে বঙ্গদেশ ও পাঞ্জাব অবিভক্ত অবস্থায়ই পাকিস্তানে শামিল হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু বিদায়ী ইংরেজ শাসকদের সম্মতি পেয়ে এ দুটো প্রদেশ অমুসলিমরা বিভক্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে পাকিস্তানের আকার অনেক ছোট হয়।

ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতবর্ষে ছোট-বড় অনেকগুলো স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য ছিলো। এ সব রাজ্যকে ইখতিয়ার দেওয়া হয় যে, তারা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকিস্তান বা ভারতে যোগদান করবে অথবা স্বাধীন থাকবে। ছোট রাজ্যগুলো চাপে পড়ে ভারতে শামিল হতে বাধ্য হয়। জুনাগড় রাজ্যকে ভারত জোর করেই নিয়ে নেয়। দুটো রাজ্যই বড় ছিলো, জম্মু ও কাশ্মীর এবং দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদ। ঘটনাক্রমে জম্মু কাশ্মীরে শতকরা ৯০ জন মুসলিম হলেও শাসক ছিলেন হিন্দু-মহারাজা হরি সিং। অপরদিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হায়দ্রাবাদের শাসক ছিলেন মুসলিম।

হায়দ্রাবাদের শাসক নিযাম পাকিস্তানে যোগদানের ঘোষণা দিলে ভারত সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করে হায়দ্রাবাদ দখল করে নেয়। কাশ্মীরের অবিসংবাদিত নেতা শেখ আবদুল্লাহ পণ্ডিত নেহরুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। নেহরুর বাড়িও কাশ্মীরে। শেখ আবদুল্লাহর সমর্থন নিয়ে মহারাজা হরি সিং জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতে শামিল করার ঘোষণা দেয়। কাশ্মীরের জনগণ চরম পাকিস্তানপন্থি হওয়ায় '৪৭ সালেই পাকিস্তান সেনাবাহিনী জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে কাশ্মীর দখল করার উদ্যোগ নেয়। ফলে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় জম্মু ও কাশ্মীরে। ভারতীয় বাহিনী জনসমর্থন না পাওয়ায় পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং পাকবাহিনী এগুতে থাকে। পাকবাহিনী জম্মু ও কাশ্মীরের তিন ভাগের একভাগ দখল করে ফেলার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু জাতিসংঘে ধরনা দেন, যাতে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করা হয়। পাকিস্তান পুরো কাশ্মীর দখল করতে সক্ষম থাকায় যুদ্ধবিরতির পক্ষে ছিলো না। কিন্তু জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মত হয়ে প্রস্তাব পাস করে যে, জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ রেডারেন্ডামের (গণভোট) মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবে যে, তারা কোন্ দেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। জাতিসংঘের চাপে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়।

নেহরুই জাতিসংঘের নিকট ধরনা দিয়ে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে। অথচ নপুংশক জাতিসংঘ নেহরুর শাসনামলেও গণভোটের জন্য ভারতকে সম্মত করাতে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তান ও কাশ্মীরের জনগণ গত ৫০ বছর থেকে গণভোটের প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার দাবি জানিয়ে এসেছে। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে জনগণ ১৯৮৮ সাল থেকে সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে। প্রতিবেশীদের সাথে প্রতারণা করা ও ওয়াদা ভঙ্গ করা ভারতের কূটনৈতিক ঐতিহ্য। গত পঞ্চাশ বছর থেকে ভারত জোর করেই জম্মু ও কাশ্মীর দখল করে আছে এবং '৮৮ সাল থেকে মুক্তি সংগ্রামকে দমন করার জন্য গণহত্যা চালাচ্ছে। জাতিসংঘ কয়েক মাসের মধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব-তিমুরে গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতা দান করতে পারলো, অথচ কাশ্মীরে নিজেদের প্রস্তাবও বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে পারলো না।

তাসখন্দে আইয়ুব খানের কূটনৈতিক পরাজয়

তাসখন্দে পাক-ভারত যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সমঝোতা হওয়ার পর ভারত অত্যন্ত চতুরতার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করে আইয়ূব খানকে এ কথার উপর সম্মত করালো যে, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা

হবে। নেহরুর সময় থেকেই ভারত অবিরাম ঘোষণা করে আসছে যে, কাশ্মীর ভারতের 'অটুট অঙ্গ' (অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ)। আর পাকিস্তানের দাবি হচ্ছে যে, জাতিসংঘের মাধ্যমে গণভোটে এর ফায়সালা হতে হবে।

আইয়ূব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো তাসখন্দ ঘোষণার প্রতিবাদে পদত্যাগ করে জাতীয় বীর হবার জন্য আইয়ূব-বিরোধী আন্দোলন শুরু করলেন।

৯৭.

আইয়ূব-বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন

তাসখন্দ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দলই অত্যন্ত সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। আইয়ূব খান অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করে যেটুকু জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন, তাসখন্দ ঘোষণায় কূটনৈতিক পরাজয় বরণ করায় তা দারুণভাবে হ্রাস পেতে থাকে। তখন থেকেই আইয়ূব খানের পতনের সূচনা হয় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

ঐ সময় মাওলানা মওদূদীর এক বিবৃতি রাজনৈতিক মহলে অত্যন্ত প্রশংসিত হয়। তিনি বলেন, "ডিকটেটররা নিজের দেশে যতই বাহাদুরি দেখাক, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তারা দুর্বল ভূমিকাই পালন করে। কারণ তাদের পেছনে জনগণের শক্তি কার্যকর থাকে না এবং তারা যখন সিদ্ধান্ত নেয় তখন জনগণের নিকট জওয়াবদিহিতার পরওয়া করে না। জনগণের নির্বাচিত সরকারপ্রধান দেশে জনসমর্থনের কাঙাল বলে দাপট দেখায় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক ময়দানে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। আইয়ূব খান ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে এটাই বিরাট পার্থক্য।"

তাসখন্দ ঘোষণার পর একমাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দলসমূহ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার করার জন্য অগ্রসর হয়।

১৯৬৪ সালে যে কয়টি রাজনৈতিক দল ঐক্যবদ্ধভাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য COP (সম্মিলিত বিরোধী দল) গঠন করেছিলো, সেসব দলের নেতৃবৃন্দ ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) ও পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টির নেতৃবৃন্দ উক্ত সম্মেলনে তাসখন্দ ইস্যুকে কেন্দ্র করে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আবার জোরেশোরে আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত নেন। পরের দিন ৬ ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো ও গণদাবির তালিকা তৈরি এবং দেশব্যাপী অভিযানের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্মেলন মুলতবি করা হয়। COP-এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান ও পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

৫ তারিখ সন্ধ্যায় জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠক বসে। মাওলানা মওদূদী সভাপতিত্ব করছিলেন। তিনি টাইপ করা একটি কাগজ আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে এ কাগজটি বিলি করা হয়।

মাওলানার নির্দেশে ইংরেজিতে টাইপ করা কাগজটির বক্তব্য কর্মপরিষদের সদস্যদেরকে পড়ে শুনালাম। এতে ৬ দফা দাবি পেশ করা হয় এবং সম্মেলনে যোগদানকারী সকল দলকে তা সমর্থন করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।

মাওলানা পরিষদকে জানালেন যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান ফোনে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে মাওলানার নিকট দুঃখ প্রকাশ করলেন। দলের প্রাদেশিক সভাপতি কেন্দ্রীয় সভাপতিকে উপেক্ষা করে এ সব দাবি পেশ করায় সর্বদলীয় সম্মেলন ব্যর্থ হবার উপক্রম হয়ে গেলো।

পরদিন সকাল দশটায় ৪ দলীয় সম্মেলনের বৈঠকে আন্দোলনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার কথা। কিন্তু সকালে দেখা গেলো, সরকার সমর্থক সকল ইংরেজি ও উর্দু পত্রিকায় শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলনে পেশ করা ৬ দফা দাবি সবচেয়ে গুরুত্বসহকারে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। এতে বুঝা গেলো যে, বিরোধী দলসমূহের সম্মিলিত আন্দোলনের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করার জন্য ৬ দফা অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করবে মনে করেই সরকার এভাবে ফলাও করা জরুরি মনে করেছে। এভাবে শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্মেলনকে বানচাল করে দিলো। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবযাদা হলেও পশ্চিম-পাকিস্তানে এ দলটির কোন গুরুত্ব ছিলো না। আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানেই শক্তিশালী ছিলো। ৬ দফা প্রস্তাব নওয়াবযাদাও সমর্থন না করায় এবং অন্য কোন দলের সমর্থনের কোন সম্ভাবনা না থাকায় নওয়াবযাদা সম্মেলন বাতিল ঘোষণা করেন। ফলে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন সম্মিলিতভাবে শুরু করা সম্ভব হলো না। আইয়ূব খান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

পিডিএম গঠন

আইয়ূব খানের স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলন সম্মিলিতভাবে করা সম্ভব না হলেও সকল রাজনৈতিক দলই জনগণের ভোটাধিকার বহাল করার দাবিতে সোচ্চার হয়। গোটা পাকিস্তানেই গণতান্ত্রিক আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।

পূর্ব-পাকিস্তানে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন করতে থাকে। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইয়ূব সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যপ্রচেষ্টা বানচালের জন্য ৬ দফা ফলাও করে প্রচার করলেও ৮ মে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা প্রয়োজন মনে করে। রাজনৈতিক গরজ বড়ই বালাই। ৬ দফার আন্দোলন আরও জোরদার হলে আওয়ামী লীগের কয়েকজন শীর্ষনেতা গ্রেপ্তার হন। এ অবস্থায় আমেনা বেগমের নেতৃত্বে ৬ দফা আন্দোলন অব্যাহত থাকে।

এ পরিস্থিতিতে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে জনগণের রাজনৈতিক জাগরণের প্রেক্ষিতে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের গুরুত্ব অনুভূত হয়। ১৯৬৭ সালের ৩০ এপ্রিল সাবেক প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রাহমান খানের বাসভবনে ৫টি দলের নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়। দলগুলো হলো, পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও এনডিএফ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট)।

উক্ত বৈঠকে 'পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট' (PDM) নামে রাজনৈতিক জোট কায়েম হয় এবং প্রত্যেক দল থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি নিয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়।

১. এনডিএফ থেকে সর্বজনাব নূরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী ও আতাউর রাহমান খান।
২. মুসলিম লীগ থেকে মিয়া মমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা, জনাব তোফাজ্জল আলী ও খাজা খায়রুদ্দীন।
৩. জামায়াতে ইসলামী থেকে মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ও অধ্যাপক গোলাম আযম।
৪. আওয়ামী লীগ থেকে নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান, এডভোটেক আবদুস সালাম খান ও গোলাম মুহাম্মদ খান লুন্দখোর।
৫. নেযামে ইসলাম পার্টি থেকে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, জনাব ফরীদ আহমদ ও এমআর খান।

উক্ত বৈঠকে উপরিউক্ত সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

পিডিএম প্রশ্নে পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগে দ্বিধাবিভক্তি

পিডিএম গঠনের সাথে সাথেই পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

৬ দফাপন্থি আওয়ামী লীগের মুকাবিলায় পিডিএমপন্থি আওয়ামী লীগের ২৪ সদস্যবিশিষ্ট পৃথক এডহক কমিটি গঠিত হয়। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৬৭ সালের ২৩ আগস্ট এ কমিটির নাম ঘোষণা করে। কমিটির সভাপতি হন মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, সহ-সভাপতি যশোরের এ্যাডভোকেট মশিয়ূর রাহমান, সেক্রেটারি রাজশাহীর এ্যাডভোকেট মুজীবুর রাহমান ও কোষাধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম চৌধুরী। সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম ঃ

আবদুস সালাম খান এডভোকেট (ফরিদপুর), মিয়া আবদুর রশীদ (যশোর), আবদুর রাহমান খান (কুমিল্লা), মতিউর রাহমান (রংপুর), রহীমুদ্দীন আহমদ (দিনাজপুর), সাদ আহমদ এডভোকেট (কুষ্টিয়া), লকিতুল্লাহ (বরিশাল), মোমিনুদ্দীন আহমদ (খুলনা), জালালউদ্দীন আহমদ (সিলেট), নূরুল হক এডভোকেট (রংপুর), ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (পাবনা), জুলমত আলী খান এডভোকেট (ময়মনসিংহ)।

পিডিএম-এর ৮ দফা

পিডিএমভুক্ত দলগুলোর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, ভারতের মতো সম্প্রসারণবাদী দেশের মুকাবিলায় মুসলিম দেশ হিসাবে মর্যাদার সাথে টিকে থাকতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মযবুত ঐক্য প্রয়োজন। ঐ সব দলের পূর্ব-পাকিস্তানি নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বহাল করা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হিসাবে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রাধান্য এক সময় অবশ্যই বহাল হবে। কোন দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পৃথক হবার চিন্তা করে না। সংখ্যালঘিষ্ঠ এলাকাই এ জাতীয় চিন্তা করে থাকে। প্রায় চারদিকে ভারত দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তান আলাদা হলে ভারতের আধিপত্যের শিকার হবার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।

আওয়ামী লীগের একাংশসহ পিডিএমভুক্ত দলসমূহ ৬ দফা দাবিকে রাষ্ট্রীয় সংহতি পরিপন্থী মনে করে। পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে পৃথক করার পরিকল্পনায়ই ৬ দফা রচিত বলে ধারণা হয়। তাই এর বিকল্প হিসাবে পিডিএম নিম্নোক্ত ৮ দফা দাবি পেশ করে, যাতে প্রাদেশিক সরকার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে পারে।

১. শাসনতন্ত্রে নিম্ন বিধানসমূহের ব্যবস্থা থাকিবে ঃ

ক. পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ফেডারেল সরকার;

খ. ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র মোতাবেক প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদের প্রাধান্য;

গ. পূর্ণাঙ্গ মৌলিক অধিকার;

ঘ. সংবাদপত্রের অবাধ আজাদি;

ঙ. বিচার বিভাগের নিশ্চিত স্বাধীনতা।

২. ফেডারেল সরকার নিম্ন বিষয়সমূহের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন ঃ

ক. প্রতিরক্ষা (ডিফেন্স);

খ. বৈদেশিক বিষয়;

গ. মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় অর্থব্যবস্থা;

ঘ. আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য এবং ঐকমত্যে নির্ধারিত অন্য যে কোন বিষয়।

৩. পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা হইবে এবং কেন্দ্রীয় বিষয় ছাড়া সরকারের অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা শাসনতন্ত্র মোতাবেক স্থাপিত আঞ্চলিক সরকারের নিকটই ন্যস্ত থাকিবে।

৪. উভয় প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য ১০ বছরের মধ্যে দূর করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে।

ক. এই সময়ের মধ্যে দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়ে ব্যয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বৈদেশিক ঋণদানসহ কেন্দ্রীয় সরকারের দেনায় পূর্ব-পাকিস্তানে

ব্যয়িত অর্থের আনুপাতিক অংশ আদায়ের পর পূর্ব-পাকিস্তানে অর্জিত সম্পূর্ণ মুদ্রা নিরঙ্কুশভাবে এই প্রদেশেই ব্যয় করা হইবে।

খ. উভয় অঞ্চলের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বাধীনেই থাকিবে।

গ. অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে অগ্রাধিকার প্রদান করিবেন এবং এমন আর্থিক নীতি গ্রহণ করিবেন যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে মূলধন পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাংকের মওজুদ অর্থ ও মুনাফা, বীমার প্রিমিয়াম এবং শিল্পের মুনাফা সম্পর্কে যথাসময়ে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইবে।

৫. ক. মুদ্রা, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং;

খ. আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্য;

গ. আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ;

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্য।

উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সমসংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত এক একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রত্যেক প্রদেশের সদস্যগণ নিজ প্রদেশের জন্য উক্ত বোর্ডসমূহের সদস্যগণকে নির্বাচন করিবেন।

৬. সুপ্রিমকোর্ট এবং কূটনৈতিক বিভাগসহ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল বিভাগ ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সমসংখ্যক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হইবে। এই সংখ্যাসাম্য অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে এককভাবে কর্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে যাহাতে ১০ বছরের মধ্যে তাহাদের সংখ্যা উভয় প্রদেশে সমান হইতে পারে।

৭. প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে কার্যকরী সামরিক শক্তি ও সমরসজ্জার ব্যাপারে উভয় অঞ্চলের মধ্যে সমতা বিধান করা পাকিস্তান সরকারের শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব হইবে। এই উদ্দেশ্যে–

ক. পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক একাডেমী, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা, ক্যাডেট কলেজ স্থাপন করিতে হইবে।

খ. দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি বিভাগেই পূর্ব-পাকিস্তান হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোক নিয়োগ করিতে হইবে।

গ. নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব-পাকিস্তানে স্থানান্তরিত করিতে হইবে।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সমসংখক সদস্য সংবলিত একটি ডিফেন্স কাউন্সিল গঠন করা হইবে।

৮. এই ঘোষণায় শাসনতন্ত্র শব্দ দ্বারা ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বুঝায়, যাহা

অবিলম্বে জারি করা হইবে। এই শাসনতন্ত্র চালু করিবার ৬ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনেই এই কর্মসূচি ২ হইতে ৭ দফাসমূহকে শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হইবে। উপরিউক্ত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠান ঐক্যবদ্ধ এবং পৃথক পৃথকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

শেখ মুজিবের দৃষ্টিভঙ্গি

১৯৭১ সালে একটি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এবং ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের সাহায্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। শেখ মুজিব এভাবে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে পৃথক হবার কোন পরিকল্পনা মোটেই করেননি। যদি তা করতেন তাহলে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে ইয়াহইয়া খানের সেনাবাহিনীর হাতে ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রেপ্তার হতেন না। তাহলে আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাদের মতো তিনিও ভারতে চলে যেতেন। বিশ্বে এমন কোন নযির নেই যে, কোন সেনাপতি প্রতিপক্ষের নিকট ইচ্ছাকৃতভাবে ধরা দেয়।

তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় বসে ৬ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তিনি ক্রমপর্যায়ে পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে গড়তে চেয়েছিলেন। পৃথক হওয়ার চিন্তা তার মগজে ১৯৫৬ সালেই স্থান করে নেয়। কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও যুক্ত নির্বাচন আওয়ামী লীগের গঠণতন্ত্রে সন্নিবেশিত হবার পর এবং আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দ অপসারণের পর থেকেই তার মুখে বাঙালি জাতীয়তার আওয়াজ শোনা যায়।

মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতেই পাকিস্তান আন্দোলন হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ঘনিষ্ঠ যুবনেতা হিসাবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ১৯৫৬ সালে প্রাদেশিক আইনসভায় অমুসলিম সদস্যদের সমর্থনে ক্ষমতাসীন হবার উদ্দেশ্যে তাদের দাবি অনুযায়ী যখন তিনি মুসলিম জাতীয়তা ত্যাগ করে তথাকথিত 'অসাম্প্রদায়িক' হবার সিদ্ধান্ত নেন, তখন মুসলিম জাতীয়তার শূন্যস্থানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ স্থান করে নেয়।

তাঁর সাথে আমার রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতার কারণে আমি উপলব্ধি করেছি যে, তিনি নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন না। তিনি শুধু প্রদেশ ভিত্তিক রাজনীতি নিয়েই সন্তুষ্ট। এটাই স্বাভাবিক। কারণ বাঙালি জাতীয়তা ভিত্তিক রাজনীতি পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে খাপ খেতে পারে না। এভাবে তিনি পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনীতির অযোগ্য হয়ে পড়েন। সিন্ধু জাতীয়তা ভিত্তিক রাজনীতি যেমন পূর্ব-পাকিস্তানে অচল, তেমনি তার রাজনীতিও পশ্চিম-পাকিস্তানের উপযোগী রইলো না। এ চিন্তার ভিত্তিতেই ৬ দফা রচিত।

শেখ মুজিবের ৬ দফা

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান লাহোরে এক সংবাদ সম্মেলনে নিম্নরূপ ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন ঃ

১. **শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ঃ** ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান একটি যুক্তরাষ্ট্র হইবে। সেখানে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানকে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের অঞ্চলগুলোকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে। পাকিস্তানে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইনসভার সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

২. **কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ঃ** কেন্দ্রীয় (ফেডারেল) সরকারের ক্ষমতা কেবল দু'টি বিষয়ে, যথা–দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতিতে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

৩. **মুদ্রা ও অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ** ক. দু'টি প্রদেশের জন্য দু'টি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকিবে।

অথবা খ. সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রাই রাখা যাইতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পশ্চিম-পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার জন্য কার্যকর সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে পূর্ব-পাকিস্তানের পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভ এবং পৃথক অর্থ ও মুদ্রা বিষয়ক নীতি থাকিবে।

৪. **রাজস্ব, কর ও শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ** কর ধার্যের কোন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে না। এই ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকিবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যের রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ লাভ করিবে।

৫. **বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা ঃ** পাকিস্তান ফেডারেশনভুক্ত দু'টি অঙ্গরাজ্যের (পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান) বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দু'টি পৃথক খাত হিসেবে রাখা হইবে। বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত পূর্ব-পাকিস্তানের আয় পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের আয় পশ্চিম-পাকিস্তানের সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে বা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাজ্যগুলোই মিটাইবে। অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোন বাধা-নিষেধ থাকিবে না। সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্যিক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বিদেশের সহিত বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হইবে।

৬. **আঞ্চলিক সেবাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা ঃ** আঞ্চলিক সংহতি ও সংবিধান রক্ষার জন্য সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব-পাকিস্তান ইহার নিজস্ব আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও পোষণ করার অধিকারী হইবে।

৬ দফা ও মাওলানা ভাসানী

শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবি সম্পর্কে ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতেই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান খুলনায় এক জনসভায় ঘোষণা করলেন, "শেখ মুজিব, আমি তোমার ৬ দফা ডিসমিস করে দিলাম।" শেখ মুজিব কারাগারে বন্দি থাকাকালে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে মস্কোপন্থি ও পিকিংপন্থি ছাত্র সংগঠনসহ সকল বামপন্থি মহল এবং ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদ ও জিএস নাযিম কামরান ১১-দফা দাবিনামা রচনা করে। এ ১১ দফার মধ্যে শেখ মুজিবের ৬ দফাও শামিল করা হয়।

বিস্ময়ের বিষয় যে, মাওলানা ভাসানী ৬ দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি হতে দেখে তিনি ১১ দফার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন। মাওলানার নেতৃত্বে শ্রমিক মহলও সাড়া দেয়। এভাবে শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে মাওলানা ভাসানী ছাত্র ও শ্রমিকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত করে তোলেন। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলীতে লোক নিহত হয় এবং মাওলানা এসব ঘটনাকে যোগ্যতার সাথে কাজে লাগান।

পিডিএম-এর সাংগঠনিক কাঠামো

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্টের কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান হন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান এবং কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি হন এনডিএফ-এর জনাব মাহমুদ আলী।

পূর্ব-পাকিস্তান আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান হন ৮ দফাপন্থি আওয়ামী লীগের নেতা জনাব আবদুস সালাম খান এবং সেক্রেটারি হন অধ্যাপক গোলাম আযম। কোষাধ্যক্ষ হন এনডিএফ-এর প্রাদেশিক সেক্রেটারি জনাব আবদুস সামাদ, যিনি পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা। ঐ সময় তার নামের সাথে আযাদ শব্দটি ছিলো না। বাংলাদেশ আমলে তা নামের অংশ হয়।

১৯৬৭ সালের জুন মাসেই পিডিএম-এর আঞ্চলিক অফিস ঢাকার মগবাজার চৌরাস্তার পাশে এক দোতলায় কায়েম করা হয়। আঞ্চলিক সেক্রেটারি হিসাবে আমি বলতে গেলে সার্বক্ষণিকভাবেই দায়িত্ব পালন করতে থাকি। তিন মাসের মধ্যেই পিডিএম-এর জেলা সংগঠন কায়েম করা হয়।

পিডিএম-এর ৮ দফা ভিত্তিক আন্দোলন

মগবাজার আঞ্চলিক অফিসের পাশের কামরায় কেন্দ্রীয় অফিস করা হয়, যেখানে জনাব মাহমুদ আলী মাঝে মাঝে বসতেন। আঞ্চলিক অফিস প্রত্যেক দিনই কর্মচঞ্চল ছিলো। আমি তো নিয়মিতই হাজির হতাম। যারা পিডিএম-এর আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন তারা হলেন, চেয়ারম্যান আবদুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ আবদুস সামাদ, নেযামে ইসলামের এমআর খান ও কাউন্সিল মুসলিম লীগের তোয়াহা-বিন-হাবীব।

পিডিএম-এর ৮ দফা ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি পুস্তিকা বিপুল সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। এতে ৬ দফার যুক্তিভিত্তিক অত্যন্ত শালীন সমালোচনাও শামিল করা হয়, যাতে পাঠক-পাঠিকা দু'টো তুলনা করার সুযোগ পায়।

পিডিএম আঞ্চলিক অফিসের ভাড়া ও অন্যান্য নিয়মিত খরচের জন্য পাঁচ পার্টির উপরই সমান অংকের চাঁদা ধার্য করা হয়। একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে মাসিক চাঁদা আদায় করতো। সবচেয়ে অনিয়মিত ছিলো আওয়ামী মুসলিম লীগ। নেযামে ইসলাম নিয়মিত থাকার চেষ্টা করতো।

৫ পার্টির দায়িত্বশীলদের এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে একজন মন্তব্য করলেন যে, একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই ধনী পার্টি। দলের তহবিল সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় দেখা গেলো কর্মীদের থেকে মাসিক নিয়মিত অর্থ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা একমাত্র জামায়াতে ইসলামীতেই আছে। তোয়াহা-বিন-হাবীব মন্তব্য করলেন, "জামায়াতে ইসলামী গরীব লোকদের ধনী পার্টি, আর অন্যরা ধনী লোকদের গরীব পার্টি।"

৯৮.

পিডিএম-এর প্রচারাভিযান

১৯৬৭ সালের শীত মওসুম শুরু হবার সাথে সাথেই পিডিএম-এর আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন জেলায় জনসভা করেন। আইয়ূব খানের স্বৈরশাসনের অবসান করে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা এবং পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জনগণকে ৮ দফার আন্দোলনে শরীক হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

এ প্রচারাভিযানের আসল টারগেট আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা এবং বিডি সিস্টেম উৎখাত করে জনগণের ভোটাধিকার বহাল করা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কিভাবে বণ্টন করা হবে ৮ দফায় তাই উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রেখে প্রদেশকে পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন দেবার রূপরেখাই ৮ দফায় পেশ করা হয়।

আমি যেসব জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলাম, সেখানে আমার বক্তৃতার পর শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হয়। স্বাভাবিক কারণেই ৬ দফা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হতো। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলতাম যে, পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্র হিসাবে টিকিয়ে রাখতে হলে ৬ দফা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কোন কোন দফার আলোচনা করে আমি এ কথা প্রমাণ করতাম।

কুমিল্লায় সুধী বৈঠক

জনসভার পর সুধী বৈঠকও করা হতো, যাতে তাদের সাথে খোলামেলা মতবিনিময় করা যায়। আমার মনে পড়ে, কুমিল্লা টাউন হল মিলনায়তনে পিডিএম-এর

জনসভার পর কান্দিরপাড় সিনেমা হলের নিকটে এক বাড়িতে ৩০/৩৫ জনের এক সুধী বৈঠক হয়। এতে অধ্যাপক, আইনজীবী, ব্যবসায়ী এবং কলেজের ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। ৬ দফা সম্পর্কে আমার বক্তব্যে আপত্তি তোলা হলো। আমি প্রশ্নকর্তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি ৬ দফা কি ভালভাবে পড়েছেন? তিনি বলেন যে, দেখেছি বটে; কিন্তু সবকথা মনে নেই।

জানতে চাইলাম, তাহলে কিসের ভিত্তিতে আপত্তি করলেন? বললেন, পূর্ব-পাকিস্তানের দাবিদাওয়া হিসাবেই আমরা ৬ দফা সমর্থন করি। জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি এটা চান যে, পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হোক? কয়েকজনেই জোর দিয়ে বললেন, না তা চাই না।

এরপর উপস্থিত সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনাদের মধ্যে যে যে মনোযোগ দিয়ে ৬ দফা পড়েছেন তাদের সাথে আমি এ বিষয়ে মতবিনিময় করতে চাই। অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, একজনও ভালভাবে ৬ দফা সম্পর্কে অবহিত বলে দাবি করলেন না।

আমি মন্তব্য করলাম যে, একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দেশের সরকার গঠন ও পরিচালনার জন্য ৬ দফা কর্মসূচি পেশ করা হয়েছে। আপনাদের মতো উচ্চ শিক্ষিত ও সচেতন লোকেরাও যদি তা সঠিকভাবে না জেনেই অন্ধভাবে সমর্থন করেন তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ কী? আমার মন্তব্যে তাদেরকে একটু লজ্জিত হতে দেখে বললাম, দেশে সামরিক শাসন ও অগণতান্ত্রিক সরকার কায়েম থাকায় পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে এর প্রতিকারের জন্যই জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা প্রয়োজন। গণপ্রতিনিধিগণ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য নিঃস্বার্থভাবে চেষ্টা করলে কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করা সম্ভব।

আমি ১৯৬২ সালের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করলাম যে, পূর্ব-পাকিস্তানের নেতাদের দুর্বলতার কারণেই আমরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আছি। সবুর খান, মোনায়েম খান, মুহাম্মদ আলী বগুড়াদের মতো নেতারা মন্ত্রী হবার লোভে প্রদেশের স্বার্থ বিসর্জন না দিলে পূর্ব-পাকিস্তানের দাবি তখনই আদায় করা যেতো। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের মীর জাফরদের কারণেই আমরা বঞ্চনার শিকার হই।

এরপর আমি ৬ দফার ২য় ও ৪র্থ দফার উল্লেখ করে দেখাই যে, শুধু দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি কেন্দ্রের হাতে থাকবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আদায়েরও কোন ইখতিয়ার থাকবে না। দুনিয়ায় এ জাতীয় কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নেই। এটা করা হলে পাকিস্তান কনফেডারেশনে পরিণত হবে। দুনিয়ার কোন ফেডারেল রাষ্ট্র এমন দুর্বল নয়।

দেশরক্ষা বিভাগ কেন্দ্রের হাতে থাকবে বলে উল্লেখ করেও ৬ নং দফায় পূর্ব-পাকিস্তান সরকারকে পৃথক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দেওয়ার দাবি করা হয়েছে।

৬ দফা বিশ্লেষণ করে আমি প্রমাণ করলাম যে, এ কর্মসূচি পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যেই রচনা করা হয়েছে। ইউনিয়ন কাউন্সিলকেও ইউনিয়নের কাজের জন্য কর বসাবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কোন ক্লাব ও সমিতি কি সদস্যদের থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করা ছাড়া চলতে পারে? অথচ ৬ দফায় কেন্দ্রীয় সরকারকে এটুকু ক্ষমতা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রদেশের দেওয়া চাঁদায় কেন্দ্রীয় সরকারকে চলতে হবে।

সর্বশেষে আমি বললাম, ভারতের মতো বৈরী প্রতিবেশী দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় পাকিস্তান থেকে পৃথক হওয়া যদি আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে বলে মনে করেন তাহলে ৬ দফা সমর্থন করুন।

বেশ কয়টি জেলা শহরেই আমি জনসভার পর এ জাতীয় সুধী বৈঠক করেছি এবং আমার যুক্তি কেউ খণ্ডন করতে এগিয়ে আসেননি।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সফর

১৯৬৮ সালে পিডিএম-এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান এবং বিভিন্ন দলের পশ্চিম-পাকিস্তানি প্রতিনিধিগণ দু'বার পূর্ব-পাকিস্তান সফর করেছেন। তারা জেলা শহরগুলোতে জনসভায় বক্তব্য রেখেছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের পিডিএম নেতারাই এসব জনসভায় বেশি সংখ্যায় বক্তৃতা করেছেন।

এসব জনসভায় কোথাও আওয়ামী লীগ ও তাদের ৬ দফার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা হয়নি। সকল বক্তাই স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ও গণতন্ত্রের পক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। আইয়ূব খানকে টার্গেট করেই সবাই কথা বলেছেন।

অথচ প্রতিটি জনসভায়ই আওয়ামী সন্ত্রাসীরা হামলা করেছে। এ ফ্যাসিস্ট চরিত্রই তাদের ঐতিহ্য। রাজনৈতিক ময়দান তারা একাই দখল করে রাখতে চায়। আমি লক্ষ্য করেছি যে, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খানের প্রতিই তাদের চরম বিদ্বেষ। তাদের কোন কেন্দ্রীয় নেতা নেই। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের পশ্চিম-পাকিস্তানে কোন গ্রুপ নেই। শেখ মুজিব প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নেতা মাত্র। তিনি নওয়াবযাদা থেকে পৃথক হয়ে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিক দল গঠন করা প্রয়োজনই মনে করেননি। তার রাজনৈতিক চিন্তা কেবল প্রদেশ ভিত্তিক।

জনসভায় গোলযোগ করার জন্য যারা চেষ্টা করেছে তাদের মুকাবিলা করার জন্য পিডিএম-এর পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীর কর্মীদেরকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। অন্যান্য শরীক দলের জেলা পর্যায়ে জনশক্তির বেশ অভাব ছিলো। ৮ দফা পন্থি আওয়ামী লীগের অবস্থা জেলা পর্যায়ে সবচেয়ে করুণ মনে হয়েছে। তাদের কেন্দ্রীয় নেতারাও জেলায় অসহায়ত্ব বোধ করেছেন।

গোটা পাকিস্তানে আইয়ূব-বিরোধী আন্দোলন জোরদার। ইতঃপূর্বে কখনো একই সময়ে একই ইস্যুতে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে রাজনৈতিক আন্দোলন এমন জোরদার

হয়নি। আইয়ূবের ক্ষমতা দখলের পর পশ্চিমে এই প্রথম গণতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধলো। তাসখন্দ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায়ই এ আন্দোলনের সূচনা হয়।

১৯৬৭ সালের নভেম্বরে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) নামে দল গঠন করে ময়দানে তোলপাড় সৃষ্টি করেন। সিনেমার অভিনেতাদের মতো নাটকীয় ভঙ্গিতে বক্তৃতা করে তিনি জনপ্রিয় হতে লাগলেন। আইয়ূব খানের হাতে গড়া নেতার বিদ্রোহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ায় রাজনৈতিক চমক সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক। ভুট্টো কোন দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন না। সিন্ধু প্রদেশের লারকানার জমিদার তনয় ভুট্টোকে আইয়ূব খান বলতে গেলে রাজপথ থেকে তুলে এনে রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। ভুট্টো আপন যোগ্যতা বলে আইয়ূব খানের এতোটা বিশ্বস্ততা অর্জন করতে সক্ষম হন যে, একদিকে দেশে তিনি আইয়ূব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগের সেক্রেটারি জেনারেল হয়ে দলে দ্বিতীয় প্রধান কর্তার মর্যাদা পেলেন, অপরদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে জাতিসংঘসহ গোটা বিশ্বে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেন। ভুট্টো উর্বর মেধার অধিকারী ছিলেন এবং অতুলনীয় বাগ্মী ছিলেন। ইংরেজী, উর্দু ও সিন্ধু ভাষায় আকর্ষণীয় বক্তা ছিলেন। জনসভায় তিনি শ্রোতাদেরকে নাচিয়ে তোলার যোগ্য ছিলেন।

১৯৬৮ সালের অক্টোবরে একটা সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরাট ছাত্র-আন্দোলন শুরু হয়। পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো ছাত্রদের হিরো হিসেবে অবতীর্ণ হন।

ঘটনাটি হলো, সীমান্ত প্রদেশের লান্ডিকোটাল বিদেশ থেকে পাচারকৃত মালের বিখ্যাত বা কুখ্যাত বিরাট বাজার। রাওয়ালপিণ্ডি গর্ডন কলেজের ৭০ জন ছাত্র সেখান থেকে মাল কিনে ফিরবার সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষ সমুদয় মাল বাজেয়াপ্ত করে। ছাত্ররা এর প্রতিবাদে পিণ্ডিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশের গুলীতে আবদুল হামীদ নামে এক ছাত্র নিহত হয়। সবাই লান্ডিকোটাল থেকে বিদেশী মাল কিনে আনে। ছাত্রদের কেনা মাল কেন বাজেয়াপ্ত করা হলো? এর প্রতিবাদ করায় ছাত্রদের গুলী করতে হবে কেন? এ ঘটনাটির প্রতিবাদে সারা পশ্চিম-পাকিস্তানে গণআন্দোলনের সূচনা হয়। মনে হয় যেন আইয়ূব বিরোধী বিক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে এ ঘটনাটি বারুদ ছিটিয়ে দিলো।

ভুট্টোতো এ সুযোগ পুরোপুরিই কাজে লাগালেন। অবসরপ্রাপ্ত এয়ার মার্শাল আজগর খানও রাজনৈতিক দল গঠন করে ময়দানে অবতীর্ণ হলেন। তার দলের নাম রাখেন জাস্টিস পার্টি। ঢাকা হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুরশিদ পূর্ব-পাকিস্তানে এ দলের নেতা হন।

পূর্ব-পাকিস্তানে চরম রাজনৈতিক বিক্ষোভ

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ উৎখাত হয়ে যাবার পর পাকিস্তানের ভিত্তি কেঁপে উঠে। যে মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তানের জন্ম এর এ রকম পরিণতির ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা দুর্বল হয়ে পড়ে। ইসলামের নামে কায়েম

হওয়া পাকিস্তানের শাসকদের ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তারা জনগণের আস্থা হারায়। মুসলিম জাতীয়তাবোধের লালন না করায় বাঙালি জাতীয়তার চেতনা জেগে উঠে।

বিশেষ করে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিকে দমন করার জন্য মুসলিম লীগ সরকার গুলী চালিয়ে ছাত্রদের হত্যা করার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম লীগ বাংলা ভাষা ও বাংলার দুশমন হিসাবে গণ্য হয়ে যায়।

এ পরিবেশে মাওলানা ভাসানী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম জাতীয়তা পরিত্যাগ করে বাঙালি জাতীয়তা গ্রহণ করায় রাজনৈতিক ময়দানে মুসলিম চেতনা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

ভাষা শহীদদের স্মরণে প্রতি বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা হয়। এ দ্বারা নতুন প্রজন্মের মন-মগজে বাঙালি জাতীয়তার চেতনা আরও জাগ্রত হয়।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ৯ বছর পর্যন্ত দেশের শাসনতন্ত্র রচনায় সক্ষম না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই হতাশার সৃষ্টি হয়। ১৯৫৬ সালে রচিত শাসনতন্ত্রে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেবার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ উন্নত হয়। ঐ শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন হবে বলে সিদ্ধান্ত হওয়ায় রাজনৈতিক মহলে স্বস্তি ফিরে আসে।

আইয়ুব খানের দশ বছরের স্বৈরশাসনের প্রতিক্রিয়া

পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন মহলে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন ও বিডি সিস্টেমের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা আইয়ূবের বিরুদ্ধে নিম্নরূপ চার্জশীটের জন্ম দেয়ঃ

১. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের রচিত শাসনতন্ত্রকে বাতিল ঘোষণা করে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

২. দেশ রক্ষার দায়িত্বে অবহেলা করে দেশ শাসনের ক্ষমতা দখল করে জনগণের সাথে মারাত্মক প্রতারণা করেছেন।

৩. সামরিক শাসন জারি করে ১৯৫৯ সালে নির্বাচন হতে না দিয়ে গণতন্ত্র হত্যার সাথে সাথে জনগণকে তাদের নির্বাচিত সরকার কায়েম করা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

৪. সামরিক শাসন চালু করে জনগণের নির্বাচিত তখনকার আইন পরিষদ সদস্যদের অধিকার হরণ করেছেন।

৫. রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে অর্ডিন্যান্স বলে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করে স্বৈরশাসনকে নিশ্চিত করেছেন।

৬. যে জনগণের ভোটে পাকিস্তান কায়েম হলো তাদের ভোটাধিকার হরণ করে তথাকথিত বেসিক ডেমোক্রেসি চালু করে জনগণকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন এবং গণতন্ত্রকে হত্যা করার অপরাধ করেছেন।

৭. বিডি মেম্বারদেরকে অবৈধ উপায়ে প্রভাবান্বিত করে এবং বিভিন্ন রকম স্বার্থের বিনিময়ে তাদের ভোট খরিদ করে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তি করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। অথচ বিডি মেম্বাররা ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেবার শপথ করে জনগণের ভোট পেয়েছেন।

৮. ১৯৬২ সালে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত ৪০ জন গণপরিষদ সদস্য পূর্ব-পাকিস্তানের অত্যন্ত ন্যায্য ৭ দফা দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যখন চাপ প্রয়োগ করলেন তখন মন্ত্রিত্বের টোপ ফেলে সুবিধাবাদীদেরকে নিয়ে সরকার গঠন করে পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

৯. ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে শেখ মুজিবের ঘোষিত ৬ দফা ব্যাপকভাবে সরকার সমর্থক পত্রিকায় প্রচার করার পর পূর্ব-পাকিস্তানে এর পক্ষে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করায় শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের বিনা বিচারে জেলে আটক চরম রাজনৈতিক অসততার পরিচয় দিয়েছে। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনগণের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থেই ৬ দফা হয়েছে।

১০. এ পরিস্থিতিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে জনগণকে বিক্ষুব্ধ করা হলো। এতে জনগণের মধ্যে এ ধারণাই জন্মে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করার অপরাধে শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদোহী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দিতে চায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি সরকারি প্রেসনোটে জানানো হয় যে, ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের যোগসাজশে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে ১৮ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, ফ্লাইট সার্জেন্ট মুহাম্মদ ফজলুল হক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, মেজর শামসুল আলম প্রমুখ কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন মানের সামরিক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন। সিএসপির দু'জন অফিসারের নামও তাতে রয়েছে, আহমদ ফযলুর রহমান ও রুহুল কুদ্দুস।

১৮ জানুয়ারি (১৯৬৮) সরকারি প্রেসনোটে ঘোষণা করা হয় যে, এ মামলার প্রধান আসামি হিসেবে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিনা বিচারে আটক ছিলেন। তাকে সেখান থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়।

পিডিএম অফিসে আঞ্চলিক চেয়ারম্যান এডভোকেট আবদুস সালাম খানের সাথে ঐ দিনই এ খবর সম্পর্কে আমার আলোচনা হয়। আমরা দু'জন অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করি। আমাদের ধারণা হলো যে, এ মামলাটি যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ষড়যন্ত্রকারীদের আদালতে বিচার হলে জনগণের সমর্থন পাওয়া যেতো। কিন্তু শেখ মুজিবকে এ মামলায় প্রধান আসামি করায় জনগণ এটাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলেই সন্দেহ করবে। মামলা চলাকালে সাক্ষী-প্রমাণে শেখ মুজিব জড়িত বলে প্রমাণিত হলে তাকে গ্রেপ্তার করা সমীচীন হতো। কিন্তু মামলা শুরু হবার আগেই তাকে প্রধান আসামি ঘোষণা করা সরকারের মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল হয়েছে। জনগণের সামান্য সমর্থনও এ মামলায় আশা করা যায় না।

রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, আইয়ূব খান শেখ মুজিবকে এ মামলায় প্রথমেই জড়িত করতে চাননি। কিন্তু গভর্নর মোনায়েম খান নাকি শেখ মুজিবকে এ সুযোগে খতম করার উদ্দেশ্যে চাপ দিয়ে আইয়ূব খানকে রাজি করান। এ গুজব কতটুকু সত্য তা জানার উপায় নেই। কিন্তু কৌশলগত দিক দিয়ে এ সিদ্ধান্ত চরম বোকামিরই পরিচয় বহন করে।

পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে আগরতলায় কি এমন ষড়যন্ত্র পাকানো সম্ভব সে বিষয়ে আমাদের কোন ধারণা নেই। তবে এমন কিছু ঘটে থাকবে, যাতে রাষ্ট্রদোহিতার মামলা চলে। সরকার এ বিষয়ে নিশ্চিত না হলে সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতি সমবায়ে বিশেষ আদালত গঠন করতো না। পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি এমএ রাহমান, পূর্ব-পাক হাইকোর্টের বিচারপতি মুজিবুর রহমান ও বিচারপতি মাকসুমুল হাকীম এ আদালতের বিচারক নিযুক্ত হন। ক্যান্টনমেন্ট এলাকায়ই এ বিশেষ আদালতে বিচারকার্য শুরু হয়।

এ মামলায় শেখ মুজিবের পক্ষে আদালতে উকিলের দায়িত্ব পালন করেন এডভোকেট আবদুস সালাম খান, যিনি আঞ্চলিক পিডিএম চেয়ারম্যান। তিনি সম্পর্কে শেখ মুজিবের মামা ছিলেন। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে এ মামলাটি নতুন মাত্রা যোগ করে। একই সাথে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গণবিদ্রোহের দিকে এগুতে থাকে।

৯৯.

১৯৬৮ সালে পিডিএম-এর উদ্যোগে আমার পশ্চিম-পাকিস্তান সফর

পিডিএম-এর কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান পূর্ব-পাকিস্তানে দু'বার সফর করে অনেক জেলা শহরে জনসভা করেছেন। পশ্চিম-পাকিস্তানের আর কোন কেন্দ্রীয় নেতা এখানে সফর করা প্রয়োজন মনে করেননি।

কিন্তু পিডিএমভুক্ত দলগুলোর কেন্দ্রীয় নেতাদের পশ্চিম-পাকিস্তানে এক সাথে সফর করা জরুরি বলে সিদ্ধান্ত হয়। ৫ দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে নওয়াবযাদা, চৌধুরী

মুহাম্মদ আলী ও দৌলতানা এবং মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ একসাথে ৪টি প্রাদেশিক রাজধানীসহ বেশ কয়টি বিভাগীয় ও জেলা শহরে জনসভা করেছেন। এনডিএফ-এর নেতা জনাব নূরুল আমীন বার্ধক্যজনিত কারণে সফরে যেতে পারেননি।

এ সফরে পূর্ব-পাকিস্তানের ৫ দলীয় নেতাদের মধ্যে নেযামে ইসলাম পার্টির মৌলভী ফরীদ আহমদ (এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন) ও জামায়াতের পক্ষ থেকে আমি ঐ সফরে ছিলাম। পশ্চিম-পাকিস্তানের উক্ত ৪ জন বড় নেতার সাথে তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় একসাথে ট্রেনে ও সড়ক পথে সফর, এক সাথে খাওয়া ও থাকার সুযোগ হয়। বাকি তিন দলের কোন পূর্ব-পাকিস্তানি নেতা এ সফরে যাননি।

এ সফরে বিশাল জনসভাসমূহে মৌলভী ফরীদ আহমদ ও আমাকে বক্তৃতার জন্য বেশি সময় বরাদ্দ করা হতো। উর্দুতেই বক্তৃতা দিতে হতো। ফরীদ সাহেব খুব রসিয়ে রসিয়ে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতেন ও শ্রোতাদেরকে মাতিয়ে রাখতে পারতেন। আইয়ূব খান ও ভুট্টো সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মক এমন সব কথা বলতেন, যা জনগণ খুব মজা করে শুনতো। পার্লামেন্টে তিনি ইংরেজিতে এবং জনসভায় উর্দুতে চমৎকার বক্তৃতা করতেন। তাঁকে বড় বাগ্মী বলে সবাই স্বীকার করতো।

আমার বক্তৃতায় আইয়ূব খানের বেসিক ডেমোক্রেসিকেই সমালোচনার প্রধান বিষয় হিসেবে পেশ করতাম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে পরোক্ষ নির্বাচন ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন সম্পর্কিত বিতর্কের যুক্তি তুলে ধরতাম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিতর্কে পরোক্ষ নির্বাচনের পক্ষে প্রধান যে যুক্তি দেখানো হয়, সেটাই আইয়ূব খান অবলম্বন করেন। তাতে বলা হয় যে, জনগণ শিক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া উচিত নয়। অশিক্ষিত জনগণ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার যোগ্য হতে পারে না। আইয়ূব খানের নিকট এ যুক্তিটি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়। অথচ অশিক্ষিত মুসলিম জনগণ ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিতে ভুল করেনি। অনেক শিক্ষিত লোকও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিতর্কে যারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পক্ষে, তারা মনে করেন যে, জনগণকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যেই প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রয়োজন। জনগণ সরাসরি জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে সকল দলের প্রার্থীরাই তাদের বক্তব্য নিয়ে ভোটারদের নিকট হাজির হতে বাধ্য হবে। দেশের সমস্যা ও এর সমাধান সম্পর্কে দলীয় মেনিফেস্টো অনুযায়ী ভোটারদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করবে। তাদের সমর্থন হাসিল করার জন্য অশিক্ষিত জনগণের উপযোগী স্থানীয় ভাষায় বক্তব্য রাখবে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জনগণের প্রধান প্রধান সমস্যা ও এ সবের গ্রহণযোগ্য সমাধান, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতামত ইত্যাদি সম্পর্কে সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, ধারণা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কোন বিকল্প নেই। জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে যারা নির্বাচিত হবে তাদেরকে জনগণের নিকট সরাসরি হাজির হওয়ার এটাই

একমাত্র উপায়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সব জ্ঞান দান করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

জনসভায় আমার যুক্তি

আমি একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে রসিয়ে রসিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করতাম। শিশুরা যখন হাঁটা শেখে তখন বার বার আছাড় পড়ে। পয়লা দাঁড়াতে শেখে। এরপর কোন কিছু ধরে এক-দু'পা করে হাঁটে। এর পর কোন অবলম্বন ছাড়া দাঁড়িয়ে যখন পা বাড়ায় তখনই পড়ে যায়। আবার উঠে দাঁড়ায়। দু'এক পা এগুতেই আবার আছাড় খায়। কোন কোন সময় পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠে।

শিশুর হাঁটার এ প্রচেষ্টা আপনজনেরা বেশ উপভোগ করে। তারা একটু দূরে থেকে হাত বাড়িয়ে তাকে হাঁটতে উৎসাহ দেয়। বার বার পড়ে যেতে দেখেও কেউ কোলে নিয়ে হাঁটার প্রচেষ্টা থামিয়ে দেয় না। পড়ে গিয়ে কষ্ট পাবে আশঙ্কা করেও শিশুকে হাঁটতে বারণ করে না।

যদি কোন পিতামাতা আদরের আতিশয্যে শিশুকে এভাবে কষ্ট করে হাঁটতে না দিয়ে সব সময় কোলে নিয়ে রাখে এবং ভালোভাবে হাঁটার যোগ্য হওয়ার অপেক্ষা করে তাহলে এ শিশু হাঁটা শিখতেই পারবে না। কয়েক মাস অবিরাম কোলে রেখে যখনই তাকে হাঁটতে ছেড়ে দেবে তখনই আবার আছাড় খাবে। কোন পিতামাতা এমন আচরণ করলে তা সোহাগের নামে দুশমনিই করা হবে।

আইয়ূব খান জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে চরম দুশমনি করেছেন। জনগণ অশিক্ষিত ও সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে অক্ষম বলে তিনি ধারণা করেন। তাই তাদের মায়া-মহব্বতে পেরেশান হয়ে তিনি জনগণকে নির্বাচনী ঝামেলা থেকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর বুনিয়াদি গণতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলতাম যে, কোলের শিশুকে দু'হাত ধরে ঝুলিয়ে রেখে পা দুটো শূন্যে হাঁটার মতো নাড়াচাড়া করতে দিলেন, এভাবে হাঁটা শেখার পর তাদেরকে প্রত্যক্ষভাবে ভোট দেবার সুযোগ দেওয়া হবে। তারা ইউনিয়ন পর্যায়ে ভোট দিতে দিতে যোগ্য হবার পর সরাসরি জাতীয় নির্বাচনে তাদের ভোট দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রোতাদের এ উদাহরণটির রস খুবই উপভোগ করতে দেখেছি।

১৯৬৮ সালের আন্দোলন

১৯৬৮ সাল পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইয়ূব খানের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে ঐ বছরই পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানে যুগপৎ ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠে। সর্বত্র বিক্ষোভ-মিছিলে জনগণ বিপুলভাবে সাড়া দেয়। বিক্ষোভ দমন করার জন্য বহু জায়গায় পুলিশের গুলীতে নিহত হবার খবর জনগণকে আরও উত্তেজিত করে তোলে। পূর্ব-পাকিস্তানে নিহত হবার প্রতিবাদে পশ্চিম-পাকিস্তানে এবং পশ্চিমে নিহত হবার প্রতিবাদে পূর্বে প্রচণ্ড বিক্ষোভ চলতে থাকে।

পূর্ব-পাকিস্তানে ৬ দফা ও ১১ দফার আন্দোলন ময়দানে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। আগরতলা মামলা এ আন্দোলনে বলিষ্ঠ মাত্রা যোগ করে।

পিডিএম প্রায় দু'বছর আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন করে ময়দানে যেটুকু উত্তাপ সৃষ্টি করেছিলো, তাও ১১ দফার আন্দোলনের খাতেই জমা হয়ে যায়। পিডিএম ময়দানে সক্রিয় থাকলেও ছাত্র-শ্রমিকদের উগ্র আন্দোলনের তুলনায় তা নগণ্যই বলা যায়।

পিডিএম পল্টন ময়দানে বিশাল এক জনসভার আয়োজন করে চলতি গণআন্দোলনে সহযোগী ভূমিকা পালনের চেষ্টা করে। জনাব নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে জনসভা যথাসময়েই শুরু হয়। বিকাল ৪টায় আওয়ামী লীগ নেতা তাজুদ্দীন ও অন্যান্য কয়েকজনের নেতৃত্বে ছাত্র ও শ্রমিকসহ এক বিরাট বাহিনী পেছন দিক থেকে এসে পিডিএম-এর মঞ্চ দখল করে নেয়। তারা বিশাল ক্যানভাসে শেখ মুজিবের ফটো মঞ্চের সামনে তুলে ধরে। সভাপতি জনাব নূরুল আমীন অসহায়ের মতো আসনে বসে রইলেন। এদের সাথে সংঘর্ষ করা সম্ভব নয় বলে পিডিএম নেতৃবৃন্দ এ ফ্যাসিস্ট (সন্ত্রাসী) আচরণ বাধ্য হয়ে সহ্য করেন। আমার সাথে ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও তাজুদ্দীন ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমার দিকে (হয়তো চক্ষুলজ্জায়) তাকালেনও না। তাদের এ আচরণে আপত্তি করলে যে তারা গুণ্ডার মতো হিংস্র আচরণ করবেন তাতে কোন সন্দেহ ছিলো না।

রাজনৈতিক ময়দানে আর কোন শক্তির অস্তিত্ব বরদাশত না করার ঐতিহ্য আওয়ামী লীগের মজ্জাগত। তারা একলাই ময়দান দখলে রাখা প্রয়োজন মনে করে। তাদের আচরণে কখনোই গণতান্ত্রিক মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায় না। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের বাকশাল কায়েম করা এবং ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালের শেখ হাসিনার শাসনকাল ঐ ফ্যাসিস্ট ঐতিহ্যেরই চূড়ান্ত রূপ।

মাওলানা ভাসানী ১১ দফার সমর্থক হলেও তিনি আওয়ামী লীগ থেকে ভিন্নভাবে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন শুরু করলেন।

পশ্চিম-পাকিস্তানে পিডিএম ময়দানে বেশ সক্রিয় থাকলেও মি. ভুট্টো সর্বশক্তি দিয়ে ময়দান দখলে তৎপর হলেন। মাওলানা ভাসানীর মতো তিনিও জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলনের মাধ্যমে এগুতে লাগলেন।

এ পরিস্থিতিতে পিডিএম-এর অন্তর্ভুক্ত ৫টি দলের বাইরের আরও তিনটি দল ৫ দলের সাথে মিলে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য এক মঞ্চে সমবেত হওয়া অত্যাবশ্যক মনে করলেন। ঐ তিনটি দল হলো ৬ দফাপন্থি আওয়ামী লীগ, সীমান্তের পাঠান নেতা ওয়ালি খানের ন্যাপ ও মাওলানা মুফতী মাহমুদের জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম।

ঢাকায় DAC গঠন

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের সভাপতি মুফতী মাহমুদ ও ন্যাপের সেক্রেটারি জেনারেল এডভোকেট মাহমুদ আলী কাসূরী ঢাকায় এলেন। একই সময়ে পাকিস্তান

নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি চৌধুরী মুহাম্মদ আলী, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি মিয়া মমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান ঢাকায় পৌঁছলেন।

১৯৬৯ সালের ৭ ও ৮ জানুয়ারি জনাব নূরুল আমীনের বাড়িতে ৮ দলীয় নেতৃবৃন্দের বৈঠকে Democratic Action Committee (DAC) (গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি) নামে ঐক্যমঞ্চ গঠিত হয়। এতে যারা স্বাক্ষর করেন, তারা হলেন ঃ

১. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ,
২. পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম-এর মাওলানা মুফতী মাহমুদ,
৩. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর জনাব নূরুল আমীন,
৪. পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টির চৌধুরী মুহাম্মদ আলী,
৫. পাকিস্তান আওয়ামী লীগ-এর নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান,
৬. পাকিস্তান মুসলিম লীগ-এর মিয়া মমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা,
৭. পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (৬ দফা)-এর সৈয়দ নজরুল ইসলাম,
৮. পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর আমীর হোসেন শাহ।

DAC-এর ৮ দফা

আট দলীয় জোট গণতন্ত্র বহালের আন্দোলন শুরু করার উদ্দেশ্যে ঐ বৈঠকেই নিম্নরূপ ৮ দফা দাবিতে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন ঃ

১. কেন্দ্রে ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার।
২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন।
৩. অবিলম্বে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার।
৪. নাগরিক অধিকার পুনর্বহাল ও সকল কালাকানুন বাতিল। বিশেষত বিনাবিচারে আটক রাখার আইন ও বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিল।
৫. শেখ মুজিবুর রহমান, খান আবদুল ওয়ালী খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তি এবং কোর্ট ও ট্রাইব্যুনাল সমীপে দায়েরকৃত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।
৬. ১৪৪ ধারার আওতায় দেওয়া সর্বপ্রকার আদেশ প্রত্যাহার।
৭. শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার বহাল।
৮. সংবাদপত্রের উপর আরোপিত যাবতীয় বিধি-নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বাজেয়াপ্তকৃত সকল প্রেস ও পত্রিকা পুনর্বহাল।

এভাবে পিডিএম-ভুক্ত ৫ দল ও এর বাইরের ৩ দল মিলে DAC নামে ঐক্যমঞ্চ গড়ে উঠলো। অতঃপর এ নামেই আন্দোলন পরিচালনা করা হলো। DAC-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খানকেই করা হলো। পূর্ব-পাকিস্তানের

আঞ্চলিক আহ্বায়ক কে হবে, সে বিষয়ে আলোচনায় দেখা গেলো যে, ৬ দফাপন্থি আওয়ামী লীগ ছাড়া বাকি ৭টি দলের পক্ষ থেকে দাবি জানিয়ে পদ পাওয়ার মতো নির্লজ্জ ভূমিকা কেউ পালন করেনি। এ পদটি আওয়ামী লীগকে না দিলে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ DAC-এ থাকতে রাজি হবে কিনা সন্দেহ দেখা দিলো। তাই আন্দোলনের স্বার্থে তাদের দাবি সবাই মেনে নিলো। শেখ মুজিব জেলে থাকায় সিনিয়র হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমদকে আহ্বায়ক করা হলো।

আন্দোলন তুঙ্গে উঠলো

এ বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির সাথে সাথে গোটা পাকিস্তানে আন্দোলন এমন জোরদার হলো যে, সেনাবাহিনী ব্যবহার করেও দমন করা অসম্ভব হয়ে পড়লো। আন্দোলন দমন করতে গিয়ে গুলীতে কোথাও লোক নিহত হলে এর প্রতিক্রিয়ায় সারা পাকিস্তানে বিক্ষোভ আরও বেড়ে চলে।

২০ জানুয়ারি (১৯৬৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আহূত ছাত্র সমাবেশে বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান থেকে হাজার হাজার ছাত্র যোগদান করে। পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর লাঠিচার্জ ও টিয়ার গ্যাস উপেক্ষা করে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল এগুতে থাকে। বার বার ছত্রভঙ্গ হয়েও আবার মিছিল অব্যাহত রাখতে গিয়ে মেডিক্যাল কলেজের সামনে সশস্ত্র আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ছাত্র-জনতার ইট-পাটকেলের আক্রমণে উত্তেজিত হয়ে গুলী ছোঁড়ে। সেন্ট্রাল ল কলেজের ছাত্র আসাদুজ্জামান নিহত হয়। সারা শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আসাদের মৃতদেহ ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়ে ছাত্র-জনতা শোকসভা করে এবং পরদিন ২১ জানুয়ারি সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ঘোষণা করা হয়। হরতাল চলাকালে কয়েক জায়গায় গুলী চলে। দুপুরে পল্টন ময়দানে বিরাট গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। জানাযা শেষে ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে বিশাল শোক মিছিল করে রাজপথ দখল করে রাখে।

২২ জানুয়ারি পাকিস্তানে সকল বড় বড় শহরে আসাদের গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। DAC নেতৃবৃন্দের বৈঠকে ১২ ফেব্রুয়ারি সারা পাকিস্তানে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। একই দিনে সারা পাকিস্তানে একই ইস্যুতে আর কোন সময় হরতাল করা হয়নি। ডাক গঠন করার পর আন্দোলন দ্রুত নিখিল পাকিস্তান রূপ পরিগ্রহ করে।

গভর্নর মোনায়েম খান মুহাম্মদপুর এলাকার প্রবেশপথে এক বিরাট ফাঁকা গেইট তৈরি করে বড় বড় হরফে আইয়ূব গেট লিখে তার প্রিয় নেতার জনপ্রিয়তা প্রমাণের চেষ্টা করেন। আসাদ হত্যার পর ঐ গেটকেই আসাদ গেট হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যা স্থায়ী হয়ে আছে।

ওদিকে আদালতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার প্রতিক্রিয়ায় আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করায় তাঁর জনপ্রিয়তাও বেড়ে চলে।

সর্বত্র বিক্ষুব্ধ জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করায় বেসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় এবং পশ্চিম-পাকিস্তানে করাচী, হায়দারাবাদ ও লাহোরে সেনাবাহিনী তলব করতে হয়। ঢাকায় ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক প্রহরারত সৈনিকের গুলীতে নিহত হওয়ায় ঢাকা শহরে যেন আগুন লেগে যায়। ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্নাহ হলের নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল রেখে এর প্রতিশোধ নেয়। এবার ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা শহীদ দিবস পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি উদ্দীপনার সাথে পালন করা হয়।

আইয়ূব খানের আত্মসমর্পণ

গোটা পাকিস্তানে আইয়ূবের স্বৈরশাসন-বিরোধী আন্দোলন দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দেখে আইয়ূব খান ৫ ফেব্রুয়ারি DAC-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খানকে এক চিঠিতে প্রস্তাব দেন যে, 'ডাক'-এর প্রতিনিধিদের সাথে ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে আলোচনা করতে চান। 'ডাক'-এর আহ্বায়ক বৈঠকে শরীক হবার সম্মতি জানিয়ে তারিখ পরিবর্তনের প্রস্তাব দেন।

ইতোমধ্যে পরিস্থিতি এতোটা মারাত্মক আকার ধারণ করে যে, ১৪৪ ধারা কোথাও কার্যকর করা সম্ভব ছিলো না। এমনকি সেনাবাহিনী নিয়োগ করেও আইন-শৃঙ্খলার তেমন কোন উন্নতি করা যাচ্ছিলো না। দেশে কোন সরকার আছে বলে মনে হচ্ছিলো না। এদিকে মাওলানা ভাসানী ও ওদিকে মি. ভুট্টো জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন করে উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে বিদ্রোহের দিকে এগিয়ে দিলেন।

আইয়ূব খান উপলব্ধি করলেন যে, তিনি ক্ষমতা ত্যাগ করার ঘোষণা না দিলে বিদ্রোহের এ আগুনের লেলিহান শিখা দেশে চরম অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করবে। তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) জাতিকে জানিয়ে দিলেন যে, আগামী নির্বাচনে তিনি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হবেন না। স্বৈরশাসক এভাবেই আন্দোলনের নিকট আত্মসমর্পণ করে আগুনে পানি ঢেলে দিলেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য এটুকু ঘোষণা যথেষ্ট বিবেচিত হবে না বলেই ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হয়। পরের দিন ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমানকে বিশাল গণসম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেখানেই কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রথম বৈঠক হবার কথা ছিলো। আওয়ামী লীগ দাবি করলো যে, বৈঠকে শেখ মুজিবকে শরীক করতে হবে। আইয়ূব খান পেরোলের (সাময়িক মুক্তি) সুযোগ দিতে রাজি হলেন। কিন্তু ছাত্র-সংগ্রাম পরিষদ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেবার দাবিতে তীব্র আক্রমণাত্মক আন্দোলন চালায়। যে আদালতে মামলা চলে সেখানেও আক্রমণ করা হয়।

এ পরিস্থিতিতেই আইয়ূব খান ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঐ ঘোষণা দেন। শেখ মুজিবের মুক্তির পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। পশ্চিম-পাকিস্তানে আরও কিছু আগেই ভুট্টোকে মুক্তি দেওয়া হয়।

গোলটেবিল বৈঠকের জন্য পরিবেশ অনুকূল হয়। আইয়ূব খান ঐ বৈঠকের মাধ্যমে সম্মানজনকভাবে ক্ষমতা থেকে সরে যাবার ব্যবস্থা করলেন। DAC এবং আইয়ূব খানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ডাকের ৮ দফা তিনি মেনে নিয়ে দেশকে নির্বাচনমুখী করতে চেয়েছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক সফল হলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন '৬৯ সালেই বিজয়ী হয়ে যেতো। কিন্তু তা হয়নি।

১০০.

রাউন্ডটেবল কনফারেন্স

রাউন্ডটেবল কনফারেন্স-এর তারিখ দু'দফা পরিবর্তন হয়ে শেষ পর্যন্ত ২৬ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তারিখ হিসেবে সাব্যস্ত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ূব খানের ক্ষমতা ত্যাগের ঘোষণা, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি গোলটেবিল বৈঠকের জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

DAC-এর অন্তর্ভুক্ত ৮ দলের নেতৃবৃন্দ '৬২ থেকে '৬৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নিশ্চিত সাফল্যের আনন্দে উদ্বেলিত। 'ডাক'-এর ঘোষিত ৮ দফা দাবি গোলটেবিল বৈঠক সরকারিভাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান মেনে নেবার ঘোষণা দেওয়ার ফরমালিটি শুধু বাকি রয়েছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে স্বৈরশাসন থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় উত্তরণের জন্যই এ ব্যবস্থা। 'ফিল্ড মার্শাল' আইয়ূব খান দশ বছর দাপটের সাথে স্বৈরশাসন চালিয়ে গণআন্দোলনের মুখে ক্ষমতা ত্যাগের সময় সর্বনিম্ন সম্মানটুকু নিয়ে বিদায় হবার পদ্ধতি হিসেবেই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। DAC-এর নেতৃবৃন্দ এটুকু সম্মান প্রদর্শন করতে দ্বিধাবোধ করেননি।

গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিতদের তালিকা

DAC-এর অন্তর্ভুক্ত ৮টি দলের সম্মিলিত সংগ্রামের ফলেই স্বৈরশাসক আইয়ূব খানকে বিদায় নিতে হয়। তাই তিনি DAC-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খানকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার জন্য ফরমালি (আনুষ্ঠানিক) চিঠি দেন। সে চিঠিতে তিনি 'ডাক'-এর আহ্বায়ককে বৈঠকে আমন্ত্রিতদের তালিকা পাঠাতে অনুরোধ করলেন এবং ডাক-এর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোন ব্যক্তির নামও তালিকায় দেবার ইখতিয়ার দিলেন। যেহেতু ডাকের সাথেই বৈঠক হবে, সেহেতু ডাকের বাইরের কোন ব্যক্তিকে ডাকের সম্মতি ব্যতীত দাওয়াত দেওয়া সমীচীন নয়।

গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারীদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য ডাকের বৈঠক বসে। ৮ দলের প্রত্যেক দল থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের একজন এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের একজন করে আট দল থেকে মোট ১৬ জনের নিম্নরূপ তালিকা প্রস্তুত করা হলো ঃ

১. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান– মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ও অধ্যাপক গোলাম আযম।
২. পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টি– চৌধুরী মুহাম্মদ আলী ও মৌলভী ফরীদ আহমদ।
৩. পাকিস্তান মুসলিম লীগ– মিয়া মুমতায মুহাম্মদ খান দৌলতানা ও সাইয়েদ খাজা খায়রুদ্দীন।
৪. পাকিস্তান আওয়ামী লীগ– নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান ও আবদুস সালাম খান এডভোকেট।
৫. পাকিস্তান ন্যাশনাল ডেমেক্রেটিক ফ্রন্ট– জনাব নূরুল আমীন ও হামীদুল হক চৌধুরী এডভোকেট।
৬. আওয়ামী লীগ– শেখ মুজিবুর রহমান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
৭. পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম– মাওলানা মুফতী মাহমুদ ও পীর মুহসিনুদ্দীন আহমদ (দুদু মিয়া)।
৮. পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি– খান আবদুল ওয়ালী খান ও অধ্যাপক মুযাফফর আহমদ।

ডাক-এর বৈঠকে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, ডাক-এর বাইরে যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন তাদেরকেও গোলটেবিল বৈঠকে দাওয়াত দেবার জন্য ডাকের পক্ষ থেকে সুপারিশ করা প্রয়োজন। এ পর্যায়ে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

১. মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ)।
২. জুলফিকার আলী ভুট্টো (পিপলস পার্টি)।
৩. এয়ার মার্শাল আসগর খান।
৪. লে. জেনারেল মুহাম্মদ আযম খান।
৫. সৈয়দ মাহবুব মুরশিদ (সাবেক প্রধান বিচারপতি)।

গোলটেবিল বৈঠক শুরু

রাওয়ালপিণ্ডিতে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট গেস্টহাউজে ১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি গোলটেবিল বৈঠক বসে। বৈঠকে ডাক-এর ১৬ জন, আইয়ূব খানের সরকারি মুসলিম লীগের আইয়ূব খান ব্যতীত ১৫ জন, নির্দলীয় এয়ার মার্শাল আসগর খান ও বিচারপতি সাইয়েদ মাহবুব মুরশিদ বৈঠকে যোগদান করেন। মাওলানা ভাসানী, মি. ভুট্টো ও আযম খান আমন্ত্রণ পাওয়া সত্ত্বেও বৈঠকে যোগদান করেননি।

এ বৈঠক সকাল ১০-৩০ মিনিটে শুরু হয়ে মাত্র ৪০ মিনিট পর ঈদুল আযহা উপলক্ষে ১০ মার্চ সকাল ১০টা পর্যন্ত মুলতবি হয়। বৈঠকে DAC-এর পক্ষ থেকে আহ্বায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্টের নিকট ৮ দফা দাবি সংবলিত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য লিখিত আকারে হস্তান্তর করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান দুর্বল কণ্ঠে সবাইকে তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে বৈঠকে হাজির হওয়ার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানান। বৈঠকের এ প্রথম দিনে আনুষ্ঠানিক আর কোন আলোচনা হয়নি। তবে বৈঠক শুরু হবার আগে এবং বৈঠক মুলতবি হবার পর সবাই পরস্পর পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে হাত মিলান ও অনেকে কোলাকুলি করেন।

একসাথে ঢাকা প্রত্যাবর্তন

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত নেতৃবৃন্দকে ঢাকা ফিরে যাবার সুব্যবস্থার উদ্দেশ্যে পিআইএ-এর এক বিশেষ বিমানকে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে সরাসরি ঢাকা পৌছার নির্দেশ দেওয়া হয়। গোলটেবিল বৈঠক উপলক্ষে ৮ দলের অনেক নেতা রাওয়ালপিণ্ডি এসেছিলেন। বৈঠকে আমন্ত্রিতদের কয়েকগুণ বেশি সংখ্যায় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন, যাতে কোন বিষয়ে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে ত্বরিত ব্যবস্থা করা যায়।

বিমানে আরোহণ করে আমার আসন তালাশ করছি। এমন সময় শেখ মুজিব "এই আযম সাহেব এদিকে আসেন" বলে আওয়াজ দিলেন। কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম যে, আশে পাশে কয়েক দলের নেতারা বসে আছেন। শেখ মুজিব হাসি মুখে কথা বলতে অভ্যস্ত এবং হালকা রসিকতা করতে পছন্দ করতেন। শেখ মুজিব হাত বাড়িয়ে আমাকে এক আসনে বসিয়ে দিয়ে রসিকতা করে অন্যদেরকে শুনিয়ে বললেন, "আযম সাহেবের মতো ভাল মানুষ জামায়াতে ইসলামীতে গেলেন।" আমি জওয়াবে হেসে বললাম, "শেখ সাহেব ঠিকই বলেছেন। সব ভালো লোকগুলো জামায়াতে ইসলামীর মতো একটা খারাপ দলে যোগদান করেছে এবং মন্দ লোকগুলো আওয়ামী লীগের মতো একটি ভালো দলে শামিল হয়েছে।" আশে পাশে সবাই হাসলেন। শেখ সাহেব বললেন, "দেখুন দেখি আমাকে কেমন মারটা দিলো।" আমি পরিবেশ হালকা করার জন্য বললাম, "আমরা এখানে সবাই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযোদ্ধা, আর আপনি সেনাপতি।" শুনে আমার সাথে মযবুত আলিঙ্গন করলেন। আমার আসন একটু দূরে ছিলো। নিকটবর্তী সবার সাথে হাত মিলিয়ে আমার আসনে গিয়ে বসলাম।

৮ মার্চ লাহোরে ডাকের বৈঠক

১৯৬৯ সালের ১০ মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে মুলতবি গোলটেবিল বৈঠক শুরু হবার কথা। ৮ মার্চ সকাল ১০টায় পূর্ব-সিদ্ধান্ত অনুযায়ী লাহোরে চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর বাড়িতে DAC-এর নেতৃবৃন্দের বৈঠক বসে। সবাই নিশ্চিত যে, গোলটেবিল বৈঠকে আইয়ূব খান ডাক-এর ৮ দফা দাবি মেনে নেবেন।

এর পরের করণীয় সম্পর্কে গোলটেবিল বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হতে হবে। ৮ দফার ভিত্তিতে যথাসম্ভব শিগগীর নির্বাচন হতে হবে। নির্বাচন পরিচালনার সময় কেন্দ্রে

ও প্রদেশে সরকারি ক্ষমতা যাদের হাতে থাকবে, কখন নির্বাচন হবে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন কমিশন গঠনের নীতি কি হবে ইত্যাদি বিষয়ে প্রেসিডেন্ট সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই প্রস্তাব পেশ করবেন। তাই এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গোল টেবিল বৈঠকে বসার পূর্বেই DAC-কে ঐকমত্যে পৌঁছা প্রয়োজন। সেখানে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে ভিন্ন ভিন্ন মত পেশ করার সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। বৈঠকের একপক্ষ আইয়ূব সরকার আর অপরপক্ষ DAC. তাই DAC-এর অন্তর্ভুক্ত ৮ দলকে উপরিউক্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হওয়া অত্যাবশ্যক।

DAC-এর কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান সভাপতি হিসেবে বৈঠকের শুরুতে কিছু বলবার আগেই শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম দাঁড়িয়ে বললেন, "ডাক-এর নেতৃবৃন্দের নিকট আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো যাচ্ছে যে, গোলটেবিল বৈঠকে DAC-এর পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবি পেশ করা হোক। এ কথা বলার সাথে সাথে উপস্থিত সবাই হতভম্ভ হয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছেন। সেখানে চরম নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সবাই সভাপতির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সভাপতি হাতে মাথা ঠেকিয়ে নিচের দিকে চেয়ে রইলেন। বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতারা একত্র বসা আছেন। কেউ কিছু বলছেন না। যেন বৈঠকখানায় বজ্রপাত হয়েছে। DAC-এর ৮টি দলের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ দফা রচিত হয়েছে। এ ৮ দফা দাবির ভিত্তিতেই আন্দোলন হয়েছে। এ দাবি মেনে নিতে রাজি হয়েই প্রেসিডেন্ট আইয়ূব গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করেছেন। এ ৮ দফা প্রণয়নে শেখ মুজিবের দলও শরীক ছিলো। একদিন পরই গোলটেবিল বৈঠকে বসার কথা। ৮ দফা দাবি মেনে নেবার পর যেসব ইস্যু আলোচনা হতে পারে সে সম্পর্কে DAC-এর মতামত চূড়ান্ত করার জন্য ৮ দলের নেতৃবৃন্দ এখানে সমবেত হয়েছেন।

এ পরিস্থিতিতে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পশ্চিম পাকিস্তানে যার কোন প্রতিনিধি নেই)-এর দলীয় ৬ দফা দাবি গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করার দাবি জানানো বজ্রপাতের চেয়েও বেশি মারাত্মক। যৌথ আন্দোলনে শরীক কোন দল এমন অদ্ভুত আচরণ কেমন করে করতে পারলো এটাই সবাইকে হতবাক করেছে। গোলটেবিল বৈঠককে ব্যর্থ করার ষড়যন্ত্র ছাড়া এর মধ্যে আর কোন সৎ উদ্দেশ্য তালাশ করে পাওয়া সম্ভব নয়। ৮ বছরব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে এসে ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কায় DAC-এর ৭টি দলের নেতৃবৃন্দ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিস্তব্ধ অবস্থায় পড়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর সভাপতি গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত বৈঠক মুলতবি করা হলো। চরম হতাশা নিয়ে সবাই ধীরে ধীরে উঠে বের হয়ে গেলেন।

মাওলানা মওদূদীর সাথে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎ

চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সাহেবের ড্রইংরুম থেকে বের হয়ে গাড়ি কাছে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম, শেখ মুজিব ও জনাব তাজুদ্দীন একসাথে

আসছেন। হঠাৎ আমি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত মিলিয়ে বললাম, "আপনি কি করতে চাচ্ছেন বুঝতে পারছি না। চলুন না মাওলানা মওদূদীর সাথে বসে আলাপ করি।" তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। ইস্ট-পাকিস্তান হাউজ থেকে যে সরকারি গাড়িতে এসেছিলেন সে গাড়িকে চলে যেতে বললেন। তিনি ও তাজুদ্দীন আমার সাথে জামায়াতের গাড়িতে উঠলেন।

একটু আগেই মাওলানা বৈঠক থেকে বাড়িতে ফিরে গেলেন। আমাদের গাড়ি মাওলানার চেম্বারের সামনে থামলে আমি শেখ মুজিবকে পাশের বৈঠকখানায় বসিয়ে মাওলানাকে ভেতরে খবর দিলাম। মাওলানা সাথে সাথেই চেম্বারের দরজা খুলে শেখ সাহেবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলেন। খবর পেয়ে মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদও হাজির হলেন। তাজুদ্দীন শেখ সাহেবের পাশেই বসলেন। আমি ও মিয়া সাহেব পাশাপাশি বসলাম। আলোচনার সূচনার উদ্দেশ্যে আমি বললাম, "মাওলানা, আপনার সাথে যোগাযোগ না করেই আমি শেখ সাহেবকে নিয়ে এলাম। তিনি কি চান তা তাঁর কাছ থেকে শুনবার উদ্দেশ্যেই আমি নিয়ে এসেছি। এখন শেখ সাহেব বলুন।"

শেখ মুজিব উর্দু ও ইংরেজি উভয় ভাষা মিলিয়ে প্রায় ১০/১২ মিনিট তার বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, "মাওলানা সাহেব, আমি ৬ দফার আন্দোলন শুরু করার পরই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমি জেলে থাকা অবস্থায়ই আমার ৬ দফার সাথে আরও ৫ দফা যোগ করে ছাত্ররা ১১ দফার আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়। আযম সাহেব ৬ দফা সম্পর্কে শুরু থেকে এ পর্যন্ত একই ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু মাওলানা ভাসানী আজব চিজ। তিনি প্রথমে ৬ দফা ডিস্‌মিস বলে ঘোষণা করলেন। অথচ আমার অনুপস্থিতিতে ১১ দফা নিয়ে মাতামাতি করছেন। ছাত্র ও শ্রমিক মহলে ১১ দফার ব্যাপক সমর্থন রয়েছে। মাওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকেও যোগদান করলেন না। তাঁর উদ্দেশ্য মোটেই ভালো নয়। তিনি জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন চালাচ্ছেন। আমি যদি ৬ দফার বদলে DAC-এর ৮ দফা মেনে নেই, তাহলে আমার বিরুদ্ধে মাওলানা ছাত্র ও শ্রমিকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন। জনগণের মধ্যে ৬ দফাসহ ১১ দফা যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এর ফলে আমি বিরাট সমস্যায় পড়েছি। মাওলানা ভাসানী বিরাট এক ফেতনা। তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন।"

একটানা এ কথাগুলো বলার পর একটু থেমে আবেগময় কণ্ঠে বললেন, "মাওলানা সাহেব, মেহেরবানি করে ৬ দফাকে সমর্থন করে আমাকে সাহায্য করুন। দেখবেন, আমি মাওলানা ভাসানীকে দেশ থেকে তাড়াবো।"

মাওলানা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন, "আপনি যদি আপনার দলীয় দাবিতে অনড় থাকেন তাহলে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবে এবং মাওলানা ভাসানী আরও মযবুতভাবে কায়েম হবে। মাওলানা চান যে, গোলটেবিল বৈঠক বানচাল হয়ে যাক। আপনার এ পদক্ষেপ মাওলানার উদ্দেশ্যই পূরণ করবে। মনে রাখবেন, ৭/৮ বছরের

আন্দোলনের ফলে গণতন্ত্র এখন আমাদের দুয়ারে হাজির। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে আবার সামরিক শাসন অনিবার্য হয়ে পড়বে। গোলটেবিল বৈঠককে সফল করুন এবং গণতন্ত্র বহাল হতে দিন। আগামী নির্বাচনে আশা করি আপনি ভালো করবেন।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে তাসখন্দ ইস্যুকে ভিত্তি করে সম্মিলিতভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ৬ দফার কারণেই আপনার দল শরীক হতে পারেনি। এবার তো আপনার দল DAC-এ শরীক হয়ে ৮ দফা প্রণয়নে একমত হয়েছে। আপনার দলীয় দাবি অপর ৭ দলকে মেনে নিতে বাধ্য করতে পারেন না।

প্রেসিডেন্ট আইয়ূব ৮ দফা মেনে নিতে সম্মত হয়েই গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছেন। আপনি কেমন করে আশা করতে পারেন যে, DAC-এর অন্যান্য দল আপনার দাবি মেনে নেবে? গোলটেবিল বৈঠককে সফল করে গণতন্ত্রকে এক্ষুণি বহাল করার মহাসুযোগ নষ্ট করবেন না। দেশে অবিলম্বে নির্বাচন হতে দিন। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দলীয় মেনিফেস্টো অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবেন। আমি বিষয়টা বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।"

ইতোমধ্যে চা-নাস্তা এলো। শেখ সাহেব আর কিছুই বললেন না। একটু চা খেয়ে বিদায় নিলেন। যে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিলাম, সে গাড়িতেই ইস্ট-পাকিস্তান হাউজে পৌঁছাবার জন্য সাথে গেলাম। গাড়িতে আমি মাওলানার কথাগুলোকে সিরিয়াসলি বিবেচনা করার জন্য কয়েকবার তাগিদ দিলাম। সারা পথে মাঝে মাঝে দু'এক কথা আমিই বললাম। তারা দু'জনই গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। কোন কথাই আর বললেন না। আমাকে তার পক্ষে কনভিন্স করার চেষ্টা করলেন না, মাওলানার যুক্তি সম্পর্কেও কোন মন্তব্য করলেন না।

ইস্ট-পাকিস্তান হাউজে পৌঁছলে গাড়ি থেকে নেমে আমার সাথে হাত মিলিয়ে নীরবে চলে গেলেন। মুখে অত্যন্ত বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করলাম। তার স্বভাবসুলভ সৌজন্য হাসিটুকুও দেখা গেলো না।

অনিশ্চিত অবস্থায়ই রাওয়ালপিণ্ডি গমন

DAC-এর যে বৈঠক ৮ মার্চ সন্ধ্যা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়, সে বৈঠক আর হতে পারেনি। নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান এবং আরও কয়েকজন মিলে শেখ মুজিবকে বুঝাতে সক্ষম না হওয়ায় DAC-এর বৈঠক করে কোন লাভ নেই বলে আমাদেরকে জানানো হলো।

এখন প্রশ্ন দেখা দিলো যে, এ অবস্থায় গোলটেবিল বৈঠকে গিয়ে আর কি লাভ হবে? তবু এ অনিশ্চিত অবস্থায়ই পরদিন ৯ মার্চ সবাই রাওয়ালপিণ্ডি গেলেন। সেখানে বিকেলে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের বৈঠকে মাওলানা মওদূদী পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। গোলটেবিল বৈঠককে সফল করার জন্য নওয়াবযাদার সর্বাত্মক চেষ্টার কথা জানালেন। শেখ মুজিবের একগুঁয়েমির কারণে দেশে আবার এক সামরিক শাসনের আশঙ্কাও প্রকাশ করলেন।

আমি বললাম, মাওলানা আপনি আরও একবার শেখ মুজিবকে বুঝাবার চেষ্টা করবেন? তাকে আবার আপনার কাছে নিয়ে আসবো? মাওলানা বললেন, "যে ব্যক্তি পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানীর হুমকির ভয়ে জাতির ভাগ্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়, এমন অদূরদর্শীর সাথে আলোচনা অর্থহীন।"

এ অবস্থায়ও পরদিন ১০ মার্চ সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্টের গেস্ট হাউজে অনুষ্ঠিতব্য গোলটেবিল বৈঠকে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত বহাল রইলো। শেষ পর্যন্ত কি হতে যাচ্ছে কেউ বলতে পারছে না। শেখ মুজিবের হঠকারিতার কারণে গণতন্ত্র ঘরের দুয়ার থেকে ফিরে যাবার আশঙ্কায় সবাই পেরেশানি বোধ করলেন। ১৯৬২ সাল থেকে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সফল হওয়ার শেষ পর্যায়ে ব্যর্থ হবার উপক্রম হলো বলে সবাই শঙ্কিত।

১০১.

রাউন্ডটেবিল কনফারেন্সের বিবরণ

১৯৬৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডির প্রেসিডেন্টস্ গেস্ট হাউসে কনফারেন্সের প্রথম বৈঠক বসে। ঈদুল আযহার কারণে ১০ মার্চ পর্যন্ত বৈঠক মুলতবি হয়। ঐ বৈঠকে DAC-এর আহ্বায়ক নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান ফরমালি ৮ দলীয় জোট—ডাক-এর পক্ষ থেকে ৮ দফা দাবি পেশ করেন। এ বিষয়ে পরবর্তী বৈঠকে আলোচনা হবার কথা। এটা সবার কাছেই স্পষ্ট ছিলো যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান DAC-এর ৮ দফা মেনে নেবেন এবং এর ভিত্তিতে পরবর্তী কর্মপন্থা সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

কিন্তু ১০ মার্চ মুলতবি বৈঠক শুরু হবার পূর্বে ৮ মার্চ লাহোরে DAC-এর বৈঠকে শেখ মুজিব তাঁর দলীয় ৬ দফা দাবি গোলটেবিল বৈঠকে পেশ করার প্রস্তাব দিয়ে চরম জটিলতা সৃষ্টি করে দিলেন। গোলটেবিল বৈঠকে DAC-এর ৮ দফা মেনে নেবার পর তা বাস্তবায়িত করার কর্মপন্থা সম্পর্কে DAC-এর লাহোর বৈঠকে কোন আলোচনা করার পরিবেশই অবশিষ্ট রইলো না। এ সত্ত্বেও চরম অনিশ্চয়তার মধ্যেই ১০ মার্চ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৈঠক বসলো। যার যার নির্দিষ্ট আসনে সবাই বসলেন। কিন্তু যথারীতি বৈঠকের কর্মসূচি শুরু হলো না।

আইয়ূব খান জানতে পারলেন যে, শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবির কারণে ডাকের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। নওয়াবযাদার সাথে আইয়ূব খানের টেলিফোনে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আলোচনা হয়। কিন্তু কোন পথই বের করা গেলো না। এ সত্ত্বেও বৈঠক বসার সিদ্ধান্ত বহাল রইলো। নওয়াবযাদা শেখ মুজিবকে সম্মত করাতে সক্ষম হবেন বলে সামান্য ইঙ্গিত ছিলো বলেই বৈঠক বসলো।

দেখা গেলো যে, ডাক-এর ৮ দলের প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ আসন থেকে উঠে টেবিলের আশপাশেই পরস্পর কথাবার্তা বলছেন। আইয়ূব খান তাঁর দলের

প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে নিজেদের আসনে বসে আছেন। নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান মাওলানা মওদূদী ও চৌধুরী মুহাম্মদ আলীর মাঝের আসনে বসে একবার মাওলানার সাথে, আর একবার চৌধুরী সাহেবের সাথে মাঝে মাঝে কথা বলছেন। সবাই চরম বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেছেন বলে বুঝা গেলো।

সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়লাম

আমার হাতে একজন এক টুকরা কাগজ দিলেন। গেটে জামায়াতের স্থানীয় দায়িত্বশীল আমার অপেক্ষা করছেন বলে জানলাম। আমি বের হতেই সাংবাদিক বাহিনী আমাকে ঘিরে ফেললেন। আমি গেটে অপেক্ষারত ব্যক্তির দোহাই দিয়ে ছাড়া পেলাম বটে, কিন্তু গেট থেকে হলে ফিরে আসার আগেই আবার সাংবাদিকদের পাল্লায় পড়লাম। বৈঠকে কি হচ্ছে জানার জন্য কতভাবে যে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা হলো, যার কোন জওয়াব দেওয়া কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। আমি নানা কথা বলে তাদের খপ্পর থেকে বেঁচে আসতে চাইলাম। একজন জিজ্ঞেস করলেন, “গত রাতে সেনাপ্রধান ইয়াহইয়া খানের সাথে শেখ মুজিবের যে গোপন সাক্ষাৎ হয়েছে, সে কথা কি আপনি জানেন? আমি অজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

হলে ফিরে আসতে আসতে ভাবলাম, এ জাতীয় গোপন বৈঠক কখনো গোপন থাকে না। এ বৈঠক যদি সত্যিই হয়ে থাকে তাহলে এর উদ্দেশ্য কি? পূর্ব-পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত পলিসির ফলে নির্মিত হিরো হিসেবে শেখ মুজিবের সাথে সেনাপ্রধানের কি ধরনের সমঝোতা হতে পারে তা ভেবে পেলাম না। আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত হলাম যে, এ গোপন বৈঠকের খবর মিথ্যা হওয়ার কথা নয়। সাংবাদিকরা খবর জেনে যায় এবং কোন কোন সময় তাদের কাউকে জানিয়েও দেওয়া হয়। শেখ মুজিবের মতো বড় নেতা সেনাপ্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করে থাকলে উভয় পক্ষেই বেশ কয়জনের জানা স্বাভাবিক। তাই যত গোপন বৈঠকই হোক তা মুখে মুখে ও কানে কানে সহজেই ছড়িয়ে যায়।

হলে ফিরে এলাম

গোলটেবিল বৈঠকের পর হলে ফিরে এসে পূর্বের স্থবির অবস্থাই দেখলাম। সরকারি দায়িত্বশীল ও প্রায় সব বিরোধী দলীয় জাঁদরেল নেতারা এমন অচল অবস্থায় পড়ে রইলেন দেখে হতাশ হলাম। দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে ভাবতে পারছিলাম না। গোলটেবিল বৈঠক যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে বাকি রইলো না। এক সময়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদের লিডার সবুর খান ঘোষণা করলেন যে, আজ বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করা হলো। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে তাদের দাবি সম্পর্কে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত জানালে আবার বৈঠক বসতে পারে। কোন সময় নির্দিষ্ট না করেই বৈঠক মুলতবি হয়ে গেলো। বিমর্ষ বদনে সবাই বিদায় হয়ে গেলেন।

হল থেকে বের হতেই সাংবাদিকগণ বিভিন্ন নেতা থেকে বৈঠকের ফলাফল জানতে

চাইলেন। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য বৈঠক মুলতবি হয়ে গেলো বলা ছাড়া কারো পক্ষেই আর কিছু বলার ছিলো না। নওয়াবযাদা সাংবাদিকদের থেকে কোন রকমে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন।

১১ ও ১২ মার্চ রাওয়ালপিণ্ডিতে DAC-এর নেতৃবৃন্দ গোলটেবিল বৈঠক সফল করার জন্য শেখ মুজিবকে বুঝাবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান। শেখ মুজিবের এক কথা, "৬ দফা মুলতবি করার সাধ্যও আমার নেই। ৬ দফা জনগণ গ্রহণ করে ফেলেছে। আমি জনগণের সামনে কৈফিয়ত দিয়ে কুলাতে পারবো না। মাওলানা ভাসানী ময়দান দখল করে ফেলবে। আন্দোলনরত ছাত্র-শ্রমিক জনতা একমুখী হয়ে গেছে।"

গোলটেবিলের শেষ বৈঠক

১৩ মার্চ শেষ বৈঠক যথাস্থানেই শুরু হলো। সবাই বুঝতে পারলেন যে, এ বৈঠকের ফলাফল শূন্যই হবে। শুধু সমাপ্তি ঘোষণার উদ্দেশ্যেই বৈঠক বসেছে। আইয়ূব খান ঘোষণা করলেন, "সকল রাজনৈতিক দল দু'টো বিষয়ে একমত বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১. প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে জনগণের সকল প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে হবে।

২. ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

তাই সরকারের পক্ষ থেকে এ দু'টো দাবি মেনে নিলাম। আর কোন বিষয়ে ঐকমত্যে না পৌঁছার কারণে তা বিবেচনা করা সম্ভব হলো না।

আমি গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করছি।"

এরপর ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (DAC)-র এক দায়সারা বৈঠকে আহ্বায়ক ঘোষণা করলেন যে, DAC-এর প্রধান দু'টো দাবি সরকার মেনে নেওয়ায় ৮ দলীয় জোটের আর প্রয়োজন রইলো না। তাই DAC বিলুপ্ত ঘোষণা করা হলো।

গোলটেবিল বৈঠকের চরম ব্যর্থতা

বহু কাঙ্ক্ষিত গোলটেবিল বৈঠকের চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আমরা মনমরা হয়ে রইলাম। গণতন্ত্র ঘরের দুয়ার থেকে ফিরে যাওয়ার দুঃখে গভীর বেদনায় অস্থিরতা বোধ করলাম। আইয়ূব-বিরোধী আন্দোলনে নয় বছরের সংগ্রামের সুফল হাতের মুঠোয় এসেও হারিয়ে গেলো। এসব অনুভূতি ডাক-এর সবাইকে মর্মাহত করলো।

অপরদিকে ১৪ মার্চ শেখ মুজিব গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ করার মহাগৌরব নিয়ে ঢাকা বিমানবন্দরে বীরোচিত সম্বর্ধনা পেলেন। গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতাকে তিনি ৬ দফার বিজয় হিসেবে ধারণা করলেন। বিমানবন্দরে তিনি ঘোষণা করলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানি নেতারা ৬ দফা সমর্থন করলে আইয়ূব খান মেনে নিতে বাধ্য হতেন। এভাবে তিনি পূর্ব-পাকিস্তানি সকল দলের নেতাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। মাওলানা ভাসানী সম্পর্কেও তিনি মন্তব্য করেন যে, রাজনীতি থেকে তার অবসর গ্রহণ করা উচিত।

মাওলানা মওদূদীর সাথে বৈঠক

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যাবার পর রাওয়ালপিণ্ডিতেই জামায়াত নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক হয়। মাওলানা মওদূদী তাতে সভাপতিত্ব করেন।

আমি হতাশা প্রকাশ করে বললাম, "এরপর দেশে কী হতে যাচ্ছে? আইয়ুব খান তো আর শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।" মাওলানা বললেন, "আইয়ুব খানকে এখন সেনাপ্রধানের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। আবার আমরা সামরিক শাসনের অধীন হলাম।"

ইতোমধ্যে ইয়াহইয়া-মুজিব গোপন বৈঠকের কথা গুজবের পর্যায় পার হয়ে সত্যি ঘটনা হিসেবে ব্যাপক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমি মাওলানাকে জিজ্ঞেস করলাম, "এ বৈঠকের উদ্দেশ্য কী হতে পারে?" মাওলানা বললেন, "গোলটেবিল বৈঠককে ব্যর্থ করার মহান উদ্দেশ্য ছাড়া আর কী হতে পারে?" আবার প্রশ্ন করলাম, "এতে ইয়াহইয়ার স্বার্থ কী?"

মাওলানা বললেন, "ক্ষমতা দখল করার এমন মহাসুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়? দশ বছর আগে যখন সেনাপ্রধান আইয়ূব খান সামরিক শাসন জারি করেন তখন এর পরিবেশ এতোটা অনুকূল ছিলো না। এখন সারাদেশে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে তাতে সামরিক শাসনের পথ খোলাসা হয়েছে। গোলটেবিল বৈঠক সফল হলে সারাদেশ নির্বাচনমুখী হয়ে যেতো। রাজনৈতিক দলগুলোই বিশৃঙ্খলা ঘটায়। তারা নির্বাচনমুখী হলে সহজেই আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসতো। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে সামরিক শাসন অনিবার্য হয়ে পড়বে বলেই ইয়াহইয়া এ ব্যবস্থা করেছেন।"

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, "শেখ মুজিব কি সামরিক শাসন চাইতে পারেন? তিনি কেন এ বিষয়ে ইয়াহইয়া খানকে সমর্থন করবেন?"

মাওলানা একটু ক্ষোভের সাথে বললেন, "তাঁর হিসাবই আলাদা। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এতো বড় নেতা বানিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু নেতাসুলভ দূরদৃষ্টি দান করেননি। তাঁর দৃষ্টি কেবল পল্টন ময়দান ও রাজপথে। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে সামরিক শাসন আসবে না এমন নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্যই হয়তো তিনি ইয়াহইয়ার সাথে দেখা করে থাকবেন। ইয়াহইয়া খান হয়তো তাঁকে সে নিশ্চয়তাই দিয়ে থাকবেন।" আমি আবার বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, "আপনি বলছেন যে, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে সামরিক শাসন অনিবার্য হয়ে পড়বে। ইয়াহইয়া খান তখন শেখ মুজিবকে কী কৈফিয়ত দেবেন?"

মাওলানা মুচকি হেসে বললেন, "কৈফিয়ত দিতে হবে কেন? তিনি সরলভাবে অত্যন্ত নেক মানুষ হিসেবে নিজে উদ্যোগ নিয়েই হয়তো বলবেন, 'মার্শাল ল' জারি করার সামান্য আগ্রহও আমার ছিলো না। প্রেসিডেন্ট আমার হাতে ক্ষমতা তুলে দিলেন। আমি তো নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নই। সেনাপ্রধান হিসেবে সামরিক আইন জারি করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিলো না।"

আমি রীতিমতো অস্থিরতা প্রকাশ করে বললাম, "সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক শেখ মুজিব এভাবে গোলটেবিল বৈঠকটি ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হলেন। এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার।"

মাওলানা জওয়াব দিলেন, "গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পেছনে আপনি শুধু শেখ মুজিবকে একা দেখছেন কেন? ভুট্টো ও মাওলানা ভাসানী তো সর্বশক্তি দিয়ে এটাই চেয়েছেন। ইয়াহইয়া খানের ষড়যন্ত্র তো স্পষ্ট। ভুট্টোর সাথে ইয়াহইয়া খানের কোন যোগসাজশও থাকতে পারে। স্বয়ং আইয়ুব খান নাকে খত দিয়ে DAC-এর ৮ দফা মেনে নেওয়া থেকে বেঁচে গেলেন এবং বিনা ঝামেলায় নিরাপদে ক্ষমতারূপ বাঘের পিঠ থেকে নেমে যেতে পারলেন। গোলটেবিল বৈঠক সফল হলে আইয়ুব খানকে বিরোধী দলের আরও অনেক পরিপূরক দাবি মেনে নিতে বাধ্য হতে হতো এবং তাতে আইয়ুব খানের চরম পরাজয় বরণ করতে হতো। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ায় DAC-এর ৮ দলের মধ্যে শেখ মুজিবের দল ছাড়া আর সকল দলের অত্যন্ত অপমানজনক পরাজয় ঘটলো এবং আইয়ুব খানের পরোক্ষ বিজয় হলো।

তাছাড়া কোন কিছু গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন। ভেঙে দেওয়া বা নষ্ট করা সবচেয়ে সহজ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পরিণামে শেখ মুজিব শুধু একটি দলের নয়, একটি আন্দোলনের মহানেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় এ জাতীয় ভূমিকা পালন করতে পারলেন। ইয়াহইয়া খানও এ সুযোগ নিতে সক্ষম হলেন এবং আইয়ুব খানও সুবিধা পেয়ে গেলেন।"

উক্ত বৈঠকে মাওলানাকে অনেকেই নানা প্রশ্ন করলেন। মাওলানা ঐ সব প্রশ্নের জওয়াব দেবার পর বর্তমান পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে কতক পরামর্শ দিলেন। আরও একবার সামরিক শাসনের শিকার হতে হচ্ছে, এ নিশ্চয়তা নিয়েই বৈঠক শেষ হলো।

ঢাকায় ফিরে এলাম

কয়েকদিন পর ভাঙা মন ও চরম হতাশা নিয়ে ঢাকায় ফিরে এলাম। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এমন মারাত্মক পরিণতির জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। ফিরে এসেই জামায়াতের প্রাদেশিক মজলিসে শূরার বৈঠক ডাকলাম। সামরিক আইন জারি হলে সাংগঠনিক কাঠামোকে বহাল রাখা ও দাওয়াত সম্প্রসারণ করা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যেই বৈঠক ডাকা হলো। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সামরিক শাসন শুরু হবার আগেই মজলিসে শূরার বৈঠক হয়ে গেলো। তাই জামায়াতকে কোন অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হলো না। মাওলানা মওদূদীর দূরদৃষ্টির ফলে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের মতো পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হলো না।

আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তর

১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সেনাপ্রধান ইয়াহইয়া খানকে এক দীর্ঘ চিঠি দেন। তাতে তিনি দেশের সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেশের

বিপর্যস্ত আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা, দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করা ও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ঘোষণা দেন। উক্ত দীর্ঘ চিঠির প্রথম দুটো প্যারা নিম্নরূপ ঃ

"গভীর বেদনার সাথে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, দেশের গোটা বেসামরিক প্রশাসন ও শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। যদি বর্তমানের আশঙ্কাজনক গতিতে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে তাহলে সভ্যভাবে জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়বে।"

"ক্ষমতা ত্যাগ করে দেশরক্ষাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য দেশরক্ষা বাহিনীই একমাত্র কার্যকর ও আইনানুগ প্রতিষ্ঠান। আল্লাহ চাহেতো অবস্থার পরিবর্তন সাধনপূর্বক পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার ক্ষমতা তাদের রয়েছে। একমাত্র তারাই দেশে সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে পারে এবং বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে এগিয়ে দিতে পারে।"

উক্ত চিঠিতে আইয়ূব খান সশস্ত্র বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিগত দশ বছর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দেশ ও জনগণের কল্যাণে যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন, সে কথা উল্লেখ করতে তিনি ভুলেননি। তাঁর ঐ প্রচেষ্টার পরিণামেই দেশ যে ধ্বংসের কিনারায় পৌঁছে গেলো সে কথা বুঝবার যোগ্যতা থাকলে তিনি এভাবে তাঁর খিদমতের উল্লেখ করতেন না।

ইয়াহইয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ

২৪ মার্চে লেখা আইয়ূব খানের চিঠি পেয়ে পরদিন ২৫ মার্চ ইয়াহইয়া খান সামরিক আইন জারি করেন, সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ বিলুপ্ত করেন, গভর্নর ও মন্ত্রীদেরকে বরখাস্ত করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানকে দুটো সামরিক আইন অঞ্চলে বিভক্ত করে দু'জন সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগ করেন।

ইয়াহইয়া খান ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে দেশবাসীর নিকট স্পষ্ট ওয়াদা করেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা করা হবে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য

গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলেও স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কমপক্ষে এতটুকু সাফল্য অর্জিত হলো যে, আইয়ূব খানের চাপিয়ে দেওয়া তথাকথিত 'বুনিয়াদি গণতন্ত্র' উৎখাত হয়ে গেলো এবং জনগণ তাদের পূর্বের ভোটাধিকার ফিরে পেলো। জনগণ ব্যাপক আন্দোলন করে এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম হলো যে, তারা নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যোগ্য।

২৬ মার্চ প্রদত্ত ইয়াহইয়া খানের ভাষণের পর রাজনৈতিক মহলে এতটুকু স্বস্তি ফিরে

এলো যে, দেশে নির্বাচন হবে এবং জনগণ সরাসরি ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবে।

ইয়াহইয়া খানের সামরিক শাসন ১৯৫৮ সালের আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের মতো কঠোর ছিলো না। ইয়াহইয়া খান রাজনৈতিক দলসমূহকে বেআইনী ঘোষণা করেননি, দলের অফিসে সীল মেরে দেননি এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করেননি। রাজনৈতিক দলসমূহের ওয়ার্কিং কমিটিকে বৈঠক করতে বাধা দেওয়া হয়নি। শুধু রাজনৈতিক মিটিং-মিছিল করা নিষিদ্ধ করা হলো। তখন এ সবের কোন প্রয়োজনও ছিলো না। সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে ভাল করার জন্য কী কী করণীয় তা নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সামরিক শাসন দেশে আইন-শৃঙ্খলা বহালে আত্মনিয়োগ করে। রাজনৈতিক মহল পরোক্ষভাবে এতে সহায়তা করে। প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ থাকায় আইন-শৃঙ্খলা কায়েমে তা সহায়ক হয়।

১০২.

একজন ৬ দফা প্রণেতার দাবি

গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থ পরিণতির পর করাচী থেকে ঢাকা ফিরে আসার পথে বিমানে এক ভদ্রলোক অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে আমার সাথে হাত মিলালেন। তাকে আমি চিনলাম না। আমার পাশের আসনে বসা ভদ্রলোককে অনুরোধ করে তার আসনে নিয়ে বসালেন এবং তিনি এসে আমার পাশে বসলেন। আমি বিস্মিত হয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলাম। ধারণা করেছিলাম যে, তিনি আদর্শিক দিক দিয়ে নিকটবর্তী হবেন। তাই আমার সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপ করতে চান।

অচিরেই টের পেলাম যে, তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ক্যাম্পের লোক। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হবার পর যারা বিজয়ীর গৌরব বোধ করেছেন, তিনি তাদেরই একজন। পরাজিত প্রতিপক্ষের একজন প্রতিনিধিকে পেয়ে তিনি বিজয়োৎসবের অংশ হিসেবে আমাকে 'ভ্রান্ত পথ' ত্যাগ করার উপদেশ দিতে চেয়েছেন।

পরিচয় নিয়ে জানলাম, তিনি একজন সিএসপি উচ্চ কর্মকর্তা। ইসলামাবাদে কর্মরত আছেন। ছুটিতে দেশের বাড়িতে যাচ্ছেন। বাড়ি তাঁর চাঁদপুরে। নাম ডক্টর আব্দুস সাত্তার। আমাকে তিনি খুব ভালো করেই চেনেন বলে বললেন। যারা রাজনীতি করেন তারা লেখাপড়ার চর্চা কমই করেন। আমি এর ব্যতিক্রম বলে আমাকে শ্রদ্ধা করেন বলেও উল্লেখ করেছেন। আমার সাথে আলোচনার সুযোগ পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছেন বলে জানালেন। এভাবে কতক সৌজন্যমূলক কথা বলে তিনি বক্তব্য শুরু করলেন ঃ

"আপনারা ৬ দফাকে সঠিকভাবে বিবেচনা করলেন না। এটাকে শেখ মুজিবের একটি হঠকারী রাজনৈতিক প্রস্তাব মনে করে হয়তো এর যথার্থ মূল্যায়ন করতে

পারেননি। এটা শেখ মুজিবের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছে বটে, কিন্তু এর প্রণেতা হলেন ১৮ জন পিএইচডি। এর মধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং সরকারি ও বেসরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিত্ব রয়েছেন। এটা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত ফর্মুলা, যা ৮ কোটি বাঙালির ভাগ্যের দ্রুত পরিবর্তন করবে।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ আঠারো জন পিএইচডি-এর মধ্যে আপনি নিশ্চয়ই অন্যতম? তিনি জোশের সাথে দাবি করলেন যে, তিনি এ সংগঠকদেরও একজন। আমি জানতে চাইলাম, "এ আঠার জনের সবাই কি বাঙালি?" তিনি আরও উৎসাহের সাথে জানালেন যে, তারা সবাই বাঙালি জাতীয়তায় বিশ্বাসী।

আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনারা নিশ্চয়ই সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ভিত্তিতেই এ ৬ দফা প্রণয়ন করেছেন। উক্ত পরিকল্পনায় কি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলবার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে? তিনি খুবই খোলা মনে জওয়াব দিলেন, "আপনারা জনগণের ময়দানে কাজ করেন। আমরা তাদের সাথে কাজ করছি, যারা দেশ চালাচ্ছেন। পাঞ্জাবীরা আমাদেরকে দাবিয়ে রাখতে চায়। তাদের থেকে আলাদা না হয়ে আমরা উন্নতি করতে পারবো না। আমাদের দু'অঞ্চলের মাঝখানে ভারত। এ অবস্থায় এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত থাকা অস্বাভাবিক।"

আমি বললাম, "আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। দেশ গণতন্ত্রের পথে এগুচ্ছে। আমরা কেন্দ্রেও প্রাধান্য বিস্তার করবো। আমরা কেন আলাদা হওয়ার চিন্তা করবো? তারা আলাদা হতে চাইলে দেখা যাবে।"

এর জওয়াবে তিনি এমন কথা বললেন, যা শুনে আমি চমকে গেলাম। তিনি বললেন, "বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে। ৪৭ সালে বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করায় আমরা জাতি হিসেবে দুর্বল হয়ে গেছি। বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হলে গোটা উপমহাদেশে আমরা বিশাল মর্যাদার অধিকারী হতে পারবো।"

আমি জানতে চাইলাম, "পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা কি ভারত থেকে আলাদা হয়ে আমাদের সাথে মিলে আলাদা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে রাজি হবে?"

তিনি আস্থার সাথে বললেন, "আলবত তারা প্রস্তুত হবে। তারা কোলকাতাকে রাজধানী করতে চাইবে। বঙ্গদেশ বিভক্ত না হলে তো আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী কোলকাতায়ই থাকতো। ব্রিটিশ আমলেও কোলকাতা বহু বছর ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিলো।"

আমি উপলব্ধি করলাম যে, এ ভদ্রলোক মুসলিম হিসেবে চিন্তা করেন না, বাঙালি হিসেবেই গর্ববোধ করেন। তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হওয়ার পরিবর্তে সহানুভূতি বোধ করলাম। বললাম যে, দীর্ঘ সময় ধরে আপনার চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার সুযোগ হলো। এখন আমার কথা শুনুন।

"আপনারা এ প্রজন্মের মানুষ। আমরা ব্রিটিশ আমল দেখেছি। ইংরেজরা মুসলমানদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণদেরকে জমিদারি স্বত্ব

দিয়ে মুসলিম কৃষকদেরকে তাদের প্রজা বানালো। সর্বক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের হিন্দুদেরকে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের সাহায্যে এদেশে ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘস্থায়ী করলো। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর ৪টি প্রদেশে মুসলিম লীগ সরকার ও ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস সরকার কায়েম হয়। মাত্র দু'বছরে কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানরা যে নির্যাতন ভোগ করেছে, তারই প্রতিক্রিয়ায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে পাকিস্তান কায়েমের আন্দোলন দানা বাঁধে এবং ৪৭ সালে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিকারী হই।"

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, যারা পাকিস্তান রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন, তারা মুসলিম জাতীয়তাবোধের লালন না করে পাকিস্তানের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে পরবর্তী জেনারেশনে বাঙালি জাতীয়তার উদ্ভব হয়। আপনাদের মতো মেধাবীদের সামনে তারা পাকিস্তানের আদর্শ তুলে না ধরার কারণেই নতুন প্রজন্ম ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছে।" তিনি বললেন, "ইতিহাসের গতি এখন ফিরাবার উপায় নেই।" এভাবেই করাচী থেকে ঢাকা পর্যন্ত তিন ঘণ্টা সময় দু'প্রজন্মের চিন্তাধারার আদান-প্রদানে কেটে গেলো।

শেখ মুজিবের সাথে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎ

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহইয়া খানের মার্শাল ল' জারির সপ্তাহখানেক পর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা চৌধুরী রহমত ইলাহীর এক টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে, "বর্তমান পরিস্থিতিতে জামায়াতের করণীয় সম্পর্কে আমীরে জামায়াতের হেদায়াত পৌঁছাবার জন্য আমি অমুক তারিখে ঢাকা পৌঁছতে চাই। আমি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথেও দেখা করা জরুরি মনে করি। আপনি তার সাথে সাক্ষাতের সময় নিয়ে রাখবেন।"

আমি ফোনে শেখ সাহেবের সাথে সরাসরি কথা বললাম। তিনি সাক্ষাতের সময় ঠিক করে দিলেন। আমি চৌধুরী সাহেবকে নিয়ে যথাসময় শেখ সাহেবের ধানমণ্ডিস্থ ৩২নং বাড়িতে পৌঁছলাম। আমার সাথে জামায়াতের প্রাদেশিক প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ নুরুয্‌যামানও ছিলেন।

শেখ মুজিব চৌধুরী সাহেবকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে কোলাকুলি করলেন এবং আমাদের দু'জনের সাথে হাত মিলিয়ে ভেতরে খাস কামরায় নিয়ে গেলেন। বৈঠকখানায় তাঁর দলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের কাউকে ভেতরে নিলেন না। তিনি আমাদেরকে বসাবার পর চৌধুরী সাহেবের সাথে কথা বলবার আগে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "আযম সাহেব! আমি যদি জানতাম যে, আবার মার্শাল ল' হবে তাহলে গোলটেবিলে আমার ভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো।" আমি সঙ্গে সঙ্গে এ কথার জওয়াবে কিছুই না বলে চৌধুরী রহমত ইলাহীর সাথে শেখ সাহেবকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। তিনি সময় নিয়ে দেখা করতে এসেছেন। তাঁকে পাশ কাটিয়ে আমার সাথে কথা

শুরু করা সঠিক মনে হয়নি। তাছাড়া তিনি আমার সাথে বাংলায় কথা বলছিলেন, যা চৌধুরী সাহেবের বুঝবার কথা নয়।

চৌধুরী সাহেব পয়লা সৌজন্যমূলক কথা বললেন। শেখ সাহেব কেমন আছেন, বাড়িতে সবাই ভালো আছেন কিনা, এ জাতীয় কিছু বলার পর চৌধুরী সাহেব জানতে চাইলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে এর পরিণাম কি হবে বলে তিনি ধারণা করেছিলেন। শেখ মুজিব কিছুটা বিব্রত ও উষ্মার ভাব প্রকাশ করে বললেন, "আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, সামরিক আইন জারি হবে না। উদ্ভূত সঙ্কট নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান রাজনৈতিক নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করবেন, যাতে ৬ দফাকে বিবেচনায় এনে কোন ফর্মুলা বের করা যায়। প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করে সেনাপ্রধানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন বলে ধারণা ছিলো না। সেনাপ্রধান সামরিক শাসন চান না বলেই আমার ধারণা ছিলো। আপনারা জানেন যে, জেনারেলরাই দেশটাকে বর্তমান সঙ্কটময় অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে।"

চৌধুরী সাহেব বললেন, "আমরা নিশ্চিত ছিলাম যে, গোটা পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলার যে চরম অবনতি হয়েছে তাতে আইয়ূব খান কিছুতেই পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না। এর পরিণতি যা হয়েছে আমরা এরই আশঙ্কা করেছিলাম।"

আমি এ সুযোগে বললাম, "শেখ সাহেব! আপনার মনে থাকার কথা যে, মাওলানা মওদূদী আপনাকে বলেছিলেন, "গোলটেবিল বৈঠক সফল না হলে আবার সামরিক শাসনই অনিবার্য হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে।"

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, "আইয়ূব খান সেনাপ্রধানের হাতে ক্ষমতা তুলে না দিলে ইয়াহইয়া খান সামরিক আইন জারি করার সুযোগই পেত না।"

চৌধুরী সাহেব বললেন, "যা হবার তা তো হয়েই গেলো। আপনি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় অন্যতম যুবনেতা ছিলেন। আপনি নিশ্চয়ই চান না যে, পাকিস্তান ভেঙে যাক। সব রাজনৈতিক দলের সাথে দেশ গড়ার ব্যাপারে আপনার চিন্তার সমন্বয় কিভাবে হতে পারে সে ফর্মুলা আপনাকেই বের করতে হবে। অন্য সবাই একদিকে, আর আপনি অন্যদিকে থাকলে সঙ্কটের সমাধান কেমন করে হবে?"

শেখ সাহেব আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। চৌধুরী সাহেব তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেবার জন্য অনেক অনেক শুকরিয়া জানালেন। শেখ মুজিব মৃদু হেসে একথা বলে আমাদেরকে বিদায় করলেন, "আমি মনে করি যে, ৬ দফা সবাই মেনে নিলে পাকিস্তানের ঐক্য আরও মযবুত হবে।"

ফিরে আসবার সময় গাড়িতেই চৌধুরী সাহেব মন্তব্য করলেন, "আমি নিশ্চিত হলাম যে, গোলটেবিল বৈঠক চলাকালে সেনাপ্রধানের সাথে শেখ মুজিবের গোপন সাক্ষাতের খবরটি গুজব ছিলো না।"

ইয়াহইয়া খানের রাজনৈতিক ঘোষণা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করে ইয়াহইয়া খান পরদিন জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে শুধু এটুকু ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। দেশে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা না থাকলেও পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক নেতাদের মতামত প্রকাশিত হচ্ছিলো। সব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দলই পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নেবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত ছিলো। কিন্তু কতক বিষয়ে ময়দানে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, যা পত্রিকায় প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন, পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ কি পুনর্বহাল হবে, না এক প্রদেশ হিসেবেই থেকে যাবে? জাতীয় পরিষদে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিনিধিদের সংখ্যাসাম্য বহাল থাকবে, না জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ হবে? সামরিক শাসন কতদিন জারি থাকবে? সাধারণ নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হবে? প্রকাশ্য রাজনীতি কবে শুরু হবে?

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এসব গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক প্রশ্নের জওয়াবে ৭-দফা ঘোষণা প্রদান করেন ঃ

১. পশ্চিম-পাকিস্তান প্রদেশ বিলুপ্ত করে সাবেক প্রদেশগুলোকে পুনর্বহাল করা হবে।
২. 'এক ব্যক্তি এক ভোট'-এর নীতিতে জনসংখ্যানুপাতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। (অর্থাৎ সংখ্যাসাম্য নীতি বাতিল করা হবে)।
৩. ফেডারেল পার্লামেন্টারি সরকার পদ্ধতি কায়েম হবে।
৪. নতুন নির্বাচিত গণপরিষদ প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র রচনা সমাপ্ত করার পর গণপরিষদ জাতীয় সংসদে রূপান্তরিত হবে।
৫. ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রাকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হবে।
৬. শাসনতন্ত্র রচনা না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন বলবৎ থাকবে।
৭. ১৯৭০ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের জনসভা

ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই বড় বড় রাজনৈতিক জনসভা ঢাকার পল্টন ময়দানে হয়ে এসেছে। তাই এ ময়দানকে 'ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান' বলা হয়।

১৯৭০-এর পয়লা জানুয়ারি থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা প্রকাশ্যে শুরু হওয়ার কথা। তাই জনসভা দিয়েই তা শুরু হয়। সেকালে রবিবার ছিলো সাপ্তাহিক ছুটির দিন। তাই বড় জনসভা রবিবারেই হতো। ১১ জানুয়ারি, রবিবার দিন সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় শেখ মুজিব ছাত্র-শ্রমিক জনতার নয়নমণি। রাজনীতিতে সক্রিয় মহল সবাই ভালোভাবে জেনেই হোক আর না জেনেই হোক ৬ দফা দাবিই পূর্ব-পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

স্বার্থ হাসিল করিয়ে দেবে বলে বিশ্বাস করতো। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার গুরুত্ব যারা উপলব্ধি করতো একমাত্র তারাই এর ব্যতিক্রম ছিলো।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবকে বানাবার কারণে ৬ দফা প্রবক্তা হিসেবে তার মর্যাদা আরও বেড়ে গেলো। ৬ দফার সমর্থক মহলের মনে এ বিশ্বাস মযবুত হলো যে, ৬ দফা দাবিকে প্রতিরোধ করার হীন-উদ্দেশ্যেই শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে ঐ মামলায় জড়িত করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে গণআন্দোলনের ফলে যখন ঐ মামলা প্রত্যাহার করতে সরকার বাধ্য হলো, তখন খুব স্বাভাবিক কারণেই শেখ মুজিব আন্দোলনরত সকলের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদা নিয়ে জেল থেকে মুক্ত হলেন।

এ পরিস্থিতিতে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভার প্রধান বক্তা শেখ মুজিবের বক্তৃতা শুনবার জন্য সমাবেশ যেমন বিরাট হওয়া স্বাভাবিক তেমনই হলো। শেখ মুজিব বিজয়ী মহাবীরের মতোই বক্তব্য রাখলেন। বিশাল জনসমুদ্র যেভাবে নেতার ডাকে সাড়া দেবার কথা সেভাবেই হাততালি ও শ্লোগান দিয়ে সাড়া দিলো। ৬ দফা হাসিল করতে হলে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অবশ্যই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার দখল করতে হবে বলে জনগণকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। পত্রিকায় এ সভার খবর যথাযথভাবেই ফলাও করা হয়।

এ সভার প্রতিক্রিয়ায় জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর সকল রাজনৈতিক দল একেবারেই চুপসে গেলো। পল্টনে জনসভা করার হিম্মত কেউ করবে বলে মনে হলো না। শেখ মুজিবের মোকাবিলায় নির্বাচনে অংশ গ্রহণের চিন্তা কোন দল করতে এগিয়ে আসবে কিনা তখনো বুঝা গেলো না।

পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভার প্রস্তুতি

জামায়াতে ইসলামী একটি আদর্শবাদী গণতান্ত্রিক দল। কোন একটি দলের ভয়ে ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া কোন অবস্থায়ই জামায়াতের সাজে না। তাই ইসলামী আদর্শ ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার স্বার্থে জামায়াত নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলো। ১১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ পল্টনে জনসভা করার ঘোষণা দেবার পরদিনই জামায়াতে ইসলামী ১৮ জানুয়ারি জনসভা করার খবর পত্রিকায় জানিয়ে দিলো।

স্বাভাবিক কারণেই আওয়ামী লীগ এটাকে তাদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ বলে মনে করলো। হয়তো তারা এটাকে দুঃসাহসিক ধৃষ্টতাই গণ্য করলো। আর কোন দল এমন ধৃষ্টতা দেখাতে সাহস করেনি বলে জামায়াতের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষিপ্ত হবারই কথা।

জনসভার প্রস্তুতি জোরেসোরেই চললো। সারা শহরে পোস্টার লাগানো হলো। রাতে পোস্টার সাঁটা হয়। দিনে বিরোধীরা তা ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। আবার পোস্টার ছেপে রাতে লাগাতে হলো। পোস্টার লাগাতেও বাধার সম্মুখীন হতে হলো। বাধার মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে গভীর রাতে, কখনো শেষ রাতে পোস্টার লাগাতে হয়। মাইকে রোড পাবলিসিটিতে বাধা দেওয়া হয়।

জামায়াতের জনসভার প্রধান বক্তা হিসেবে মাওলানা মওদূদীর নাম থাকায় বিরোধিতার মাত্রা বহুগুণ বেড়ে গেলো। শেখ মুজিবের নেতৃত্বের মোকাবিলায় পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে কোন নেতার আগমন তাদের নিকট সহনীয় না হওয়ারই কথা।

আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীদের হামলার ভয়ে প্রধান কয়েকটি পত্রিকা জনসভার বিজ্ঞাপন ছাপাতেও সাহস করেনি। এ পরিস্থিতিতেও জনসভার প্রস্তুতি যথারীতি চললো। স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারায় ১৬ জানুয়ারি থেকেই পল্টন ময়দানে বিরাট মঞ্চ তৈরি হতে লাগলো। স্বেচ্ছাসেবীরা সর্বক্ষণ পাহারায় নিযুক্ত ছিলো। ঢাকা শহরের আমীর ইঞ্জিনিয়ার খুররাম যাহ্ মুরাদ নিজে তদারকি করতে থাকলেন।

পত্রিকার সহযোগিতার কোন আশা না থাকায় মুরাদ সাহেবের কয়েক মাসব্যাপী অক্লান্ত প্রচেষ্টায় জনসভার পূর্বদিন ১৭ জানুয়ারি থেকে দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

মাওলানা মওদূদী ১৭ তারিখেই ঢাকায় এসে পৌছলেন। বিমান-বন্দর থেকে বিশাল মিছিল মাওলানাকে সম্বর্ধনা জানিয়ে শহরে নিয়ে এলো। এ খবর বিরাট আকারে ১৮ তারিখের দৈনিক সংগ্রামে মিছিলের ফটোসহ প্রকাশিত হওয়ায় জামায়াতের স্বেচ্ছাসেবক, কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেলো।

দৈনিক ইত্তেফাক তখন প্রধান রাজনৈতিক পত্রিকা। এতে প্রথম পৃষ্ঠায় মাওলানা মওদূদীর ঢাকা আগমনের খবরের উপর একটা কার্টুন ছাপা হয়। একটা বিরাট শকুন পাখা মেলে উড়ে আসছে। শকুনের চেহারাটা মাওলানা মওদূদীর। ইঙ্গিত স্পষ্ট। মাওলানার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে তৎপর সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মহাশত্রু পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে উড়ে ঢাকায় পৌছলেন।

তখনকার পল্টন ময়দান

তখন পল্টন ময়দানের জনসভায় সমাবেশ বিরাট হলে ময়দান ভর্তি হবার পর শ্রোতারা দক্ষিণ দিকে ডিআইটি রোড এবং পশ্চিম দিকে জিন্নাহ এভিনিউতে (বর্তমানে জিন্নাহর বদলে বঙ্গবন্ধু) সমবেত হতে পারতো। ময়দান খুব বিশাল না হলেও পশ্চিমের রাস্তার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বহুদূর পর্যন্ত মাইকের ব্যবস্থা করা হতো। ময়দানের উত্তর দিকে স্টেডিয়াম ছিলো। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক দেয়াল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিলো। ময়দানের প্রবেশ পথ ছিলো একমাত্র পশ্চিম দিকে। ময়দানের পূর্ব দিকে মোঘল আমলের ছোট একটি মসজিদ ছিলো। মসজিদের পূর্ব দিকেও ময়দানের আরও কিছু জায়গা ছিলো। দক্ষিণ দিকের মতো পূর্ব দিকেও দেয়াল দেওয়া থাকায় গোটা ময়দান দেয়ালবেষ্টিত ছিলো বলা যায়। ময়দানে আসা ও ময়দান থেকে বের হয়ে যাবার জন্য শুধু পশ্চিম দিকেই পথ রাখা হয়।

১০৩.

১৮ তারিখের জনসভা

বিকাল ৩টা থেকেই জনসভা শুরু হয়। বাইতুল মুকাররমে আযান হলে আমরা মাঠেই আসরের নামায আদায় করলাম। মঞ্চের ঠিক পেছনেই মসজিদটি ছোট হওয়ায় কিছু লোক ঐ মসজিদে নামাযে শরীক হন। আসরের নামাযের পর বাইতুল মুকাররমের নামাযীরা ময়দানে ঢুকলে ময়দান ভরে গেলো। আসরের পর মুলতবি জনসভা আবার শুরু হলো। আমি সভাপতিত্ব করছিলাম। আধ ঘণ্টা পর মাওলানা মওদূদীর মঞ্চে পৌঁছার কথা। তিনি আওরঙ্গজেব রোডস্থ জনাব ফযলুদ্দীন শামসী নামক এক ব্যবসায়ী রুকনের বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

আসরের পর সভা শুরু হবার সাথে সাথেই দক্ষিণ দেয়ালের বাইরে থেকে ইট-পাথরের ঢিল এসে শ্রোতাদের উপর পড়তে থাকলো। যে জখম হয় তাকে স্বেচ্ছাসেবকরা মঞ্চের উত্তর পাশের তাঁবুতে নিয়ে সেবা করতে লাগলো। প্রবেশপথ দিয়ে লাঠিধারী সন্ত্রাসীরা ময়দানে ঢুকার চেষ্টা করছিলো। স্বেচ্ছাসেবকরা খালি হাতে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললো। এমন পরিস্থিতিতেও ময়দানে উপস্থিত শ্রোতারা ভীত হয়ে ছুটাছুটি করেনি। বুঝতে পারলাম যে, ময়দানের ভেতরে সাধারণ পাবলিক নেই। তারা সবাই জামায়াতের কর্মী ও সমর্থক। এ সভায় গোলমাল হবে আশঙ্কায় সাধারণ শ্রোতা যারা এসেছিলেন তারা ময়দানের বাইরে রাস্তায় ছিলেন। উচ্চ মঞ্চ থেকে দেয়ালের বাইরে পশ্চিমের রাস্তায় অনেক লোক দেখা গেলো।

মঞ্চ থেকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম যে, দক্ষিণের রাস্তায় প্রচুর পুলিশ রয়েছে। অথচ লাঠিহাতে যারা সভায় আক্রমণ করতে চেষ্টা করছে তাদের সন্ত্রাস তারা নীরবে দেখছে। চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবকরা তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। আমি মঞ্চ থেকে মাইকে পুলিশকে বললাম, "আপনারা দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছেন? জনসভা করার গণতান্ত্রিক অধিকারে যারা বাধা দিচ্ছে তাদেরকে প্রতিহত করা কি পুলিশের দায়িত্ব নয়?" আমি লক্ষ্য করলাম যে, পুলিশ ময়দানের প্রবেশপথে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। তখন আমি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সেখান থেকে ফিরে আসার নির্দেশ দিলাম। আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম যে, স্বেচ্ছাসেবকদের ওখান থেকে সরে আসার পর লাঠিয়াল বাহিনীকে পুলিশ ময়দানে ঢুকবার জন্য পথ করে দিলো। তারা যখন সরাসরি শ্রোতাদের উপর আক্রমণ করলো তখন সবাই যে যেদিকে সম্ভব পালাবার চেষ্টা করতে বাধ্য হলো। একমাত্র পূর্বদিকের দেয়াল টপকিয়ে পার হবার পথ ছিলো। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে তো সন্ত্রাসীরা দীর্ঘ সময় ধরেই ঢিল মারছিলো।

মঞ্চ থেকে আমি মাইকে সভায় হামলার জন্য পুলিশকে দায়ী করে বক্তব্য রাখছিলাম। আমি মঞ্চেই শহীদ হবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আর যারা মঞ্চে ছিলেন তারা আমাকে মসজিদে চলে যাবার তাকিদ দিয়ে চলে গেলেন। সন্ত্রাসীরা ময়দানের

মাঝামাঝি পৌঁছে গেলো। দু'জন আমাকে জোর করে মঞ্চ থেকে টেনে নিয়ে গেলো। ছোট্ট মসজিদের বারান্দায়ও ঢুকবার মতো খালি জায়গা ছিলো না। বারান্দায় তিনদিক নিচু দেয়ালে ঘেরা। পূর্বদিকের দেয়ালে লোহার সিকের নিচু গেটের বাইরে কয়েকজন আমাকে উপুড় করে শুইয়ে দিয়ে আমার দু'পাশে দু'জন শুয়ে গেলো এবং একজন আমার উপর উপুড় হয়ে আমাকে ঢেকে দিলো। বারান্দার টিনের চালে বৃষ্টির মতো ঢিল পড়ছিলো। একটা ঢিল আমার ডান হাতের কনুইতে এসে লাগলো। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ছেয়ে গেছে। বারান্দাসহ মসজিদ লোকে ঠাসা।

হামলাকারীরা মসজিদের কাছে আসতে পারলে বারান্দায় যারা ঠাসাঠাসি করে ছিলেন তাদেরকে দেওয়ালের বাইরে থেকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে পারতো। তারা একটু দূরে থেকে ইট-পাটকেল মারায় মসজিদের বারান্দাও রক্তাক্ত হয়। সভা সম্পূর্ণ পণ্ড করার কাজটি পুলিশ বিনা বাধায় সমাধা করার মহান দায়িত্ব পালন করলো। তবে পুলিশ তাদেরকে মসজিদে এসে আক্রমনের সুযোগ দেয়নি। পুলিশ এসে মসজিদ ঘিরে ফেললে ঢিল পড়া থেমে যায়। ঢিল পড়া বন্ধ হলে বুঝা গেলো যে, হামলাকারীরা চলে গেছে। তখন আমাকে যারা ঢেকে রেখেছিলো তারা উঠে গেলো। আমি দাঁড়িয়ে তাদের একজনকে চিনলাম, যে আমাকে উপর থেকে ঢেকে রেখেছিলো। সে ছাত্রকর্মী মাসুদ আলী, যে বর্তমানে কানাডায় থাকে। বাকি দু'জনও ছাত্র, যারা আমার পূর্ব পরিচিত নয়। মসজিদে আশ্রয় গ্রহণকারীরা বের হতে লাগলো। তাদের মধ্যে আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামকেও দেখলাম। আশেপাশে পুলিশ দেখা গেলো। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে পরিচয় দিলেন যে, তিনি ঢাকার ডিসি। আমার ভাই এগিয়ে এসে তার সাথে হাত মিলালো। বুঝা গেলো, তারা ঘনিষ্ঠভাবে পূর্বপরিচিত। পরে জানলাম, বিলাতে তারা পরিচিত হন।

ডিসি সাহেব আমাকে বললেন, "আসুন গাড়িতে আপনাদের দু'জনকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিই।" আমি ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, "মুয়ায্যামকে নিয়ে যেতে পারেন। এখানে যারা আছে তাদের সবাই নিরাপদে চলে যাবার পর আমি যাবো। তবে আমি আপনার গাড়িতে যাবো না। আপনি স্বয়ং উপস্থিত থেকে সন্ত্রাসীদেরকে হামলার সুযোগ করে দিলেন।" তিনি আমার ভাইকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেলেন। ভদ্রলোকটির নাম মুহাম্মদ আলী। তিনি কাদিয়ানী ছিলেন বলেই এমন জঘন্য ভূমিকা পালন করতে পারলেন।

সন্ত্রাসীরা আশেপাশে কোথাও থাকতে পারে এবং মাঠে বা মাঠের বাইরে হামলা করতে পারে, এ আশঙ্কায় বাইরের খবর না নিয়ে মসজিদে যারা ছিলেন তাদের বের হয়ে যাওয়া নিরাপদ মনে করলাম না। শহরের দায়িত্বশীলরা খবর নিয়ে জানালো যে, সবাই চলে যেতে পারে, পথে কোন আশঙ্কা নেই। তারাই আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেলো। যেয়ে দেখি বাইরের ঘরে আহত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রাথমিক চিকিৎসা চলছে। খবর এলো দু'জন ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক শহীদ হয়ে গেছে এবং আহত অনেকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছে।

যে দু'জন শহীদ হয়েছিলেন তাদের নাম আবদুল মজিদ ও আবদুল আউয়াল। দু'জনই ঢাকা আলীয়া মাদরাসার ছাত্র। পরের দিন যোহরের নামাযের পর চকবাজার শাহী জামে মসজিদে তাদের জানাযায় মাওলানা মুফতী দীন মুহাম্মদ (র) ইমামতি করেন। নামাযের আগে মাইকে আমি কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে বললাম, "ইসলামের নামে পাকিস্তান কায়েম হল, আর পাকিস্তানেই ইসলাম কায়েমের কথা বলার জন্য জনসভা করতে দেওয়া হয় না। তদুপরি সভার স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার অপরাধে ময়দানেই শহীদ হতে হয়।" আমি লক্ষ্য করলাম, মুফতী সাহেবের চোখেও পানি।

একজন সাংবাদিক এলেন

আমাদের বাড়িতে অবস্থানরত প্রায় ৩০/৩৫ জন আহত স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের সাথে কথাবার্তা বলছি এবং তাদের খোঁজ-খবর নিচ্ছি, এমন সময় একজন সাংবাদিক এলেন। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত, গোলাম রসূল মল্লিক। ১৯৫৭ সালে আমি যখন দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করি, তিনি তখন এর স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন। তিনি নবগঠিত 'এনা' নামক এক সংবাদ সংস্থার স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে আমার ইন্টারভিউ নিতে চাইলেন। আহতদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আমাদের ঘরে বসা সম্ভব নয় বলে পাশের বাড়িতে তাকে নিয়ে গেলাম। এ বাড়িটি আমার চাচা মুসলিম লীগ নেতা জনাব শফীকুল ইসলামের। তাঁর বৈঠকখানায় বসলাম।

আগত সাংবাদিক প্রথমে আমার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলেন। আমি বললাম, "আইয়ূব খাঁর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে যাদের সাথে মিলে গণতন্ত্র বহালের জন্য আন্দোলন করলাম, তারাই আজ ফ্যাসীবাদী ভূমিকা পালন করলো। শেখ মুজিবের একথা মনে রাখা উচিত যে, ফ্যাসীবাদী হামলা করে অন্য দলের মিটিং পণ্ড করার শিক্ষা যাদেরকে দিচ্ছেন তাদের দ্বারা হয়তো ক্ষমতা দখল করাও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় গুণ্ডা বাহিনী নিয়ে দেশ শাসন করা যায় না। ক্ষমতায় গিয়ে এদেরকে সামলাতে পারবেন না। এদেরকে এখনি গণতান্ত্রিক শিক্ষা দিন, যদি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে চান।"

তিনি পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে আমার মন্তব্য জানতে চাইলে বললাম, "পুলিশ তো হাতিয়ার মাত্র। সাধারণত কোন ম্যাজিস্ট্রেটের পরিচালনায় আইন-শৃঙ্খলা বহাল রাখার জন্য পুলিশ বাহিনী নিয়োগ করা হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, স্বয়ং ডিসি-এর পরিচালনায় পুলিশ বাহিনী সন্ত্রাসীদের দমন করার পরিবর্তে জনসভা পণ্ড করার জন্য তাদেরকে হামলা করার ব্যবস্থা করে দিলেন। যখন সন্ত্রাসীরা হামলা শুরু করলো তখন ডিসি সাহেবের কর্তব্য ছিলো পুলিশ দিয়ে তাদেরকে প্রতিহত করা। তিনি যখন দেখলেন যে, স্বেচ্ছাসেবকদের প্রতিরোধের কারণে আক্রমণকারীরা দীর্ঘ সময় চেষ্টা করেও ময়দানে ঢুকতে পারছে না, তখন তিনি পুলিশকে ময়দানের প্রবেশ পথে নিয়ে গেলেন। পুলিশ দেখে আমি আশ্বস্ত হয়ে স্বেচ্ছাসেবকদেরকে

সরিয়ে নিলাম, যাতে পুলিশের কাজে তারা হস্তক্ষেপ না করে। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে, হামলাকারীদেরকে সাহায্য করার 'মহান' দায়িত্ব পুলিশ পালন করতে পারে। স্বয়ং ডিসি সাহেবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ জঘন্য উদাহরণ কায়েম হলো। এ সত্ত্বেও আমি শেখ মুজিবের কর্মী বাহিনীকেই প্রধানত দায়ী মনে করি। তারা সভা পণ্ড করার চেষ্টা না করলে পুলিশ সরাসরি হামলা করতে পারতো না।"

আমি আওয়ামী লীগ এবং ডিসি-এর ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানাই এবং একথা ঘোষণা করছি যে, জামায়াত একটি আদর্শবাদী আন্দোলন। জনগণের ময়দানে জামায়াতের অবস্থান। গুণ্ডামি করে এ আন্দোলনকে উৎখাত করা যাবে না।

মল্লিক সাহেব জানতে চাইলেন যে, এতো বড় ঘটনার পরও কি জামায়াত আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশ নেবে? জওয়াবে বললাম, "এ দেশের জনগণ ইসলামের নামে পাকিস্তান আন্দোলনে শরীক হয়ে ভারত থেকে পৃথক হয়েছে। জামায়াত ঐ আদর্শকেই কায়েম করতে চায়। আমরা জনগণের কাছেই যাবো। প্রশাসনের কোন সহযোগিতা দূরের কথা, নিরপেক্ষ ভূমিকাও আশা যায় না। যত প্রতিকূল অবস্থাই থাকুক জামায়াত ময়দান থেকে পালাবে না।"

একটু থেমে আমি দৃঢ়ভাবে বললাম, "যারা জনসভার আয়োজন করে তারা এর সফলতার স্বার্থে হামলাকারীদেরকে লাঠি দিয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করে না। কারণ এভাবে সভা সফল করা যায় না। তাই আমরা লাঠির মুকাবিলায় লাঠি ব্যবহার করিনি। জামায়াতের কর্মীরা শহীদ হবার জযবা নিয়েই এ আন্দোলনে এসেছে। তাই আওয়ামী লীগের হামলার ভয়ে ও প্রশাসনের বিরূপ আচরণে তারা পিছিয়ে যাবে না। আজ আমাদের দু'জন শহীদ হয়েছেন। তারা আর সবার জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন। আর যারা আহত হয়েছেন তারা আন্দোলনে আরও উদ্বুদ্ধ হবেন বলে আমি আশা করি।"

শহর অফিসে গমন

আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে মল্লিক সাহেবকে বিদায় করার পর সিদ্দিকবাজারে জামায়াতের শহর শাখার অফিসে গেলাম। শহর আমীর মুরাদ সাহেবকে সেখানে পেলাম। তিনি সেখানে আহতদের চিকিৎসা ও খাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন।

একটি বিষয়ে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। সে বিষয়ে সঠিক খবর মুরাদ সাহেব থেকে নিলাম। মাওলানা মওদূদীকে জনসভায় যথাসময়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তারই উপর ছিলো। আমার আশঙ্কা ছিলো যে, যদি মাওলানাকে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা দেখতে পায় তাহলে হামলা করবে। জনসভায় যাবার জন্য মাওলানাকে নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছিলেন কিনা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে, জনসভার পরিস্থিতি সম্পর্কে তাকে অবহিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিলো। তাই যথাসময়ে খবর পাওয়ায় মাওলানাকে রাস্তায় বের করা হয়নি। অবশ্য আসরের পর মাওলানা রওয়ানা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

আমি মুরাদ সাহেবকে বললাম যে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহতদেরকে দেখার জন্য আমি এখনই সেখানে যেতে চাই। নিরাপত্তার কথা ভেবে তিনি প্রথমে চুপ রইলেন। পর মুহূর্তেই বললেন যে, তিনিও আমার সাথে যাবেন। তখন রাত ১২টা বেজে গেছে। আরও জনকয়েক কর্মী সাথে নিয়ে আমরা গেলাম।

হাসপাতালে

আমরা হাসপাতালে যাচ্ছি এ সংবাদ নিয়ে দু'জন স্বেচ্ছাসেবক আগেই চলে গেলেন। তারা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র-সংগঠনের দায়িত্বশীলকে জানালে তারা কয়েকজন হাসপাতালের গেটে উপস্থিত হন। ইন্টার্নিদের মধ্যে তাদের দু'জন তখন ডিউটিতে ছিলো। পল্টন ময়দান থেকে আহত হয়ে যারা ইমারজেন্সিতে বা হাসপাতালের ওয়ার্ডে আছেন, তাদের খবর তারা জানে। তারা আমাদেরকে সাথে নিয়ে প্রথমে ইমারজেন্সিতে গেলো। সেখানে দেখা গেলো, প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে বিদায় করার মতো যারা, তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আর ভর্তি করে চিকিৎসার প্রয়োজন যাদের, তাদেরকে ভর্তি করা হচ্ছে।

সেখানে ইন্টার্নি ডিউটিরত তরুণ ডাক্তাররাই কর্মরত ছিলো। তাদের মধ্যে কারো কারো চোখে বিরূপ ভাব লক্ষ্য করলাম। সেখান থেকে হাসপাতালের ওয়ার্ডে যাবার পথে আমাদের ইন্টার্নিদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে, আহতদের সাথে কেউ মন্দ আচরণ করেছে কিনা। তারা বললো, "প্রথমদিকে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা আহতদেরকে দেখে বিরূপ মন্তব্য করা শুরু করেছিলো। আমরা ইমারজেন্সির দায়িত্বশীল ডাক্তারের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করায় পরিবেশ বদলে যায়। তিনি জোরে জোরে বলতে থাকলেন, "এটা হাসপাতাল, আর আমরা ডাক্তার। এখানে রোগীর সেবা করা আমাদের দায়িত্ব। রোগী রোগীই। আমরা এখানে নোংরা রাজনীতি করবো না। এখানে আমরা শুধু ডাক্তার।" তার এ ভূমিকার পর তেমন কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। অবশ্য বিরোধী মনোভাবের যারা, তারা হাসপাতালে ভর্তি না করে ছেড়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ইন্টার্নিরা আমাদেরকে আহতদের কাছে নিয়ে গেলো। আমরা প্রত্যেক আহত ভাইয়ের কাছে কিছু সময় অবস্থান করে তাদের অবস্থা জানতে চেষ্টা করলাম। যারা ঘুমিয়ে পড়েছিলো তাদেরও কপালে হাত দিলে তারা চোখ খুলে দেখলো এবং কথা বললো। রোগীকে ঘুমাতে দেওয়াই উচিত, এ কথা জেনেও আমরা তাদের সাথে ভিন্ন আচরণ করা কর্তব্য মনে করলাম। আমাদেরকে দেখে তারা মানসিক দিক দিয়ে যে প্রেরণা পেলো এবং তাদের উপর আমাদের যে নৈতিক প্রভাব পড়তে দেখলাম তা তাদের আরোগ্য সহায়ক বলেই আমরা অনুভব করলাম। জামায়াতের সুধী পর্যায়ের দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় দেখে আমরা খুবই বেদনাবোধ করলাম। তাদের একজন কায়েদে আযম (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী) কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জনাব এ আর ফাতেমী এবং অপরজন

সাপ্তাহিক 'ইয়ং পাকিস্তান' নামক ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদক জনাব আযীয আহমদ বিনইয়ামিনী। দু'জনই বয়স্ক লোক। তাদের মাথায় লাঠির আঘাত। মাথায় ব্যান্ডেজ দেওয়া আছে। চোখ-মুখ ফুলে আছে। আহতদের প্রায় সবাই মাথায় লাঠির আঘাতে জখম হয়েছেন। তারা দু'জনই রাত তিনটায় আমাদের দু'জনকে হাসপাতালে দেখে অত্যন্ত অভিভূত হয়ে বহুত বহুত শুকরিয়া জানালেন।

এ রকম হাঙ্গামি পরিস্থিতিতে খাবার রুচি থাকে না। বাড়ি থেকে বের হবার সময় আম্মা খাবার জন্য চাপ দেওয়া সত্ত্বেও খেতে বসতে পারলাম না। খাওয়া ও ঘুম ছাড়াই ব্যস্ততা চলতে থাকলো। হাসপাতাল থেকে যখন বের হলাম তখন রাত চারটা। আহতদের পাশে যেতে পারার কারণে মনে এমন তৃপ্তি বোধ করলাম যে, তখন ক্লান্তিতে কাবু হইনি। বাড়িতে এসে হাত-মুখ ভালো করে ধুয়ে ওযূ করে এবং মাথায় পানি দিয়ে কিছু খেলাম। ফজরের নামাযের পর অবসন্ন হয়ে বিছানায় পড়ে গেলাম। ১০টায় ঘুম থেকে ডেকে উঠালো।

১৯ তারিখের পত্রিকা

১৯ জানুয়ারি ঢাকার সব দৈনিক পত্রিকা দেখলাম। একমাত্র দৈনিক সংগ্রামে গতকালের কলঙ্কজনক ঘটনার সঠিক বিবরণ পড়ে কর্মীদের ও সমর্থকদের মনে কিছুটা সান্ত্বনা বোধ হলো। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিবরণ প্রধান কোন পত্রিকায়ই দেখা গেলো না। আওয়ামীদের সমর্থক পত্রিকায় 'বিক্ষুব্ধ জনতার" আক্রমণে জামায়াতের জনসভা পণ্ড হবার খবর রসিয়ে রসিয়ে বয়ান করা হলো। জামায়াতের বিরুদ্ধে 'জনতার' বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করতেও তাদের লজ্জাবোধ হয়নি। এতে যারা রিপোর্টার তাদের রাজনৈতিক পরিচয় স্পষ্ট হয়ে গেলো। তারা যে আসলে সাংবাদিক নয় তা-ই প্রমাণিত হলো।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, ENA (Eastern News Agency)-এর রিপোর্টার গোলাম রসূল মল্লিক থেকে পরিবেশিত আমার ইন্টারভিউ সব পত্রিকায়ই প্রকাশিত হয়। অবশ্য দৈনিক সংগ্রাম ছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় একরকমভাবে প্রকাশিত হয়নি। তবু আমার বক্তব্যের সারকথা মোটামুটি এসে যাওয়ায় জামায়াতের ভাবমর্যাদা কিছুটা বহাল থাকে।

এনার রিপোর্টারকে ফোনে শুকরিয়া জানালাম। তিনি এ কাজটুকু করে যে বিরাট খিদমত করেছেন, তাতে তার দরদের পরিচয় পাওয়া গেলো। তিনি এ রিপোর্ট পেশ না করলে জামায়াতের বিরাট রাজনৈতিক ক্ষতি হয়ে যেতো।

কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি দেওয়া হয়েছিলো কিনা মনে পড়ছে না। একমাত্র নেযামে ইসলাম পার্টির মৌলভী ফরিদ আহমদ বিবৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু দৈনিক সংগ্রাম ছাড়া আর কোন পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়নি।

সকল রাজনৈতিক দলই আওয়ামী লীগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে। তাই গতকালের ঘটনার পর গুণ্ডামির ভয়ে চুপ থাকতে বাধ্য হওয়ায় কাউকে দোষ দেওয়া যায় না।

১৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাৎ

১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভা পণ্ড করার জন্য আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও প্রশাসনের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা নিয়ে পরদিন জামায়াতের দায়িত্বশীলগণ মাওলানা মওদূদীর সাথে আলোচনা করেন। মাওলানা মন্তব্য করেন যে, ইয়াহইয়া খানের সামরিক সরকার দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক অঙ্গনে মুজিব ও ভুট্টোকে যথেচ্ছাচার করার সুযোগ দেবে বলে মনে হচ্ছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এ সরকার পালন করবে না, এর নিশ্চিত প্রমাণ গতকালের জনসভা।

এ পরিস্থিতিতে আপনারা অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হোন। যেসব আসনে জামায়াতের পক্ষ থেকে নমিনী দেওয়া সম্ভব, সেসব চিহ্নিত করে আসনভিত্তিক তৎপরতা চালান। নির্বাচনী সিডিউল ঘোষণার পূর্বে বড় জনসভা করার প্রয়োজন নেই। বাছাই করা আসনে ব্যাপক গণসংযোগ করুন।

পূর্ব-পাকিস্তানে আর কোন রাজনৈতিক দল ময়দানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে কিনা এখনও বলা যায় না। গণভিত্তিহীন নেতাসর্বস্ব কোন দলের সাথে নির্বাচনী ঐক্যে কোন সুফল আনবে না। একমাত্র নেযামে ইসলাম পার্টির সাথে নির্বাচনী সমঝোতা ও সহযোগিতা সম্ভব হতে পারে।

মাওলানার এসব পরামর্শের ভিত্তিতে প্রাদেশিক মজলিসে শূরার বৈঠকে নির্বাচনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে আমি মাওলানাকে জানালাম।

মাওলানার সাথে এ বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় যে, পরদিন তিনি পশ্চিম-পাকিস্তানে ফিরে যাবেন। মাওলানা আমাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন যে, অতীতে ইসলামী আন্দোলন এর চেয়েও অনেক কঠিন ও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে। আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের জন্য কাজ করছি। এ পথে টিকে থাকাই বড় সাফল্য। আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন।

১০৪.

বর্ষব্যাপী নির্বাচনী অভিযান

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জেনারেল ইয়াহইয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় সংসদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন এবং ১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হবে বলে জানান।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজ নিজ ইস্যু নিয়েই মাঠে-ময়দানে রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করে থাকে। যেসব দলীয় দাবিকে জনপ্রিয় করা ও সরকারের নিকট জোর দাবি জানাবার প্রয়োজন, সেসবই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। কিন্তু ১ জানুয়ারি

থেকে রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু হলেও কোন রাজনৈতিক দল তেমন উল্লেখযোগ্য ইস্যু নিয়ে ময়দান গরম করতে চেষ্টা করেনি। তখন নির্বাচনই একমাত্র রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।

তাই ১১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ এবং ১৮ জানুয়ারি জামায়াতে ইসলামী পল্টন ময়দানে প্রথম নির্বাচনী জনসভার আয়োজন করে। নির্বাচনী ইস্যু ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক ইস্যু না থাকায় যেসব দল নির্বাচনে উৎসাহী নয় তাদের কোন রাজনৈতিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি।

সব দেশেই দেখা যায় যে, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার ২/৩ মাসের মধ্যেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাই নির্বাচনী অভিযান কোথাও ৩ মাসের বেশি চলে না। কিন্তু ১৯৭০-এর নির্বাচনে প্রায় সারা বছরই নির্বাচনী অভিযানের বোঝা বহন করতে হয়। ৫ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাস দীর্ঘ অভিযান চালাতে হতো। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে আগস্ট মাসে ব্যাপক ও ভয়াবহ বন্যা হওয়ায় নির্বাচনের অনুষ্ঠান ৭ ডিসেম্বরে করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। তাই নির্বাচনী অভিযানের সময় আরও দু'মাস বেড়ে যায়। ১২ নভেম্বর বৃহত্তর নোয়াখালীতে প্রলয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কোন কোন মহল থেকে নির্বাচনের তারিখ আবারও পিছাবার দাবি উঠে। যদি পিছাতো তাহলে নির্বাচনী অভিযানের সময় আরও বেড়ে যেতো। ৭ ডিসেম্বরেই নির্বাচন হয় এবং দীর্ঘ এগারো মাস নির্বাচনী অভিযান চলে। নির্বাচনী অভিযানের মেয়াদের দিক থেকে এটা হয়তো বিশ্ব-রেকর্ড।

নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত

সম্ভবত ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রাদেশিক মজলিসে শূরার অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, জামায়াত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে। ১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতের জনসভার সাথে আওয়ামী লীগ ও প্রশাসনের দুশমনি আচরণ সত্ত্বেও মজলিসে শূরায় সর্বসম্মতভাবেই এ সিদ্ধান্ত হয়। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে জামায়াত এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা সংক্ষেপে পেশ করছি ঃ

আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যেই জামায়াতে ইসলামী নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সকল বাতিল শক্তিই এর বিরোধিতা করবে, এটাই স্বাভাবিক। এদেশে বাতিল শক্তির মধ্যে প্রধানই হলো আওয়ামী লীগ। তাই তাদের পক্ষ থেকেই সর্বাপেক্ষা বেশি বিরোধিতা হবার কথা। বাতিলের মোকাবিলায় ময়দানে মযবুত ভূমিকা পালন করাই ঈমানের দাবি।

জামায়াত দেশে নেতৃত্বের পরিবর্তন চায়। জনগণের সামনে সৎ নেতৃত্ব তুলে না ধরলে এ পরিবর্তনের সূচনাই হতে পারে না। এ নির্বাচনেই নেতৃত্বের পরিবর্তন আশা করা না গেলেও দেশবাসীর নিকট জামায়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

যে কয়টি আসনে জামায়াত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ঐ এলাকার জনগণের নিকট স্বাভাবিকভাবেই জামায়াতের দাওয়াত ব্যাপকভাবে পৌছবে। নির্বাচনী অভিযান উপলক্ষে অনেক নতুন নির্বাচনী কর্মী যোগাড় হবে। নির্বাচনের ফলাফল যা-ই হোক, নির্বাচনের পর সংগঠনের বিস্তার সহজ হবে, নির্বাচনী কর্মীরা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীতে পরিণত হবে।

জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন দীর্ঘমেয়াদী। একটা নির্বাচনে ফলাফল কেমন হলো এটা প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। দাওয়াতের সম্প্রসারণ ও সাংগঠনিক অগ্রগতিই প্রধান উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যের জন্য নির্বাচন অত্যন্ত সহায়ক। নির্বাচনের সময় জনগণ যতটা আগ্রহ নিয়ে এবং মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বক্তব্য শুনে ও বিবেচনা করে অন্য সময় এমন পরিবেশ তৈরি থাকে না।

জামায়াতের নমিনী বাছাই

সাধারণত রাজনৈতিক দলের নমিনেশন বা টিকেট পেতে হলে নির্বাচনে প্রার্থী হতে যারা আগ্রহী তারাই তাদের পছন্দের দলের নিকট ধরনা দেয়। রাজনৈতিক দলও দলের মনোনয়নের জন্য প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করে। দরখাস্তের ফরম বিক্রির নিয়মও চালু আছে। যে দলের নির্বাচনে ভাল ফলের আশা বেশি সে দলে প্রার্থীর ভিড়ও অধিক হয়।

এ ব্যাপারে জামায়াতে ইসলামীর পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্বাচনী প্রার্থী হওয়ার উদ্দেশ্যে দলের মনোনয়নের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয় না। কোন ব্যক্তি জামায়াতের নিকট প্রার্থী হবার আগ্রহ প্রকাশ করলে তিনি অযোগ্য বিবেচিত হবেন। কোন রুকন (সদস্য) প্রার্থী হবার দাবি করলে তিনি সদস্যপদই হারাবেন। কারণ রাসূল (স) যে পদ চায় তাকে দিতেন না। চাইলে বুঝা গেলো যে, সে ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের সুযোগ তালাশ করছে। সংগঠন যাকে যে পদের জন্য যোগ্য বিবেচনা করে, সে পদ নিতে অস্বীকার করাও দূষণীয়। অর্থাৎ সবাইকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের নিয়তে সবকিছু করতে হবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ, মর্যাদা ও সুযোগ কামনা করা ইসলামের খেলাফ।

নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্য জামায়াত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ পদ্ধতি অবলম্বন করে।

১. জামায়াতের মজলিসে শূরা একটি পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করে। বোর্ডের পক্ষ থেকে জেলা আমীরদের নিকট নির্বাচনে দাঁড় করাবার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা পাঠাবার জন্য অনুরোধ করে। জেলা আমীর জেলার মজলিসে শূরা অথবা রুকনদের মতামত নিয়ে উপযুক্ত লোকদের তালিকা এবং তাদের ব্যক্তিগত সকল প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে পাঠান।

২. পার্লামেন্টারি বোর্ড প্রেরিত তথ্যাবলির ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে এক এক আসনের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বাছাই করেন।

৩. বোর্ড বাছাইকৃত ব্যক্তিদেরকে ডেকে বিস্তারিতভাবে আলাপ-আলোচনা করে তাদের যোগ্যতার মান যাচাই করেন।

৪. পার্লামেন্টারি বোর্ড ২/৩ জনের টিম তৈরি করে প্রত্যেক আসনে গিয়ে সরেজমিনে প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর নিতে পাঠান। টিম রুকন ও কর্মীদের মতামত সংগ্রহ করেন। গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে জানতে চান যে, ঐ আসন থেকে নির্বাচনে দাঁড় করাবার জন্য কে, কাকে সবচেয়ে যোগ্য ও উপযোগী মনে করেন।

সর্বশেষে পার্লামেন্টারি বোর্ড যাবতীয় তথ্য যাচাই-বাছাই করে যাকে সকল দিক দিয়ে যোগ্যতম বিবেচনা করে তাকে মনোনয়ন দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাধারণত বোর্ডের সকল সদস্যের মধ্যে ব্যাপক আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বলা বাহুল্য যে, ব্যক্তি বাছাই করার বেলায় যেসব গুণাবলি অপরিহার্য বিবেচনা করা হয় তা হলো, উন্নতমানের নৈতিক চরিত্র, ইসলামী আন্দোলনে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা, জনগণের নিকট সৎ লোক হিসেবে পরিচিতি এবং সর্বসাধারণের সাথে মেলামেশায় অভ্যস্ত।

অন্যান্য দলে প্রার্থী বাছাইয়ের পদ্ধতি

যেসব রাজনৈতিক দলের কোন আদর্শ কায়েমের কর্মসূচি নেই, সে দলগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষমতায় যাওয়া। তারা পাওয়ার পলিটিক্স বা ক্ষমতার রাজনীতি করেন। তাই নির্বাচনে প্রার্থী বাছাই করার সময় দলের প্রধান দায়িত্বশীলগণ এমন লোকদেরকেই মনোনয়ন দেন, যাদের জিতে আসবার যোগ্যতা আছে। এ যোগ্যতার মাপকাঠি সততা বা নৈতিক চরিত্র নয়; প্রধান মাপকাঠি হলো আর্থিক সঙ্গতি। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা যদি খরচ করা প্রয়োজন হয় তাও খরচ করতে সক্ষম হতে হবে। যে নিজের নির্বাচনী ব্যয় বহন করার সাথে সাথে দলের নির্বাচনী তহবিলে মোটা অংকের চাঁদা দিতে আগ্রহী এমন প্রার্থীর কদর সবচেয়ে বেশি।

আর্থিক সঙ্গতির পর যোগ্যতার দ্বিতীয় মাপকাঠি হলো, সাহসী নির্বাচনী কর্মীবাহিনী যোগাড় করার ক্ষমতা। টাকা থাকলে এ বাহিনী যোগাড় করা সহজ হলেও শুধু টাকায় এটা হয় না। এর জন্য সাংগঠনিক যোগ্যতা প্রয়োজন হয়। ইতঃপূর্বে কোন নির্বাচনে যোগ্যতার এ পরিচয় দিয়ে থাকলে তো কোন কথাই নেই।

এ দু'টো যোগ্যতার প্রতিযোগিতায় যে অন্য প্রার্থীর নিকট পরাজিত হয়, অর্থাৎ দলের মনোনয়ন যদি অন্য কেউ পেয়ে যায়, তাহলে এ ব্যক্তি ঐ দলের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নিকটও ধরনা দিতে পারে এবং সে দলও তাকে মনোনয়ন দিতে সম্মত হতে পারে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য যদি জনসেবাই হয়, তাহলে এ বিরাট টাকার অংক দিয়ে কতভাবেই জনহিতকর কাজ করা যায়। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ব্যবসা। নির্বাচনে যে মোটা অংক ব্যয় করা হয় তা এ ব্যবসায় বিনিয়োগ করে নির্বাচনে বিজয়ী হলে এ টাকা উসুল করেও বিরাট লাভ করা যাবে। এ ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি না থাকলে জনগণের খিদমত করার জন্য এ পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয় করা স্বাভাবিক নয়।

নির্বাচনের মওসুম আসলে দলীয় প্রধানদের হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে যারা দলে যোগদান করেন তারা সবই মনোনয়ন প্রার্থী। মনোনয়ন দিতে সম্মত হবার পরই যোগদানের ঐ অনুষ্ঠান করা হয়। আমি এ জাতীয় যতো অনুষ্ঠানের ফটো পত্রিকায় দেখেছি প্রায় সবই মনোনয়ন দানের পরোক্ষ ঘোষণা বলেই প্রমাণিত হয়েছে।

এ জাতীয় লোক যোগাড় না হলে দলের লোকদের মধ্য থেকে কেউ নমিনেশন পায়। তা না হলে দলের কেউ কেউ যত নিষ্ঠাবান ও ত্যাগীই হোক, তারা সহজে নমিনেশন পায় না। এমনও দেখা যায় যে, দলের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অন্য দলের নেতাকেও নির্বাচনের উদ্দেশ্যে লুফে নেওয়া হয়।

এ জাতীয় ক্ষমতার রাজনীতি সর্বস্ব দলের হাতে দেশের শাসনভার যতদিন থাকবে, ততদিন সত্যিকার নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব আশা করা যায় না। এ জাতীয় নেতৃত্বের পরিবর্তন না হলে দেশগড়ার রাজনীতির মুখ কখনো জনগণ দেখতে পাবে না।

জামায়াতের বাছাই করা আসন সংখ্যা

শেষ পর্যন্ত জামায়াত মাত্র ৬০ থেকে ৬৫ টি আসনে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়। পূর্ব-পাকিস্তানে জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা ১৬২টি ছিলো। জামায়াত চূড়ান্ত পর্যায়ে মাত্র ৬৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জামায়াত কতটি প্রাদেশিক আসনে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিলো তা স্মরণে আসছে না।

জাতীয় সংসদের প্রতিটি আসনের এলাকায় প্রাদেশিক পরিষদের দু'টো আসন ছিলো। সে হিসেবে প্রাদেশিক আসন সংখ্যা ৩২৪ ছিলো।

কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জামায়াতের কোন রকম নির্বাচনী ঐক্য বা সমঝোতা ছিলো না। শুধু নেযামে ইসলাম পার্টির সাথে জামায়াত এ বিষয়ে একমত হয় যে, এ দু'দলের প্রার্থী এক আসনে দাঁড়াবে না।

জামায়াত আমাকে ঢাকা শহরের এক আসনে নমিনী বানায়। যাকে নমিনেশন বা মনোনয়ন দেওয়া হয় জামায়াত তাকে কেন্ডিডেট বা প্রার্থী না বলে নমিনী বলে। আমার আসন ছিলো ৪টি থানার বিরাট এলাকা। আমার নিজের থানা রমনাসহ তেজগাঁও, লালবাগ ও মুহাম্মদপুর। রমনা ও তেজগাঁও মিলে একটি প্রাদেশিক আসন ও অপর দু'থানা মিলে আর একটি প্রাদেশিক আসন।

নির্বাচনী অভিযানের অভিজ্ঞতা

আমার নিজের আসনে জামায়াতের গোটা জনশক্তি, যা তখন বড় ছিলো না বটে; কিন্তু সবাই জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করেছে। আমি ঢাকায় উপস্থিত থাকলে নির্বাচনী

সভায় বক্তব্য রেখেছি। আমি প্রায় সব আসনেই গিয়েছি এবং নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা করেছি। জনসভাগুলোতে যথেষ্ট লোক সমাগম ছিলো। সভার শেষভাগে এলাকার গণ্যমান্য লোকদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থাও করা হতো। প্রায় সর্বত্রই বৈঠকে উপস্থিত লোকদের পক্ষ থেকে একই রকম মন্তব্য শুনেছি। মন্তব্যের সারকথা একই, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি যাই হোক। "আপনার বক্তব্য অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। যে উদ্দেশ্যে আমরা ভারত থেকে পৃথক হলাম, সে উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে জামায়াতকেই ভোট দেওয়া উচিত। আপনাদের প্রার্থীতো সব দিক দিয়ে অন্যান্য দলের প্রার্থীর চেয়ে বেশি উপযুক্ত। কিন্তু আপনাদের দলের প্রধান পশ্চিম-পাকিস্তানি। আপনাদেরকে ভোট দিলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমেই থেকে যাবে। এবার আমাদের নির্বাচনী টার্গেট হওয়া উচিত কেন্দ্রে পূর্ব-পাকিস্তানি নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। পশ্চিম-পাকিস্তানিদের হাতে দেশের কর্তৃত্ব থাকায় সর্বদিক দিয়ে আমরা পেছনে পড়ে আছি। জাতীয় সংসদে পূর্ব-পাকিস্তানের আসন সংখ্যা বেশি হওয়ায় কেন্দ্রে পূর্ব-পাকিস্তানি নেতৃত্ব কায়েমের সুযোগ এসেছে। এবারকার নির্বাচনে আমাদেরকে এ সুযোগটা নিতে দিন। আমরা এ নির্বাচনে আমাদের অধিকার আদায় করে নিই। ভবিষ্যতে আপনাদের মতো লোকদেরকে নির্বাচনে আমরা প্রাধান্য দেবো। কিন্তু এ নির্বাচনে আমাদেরকে ক্ষমা করুন।" আওয়ামী লীগ নেতাদের যোগ্যতার প্রশংসা করতে হয় যে, তারা রাজনীতি সচেতন মাঠ পর্যায়ে লোকদেরকেও একথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের স্বার্থেই শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ও আওয়ামী লীগের সরকার কেন্দ্রে কায়েম হওয়া প্রয়োজন। কত সহজ-সরল ও সুন্দরভাবে তাদের মগজে এ কথা বসে গেছে! এ কথার মধ্যে যে ভুল রয়েছে তা অনুধাবনের পথই রুদ্ধ হয়ে গেছে। বিশেষ করে আইয়ূব খানের দশ বছরের একটানা শাসনের এ প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক।

তাদের মন্তব্যের জওয়াবে আমি বলতাম, "আপনারা কি জানেন যে, আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব-পাকিস্তানেই আছে? পশ্চিম-পাকিস্তানে এদের কিছুই নেই। তারা ক্ষমতা পেলে পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে আলাদা করে ফেলতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে ভবিষ্যতে আপনারা পাকিস্তানের নির্বাচনে ভোট দেবার সুযোগই হয়তো পাবেন না। যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান কায়েম হয়, তা সফল করার জন্য আর কোন নির্বাচন হতে পারবে কিনা বিবেচনা করে দেখুন।" আমার এ কথার কোন জওয়াব তারা না দিলেও তাদের চেহারা দেখে বুঝা যেতো যে, তারা এমন আশঙ্কা করেন না।

ঢাকা শহরে নির্বাচনী জনসভায় এবং জামায়াতের নির্বাচনী মিছিলে ঢিল মারা আওয়ামী লীগের মস্তানদের স্থায়ী কর্মসূচি ছিলো। অবশ্য ঢাকার বাইরে কম জায়গায়ই জনসভায় হামলা হয়েছে। কারণ জামায়াত এলাকার বেশকিছু গণ্যমান্য লোককে জনসভায় হাজির করে মঞ্চের আশেপাশের চেয়ারে বসার ব্যবস্থা করেছিলো। যে আসনের এলাকায় এ ব্যবস্থা করা যায়নি বা হয়নি, সেখানেই বিভিন্ন মাত্রার হামলা হয়েছে।

আমি নির্বাচনী জনসভায় শেখ মুজিবের নাম নিয়ে দু'টো কথা বলতাম। একটি কথা হলো, "শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি হলেও তাঁর দলের কোন শাখা পাশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশের কোনটাতেই নেই। সেখানে আর একটি 'পাকিস্তান আওয়ামী লীগ' আছে, যার সভাপতি নওয়াবযাদা নসরুল্লাহ খান। ঐ দলটির কোন শাখা পূর্ব-পাকিস্তানে নেই। এতে প্রমাণিত হয় যে, "শেখ মুজিব সারা পাকিস্তানের রাজনীতি করেন না। তিনি পাকিস্তানকে একরাষ্ট্র হিসেবে চিন্তা হয়তো করছেন না। তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে তিনি পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে পারেন।

অপর কথাটি শেখ মুজিবকে সম্বোধন করে বলতাম, "শেখ সাহেব! আপনার দলের কর্মীদেরকে রাজনৈতিক আচরণ শিক্ষা দিন। যদি তাদেরকে গুণ্ডামি করে অন্য দলের সভাভাঙা থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারেন, তাহলে একদিন আপনার সাথেও তারা বেতমিযি করবে। এদেরকে সংশোধন করতে না পারলে আপনি শান্তিতে দেশ পরিচালনা করতে পারবেন না। এ জাতীয় উচ্ছৃঙ্খল লোকদের সহযোগিতা নিয়ে হয়তো ক্ষমতায় যেতে পারবেন; কিন্তু দেশ শাসন করতে পারবেন না। আর যাই করা যাক গুণ্ডা দিয়ে শাসন করা যায় না। আমার এক চাচাকে আমার আব্বার সাথে বেআদবী করতে দেখে আমি ও আমার ছোট ভাই-এর প্রতিবাদ করতে উদ্যত হলে আমাদেরকে আব্বা কড়া ধমক লাগিয়ে বললেন, "তোরা কি তোদের চাচার সাথে বেআদবী করতে চাস? তাহলে তো একদিন আমার সাথেও করার সাহস পাবি। একথা বলার সাথে সাথে আমরা থেমে গেলাম, চাচাও লজ্জায় সরে গেলেন।

আমার আব্বার এ উদাহরণটা শুনে শ্রোতাদের মাথা নেড়ে একথা সমর্থন করতে দেখেছি।

নির্বাচনে অন্যান্য দলের হাল

৬ দফা ও ১১ দফার পক্ষে আন্দোলনরত বামপন্থি কোন দলই নির্বাচনে সামান্য অনুগ্রহও আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পায়নি। আওয়ামী লীগের ক্যাডারের বাইরে নৌকা প্রতীক নিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ না পেয়ে তারা পৃথকভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা করেছে। ন্যাপের ভাসানী গ্রুপ ও মুজাফফর গ্রুপ এবং মুসলিম লীগের তিন গ্রুপ প্রার্থী দাঁড় করালেও আওয়ামী লীগের প্রচারাভিযানের দাপটে শেষ পর্যন্ত ঘোষণা দিয়ে তাদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। একমাত্র জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর কোন দল ময়দানে দাঁড়িয়ে থাকেনি।

ভোট কেন্দ্রের হাল

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন ভোট কেন্দ্রের যে হাল ছিলো তা নির্বাচন অভিযানের হাল জানার পর সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। ভোট কেন্দ্রে জামায়াতই একমাত্র প্রতিপক্ষ, তা যতই ক্ষুদ্র হোক। জামায়াতের পোলিং

এজেন্টদেরকে সর্বত্রই সরিয়ে দেবার চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয়নি। যেখানে জামায়াতের এজেন্ট কোন রকমে টিকে ছিলো সেখানেও তাদের যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করতে পারেনি। ইয়াহইয়া খানের সামরিক প্রশাসন রাজনৈতিক ময়দানের মতো নির্বাচনী ময়দানেও নিষ্ক্রিয়ই ছিলো। যারা জামায়াতকে ভোট দিয়েছেন তারা অতি নীরবে ব্যালট পেপার দাঁড়িপাল্লার বাক্সে রেখে এসেছেন।

১০৫.

নির্বাচনী ফলাফল

১৯৭০-এর ডিসেম্বরের ৭ তারিখ যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এর ফলাফল সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই রেডিওতে প্রচারিত হতে থাকে। সারাদিন ভোট কেন্দ্রগুলোতে দৌড়াদৌড়ি করে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ফলাফল কী হবে সে সম্পর্কে ধারণা থাকায় রেডিও শুনবার কোন আগ্রহ বোধ করিনি। তাছাড়া চূড়ান্ত ফলাফল তো গণনা শেষ হলে শেষ রাত থেকে হয়তো জানা যাবে। কোন্ আসনে এ পর্যন্ত কতটি ভোট কেন্দ্রের গণনা সম্পন্ন হয়েছে এবং এতে কোন্ দলের কোন্ প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন এবং তার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দী কোন্ দলের কে কত পেয়েছেন, এ বিবরণই একটানা চলছিলো।

প্রতি আসনের খবরেই সর্বোচ্চ ভোট সংখ্যা ও নিকটবর্তী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা উল্লেখ করা হচ্ছিলো। জামায়াত ছাড়া অন্যান্য দল শেষ পর্যন্ত নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও তাদের বাক্সেও কিছু ভোট পড়েছে, যা হাস্যকরভাবে অতি নগণ্য। কিন্তু বাক্স যখন বসানো হয়েছে, তখন গণনার ফলাফল তো ঘোষণায় আসবেই। নির্বাচন কমিশন প্রার্থিতা প্রত্যাহারের যে তারিখ নির্দিষ্ট করেন, সে তারিখের মধ্যে প্রত্যাহার না করলে প্রার্থীর নাম ব্যালট পেপারে আসবেই এবং তাদের জন্য ভোট কেন্দ্রে ব্যালট বাক্স বসবেই। তবে দলীয় প্রার্থীরা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনী ময়দানে না থাকায় যেসব আসনে জামায়াতের নমিনী ছিলো না, সেখানে প্রধানত স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদা পান, তাদের ভোটের সংখ্যা যত নগণ্যই হোক। যেসব আসনে জামায়াত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, এমন আসনেই নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে জামায়াতের নাম অবশ্যই এসেছে। তবে ভোটের ব্যবধান বিরাট।

রেডিওতে সারারাত এবং পরের দিন দুপুর পর্যন্ত একটানা ফলাফল প্রচারিত হতে থাকে। কতক উৎসাহী কর্মী রেডিও নিয়ে বসেই রইলো। আমি ইশার নামাজের পর খেয়ে পরাজয়ের নিশ্চয়তা বোধ নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লাম। ফজরের আজানের সময় উঠে রেডিও শ্রোতাদের কাছ থেকে জানলাম যে, মাত্র কয়েকটি আসনের চূড়ান্ত ফলাফল এ পর্যন্ত পাওয়া গেলো এবং সবক'টিতেই আওয়ামী লীগ বিজয়ী এবং জামায়াত সব আসনেই নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী।

বিকালে চূড়ান্ত ফলাফল জানা গেলো। জামায়াত কোন আসনেই বিজয়ী হয়নি।

দু'টো আসন ছাড়া সকল আসনেই আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে বিজয়ী। যে দুটি আসনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হয়, এর একটিতে জনাব নূরুল আমীন এবং অপরটিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায় বিজয়ী হন। এ দু'আসনেও আওয়ামী লীগ যথেষ্ট ভোট পায়। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে জাতীয় সংসদের একটি আসন। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় প্রায় সকল উপজাতির ভোট পেয়ে বিজয়ী হলেন। জনাব নূরুল আমীন মোমেনশাহী জেলার নান্দাইল থেকে বিজয়ী হন। তিনি মুসলিম লীগ শাসনামলে পূর্ব-পাকিস্তানের দ্বিতীয় প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর শাসনামলেই '৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তিনি খুনী নূরুল আমীন উপাধি পান এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি ছাত্রনেতা খালেক নেওয়ায খানের নিকট পরাজয়বরণ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারির আবেগের বন্যায় তিনি ভেসে গেলেন। কিন্তু তিনি ঐ এলাকার উন্নয়নে যে বিরাট অবদান রেখেছেন এর স্বীকৃতিস্বরূপ '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী প্লাবন সত্ত্বেও জনগণ তাকে নির্বাচিত করে।

সারা পাকিস্তানে নির্বাচনের ফলাফল

১৭ জানুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা গেলো যে, পূর্ব-পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা শেখ মুজিব এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রধান নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ ও উপজাতি এলাকার সর্বমোট আসন সংখ্যা ১৩৮টি। এর মধ্যে ৮৮টি আসন ভুট্টোর পিপলস পার্টি পেয়েছে। অবশিষ্ট ৫০টি আসন ৭টি রাজনৈতিক দল ও উপজাতীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পায়। এ সাতটি দলের মধ্যে মুসলিম লীগের ৩ গ্রুপ, ন্যাপ, জমিয়তে উলামা, মারকাযী উলামা ও জামায়াতে ইসলামী। আইয়ূব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ মাত্র ২টি আসন পায়। আর জামায়াতে ইসলামী পায় ৪টি আসন।

পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন দখল করে। নূরুল আমীনের ডেমোক্রেটিক পার্টি দু'টি এবং জামায়াতে ইসলামী, নেযামে ইসলাম ও ন্যাপ (মুযাফ্ফর) এক-একটি করে আসনে বিজয়ী হয়। বগুড়ার মাওলানা আবদুর রহমান ফকির একটি প্রাদেশিক আসনে নির্বাচিত হন।

জাতীয় সংসদের নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেলো, পূর্ব-পাকিস্তান শেখ মুজিবের দখলে, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশদ্বয় ভুট্টোর কজায় এবং অপর দু'টো প্রদেশ ওয়ালী খান ও মুফতী মাহমুদের নিয়ন্ত্রণে।

নির্বাচনী মুবারকবাদ

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুযায়ী ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে তাদের ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য আন্তরিক মুবারকবাদ জানিয়ে আমি সংবাদপত্রে বিবৃতি দেই। ব্যক্তিগতভাবে শুধু আবদুস সামাদ সাহেবকে টেলিফোনে মুবারকবাদ

জানাই। তার নামের সাথে আজাদ শব্দটি কিভাবে জড়িত হলো তা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর লেখা 'রাজনীতির তিন কাল' বইটি থেকে জানতে পারলাম।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকেই নাকি ছদ্মনাম ধারণ করেন। সামাদ সাহেবের ছদ্মনাম নাকি ছিলো আজাদ। বিজয়ের পর আসল নামের সাথে ছদ্ম নামটিও যুক্ত হয়ে যায়। যা হোক ফোনে মুবারকবাদ জানাবার সাথে সাথে তিনি বলে উঠলেন, "আরে ভাই আপনি বিশ্বাস করবেন না, মালাউনরা সবাই আমাকে একচেটিয়া ভোট দিয়েছে। যার হাঁটবার ক্ষমতা নেই সেও অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে এসেছে।" তিনি আমাকে এভাবে কথাটি বলা কেন প্রয়োজন মনে করলেন তা আমার জানা নেই। এ কথাটিতে আমি বিস্মিতই হয়েছি। পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগের অনেকেই হিন্দুদেরকে মালাউন বলতেন। শব্দটি আসলে আরবী 'মাল্উন' শব্দেরই বিকৃত উচ্চারণ। এর অর্থ হলো অভিশপ্ত বা লানতপ্রাপ্ত। লানত শব্দ থেকে মালউন শব্দটি গঠিত। সামাদ সাহেব পাকিস্তান আন্দোলনের কর্মী হিসেবে হয়তো এ শব্দ ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজুদ্দীনের সাথে ছাত্রজীবন থেকেই ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তাদের সাথে রাজনৈতিক সখ্য ছিলো না। সামাদ সাহেবের সাথে ছাত্রজীবনে কোন পরিচয় না থাকলেও রাজনৈতিক ময়দানে ঘনিষ্ঠতা জন্মে যখন আমরা PDM-এর আন্দোলনে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করি। আমি যখন PDM-এর সেক্রেটারি তখন তিনি ট্রেজারার। তখন তিনি নূরুল আমীন সাহেবের ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাদেশিক সেক্রেটারি। ৬ দফার বিকল্প হিসেবে আমরা ৮ দফা নিয়ে আন্দোলন করাকালেই এ বন্ধুত্বের জন্ম। গোলটেবিল বৈঠকে ফেল করার পর তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।

ইয়াহইয়া খানের গড়িমসি

সকল গণতান্ত্রিক দেশেই নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হবার পর কোন দল যদি পার্লামেন্টের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয় তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান অবিলম্বে ঐ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে ৩০০ আসনের পার্লামেন্টে ১৬০টি আসনে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানানো হয়নি।

এর কারণ যদি এটা হয়ে থাকে যে, '৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে ইয়াহইয়া খান যে কার্যধারা ঘোষণা করেছেন, সে অনুযায়ী প্রথমে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা গণপরিষদ হিসেবে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব পালনের পরই সরকার গঠনের সুযোগ আসবে। সে কারণে নির্বাচনের পরই সরকার গঠন করা যায়নি। তাহলে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে বিলম্ব করার কী যুক্তি থাকতে পারে?

নির্বাচন হয়ে গেলো ৭ ডিসেম্বর, আর ইয়াহইয়া খান গড়িমসি করে গণপরিষদের

অধিবেশন ডাকলেন ৩ মার্চ। তাও আবার ভুট্টোর দাবিতে ১ মার্চ এ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণা করে ইয়াহইয়া খান তাঁর গড়িমসির মেয়াদ বাড়িয়ে দিলেন।

এ গড়িমসির আসল কারণ

ইয়াহইয়া খান হয়তো এ ধারণা করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দল যদি ২৫/৩০টি আসনও পায় তাহলে পশ্চিম-পাকিস্তানের সদস্যদের সাথে নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠনের সুযোগ হবে। শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হলে ৬ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করে পাকিস্তানের সংহতি বিপন্ন করে ফেলবেন বলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দেওয়া যাবে না।

কিন্তু জাতীয় সংসদে শেখ মুজিব সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নেতা হয়ে যাওয়ায় ইয়াহইয়া খানদের সকল পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষাই যদি প্রকৃত উদ্দেশ্য হতো তাহলে ইয়াহইয়া খান নির্বাচনের পর অবিলম্বে নির্বাচিত দলসমূহের নেতাদের বৈঠক ডেকে শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে চিন্তার সমন্বয় সাধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। তা না করে শুধু ভুট্টোর সাথে পরামর্শ করে পরিস্থিতিকে জটিল করতে থাকলেন।

ভুট্টো ইয়াহইয়ার জন্য সমস্যা বাড়িয়েই চললেন। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হলে তাকে সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা হতে হবে, এটা তিনি কিছুতেই মানতে চান না। তাঁর ক্ষমতা চাই। তাঁর ক্ষমতায় যাবার একমাত্র উপায়ই হলো পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করা। আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের দশ বছর তিনি তাঁর অন্যতম প্রধান দোসর থেকে ক্ষমতার যে স্বাদ ভোগ করেছেন, তা আবার পাওয়ার জন্য তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য লোকের মতো অদ্ভুত ধরনের বক্তব্য দিতে থাকলেন।

একবার বললেন, "পাকিস্তানে দু'টো মেজরিটি পার্টি আছে, আওয়ামী লীগ ও পিপলস পার্টি।" গণতন্ত্রের কোন সংজ্ঞায় এক পার্লামেন্টে দুটো মেজরিটি পার্টির অস্তিত্ব থাকতে পারে? ক্ষমতার পাগলের প্রলাপ ছাড়া এ কথাকে আর কোনভাবেই আখ্যায়িত করা যায় না। এ পাগলামির নিকৃষ্টমানের উচ্চারণই ছিলো, "শেখ মুজিব! ওধার তোম, এধার হাম" (ওদিকে তুমি আর এদিকে আমি)।

ক্ষমতার নেশাগ্রস্ত না হলে এবং পাকিস্তানের ঐক্য রাখার ব্যাপারে সামান্য আন্তরিকতা থাকলে ভুট্টো নির্বাচনের পর মেজরিটি পার্টির নেতা শেখ মুজিবের সাথে বসে শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে চিন্তার সমন্বয় করতে সচেষ্ট হতেন।

অনেকেরই ধারণা যে, ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিব থেকে এ নিশ্চয়তা চেয়েছিলেন যে, যখন সরকার গঠন করা হবে এবং শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হবেন তখন তাঁকে যেন প্রেসিডেন্ট করা হয়। এ নিশ্চয়তা না পাওয়ায় তিনি ভুট্টোর সাথে আঁতাত করে সমস্যা বৃদ্ধিই করতে থাকেন।

৭১ সালের ৩ মার্চে নির্বাচিত গণপরিষদের অধিবেশন ঢাকায় অনুষ্ঠানের ঘোষণাটি ইয়াহইয়া খান একমাত্র ভুট্টোর চাপেই মুলতবি করেন। মেজরিটি পার্টির নেতার সাথে যোগাযোগ না করেই এবং পরবর্তী কোন তারিখের উল্লেখ ছাড়াই অধিবেশন মুলতবি করাটা চরম হঠকারী সিদ্ধান্ত ছিলো। ভুট্টো হুমকি দিলেন যে, পশ্চিম-পাকিস্তানের কোন সদস্য ৩ মার্চের অধিবেশনে যোগদানের জন্য চেষ্টা করলে করাচী বিমান বন্দরেই তার ঠ্যাঙ ভেঙে দেওয়া হবে।

এক সময় ভুট্টো বললেন, গণপরিষদের বৈঠক বসার আগে বিভিন্ন ইস্যুতে শেখ মুজিবকে তাঁর সাথে সমঝোতায় পৌছতে হবে। এ বিষয়ে যদি তিনি আন্তরিক হতেন তাহলে তিনি মুজিবকে তাঁর কাছে যাবার দাবি না করে তারই শেখ মুজিবের কাছে আশা উচিত ছিলো। ইয়াহইয়া খান এ সবকেই গড়িমসির বাহানা বানালেন।

সমাধানের একটি মহৎ প্রচেষ্টা

নির্বাচনের ২/৩ সপ্তাহ পর পশ্চিম-পাকিস্তানের যেসব পার্টি সংসদে কিছুসংখ্যক আসন পেয়েছে সে দলগুলোর কয়েকজন নেতা শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে ঢাকা এলেন। কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ মুহাম্মদ খান দৌলতানা, মাওলানা মুফতী মাহমুদ, ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান এবং মারকাযী উলামা দলের শাহ আহমদ নূরানী মিয়া শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মাওলানা নূরানী মিয়া আমার গরীবখানায় আসায় ঐ বৈঠকের বিবরণ তাঁর কাছ থেকে জানার সুযোগ পেলাম। তিনি বললেন, "আমরা শেখ মুজিবকে বললাম যে, আপনি পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা। আমরা চাই কেন্দ্রে আপনি সরকার গঠন করুন। আপনি প্রধানমন্ত্রী হলে কেন্দ্রীয় সরকারের সকল মন্ত্রীতো শুধু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নিতে পারেন না। কতক মন্ত্রীতো স্বাভাবিক কারণেই পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আপনাকে নিতে হবে। আমরা ৫০ জন সদস্য ভুট্টোর বিরোধী। মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন পার্টির সংসদ সদস্যদের সাথে আলোচনার জন্য আপনাকে দাওয়াত দিতে আমরা এসেছি। মমতাজ দৌলতানা একটু রাজনৈতিক রসিকতা করে নাকি বলেছিলেন, "শেখ সাহেব! আমরা এখানে আপনার সাথে যেখানে বসে আছি এটা কি পাকিস্তান নয়? আমরা পাকিস্তানে বসেই কথা বলছি তো? আপনি যদি নিজেকে পাকিস্তানের নেতা মনে করেন তাহলে তো আপনি পশ্চিম-পাকিস্তানেরও নেতা। আপনি যেয়ে দেখুন জনগণ কিভাবে আপনাকে মুবারকবাদ জানায়।"

শেখ সাহেব বললেন, "যিনি জনগণের সবচেয়ে বেশি আস্থা অর্জন করেছেন সেই ভুট্টো সাহেবতো আমাকে নেতা মানতে চান না।" ওয়ালী খান বললেন, "সীমান্ত ও বেলুচিস্তানের মেজরিটি এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুর বিরাট জনসংখ্যাসহ পশ্চিম-পাকিস্তানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মানুষ ভুট্টোকে চায় না। তারা আপনাকেই নেতা মেনে নেবে।" মুফতী মাহমুদও ওয়ালী খানের মত সমর্থন করলেন। এ সত্ত্বেও

শেখ সাহেবের মধ্যে তেমন উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা গেলো না। তিনি এ কথা বলে সবাইকে বিদায় করলেন, "ইয়াহইয়া ও ভুট্টোর মনোভাব দেখে আমি আপনাদের প্রস্তাব বিবেচনা করব।"

মাওলানা নূরানীর নিকট থেকে শেখ সাহেবের সাথে পশ্চিম-পাকিস্তানি নেতাদের সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ শুনে আমার মনে হলো যে, তারা সমস্যার অত্যন্ত চমৎকার সমাধান পেশ করেছিলেন। ভুট্টোর বাড়াবাড়ি তখনও এতটা উৎকট হয়ে প্রকাশিত হয়নি। শেখ সাহেব যদি তাদের প্রস্তাব কবুল করে পশ্চিম-পাকিস্তানে যেতেন, তাহলে জনগণ থেকে এমন সাড়া পেতেন, যা ভুট্টো এবং ইয়াহইয়া খানকে হয়তো প্রভাবিত করতো। এ সৎ সাহস শেখ মুজিবের থাকা উচিত ছিলো।

এ হিম্মত তিনি কোথায় পাবেন? নিজেকে তিনি শুধু 'বাঙালি জাতির' নেতা মনে করেন। সারা পাকিস্তানভিত্তিক রাজনৈতিক মনোভাবই তার ছিলো না। বাঙালি জাতীয়তার দাওয়াত নিয়ে তো পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচ ও পাঠান জনগণের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। ওখানকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মতো কোন চিন্তাধারা যদি শেখ সাহেবের মগযে থাকতো তবেই না তিনি তাদের কাছে যাবার উৎসাহ বোধ করতেন।

তিনি হয়তো এ চিন্তাই করে থাকবেন যে, ভুট্টোর বিরোধী দলগুলোর ডাকে সাড়া দিলে ভুট্টো আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভ প্রদর্শন করতে পারেন। এখানে তিনি মস্তবড় ভুল করেছেন। ভুট্টোর মতো একশ্রেণীর চরম স্বার্থপর নেতা ছাড়া পশ্চিম-পাকিস্তানের জনগণ এটা মোটেও চায়নি যে, পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক। তাই তিনি সেখানে গেলে জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখতে পেতেন।

ভুট্টো ও ইয়াহইয়া পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের ব্যালটের রায়কে বুলেট দ্বারা দমন করার হঠকারী সিদ্ধান্ত না নিলে এবং জনগণের উপর অত্যন্ত অন্যায়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে না দিলে এখানকার জনগণ কিছুতেই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া সমর্থন করতো না। ১৯৭৪ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে যখন ভুট্টো বাংলাদেশে আসলেন তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে বিমান-বন্দর থেকে অতিথি ভবন পর্যন্ত জনগণ যেভাবে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানিয়েছে; এতে শেখ সাহেব যত বিব্রতবোধই করে থাকুন, এতে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা সুস্পষ্ট। তারা ভুট্টোকে এ কথাই জানিয়ে দিলো যে, বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ পোষণ করে না। ঢাকা স্টেডিয়ামে যতবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট খেলার প্রতিযোগিতা হয়েছে, প্রত্যেকবারই বাংলাদেশের দর্শকরা পাকিস্তানকে অত্যন্ত আবেগের সাথে সমর্থন জানিয়ে ভারতের প্রতি তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করেছে। স্টেডিয়ামের এ মনোভাবই ভুট্টোর সম্বর্ধনার মধ্যে দেখা গেছে।

শেখ মুজিবের নিখিল পাকিস্তান রাজনীতি করার অযোগ্যতা ও নির্বাচনের পর ইয়াহইয়া-ভুট্টোর পূর্ব-পাকিস্তানবিরোধী ভূমিকার ফলে রাজনীতিতে সক্রিয় তরুণ ও যুবকদের মনে স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জন্মে। কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানে কোন মহলেই পূর্ব-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামান্য বিদ্বেষও ছিলো না। তাই শেখ মুজিব নির্বাচনের পর পশ্চিম-পাকিস্তানে গেলে বিপুল গণসম্বর্ধনা নিশ্চয়ই পেতেন।

নির্বাচন পরবর্তী পৌনে তিন মাস

ইয়াহইয়া খানের পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের প্রথম দায়িত্ব ছিলো ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা। অর্থাৎ নির্বাচিত সদস্যগণ প্রথমে গণপরিষদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সম্পন্ন হওয়ার পর গণপরিষদের সদস্যগণ পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন বহাল থাকার কথা। শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়ে গেলেই নির্বাচিতদের হাতে সরকারি ক্ষমতা তুলে দেওয়া হবে বলে সবারই জানা ছিলো।

এ সময়সূচি অনুযায়ী নির্বাচনের পরপরই গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা ইয়াহইয়া খানের প্রথম কর্তব্য ছিলো। অধিবেশন বসলে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলসমূহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিনিময়ের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে চিন্তার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা চলতো। কিন্তু এ স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বদলে ইয়াহইয়া খান কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়।

৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো, আর ১১ জানুয়ারি (নির্বাচনের ৩৩ দিন পর) ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে ঢাকায় আসেন। গণপরিষদ বসার আগে প্রাথমিকভাবে মতবিনিময়ের প্রয়োজন হয়ে থাকলে এতো বিলম্বে কেন এলেন? ১৪ জানুয়ারি ঢাকা ত্যাগকালে তিনি শেখ মুজিবকে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করে তাকে আশ্বস্ত করে গেলেন, যাতে তিনি আর বেশি হৈ-চৈ না করেন। কিন্তু দেশবাসী জানতে পারলো না যে, মুজিব-ইয়াহইয়া কি বিষয়ে ২/৩ দিন আলোচনা করলেন। প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করার জন্য ঢাকা আসার কোন প্রয়োজন ছিলো না। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের নেতা হিসেবে এ কথা রাওয়ালপিণ্ডি থেকেই দিতে পারতেন। শাসনতন্ত্র রচনার পূর্বে এ ঘোষণার কোন প্রয়োজন ছিলো না।

যে নেতারা শাসনতন্ত্র রচনায় নেতৃত্ব দেবেন তাদের পারস্পরিক মতবিনিময়ের প্রয়োজন থাকতে পারে। এ বিষয়ে ইয়াহইয়া খানের আসার প্রয়োজন কি? নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দরকষাকষির কোন কারবার ছিলো।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পঞ্চাশ দিন পর ভুট্টো ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় এলেন। এখানেও প্রশ্ন উঠে, এতো বিলম্বে কেন? তাদের তিন দিনব্যাপী আলোচনার বিষয় ও ফলাফল দেশবাসী জানতে পারলো না। সফল যে হয়নি তা বুঝা গেলো।

শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব গণপরিষদের; ইয়াহইয়া খানের নয়। তাঁর দায়িত্ব গণপরিষদে অধিবেশন আহ্বান করা। নেতাদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করাও তাঁর জন্য দূষণীয় হতো না, যদি নির্বাচনের পরপরই তিনি তা করতেন। কিন্তু তিনি বার বার ভুট্টোর সাথে এতো সাক্ষাৎ কেন করলেন? ১৪ জানুয়ারি ঢাকা থেকে ফিরে গিয়ে তিনি ১৭ জানুয়ারি লারকানায় যেয়ে ভুট্টোর মফস্বলের বাড়িতে সাক্ষাৎ করলেন। এর আগে ২৮ ডিসেম্বর করাচীতে এবং পরে ১৯ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে ভুট্টোর সাথে সাক্ষাৎ করে সমস্যার কোন সমাধান বের করলেন, না সমস্যা বাড়ালেন?

ইয়াহইয়া খানের ভূমিকা আগাগোড়াই ভয়ানক আপত্তিকর। নির্বাচনের পূর্বে শেখ মুজিবের ৬ দফা LFO-এর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও ৬ দফার পক্ষে জনগণের ম্যাণ্ডেট নেবার সুযোগ দিলেন কেন? সুযোগ দিয়ে ম্যাণ্ডেট নেবার ব্যবস্থা করার পর তা মেনে নিলেন না কেন? নির্বাচনের পর গণপরিষদ আহ্বানে বিলম্ব করলেন কেন? শেখ মুজিবের সাথে ও ভুট্টোর সাথে আলাদা আলাদা বৈঠকের উদ্দেশ্য কি তাদের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কোন নেক নিয়ত ছিলো? নির্বাচনের পৌনে তিন মাস পরও গণপরিষদ না ডেকে শেখ মুজিবের সাথে ২৬ ফেব্রুয়ারি আবার কেন সাক্ষাৎ করলেন?

ভুট্টোর ভূমিকা সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ছিলো। গণতন্ত্রের সর্বনিম্ন মানও তিনি রক্ষা করেননি। বিশেষভাবে ৭১ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি করাচীতে এক কর্মী সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানে ক্ষমতার তিনটি খুঁটি রয়েছে– আওয়ামী লীগ, পিপলস পার্টি ও সেনাবাহিনী। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীকেও এভাবে জড়িত করার উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারে না। গণতন্ত্রে জনগণের নির্বাচিত সরকারের অধীনে সেনাবাহিনী সরকারি কর্মচারী মাত্র। এ দ্বারা তাঁর মনের এ গোপন কথাও বের হয়ে গেলো যে, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তিনি ও সেনাপ্রধান ঐক্যবদ্ধ আছেন।

১০৬.

জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নির্বাচনোত্তর প্রথম বৈঠক

১৯৭১-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার নিয়মিত বার্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনের পর এটাই শূরার প্রথম বৈঠক। সারা পাকিস্তানে জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে এটাই প্রথম নির্বাচন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হওয়ার ২৪ বছর পর সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। এর আগে প্রাদেশিক পর্যায়ে পশ্চিমে ১৯৫০ সালে এবং পূর্বে ১৯৫৪ সালে নির্বাচন হয়। ঐ নির্বাচনে জামায়াত পশ্চিম-পাকিস্তানে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে; কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানে করেনি।

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার বৈঠকে প্রথমেই নির্বাচনের পর্যালোচনামূলক আলোচনা হয়। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্যে মন্তব্য প্রকাশ করলাম, "নির্বাচনী ফলাফল থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, রাজনৈতিক দিক দিয়ে পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। মুসলিম জাতীয়তার যে ভিত্তিতে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন দুটো ভূখণ্ড মিলে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিলো, পাকিস্তানি শাসকরা ঐ ভিত্তিটিই ধ্বংস করে দিয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানে এখন বাঙালি জাতীয়তা ঐ শূন্যস্থান দখল করেছে। আমি নিশ্চিত যে, নির্বাচনের ফলে উভয় অঞ্চলে নতুন যে নেতৃত্ব জেগে উঠেছে তারা দু'অঞ্চলকে একই রাষ্ট্রের অর্ন্তভুক্ত থাকতে দেবে না অথবা রাখতে পারবে না।"

আমার বক্তব্য শেষ হবার আগেই মাওলানা মওদূদী সভাপতির আসন থেকে মন্তব্য করলেন, "পশ্চিম-পাকিস্তানও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিভক্ত হয়ে গেলো। পাঞ্জাব ও সিন্ধু একদিকে, আর সীমান্ত ও বেলুচিস্তান আর একদিকে।" এ কথা বলে মাওলানা থামলে আমি বললাম, "পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ ভৌগোলিক দিক দিয়ে একসাথে থাকায় তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া মোটেই সহজ নয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়াকে রোধ করা অসম্ভব মনে হচ্ছে।"

মাওলানা প্রশ্ন করলেন, "এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর করণীয় কিছু আছে কিনা?"

জওয়াবে আমি বললাম, "যদি জাতীয় সংসদে জামায়াতের অন্তত ১০ সদস্যের একটি পার্লামেন্টারি পার্টি গঠন করা সম্ভব হতো তাহলে বিচ্ছিন্নতা রোধ করার উদ্দেশ্যে কোন ভূমিকা পালনের সুযোগ পাওয়া যেতো। এ পরিস্থিতিতে মজলিসে শূরার নিকট আমার পরামর্শ এই যে, যদি রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাবার কার্যক্রম শুরু করে তাহলে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করার প্রয়োজন নেই। জামায়াতের আসল যে উদ্দেশ্য, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও সে উদ্দেশ্যে যা করণীয় তা করতে পারবে।"

আমি আরও অগ্রসর হয়ে বললাম, "পূর্ব-পাকিস্তান পশ্চিমের সাথে যুক্ত থাকবে না পৃথক হবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হলে এর পূর্ণ এখতিয়ার জামায়াতের পূর্ব-পাকিস্তান শাখাকে দেওয়া হোক। এ বিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তান শাখা সর্বসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্ত নিতে চায় তা কেন্দ্রীয় জামায়াত যেন অনুমোদন করে। ওখানকার সার্বিক পরিস্থিতি বাইরে থেকে উপলব্ধি করা অসম্ভব।"

আমার এ গুরুতর প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত প্রকাশের জন্য মজলিসে শূরার সদস্যদের মধ্যে কয়েকজন মাওলানার অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে এ প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সম্ভাব্য যুক্তিগুলো পর্যালোচনা করে খুবই ধীরস্থিরভাবে আলোচনা হল। আমার আলোচনায় স্বাভাবিকভাবে কিছুটা আবেগ প্রকাশ পেলেও তাঁরা কেউ আবেগতাড়িত হননি। তাঁরা আমার আন্তরিকতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন।

সর্বশেষে মাওলানা বললেন, "শেখ মুজিব তো এখনো স্বাধীনতা দাবি করেননি, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়েই তিনি ৬ দফা পেশ করেছেন। জামায়াতের পূর্ব-পাকিস্তান শাখার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হয়েছে। মজলিসে শূরার সদস্যগণ একমত হলে আমরা ঐ বিষয়ে শুধু স্বায়ত্তশাসন নয়; পূর্ণ স্বাধীনতাই দিতে পারি।" মাওলানার এ কথার পর এক বাক্যে সবাই সমর্থন জানালেন।

৩ মার্চ ঢাকায় আহূত গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বানের প্রতিক্রিয়া

অনেক বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত '৭১-এর ৩ মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের অধিবেশন বসবার ঘোষণায় ঢাকার রাজনৈতিক অঙ্গনে কিছুটা স্বস্তির ভাব লক্ষ্য করা গেলো। কিন্তু ভুট্টো ভয়ানক চেঁচামেচি শুরু করলেন।

নির্বাচনের পর থেকে ভুট্টো যতবার আপত্তিকর বক্তব্য দিয়েছেন এর প্রতিটির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আমি বিবৃতি দিয়েছি। সব পত্রিকায়ই এ সব বিবৃতি প্রকাশিত হয়।

ভুট্টোর আপত্তি সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের ১৩ ফেব্রুয়ারির সরকারি ঘোষণায় ৩ মার্চ ঢাকায় গণপরিষদের কর্মসূচি বহাল রাখা হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৫ ফেব্রুয়ারি ভুট্টো ঘোষণা করেন, "সংখ্যাগুরু দল আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে বা গোপনে আমাদেরকে কিছুটা কনসেশনের প্রতিশ্রুতি না দেওয়া পর্যন্ত পিপলস পার্টি ঢাকায় ৩ মার্চ আহূত অধিবেশনে যোগ দেবে না। আওয়ামী লীগের রচিত সংবিধানে সম্মতি দেবার জন্য আমার পার্টির ঢাকা যাওয়া ও অপমানিত হয়ে ফিরে আসা সম্ভব নয়।"

ভুট্টো আবারো বলেন, "যেহেতু আওয়ামী লীগ সংখ্যাগুরু, সেহেতু সে পার্টির সংসদে যোগদান অর্থহীন। সেখানে আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে রচিত সংবিধান অনুমোদন করা ছাড়া আর কোন বিকল্প থাকবে না। অতএব ঢাকার এ অধিবেশন কসাইখানা ছাড়া আর কিছুই নয়।"

২৮ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভুট্টো ৩ মার্চ ঢাকায় আহূত গণপরিষদ বৈঠক মুলতবি করার দাবি জানান। পরদিন ১ মার্চ বেতার ভাষণে ইয়াহইয়া খান ভুট্টোর দাবি মেনে নিয়ে বৈঠক মুলতবি করে দেন। এ ব্যাপারে মেজরিটি পার্টির নেতা শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তাও বোধ করা হয়নি। পরবর্তী কোন তারিখ ঘোষণা করাও জরুরি বিবেচনা করা হলো না।

ঢাকা অধিবেশন মুলতবি করার প্রতিক্রিয়া

গণপরিষদের যে অধিবেশন নির্বাচনের পর অনতিবিলম্বে আহ্বান করা কর্তব্য ছিলো তা পৌনে তিন মাস পর যা-ই-বা ডাকা হলো তা ভুট্টোর দাবিতে একতরফাভাবে মুলতবি করা হলে আওয়ামী লীগের কেমন প্রতিক্রিয়া হতে পারে এ বিষয়ে ইয়াহইয়া খানের কোন ধারণা ছিলো কিনা কে জানে? সামরিক মগজে কি শুধু শক্তির দাপটই থাকে? রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝবার কোন যোগ্যতাই কি থাকে না?

১ মার্চ দুপুর একটায় রেডিওতে অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবি ঘোষণার

সাথে সাথে ঢাকাবাসী স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাকা স্টেডিয়ামের ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ বর্জন করে দর্শকরা মিছিলে যোগদান করে। হাইকোর্ট বার এবং জেলা বার এসোসিয়েশন প্রতিবাদ মিছিল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে। ছাত্ররা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে রাজপথে বের হয়ে আসে। সিনেমা হলসমূহ বন্ধ হয়ে যায় এবং দর্শকরা মিছিলের আকারে বের হয়। শিল্প এলাকা থেকে শ্রমিকরা দলে দলে মিছিলসহকারে ঢাকা শহরমুখী হয়।

ঐ সময় হোটেল পূর্বাণীতে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ পার্লামেন্টারি পার্টির সভা চলছিলো। সকল বিক্ষোভ মিছিলের স্রোত হোটেল পূর্বাণীর দিকে যেতে থাকে। মিছিলকারীদের একই শ্লোগান ছিলো, "পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর, বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা কর।"

বিদ্রোহী জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণে শেখ মুজিব ইয়াহইয়া খানের ঘোষণার প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেন।

১ মার্চ সারাদিন মিছিলে মিছিলে ঢাকা শহর প্রকম্পিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি সকল অফিস থেকে কর্মচারীরা বের হয়ে আসে। দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যায়। এসব মিছিল পল্টন ময়দানে সমবেত হলে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের পক্ষ থেকে গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় এবং পরদিন ২ মার্চ হরতাল সফল করার জন্য কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

ঢাকায় ২ মার্চের হরতাল

১ মার্চ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা শুনবার সাথে সাথে সর্বমহলে যে তীব্র ও স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে অনুমান করা যায় যে, ২ মার্চ ঢাকার হরতাল কতোটা সর্বাত্মক ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো। এর বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

ঐ দিনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা হলো, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্র সমাবেশে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি (ভিপি) আ.স.ম আবদুর রব সর্বপ্রথম বাংলাদেশের স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। সবুজ জমীনে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত এ পতাকাটিই পরবর্তীকালে মানচিত্র বাদ দিয়ে রাষ্ট্রীয় পতাকার মর্যাদা পায়।

এ পতাকাটি সম্পর্কে জনাব মিজানুর রাহমান চৌধুরী রচিত 'রাজনীতির তিনকাল' নামক পুস্তকে ৩ মার্চ পল্টন ময়দানের ছাত্র-জনতার সমাবেশ সম্পর্কে লেখেন, "ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভায় ছাত্রলীগ নেতা শিব নারায়ণ দাস অঙ্কিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকা (মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলার পতাকা যা ঈষৎ সংশোধিত হয়ে বর্তমানে দেশের পতাকা) প্রদর্শিত হয়। এ জনসভায় তৎকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করেন। এর

আগের দিন ২ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ডাকসুর তৎকালীন সহ-সভাপতি আ.স.ম আব্দুর রব সর্বপ্রথম স্বাধীনতার এই পতাকা উত্তোলন করেন।"

ঐ দিনই (২ মার্চ) শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে সামরিক আইন প্রত্যাহার করার দাবি জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, ৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে বিকেল ২টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালন করা হবে এবং ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঘোষণা করবেন।

৩ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল

পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার উদ্দেশ্যে ইয়াহইয়া খান একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেন। ইয়াহইয়া খানের সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানের দায়িত্বে লে. জেনারেল সাহেবযাদা মুঃ ইয়াকুব খান ছিলেন এবং বেসামরিক প্রশাসনের দায়িত্বে ভাইস এডমিরেল এসএম আহসান গভর্নর ছিলেন।

১ মার্চ এক আদেশবলে ইয়াহইয়া খান সাহেবযাদা ইয়াকুব খানকে একই সাথে সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নরের দায়িত্ব দিয়ে গভর্নর আহসানকে অব্যাহতি দেন। এভাবে এতদিনের দ্বৈত-শাসনের বদলে একক সামরিক শাসন চালু করেন। ১ মার্চই সামরিক কর্তৃপক্ষ পৌরসভা এলাকায় রাত ৮টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত এবং ৩ মার্চ থেকে সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করেন।

বিদ্রোহী জনতা কারফিউ অমান্য করেই মিছিল এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে গুলীতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী ২ ও ৩ তারিখে নিহত হয়। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ ৩ মার্চেই কারফিউ প্রত্যাহার করার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়।

৩ মার্চ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে এমন সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়, যার ফলে ইয়াহইয়া খান ঐ দিনই জাতীয় সংসদে নির্বাচিত দলসমূহের নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। যে বৈঠক ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহেই ডাকা উচিত ছিলো তা মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে ডাকা হলো। শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাব নাচক করে দেন। ইয়াহইয়া খানের সামান্য রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান থাকলে বুঝতে পারতেন যে, এ জাতীয় বৈঠক ডাকার সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে।

৩ মার্চ বিকালে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পল্টন ময়দানের বিশাল জনসমাবেশে শেখ মুজিব অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত কর ও খাজনা দান বন্ধ ঘোষণা করেন। তিনি সেখানে তিনটি দাবি উত্থাপন করেন ঃ

১. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
২. সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।
৩. জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

পূর্ব-পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে

৪ মার্চে দেখা গেলো, সামরিক আইন পঙ্গু হয়ে আছে। বেসামরিক সরকার ইয়াহইয়ার নিয়ন্ত্রণের বাইরে শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে চলছে। অর্থাৎ সরকার সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। ৪ মার্চ শেখ মুজিব নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করেন ঃ

১. কর্মচারীদের বেতন পরিশোধের জন্য সরকারি ও বেসরকারি অফিস বিকাল আড়াইটা থেকে দু'ঘন্টা খোলা থাকবে।

২. পনেরশ' টাকার অনূর্ধ্বে চেক পরিশোধের জন্য ব্যাংকসমূহও ঐ দু'ঘন্টা খোলা থাকবে।

৩. স্টেট ব্যাংক কর্তৃক অথবা অন্য কোন প্রকারে বাংলাদেশের বাইরে কোন টাকা পাঠানো যাবে না।

শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সচিবালয় স্থবির হয়ে যায়। সচিবগণ শেখ মুজিবের নির্দেশ পালন করতে থাকেন। বিশেষ প্রয়োজনে সচিবগণ শেখ সাহেবের বাড়িতে নির্দেশ নিতে আসেন।

রাজধানী ঢাকাসহ পূর্ব-পাকিস্তানের সর্বত্র মিছিল ও বিক্ষোভ চলতে থাকে। শ্লোগানে শ্লোগানে রাজপথ মুখরিত। শ্লোগান ছিলো 'জয় বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তোমার দেশ আমার দেশ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'পিণ্ডি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব', বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর', 'ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন কর' ইত্যাদি।

এভাবেই ইয়াহইয়া-ভুট্টো চক্র পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়। এ পরিস্থিতিতেই ইয়াহইয়া খান ৬ মার্চের বেতার ভাষণে মুলতবি গণপরিষদ অধিবেশন ২৫ মার্চ আহ্বান করেন। প্রশ্ন হলো, যে কারণে ৩ মার্চের বৈঠক মুলতবি করা হয়েছিলো সে কারণ কি দূর হয়েছে? তা না হয়ে থাকলে লোক দেখানো এ ঘোষণা অর্থহীন।

৭ মার্চ রেসকোর্সে শেখ মুজিব

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক মহাসমাবেশ হয়। মঞ্চে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ানো হয়। ঐ পরিস্থিতি ও পরিবেশে উক্ত সমাবেশে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ সকল মহলের লোকই বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত হয়। শেখ সাহেব সেই জনসমুদ্রে ২৫ মার্চ আহূত গণপরিষদ অধিবেশনে যোগদান প্রসঙ্গে এমন চারটি শর্ত আরোপ করেন, যা পূরণ না হবারই কথা। অর্থাৎ শেখ মুজিব এ বৈঠকে যোগদান না করার পরোক্ষ ঘোষণা দিলেন। শর্ত ৪টি নিম্নরূপ ঃ

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

২. সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে।

৩. এ পর্যন্তকার হত্যার তদন্ত করতে হবে।

৪. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

এ সমাবেশেই শেখ মুজিবের প্রখ্যাত ভাষণের শেষ উচ্চারণ ছিলো, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান।"

সমাবেশে তিনি পরবর্তী কোন কর্মসূচি ঘোষণা করেননি। তবে ঐ দিনই এক বিবৃতিতে পরবর্তী এক সপ্তাহের এক দীর্ঘ কর্মসূচি নির্দেশ করেন, যার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১. খাজনা ও কর দেওয়া বন্ধ থাকবে।

২. সচিবালয়, সরকারি ও বেসরকারি অফিস, হাইকোর্ট ও সকল আদালত হরতাল পালন করবে।

৩. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

৪. স্টেট ব্যাংক বা অন্য কোন উপায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠানো বন্ধ থাকবে।

৫. প্রতিদিন সকল ভবনে কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।

বলাবাহুল্য, পূর্ব-পাকিস্তানে ইয়াহইয়া খানের শাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। বেসরকারিভাবে শেখ মুজিবের শাসনই চলতে থাকে। সঙ্কটের এ পর্যায়ে ৯ মার্চ শেখ মুজিবকে ইয়াহইয়া খান জানান যে, তিনি ১৫ মার্চ ঢাকা আসছেন।

সামরিক শাসনকর্তা ও গভর্নর পরিবর্তন

লে. জেনারেল সাহেবযাদা মুহাম্মদ ইয়াকুব খানের মতো 'ভদ্রলোক' দিয়ে বিদ্রোহ দমন সম্ভব নয় বলে ইয়াহইয়া খান একজন কঠোরমনা যুদ্ধ-বিশারদ জেনারেলকে পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ও গভর্নর নিয়োগ করলেন। তিনি জেনারেল টিক্কা খান। ঘটনাক্রমে শেখ মুজিবের রেসকোর্স ময়দানের ভাষণের পরপরই এ নিয়োগের খবর জানা যায়।

নিয়ম অনুযায়ী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি গভর্নরের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। ঐ সময় শেখ মুজিবের নির্দেশে হাইকোর্টও হরতাল পালন করেছিলো। তাই প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী গভর্নরকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করেন। ফলে ইয়াকুব খানই গভর্নর হিসেবে বহাল থাকেন, যদিও তিনি অচল গভর্নর হয়েই দিন কাটাচ্ছিলেন। কারণ তখন শাসন চলছে শেখ মুজিবের।

জামায়াতে ইসলামীর দাবি

ঐ পরিস্থিতিতে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কোন রকম ভূমিকা পালনের সুযোগ ছিলো না। অন্য কোন দলের নেতার বিবৃতিও কোন গুরুত্ব বহন করতো না। অবশ্য কর্তব্য মনে করে ভুট্টোর অগণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় সংহতি বিরোধী প্রতিটি বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করে বিবৃতি দিয়েছি।

কিন্তু ৭ মার্চের পরদিন জামায়াতের পক্ষ থেকে ইয়াহইয়া খানের নিকট সঙ্কট নিরসনের একমাত্র উপায় হিসেবে একটি দাবি জানানো প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। দাবিটির সারকথা ছিলো, "ইয়াহইয়া খান! আপনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে চরম

ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। জনপ্রতিনিধিগণকে শাসনতন্ত্র রচনার সুযোগ না দিয়ে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। ভুট্টোর সাথে আঁতাত করে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছেন। বর্তমানে আপনার শাসন সম্পূর্ণ অচল। রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধানের সামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিতেও আপনি অক্ষম হয়েছেন। আমরা আপনাকে পদত্যাগ করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জোর দাবি জানাচ্ছি। সামরিক শাসনের অবসানের পর গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণের সহযোগিতায় দেশ পরিচালনা করতে দিন। শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব জনগণ তাদের হাতেই তুলে দিয়েছে। পাকিস্তানের অস্তিত্বের স্বার্থে আপনি অবিলম্বে ক্ষমতা ত্যাগ করুন।"

তখনো আইনগতভাবে সামরিক শাসন চালু থাকায় পত্রিকায় জামায়াতের বক্তব্য এমন কঠোর ভাষায় প্রকাশিত হতে পারেনি। তবে আমাদের সান্ত্বনা যে, আমরা দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি।

পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪০ জন জাতীয় সংসদ সদস্য

জাতীয় সংসদে ভুট্টোর দলের বাইরে ৭টি রাজনৈতিক দল ও উপজাতীর ৫০ জন সদস্য নির্বাচিত হন। ৩ মার্চের গণপরিষদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণার আগেই তাদের মধ্যে ৪০ জন ঢাকায় পৌছেন। ভুট্টোর হুমকিকে অগ্রাহ্য করে তারা প্রমাণ করেন যে, তারা ভুট্টোর ভয়ে ভীত নন।

তারাও ৩ মার্চের অধিবেশন মুলতবি করার প্রতিবাদ জানান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। তারা এ কথাও ঘোষণা করেন যে, ভুট্টো পশ্চিম-পাকিস্তানের একক নেতা নন।

প্রকৃতপক্ষে ইয়াহইয়া খানের সৃষ্ট রাজনৈতিক সঙ্কটের আর কোন রাজনৈতিক সমাধানই অবশিষ্ট ছিলো না। সামরিক সমাধান মগজে থাকলে রাজনৈতিক সমাধান তালাশ করা প্রয়োজন মনে করা হয় না।

১০৭.

ইয়াহইয়া-মুজিব ঐতিহাসিক সংলাপ

১৯৭১-এর ১৫ মার্চ ইয়াহইয়া খান ঢাকা আসেন। পূর্ব-পাকিস্তানে যে তখন তাঁর শাসন কায়েম নেই সে কথা নিশ্চয়ই তিনি টের পেয়েছেন। সামরিক শাসন তখন অচল, আর বেসামরিক শাসন শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে। এ পরিবেশে ইয়াহইয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে আলোচনা চলে।

এ সংলাপে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দুটো টিম গঠন করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দীন ও ড. কামাল হোসেন প্রথম টিমের সদস্য ছিলেন। এ তিনজন আলোচনার সময় উপস্থিত থাকতেন। শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সৈয়দ নজরুল ইসলামই স্পোকস্‌ম্যান (আলোচক) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

দ্বিতীয় টিমের সদস্য ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও আবদুস সামাদ। দ্বিতীয় টিম প্রথম টিমকে প্রয়োজনবোধে পরামর্শ দিতেন।

১৬ মার্চ আড়াই ঘণ্টা আলোচনা চলে। ঘোষণা করা হয় যে, আলোচনা সফলতার দিকে এগুচ্ছে। এ সংলাপের সাফল্যের উপর গোটা পাকিস্তানের সংহতি, শান্তি ও অগ্রগতি নির্ভর করে বলে সকল স্তরের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ ছিলো। এর সাফল্য সকলেরই কাম্য ছিলো। যাদের সিদ্ধান্তের উপর সাফল্য নির্ভর করে তাঁরা এ বিষয়ে কতটা আন্তরিক ছিলেন তা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়।

আলোচনা ১৭ মার্চ এক ঘণ্টা, ১৯ মার্চ দেড় ঘণ্টা, ২০ মার্চ দু'ঘণ্টা দশ মিনিট এবং ২১ মার্চ দেড় ঘণ্টা চলে। কোন পক্ষই স্পষ্ট করে জানাচ্ছে না যে, সাফল্যের দিকে কতটুকু এগিয়েছে। ১৯ তারিখ শুধু জানা গেলো যে, কোন অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়নি।

ইয়াহইয়া খানের আমন্ত্রণে জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৫ সদস্যবিশিষ্ট টিম নিয়ে ২১ মার্চ ঢাকা আসলেন। ২১ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহইয়া-ভুট্টোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপাক্ষিক কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ২২ মার্চ এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ২৫ মার্চ আহূত অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য যে, ইয়াহইয়ার মতো অবিবেচক রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে দেশের কিসমতের ফায়সালার দায়িত্ব পড়লো। দেশ ও জাতির কল্যাণের প্রতি আন্তরিকতা থাকলে নির্বাচনের পর পরই এ ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ব্যবস্থা করা হতো। রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হবার আগেই এ বৈঠক হলে হয়তো সংলাপ সহজেই সফল হতো।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবস। সেদিন সারা পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন হবার তারিখ। এর আগেই সংলাপ সফল হওয়া অত্যাবশ্যক। এ কথা ইয়াহইয়ার মগজে ছিলো কিনা কে জানে? সংলাপের সাফল্যের কোন সম্ভাবনা আছে কিনা তাও বুঝবার উপায় ছিলো না। তাই ২৩ মার্চ ছাত্ররা সর্বত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ায়। গভর্নর হাউজ ও প্রেসিডেন্ট হাউজ ছাড়া কোন সরকারি ভবনেও পাকিস্তানের চাঁদ-তারা খচিত পতাকা উড়াতে দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ঢাকায় উপস্থিত থেকে দেখলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানীতে পাকিস্তানের পতাকার বদলে ভিন্ন পতাকা উড়ছে।

এ অবস্থা দেখার পর ইয়াহইয়া খানের টনক নড়া উচিত ছিলো এবং শেখ মুজিবের ৬ দফা মেনে নিয়ে সমঝোতা করার জন্য ভুট্টোকে চাপ দেওয়া আবশ্যক ছিলো। ৬ দফায় পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে গেলেও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা তো বহাল থাকতো। পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে রক্ষা করার এটাই একমাত্র পথ ছিলো। অবশ্য এ পথে আসতে ভুট্টো রাজি হতে পারেন না। কারণ তিনি ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু বুঝেন না। তাকে ক্ষমতায় যেতেই হবে। এর জন্য পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা তাঁর জন্য অপরিহার্য। তাই তার পক্ষে শেখ মুজিবের সাথে আপস করা অসম্ভব।

সংলাপের খবর সংগ্রহ

সংলাপের আসল খবর জানার জন্য আমি অস্থির ছিলাম। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সংলাপের স্পোকসম্যান সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঢাকায় এলে আমাদের মগবাজারস্থ মহল্লায়ই উঠতেন। তাঁর বড় সম্বন্ধী ইঞ্জিনিয়ার জামান সাহেব তাঁর একমাত্র ভগ্নীপতি সৈয়দ নজরুলকে হোটেলে থাকতে দিতেন না। ৭ ভাই-এর মাত্র এক বোন ছিলেন নজরুল সাহেবের স্ত্রী।

১৯৪৮ সালে যখন মগবাজারে আমরা জমি কিনি তখন একই মালিকের জমি আমরা ৮ শরীক মিলে কিনলাম। ইঞ্জিনিয়ার জামান সাহেবও এক শরীক ছিলেন। আমাদের বাড়ির তিন বাড়ি পরেই তাঁর বাড়ি।

তাছাড়া সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছাত্রজীবন থেকেই আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত। আমি যখন ফজলুল হক মুসলিম হল ইউনিয়নের জিএস তখন তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি। তমদ্দুন মজলিসের সাথে তিনি সম্পৃক্ত থাকায় সম্পর্কটার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ময়মনসিংহ বারের তিনি উকিল থাকাকালে বার মিলনায়তনে আমি জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত সুধী সমাবেশে একাধিকবার তাঁকে পেয়েছি। তিনি জামায়াতের বই-পুস্তক পড়তেন এবং আমাকে বলতেন, "আযম ভাই! নতুন বই বের হলে আমি যেন পাই।"

তাঁর সাথে আমার এ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সুবাদে ১৯ মার্চ রাত সাড়ে এগারোটায় জামান সাহেবের বাড়িতে তাঁর খোঁজে গিয়ে পেলাম। সামান্য আগেই তিনি সংলাপ থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি জানালেন, "এখনও আলোচনা প্রাথমিক পর্যায়েই চলছে। তারা মনে করে ৬ দফা কায়েম হলে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিপন্ন হবে। আমরা জোর দিয়ে বলেছি আওয়ামী লীগের টপ লিডাররা সবাই পাকিস্তান আন্দোলনের সংগ্রামী যুবনেতা ছিলেন। পাকিস্তান ভেঙে যাক এটা তারা চাইতেই পারেন না। নির্বাচনের ফলাফলকে আপনারা মেনে নিচ্ছেন না বলেই সমস্যা ও সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের ম্যান্ডেট মেনে না নিলে কেমন করে চলবে?"

তিনি আরও বললেন, "আমরা পাকিস্তান কায়েম করেছি। ইয়াহইয়া খানরা তখন ইংরেজদের গোলামি করেছেন। আজ তারা সন্দেহ করেন আমাদের উপর যে, আমাদের হাতে পাকিস্তান নিরাপদ কিনা। আমরা তাদেরকে শক্ত ভাষায় বলে দিয়েছি যে, পাকিস্তানে আমরা মেজরিটি। মাইনরিটি যারা তারাই আলাদা হতে চাইতে পারে। আমরা কেন আলাদা হবো? আমরা শুধু আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে চাই।"

আমি বললাম, "আমি রোজই আপনার কাছ থেকে খোঁজ-খবর নেবো। আমার অনুরোধ, যে কোন অবস্থায়ই আপনারা সংলাপ ব্যর্থ হতে দেবেন না। কিছু ছাড় দিয়ে হলেও আপনারা কেন্দ্রীয় সরকার হস্তগত করুন, যাতে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকার আদায় করতে পারেন। ভুট্টো ক্ষমতার পাগল। ক্ষমতার জন্য তিনি পাকিস্তান ভেঙে দিতেও পরওয়া করবেন না।"

সংলাপের শেষ পর্যায়

২০ মার্চ সংলাপের অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে গভীর রাতেও নজরুল সাহেবকে পেলাম না। সকালে জানলাম, ভোরেই তিনি বের হয়ে গেছেন। ২১ তারিখের আলোচনায় ভুট্টো শরীক হওয়ায় খবর জানার জন্য আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেলো। কিন্তু ২২ ও ২৩ তারিখেও তার নাগাল পেলাম না। জানা গেলো, রাতে ফিরে আসার সময়ের কোন ঠিক নেই। যখনই আসুন খুব ভোরে উঠেই চলে যান।

আমার অস্থিরতার অন্ত নেই। গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতার চেয়েও এ সংলাপের ব্যর্থতার পরিণাম অনেক বেশি ভয়ানক হবে বলে আমার আশঙ্কা ছিলো বলেই এ অস্থিরতা।

২২ মার্চ শেখ মুজিব, ইয়াহইয়া ও ভুট্টোর মধ্যে আলোচনায় ভুট্টো সন্তোষ প্রকাশ করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দেখছেন বলে পরদিন পত্রিকায় দেখা গেলো। ২৪ তারিখে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, নজরুল সাহেব যত রাতেই ফিরে আসুন তার সাথে যেমন করেই হোক দেখা করবোই। তাকে দু'কলম লিখে দারোয়ানের হাতে দিয়ে বললাম, তিনি আসামাত্রই যেন তাঁর হাতে দেয়। ওদিকে আমি লোক লাগিয়ে রাখলাম যাতে আসার সাথে সাথেই আমাকে খবর দেয়। আমি সাধারণত এগারোটার মধ্যেই শুয়ে পড়ি। সে রাতে জেগে থাকার ফায়সালা করলাম। রাত সাড়ে বারোটায় ফিরেছেন বলে জানার সাথে সাথেই দৌড়ালাম।

বিনয় প্রকাশ করে বললাম, "এতো রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য লজ্জিত। হয়তো এখন খাবেন।" আমার হাত ধরে আশ্বস্ত করে বললেন, "আমি খেয়ে এসেছি। এতো রাতে ফিরি বলে খেয়েই আসি। আমি জানি আপনি কতটা উদ্বিগ্ন।" আমার কোন কথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলো না। তিনি বললেন, "আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি, যাতে সংলাপ সফল হয়। ভুট্টো এক আজব চিজ। তার কথাকে ইয়াহইয়া এতটা গুরুত্ব না দিলে সমঝোতায় পৌঁছা সহজ ছিলো। আলোচনা আজ শেষ হয়ে গেলো, বল এখন ইয়াহইয়ার কোর্টে। আমরা তার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছি।"

জানতে চাইলাম, শেষ কথা কি হলো। বললেন, "৩রা মার্চে আহূত গণপরিষদের অধিবেশনে পেশ করার জন্য আমরা শাসনতন্ত্রের যে খসড়া প্রণয়ন করেছিলাম তা তাদেরকে দেখালাম। ৬ দফার লেটার ঠিক রেখে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে এর স্পিরিট ক্ষুণ্ন করে হলেও আমরা অনেক ছাড় দিয়েছি, যাতে তাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। পাকিস্তানের ঐক্য বহাল রাখার উদ্দেশ্যে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছি। আমরা কি এটুকুও বুঝি না যে, আলাদা হলে আমাদের ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি হবে? একত্র না থাকলে আমাদের অধিকার ফিরে পাবো কেমন করে? শেখ সাহেব এ ব্যাপারে খুবই সজাগ। তিনি মনে করেন যে, আলাদা হতে চাইলেই আমরা ভারতের খপ্পরে পড়বো। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের হাতে পাওয়ার জন্য যতটুকু কনসেশন দেওয়া সম্ভব আমরা দিয়েছি।"

উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করলাম, "নজরুল ভাই! আপনি কি আশাবাদী যে ইয়াহইয়া খান মেনে নেবেন?" জওয়াবে বললেন, "আশা-নিরাশার মাঝেই আছি।" আমার চলে আসার জন্য উঠবার ভাব দেখে আমার হাত ধরে কিঞ্চিৎ আবেগের সুরে বললেন, "আযম ভাই! আপনি বহু পুরানো বন্ধু। আমি যদি 'অউথ-বাউন্ড' (গোপনীয়তা রক্ষায় ওয়াদাবদ্ধ) না হতাম তাহলে আমাদের প্রণীত শাসনতন্ত্রের খসড়া এখনি আপনাকে দেখাতাম। দেখলে আপনি সন্তুষ্ট হতেন। এতো রাতে ক্লান্তশ্রান্ত অবস্থায় আমাকে এতোটা সময় দেবার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম। উঠবার আগে আমি বললাম, "নজরুল ভাই! আগামীকালের মধ্যে শেখ সাহেবের সাথে আমাকে কয়েক মিনিটের জন্য সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারেন কিনা? সংলাপ সফল করার ব্যাপারে আমি তার সাথে কিছু কথা বলতে চাই।" তিনি বললেন, খুব কঠিন, তবু চেষ্টা করবো।

চিন্তিত মনে ফিরে আসতে আসতে মনে হলো যে, তিনি চেষ্টা করবেন বললেন বটে, কিন্তু এমন আশা করা আমার ঠিক নয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি আমাকে সাক্ষাৎ দেবেন।

অবস্থা জানার আরও চেষ্টা

২৫ মার্চ সকালে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠ হিসেবে সামাদ সাহেবকে ফোন করে ১০টায় তার বাসায় যাবার অনুমতি নিলাম। তিনি তখন সাইন্সলেবরেটরির পাশেই এক বাসায় থাকতেন। যথাসময় হাজির হলাম। বিনা ভূমিকায় সংলাপের ফলাফল জানতে চাইলাম। জানার জন্য উদ্বেগও প্রকাশ করলাম। গত রাতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম যা বললেন, সামাদ সাহেবের বক্তব্যের মর্ম একই। তাঁর শেষ কথা, "আমাদের পক্ষে যা করা সম্ভব ছিলো তা করেছি। আমরা পাকিস্তান ভাঙার দায়িত্ব নিতে চাই না। এখন তারা কী করে দেখুন।"

উদ্বিগ্নতা ও হতাশার সুরে জিজ্ঞেস করলাম, "যদি সংলাপ ব্যর্থ হয় তাহলে এর পরিণাম কী হতে পারে।" তিনি জওয়াবে বললেন, "পূর্ব-পাকিস্তানের প্রশাসন ইয়াহইয়ার হাতে নেই। দেখা যাক বঙ্গবন্ধু কী সিদ্ধান্ত নেন।"

আমি সামাদ সাহেবকে মোটেই উদ্বিগ্ন দেখলাম না। এ দিনগত রাতেই এমন ভয়ানক পরিণতি হতে পারে বলে কোন ধারণা তাঁর ছিলো বলে একটুও মনে হয়নি। আমিও ধারণা করতে পারছিলাম না যে, কী হতে যাচ্ছে। তবে আমি খুবই পেরেশান ছিলাম। সারাদিনেও সংলাপের ফলাফল জানা গেলো না।

সংলাপের কতক গুরুত্বপূর্ণ খবর

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরীর লিখিত 'রাজনীতির তিনকাল' পুস্তকে তিনি মন্তব্য করেছেন, "দৃশ্যত ২৪ মার্চ পর্যন্ত একটা ধারণা ছিলো যে, আপস মীমাংসা হয়ে যাবে। এ যাত্রা পাকিস্তানের অখণ্ডতা হয়তো টিকে যাবে। ২৫ মার্চ ভুট্টো-ইয়াহইয়া দু'জনেই ঢাকায় ছিলেন। বৈঠকের পর এমন একটা ভাব দেখানো হয় যে, মীমাংসা হয়ে গেছে।"

জনাব অলি আহাদ তাঁর রচিত 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-'৭৫' নামক গ্রন্থে (৪৭৮ ও ৭৯ পৃষ্ঠা) উল্লেখ করেছেন ঃ

"মুজিব ইয়াহইয়া আলোচনায় তিন মাসের জন্য নিম্নলিখিত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ঃ

১. সামরিক আইন প্রত্যাহার।

২. বাংলাদেশ ও পশ্চিম-পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৩. জেনারেল ইয়াহইয়া খান প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকবেন।

৪. দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি (বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত মুদ্রা ও পুঁজি পাচার নিষিদ্ধকরণসহ) ছাড়া বাকি সর্বময় ক্ষমতা বাংলাদেশ সরকারের হাতে থাকবে।

৫. তিন মাস পর দু'অঞ্চলের গণপরিষদ সদস্যগণ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করার জন্য পৃথক পৃথক বৈঠকে মিলিত হবেন। তারপর সমস্যাবলির সর্বগ্রাহ্য সমাধান নির্ধারণের জন্য যুক্ত বৈঠকে মিলিত হবে।

"এ সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত রূপদানের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে জনাব তাজুদ্দীন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ড. কামাল হোসেন আর প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের পক্ষ থেকে অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম এম আহমদ, বিচারপতি এ বশর কর্নেলিয়াস, লে. জে. পীরযাদা ও লে. কর্নেল এম এ হাসান ২৩ ও ২৪ মার্চ বৈঠকে মিলিত হন। ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের এতদসংক্রান্ত চূড়ান্ত ঐকমত্যের বিষয় ঘোষণার কথা ছিলো।"

অলি আহাদ সাহেব তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়টি যেভাবে তুলে ধরেছেন তা নিশ্চয়ই তিনি নিজের কলম থেকে বানিয়ে নেননি। কিন্তু এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঐ সংলাপে গ্রহণ করা সত্ত্বেও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও জনাব আবদুস সামাদ আমার সাথে আলোচনায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখই করেননি।

এ ৫ দফা সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে সংলাপ সফল হয়েছে বলে ঘোষণা করা যেতো। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে অন্তত তিন মাসের জন্য সঙ্কটের অবসান হয়ে যেতো। পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক সরকার চালু হয়ে গেলে ঐ সময়কার প্রশাসনিক সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো। এটাকে তো মোটামুটি একটা মীমাংসাই বলা যায়। কিন্তু এ মীমাংসা বাস্তবায়িত হতে দেওয়া হলো না।

শেখ মুজিব কী ভাবছিলেন?

২৫ মার্চ দিবাগত রাতে যা ঘটলো এমন মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবার আশঙ্কা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আবদুস সামাদ সাহেব বোধ করেছিলেন বলে তাদের সাথে আলোচনায় আমি মোটেই অনুভব করিনি। শেখ মুজিবুর রহমান কিছু আঁচ

করতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায়নি। তিনি কোন ধারণা করে থাকলে অন্তত সৈয়দ নজরুল ইসলামতো অবশ্যই জানতে পারতেন।

শেখ সাহেব সম্পর্কে জানা যায় যে, ২৫ তারিখ সারাদিন তিনি ইয়াহইয়া খান থেকে যোগাযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। এতেই বুঝা যায় যে, তিনি এ জাতীয় কোন পরিণতির কথা ভাবতে পারেননি।

শেখ সাহেব সন্ধ্যার পর জানতে পারেন যে, ইয়াহইয়া খান ঢাকা ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাঁকে কিছুই না বলে এভাবে চলে যাওয়ায় তিনি বুঝতে পারলেন যে, সংলাপ কোন মীমাংসা ছাড়াই ব্যর্থ হয়ে গেলো।

অলি আহাদ সাহেব তাঁর গ্রন্থে মন্তব্য করেন, "শেখ মুজিব সেদিন কী নির্মমভাবেই না বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়েছিলেন প্রতারক ও চাণক্যরূপী সমরনায়ক জেনারেল ইয়াহইয়া কূটকৌশলের মারপ্যাঁচে।"

পঁচিশের দিবাগত রাত

২৫ মার্চ সকাল এগারোটায় আবদুর সামাদ সাহেবের বাসা থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে আসবার পথে অস্থিরতা বোধ করলেও শেষ পর্যন্ত কী হতে যাচ্ছে তা জানার উপায় খুঁজে পেলাম না। সৈয়দ নজরুল ইসলামের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেও কোথাও পেলাম না। রেডিওর দুয়ারে ধরনা দিয়ে থাকলাম। রাত ১০টার সংবাদ পর্যন্তও কোন খবর না পেয়ে হতাশ হয়ে খেতে বসলাম।

এগারোটায় শোবার অভ্যাস। কোন খবর না পেয়ে বিছানায় গেলেও ঘুম আসবে না আশঙ্কা করে খাওয়ার পর পায়চারী করছি। সাড়ে দশটায় দূর থেকে কামানের আওয়াজ শুনতে পারলাম। পুরানা ঢাকার দিকে তাকিয়ে দেখা গেলো আকাশ লাল হয়ে আছে। বুঝা গেলো, কোথাও বড় ধরনের আগুন জ্বলছে। কিছু জানা যায় কিনা সে জন্য ফোন করতে চাইলাম। ফোন বিকল হয়ে আছে।

ইশার নামাযের পর থেকে পাড়ার লোকদের মুখে শুনতে পাচ্ছিলাম যে, শহরের বহু জায়গায় ব্যারিকেড দিয়ে বহু লোক পথরোধ করে আছে। রাত এগারোটায় জানা গেলো যে, নয়াবাজারের কাঠের দোকানগুলোর আগুন আকাশ পর্যন্ত উঁচু হয়ে জ্বলছে।

বুঝতে পারলাম, সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে আক্রমণ চালিয়েছে। পুলিশ বিভাগ তো শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণে। তারা নিশ্চয়ই ময়দানে নেই। সেনাবাহিনী ছাড়া রকেট ও কামান আর কে ব্যবহার করবে? রমনা থানার নিকটস্থ আমার বাড়ির টিনের চালে কি একটা এসে পড়লো। বিকট আওয়াজ হলো। চাল থেকে গড়িয়ে কী পড়েছে তা খোঁজ নিয়ে জানা গেলো যে, মর্টারের শেলের মযবুত একটা খোলস।

সংলাপ ফেল হলে কিছু একটা অঘটন ঘটবে বলে আশঙ্কা থাকলেও অনুমান করতে পারিনি যে, কী ঘটবে। এখন বুঝা গেলো যে, সেনাবাহিনী শহর দখল করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেছে। বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে শহরে বের হয়ে কিছু জানার চেষ্টা করাও সম্ভব ও নিরাপদ

মনে হলো না। আতঙ্কে বিছানায় শুয়ে থাকাও গেলো না। কী হচ্ছে, কী হতে যাচ্ছে সেসব চিন্তায় মগজ ছেয়ে আছে।

আমাদের বাড়ির সারিতে ৮/১০ টি বাড়ি। এ বাড়িগুলোর উত্তরদিকে ইস্পাহানী কলোনীর দীর্ঘ দেয়াল। রাত ১টার সময় খবর পেলাম, ঐ দেয়াল টপকে দু'জন পুলিশ আশ্রয় নিয়েছে। তারা নাকি রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে পালিয়ে এসেছে। সেনাবাহিনী পুলিশ লাইন আক্রমণ করে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে। পুলিশরা যে দিকে সম্ভব পালাবার চেষ্টা করছে।

অবসন্ন অবস্থায় রাত দু'টায় বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তিনটা পর্যন্ত ঘুম এলো না। ভাবতে লাগলাম, ইয়াহইয়া খান এটা কী করলেন? রাজনৈতিক সমস্যার কি কোন সামরিক সমাধান হতে পারে? ব্যালটের ফায়সালাকে কি বুলেট দিয়ে পাল্টানো যায়? এর পরিণতি শেষ পর্যন্ত কী হতে পারে? ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না যে, দেশের ভবিষ্যৎ কী হতে পারে?

ইয়াহইয়া খান পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে একসময় বলেছিলেন, "I don't want to preside over the dissolution of Pakistan" (আমি পাকিস্তান ভাঙার নেতৃত্ব দিতে চাই না।) অথচ তিনি বুঝতেই পারছেন না যে, তার প্রতিটি পদক্ষেপই পাকিস্তানকে ভাঙার দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি LFO ঘোষণা করলেন, কিন্তু তা প্রয়োগ করলেন না। ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহস বেড়ে গেলো। রাজনৈতিক অঙ্গনে তিনি সন্ত্রাস রোধ করলেন না। ফলে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলেন। নির্বাচনের পর তার একটি সিদ্ধান্তও পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে বলে প্রমাণিত হয়নি। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য যা করণীয় ছিলো এর বিপরীত কর্মকাণ্ড চালালেন। শেখ মুজিবের সাথে তার সংলাপকে সফল করতে সক্ষম হলেন না। ২৫ তারিখ দিবাগত রাতে যা শুরু করা হলো তা পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে কী করে সহায়ক হবে? এসব চিন্তা করতে করতে রাত তিনটায় ঘুমিয়ে পড়লাম।

১০৮.

২৬ মার্চ সকালে

আমাদের মহল্লায় তখন কোন মসজিদ ছিলো না। বর্তমান মসজিদটি আব্বা এককভাবে '৭১ সালে তৈরি করান এবং ঐ বছরই অক্টোবরের শেষ দিকে পহেলা রমযান থেকে এ নতুন মসজিদে নামায পড়া শুরু হয়। '৪৮ সালে আমরা এখানে বসবাস শুরু করি। তখন থেকেই রমনা থানা সংলগ্ন একটি পুরানো মসজিদে নামায পড়তাম। তখন মসজিদটি 'ভাঙা মসজিদ' নামে পরিচিত ছিলো। ২৬ মার্চ ঐ মসজিদেই ফজরের নামায পড়ার কথা। কিন্তু আযান শুনতে না পাওয়ায় বুঝা গেলো যে, কারফিউ সকাল ৬টা পর্যন্ত থাকায় আযান হয়নি। বাড়িতেই জামায়াতে ফজরের নামায পড়লাম।

ভাঙা মসজিদ প্রসঙ্গ যখন উঠলো তখন সে বিষয়ে কিছু লেখা যাক। মসজিদটি জীর্ণশীর্ণ অবস্থায়ই ছিলো। আশপাশে বসতি না থাকায় বলতে গেলে বিরান অবস্থায়ই আমরা '৪৮ সালে পেয়েছি। একজন উর্দুভাষী বয়স্ক লোক এর মুতাওয়াল্লীর দাবিদার ছিলেন। মসজিদের পেছন দিকে মসজিদেরই জায়গায় ঘর তুলে সপরিবারে বসবাস করতেন। তিনি বলেন যে, রমনা থানাসহ মসজিদের তিন দিকে বিরাট এলাকা মসজিদের ওয়াকফ-সম্পত্তি ছিলো। ইংরেজ আমলে ঐসব জায়গা সরকার দখল করে নেয়। মসজিদের পূর্বদিকে বিরাট এক পুকুর ছিলো, যা আমরা '৪৮ সালে দেখেছি। সে পুকুর পরে ভরাট করা হয়েছে।

মসজিদের প্রবেশদ্বারের দু'পাশের দেয়াল তিন হাত প্রশস্ত ছিলো এবং ইটগুলো মাত্র দেড় ইঞ্চি পুরু। এ ধরনের মসজিদ মুসলিম শাসনামলের তৈরি। লালবাগ দুর্গের ইট আর এ মসজিদের ইটের আকার ও প্রকার একই রকম। আশপাশে জনবসতি না থাকায় মসজিদে সব ওয়াক্তে নিয়মিত নামায হতো না। ইমাম ও মুযায্যিনের দায়িত্ব ঐ মুতাওয়াল্লীই পালন করতেন।

আব্বা কুমিল্লা জেলার চান্দিনা থেকে বদলি হয়ে ঢাকা আসলে তিনি এ মসজিদটি আবাদ করার ব্যবস্থা করেন। এতদিন আমরা নিয়মিত ৫ ওয়াক্ত মসজিদে যেতাম না। তিনি তাগিদ দিয়ে আমাদেরকে নিয়ে মসজিদে যেতেন। ঢাকা আলিয়া মাদরাসার কামিল ক্লাসের এক ছাত্রকে মসজিদের ইমাম নিয়োগ করে মসজিদের হুজরায় থাকার ব্যবস্থা করেন এবং আমাদের বাড়িতে তাঁর খাবার সুযোগ দেওয়া হয়। আব্বা জুমআর খতীবের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

মিন্টু রোড খুব কাছেই। সেখান থেকে শিক্ষাসচিব ফযলী সাহেব সিএসপি জুমআর নামাযে আসতেন। তিনি মসজিদের ব্যাপারে আগ্রহী হলেন। মুসল্লীদের দাবিতে মসজিদ কমিটি গঠন করা হয়। ফযলী সাহেব কমিটির প্রেসিডেন্ট হতে রাজি হন এবং আমাকে কমিটির সেক্রেটারি করা হয়। ১৯৫০-এর ডিসেম্বরে রংপুর কলেজে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত আমি এ দায়িত্ব পালন করি।

'৭১-এর নভেম্বরে আমাদের মহল্লার মসজিদ চালু হবার পর আব্বার রমনা ভাঙা মসজিদে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরে মসজিদটির আশপাশে পুলিশ অফিসারদের বিরাট কলোনী গড়ে উঠে এবং তাদেরই প্রচেষ্টায় ভাঙা মসজিদটির জায়গায় বর্তমানে বেশ বড় মসজিদ তৈরি হয়। এখন এর নাম রমনা থানা মসজিদ। রাস্তার পাশে বেশ কয়টি দোকানঘর করায় মসজিদের স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে এবং এখন এটা একটা প্রতিষ্ঠিত জামে মসজিদের মর্যাদা ভোগ করছে।

শহরের অবস্থা দেখতে গেলাম

গত রাতে ঢাকা শহরে যা ঘটলো তা স্বচক্ষে দেখার জন্য মন উতলা হয়ে উঠলো। ড্রাইভার আজ আসবে কিনা বলা যায় না। সে পুরানো ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা। গত রাতের ঘটনার পর সে বের হতে সাহস করবে কিনা সেটাই আমার চিন্তা ছিলো।

ঠিক সকাল আটটায় মুহাম্মদ আলী হাযির হয়ে যাওয়ায় খুব খুশি হলাম। তাদের এলাকায় তেমন কিছু হয়নি জানলাম।

কচ্ছপ আকৃতির 'বকস ওয়াগন' গাড়িটি আমার ব্যক্তিগত না হলেও আমার বাড়িতেই রাখা হতো। ১৯৭০ সালের শুরুতে জামায়াতের রুকন ও ব্যবসায়ী জনাব ফযলুদ্দীন শামসী নিজের এ গাড়িটি জামায়াতকে দান করেন। এ গাড়িটি না পেলে নির্বাচনী বছর হিসেবে ৭০ সালে সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করা কঠিন হতো। মুহাম্মদ আলী গাড়ি রেডি করতে করতে আমি নাস্তা সেরে নিলাম। ড্রাইভার আসবার সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হয়ে এসেছে। তার বাড়ি থেকে আসবার পথ এটাই। সে প্রথমেই সেদিকে নিয়ে গেলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের হল ও শিক্ষকগণের বাসভবনের আশপাশে দারোয়ান, পিয়ন ও অন্যান্য ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা কিছুটা বস্তির মতো ঘরে বসবাস করতো। তাদের অনেকেই দুধের জন্য গাভী পুষতো। আমার ছাত্রজীবনেও হলের দারোয়ানের গাভীর দুধ খেয়েছি। সেখানে যে বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়েছে তা বড়ই অমানবিক ও করুণ। এ বস্তিগুলোতে নারী-পুরুষ, শিশু, গাভি, বাছুর মরে পড়ে আছে। তখনও সেসব সরাবার কোন ব্যবস্থা হয়নি। কিভাবে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালালো তা বুঝতে পারলাম না। গুলীর আঘাতে নিহত বলে মনে হয়নি। আগুন দিয়েও পুড়িয়ে মারা হয়নি। বস্তির জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়নি বটে, কিন্তু কালো হয়ে পড়ে আছে। কোন রকম গ্যাস বা কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে।

এরপর নয়াবাজার গেলাম। পথে কোথাও কোথাও রাস্তায় বা রিকশায় লাশ পড়ে আছে। বংশাল রোড থেকে ইসলামপুর যাওয়ার গোটা রাস্তার দু'পাশে কাঠ ও টিনের বহু দোকান, সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাঠের আগুন তখনো নিভে শেষ হয়নি। টিনগুলো পুড়ে দুমড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। সেখান থেকে ফিরবার সময় বংশাল রোড দিয়ে নওয়াবপুর রোডে গেলাম। নওয়াবপুর থেকে গুলিস্তান যাবার পথে বেশ কয়টি লাশ রাস্তায় এবং কয়েকটি রিকশায় পড়ে থাকতে দেখলাম।

রাস্তায় যানবাহন তেমন দেখা গেলো না। লোকজনের চলাফেরাও বেশি নয়। সবার চেহারায় আতঙ্ক ও ঘৃণার ভাব লক্ষ্য করা গেলো। সবাই হতবাক। কোন হৈ চৈ নেই। নয়াবাজারে যাদেরকে দেখলাম, তাদের কাছ থেকে জানা গেলো যে, গুলী করতেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। রাত সাড়ে দশটায় দোকানে মানুষ থাকলে পুড়ে ছাই হয়ে যেতো।

যে নৃশংস দৃশ্য দেখলাম তাতে মনে হলো যে, সেনাবাহিনী যেন কোন শত্রুদেশ জয় করার জন্য আক্রমণ চালিয়েছে। বিদ্রোহ দমন করার জন্য কারফিউ জারি করে রাস্তায় যাদেরকে পাওয়া যায় তাদেরকে গুলী করে হত্যার হুমকিই যথেষ্ট ছিলো। বস্তিতে ঢুকে মানুষ-পশুকে একসাথে হত্যা করার কী প্রয়োজন ছিলো? বিশেষ করে কোটি কোটি টাকার সম্পদ পুড়িয়ে ধ্বংস করার উদ্দেশ্য কী? আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে, আর নিহত হয়েছে সাধারণ মানুষ। ২৫-এর

কালো রাতে সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হলে ঢুকে ছাত্রদের হত্যা করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাসকারী শিক্ষকদের বাসভবনে ঢুকে অধ্যাপকগণকে হত্যা করা বিদ্রোহ দমনের জন্য মোটেই জরুরি ছিলো না। কিন্তু সমরবিদদের হিসাব আলাদা। তারা যখন হামলা করে তখন দুশমন হিসেবেই ধরে নেয়। এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করার মতো মনোভাব তাদের থাকে না।

এখন কী করি?

১৯৬৯ সালের মার্চ মাস থেকেই দেশে সামরিক শাসন চলছে। নির্বাচনের পূর্বেও সামরিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। আর নির্বাচনের পর তো বলতে গেলে সামরিক শাসন স্তব্ধ অবস্থায়ই ছিলো। '৭১-এর ১ মার্চ থেকে বিদ্রোহ শুরু হলে সামরিক আইনের প্রয়োগ তো ছিলোই না; বেসরকারি প্রশাসনও শেখ মুজিবের আনুগত্য করছিলো। ইয়াহইয়া সরকারের বিরুদ্ধে সারাদেশে যখন বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লো তখন ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপের সময় বিদ্রোহীরা সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলো। তারা স্বাধীন বাংলাদেশ কায়েমের জন্য শেখ মুজিবের নির্দেশের দিকে চেয়েছিলো। ২৫ মার্চ সংলাপের সাফল্যের ঘোষণাও ইয়াহইয়া খান দিলেন না, সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিবও স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন না।

পূর্ব-পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে অতর্কিতে ঢাকা শহরে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু করলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনকারী নিরস্ত্র ছাত্র-জনতা কিভাবে এর মোকাবিলা করবে? এখন যা করা হচ্ছে তা সামরিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগই শুধু নয়, রীতিমতো জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সংলাপ সফল হতে না দেবার ফলে ইয়াহইয়া খানকে সামরিক শাসন বহাল করার জন্য যুদ্ধ করা ছাড়া আর বিকল্পও ছিলো না। এ কথা বিবেচনা করেই ইয়াহইয়াকে সংলাপে যেমন করেই হোক মীমাংসায় পৌঁছা উচিত ছিলো।

একতরফা যুদ্ধ চালিয়ে দু'দিনেই টিক্কা খান রাজধানী দখল করে ফেললেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের নিরস্ত্র সৈনিক যারা, তারা শহর থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দও আত্মগোপন করতে বাধ্য হলেন। শেখ মুজিব ২৫-এর দিবাগত রাতেই গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

আমি হিসাব করে দেখলাম যে, যুদ্ধ শুরু হলো মাত্র। এখন বিদ্রোহীরা সারাদেশে এর প্রতিক্রিয়ায় স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার করবে। আর সেনাবাহিনী রাজধানী ঢাকা দখলের মতো সকল জেলা ও মহকুমা শহর দখল করার জন্য যুদ্ধ অব্যাহত রাখবে। এর পরিণতি গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে তা হিসাব করার কোন সাধ্য আমার ছিলো না।

তাই এ অবস্থায় আমার ও জামায়াতের করণীয় কি হতে পারে সে বিষয়ে ভাবতে লাগলাম। আমাদের সাথীদের সাথে যোগাযোগও ঐ মুহূর্তে সহজ ছিলো না। ২/৩ দিনের মধ্যে কয়েকজন একসাথে বসে পরামর্শ করলাম। আমরা একমত হলাম যে,

আমাদের কোন ভূমিকা পালনের সুযোগ নেই। একদিকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, অপরদিকে আওয়ামী লীগ। এ পরিস্থিতিতে জামায়াতের গুরুত্বই বা কি আছে? তাই আমাদের এ সময়ে চুপ করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ছাড়া কিছুই করার নেই। আমি আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরি গোছানো শুরু করলাম। লেখাপড়া করেই সময়টা কাজে লাগাতে হবে বলে অনুভব করলাম।

দেশের অবস্থা কি?

পড়াশুনায় মোটেই মনোযোগ দিতে পারলাম না। সারাদেশে কি অবস্থা জানার জন্য পেরেশানী বোধ করলাম। খবর যোগাড় করার উপায় কি? পত্রিকা তো সামরিক নিয়ন্ত্রণে। শুধু সরকারিভাবে অনুমোদিত খবরই পত্রিকায় আসে। লোকমুখে যেসব খবর পাওয়া যায় তা কতটুকু সঠিক, আর কোন্টা গুজব তা বাছাই করা কঠিন।

বিভিন্ন জেলা থেকে জামায়াতের পক্ষ থেকে লোক-মারফতে ঢাকায় খবর আসা শুরু হলো। খবরে জানা গেলো, জেলায় আওয়ামী লীগ নেতারাই বেসামরিক প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করছে। ডিসি ও এসপি তাদের নির্দেশই মেনে চলছেন। অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার আসল-দায়িত্ব তাদের হাতে নয়। তাঁরা অনেকটা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছেন। আওয়ামী লীগ নেতারা যা কিছু করছেন তাতে তাঁরা কোন আপত্তি করেন না। এর ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সৈনিকরা সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ব্যাংক লুট করে সে টাকা স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছেন।

আরও জানা গেলো যে, আওয়ামী লীগের লোকেরা জামায়াতের লোকদেরকে সুনজরে দেখছে না। জামায়াত আগাগোড়াই ৬ দফার বিরোধী থাকায় এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় তারা ধরে নিয়েছে যে, জামায়াত তাদের পক্ষে নয়।

উত্তরবঙ্গের যেসব শহরে বিহারী নামে পরিচিত অবাঙালি বসবাস করছে তাদের উপর হামলা করা হচ্ছে। ঢাকায় সেনাবাহিনী যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে এর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে তাদেরকে হত্যা করা হচ্ছে এবং তাদের সম্পদ লুট করা হচ্ছে। সেখানকার বেসামরিক প্রশাসন এতে কোন বাধা দিচ্ছে না।

সেনাবাহিনীও নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়ে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। এভাবে সাধারণ মানুষ দু'দিক থেকেই হত্যার শিকার হচ্ছে। সেনাবাহিনী ঢাকার মতোই আক্রমণ চালিয়ে জেলা ও মহকুমা শহর তাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে থাকে।

চরম অস্বস্তিতে দিন কাটছে

ঐ সময়কার আমার মানসিক অবস্থার কথা স্মরণ করলে এখনও অস্বস্তির ভাবটা জেগে উঠে। জন্মভূমির প্রতি মানুষের ভালোবাসা সহজাত। আমার আল্লাহ আমাকে যে দেশে পয়দা করেছেন সেটাই আমার দেশ। আর কোন দেশ এর চেয়ে প্রিয় হতে পারে না। এ দেশের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, এ দেশের খাদ্য খেয়ে ছোট

থেকে বড় হয়েছি। আমার জন্মভূমির উন্নতি হলেই আমার উন্নতি। দেশের অকল্যাণ হলে আমার কল্যাণ কেমন করে হবে? দেশ কোন্ দিকে যাচ্ছে, দেশের ভবিষ্যৎ কী, বর্তমান সঙ্কটের অবসান কিভাবে হবে, কবে দেশে শান্তি ফিরে আসবে ইত্যাদি হাজারো ভাবনা সবসময় মনে তোলপাড় সৃষ্টি করছে। মনের এ অবস্থায় কি কারো পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব? তাই চরম অস্বস্তির মধ্যে দিন কেটে যাচ্ছে।

যারা বাংলাদেশকে আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম করতে চায় তারা যদি শুধু জনগণের ন্যায্য অধিকারের কথা বলতেন, গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের দাবিতে আন্দোলন করতেন, নির্বাচনে জনগণের মেনডেট মেনে নেবার দাবি তুলতেন এবং এসব দাবি অন্যায়ভাবে দাবিয়ে রাখার কারণেই বাধ্য হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম করতেন, তাহলে বিনাদ্বিধায় তাদের স্বার্থে শরীক হওয়া কর্তব্য মনে করতাম। কারণ ইয়াহইয়া-ভুট্টোচক্র নির্বাচনের পর যে আচরণ করছে, এর প্রতিক্রিয়ায় স্বাধীনতার দাবি অতি স্বাভাবিক।

আমি পাকিস্তান আন্দোলনে একজন ছাত্র-কর্মী ছিলাম। মুসলিম হিসেবে ইসলামের আদর্শে আমার দেশ পরিচালিত হবে সে জযবায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন চলে। শেখ মুজিব, তাজুদ্দীন, সৈয়দ নজরুল পাকিস্তান আন্দোলনে আমার চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ছিলেন। আজ তারা মুসলিম জাতীয়তা ত্যাগ করার কারণে ভারতের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েমের জন্য বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চাচ্ছেন। সমাজতন্ত্রও তাদের একটি বড় শ্লোগান। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ ও ধর্মবিদ্বেষী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ার ডাকে আমার সাড়া দেওয়া কি সম্ভব? আমার ঈমান কি এর অনুমতি দেয়?

যে আদর্শ কায়েমের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী আন্দোলন করছে, স্বাধীন বাংলাদেশেও সে আন্দোলন করায় কোন সমস্যা সৃষ্টি না হলে কোন কথাই ছিলো না। কিন্তু ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ কায়েমের উদ্দেশ্যে যে আন্দোলন চলছে তা সফল হলে স্বাধীন বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন অবশ্যই বেআইনী ঘোষণা করা হবে।

চট্টগ্রাম কালুরঘাট ট্রান্সমিশান ও রিসেপশন সেন্টার এবং আগ্রাবাদ ব্রডকাস্টিং স্টেশন দখল করে ২৭ মার্চ 'মেজর জিয়া বলছি' বলে স্বাধীনতা সংগ্রামের আহ্বান জানান। এটাই গভীর অরণ্যে নিয়ে গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হিসেবে চালু করা হয়। এ বেতার কেন্দ্র মারফতে জানা যায় যে, আওয়ামী লীগের নির্বাচিত নেতারা কোলকাতায় সমবেত হয়েছেন। এতে স্পষ্টতই বুঝা গেলো যে, ভারতের সাহায্য-সহযোগিতা নিয়েই স্বাধীনতা আন্দোলন চলবে। এটাই স্বাভাবিক ছিলো। ইয়াহইয়া খান তাদেরকে যে পথে ঠেলে দিয়েছেন, তাতে এছাড়া উপায়ই বা কি ছিলো?

এখন আমার মনে আর এক প্রশ্ন বিরাট আকারে দেখা দিলো। ভারতের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে সত্যিকার স্বাধীনতা লাভ করবে কি? পাকিস্তান ভাঙার এ মহাসুযোগ ভারত তো স্বাভাবিক কারণেই লুফে নেবে। পাকিস্তানের চিরদুশমন ভারত বাংলাদেশ বানিয়ে দেবে কোন্ স্বার্থে? লর্ড ক্লাইভের সাহায্যে মীর জাফর আলী খান সিরাজুদ্দৌলাকে হত্যা করে বাংলার নওয়াবের গদি দখল করে টিকতে পারেননি কেন? আমরা কি তাহলে রাওয়ালপিণ্ডির গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে দিল্লীর গোলাম হতে যাচ্ছি? ঐসব চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অস্বস্তি ও অস্থিরতার মধ্যে ৭/৮ দিন কেটে গেলো।

মৌলভী ফরিদ আহমদ এলেন

৩ এপ্রিল কোন যোগাযোগ ছাড়াই হঠাৎ নেযামে ইসলাম পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল আমার ঘনিষ্ঠ আদর্শিক বন্ধু সকাল ৯টায় আমার বাড়িতে আসলেন। আমার খবর কি জিজ্ঞেস করলেন। আমি যেসব চিন্তা-ভাবনা নিয়ে অস্বস্তিতে আছি তা সংক্ষেপে জানালাম। তিনি বললেন, "আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই?" জওয়াবে বললাম,"আমি তো করণীয় কিছুই তালাশ করে পাচ্ছি না।" তিনি বললেন, "আমরা যে ভারতের গোলাম হতে যাচ্ছি।" বললাম, "ইয়াহইয়া খান দেশকে সেদিকেই তো ঠেলে দিলেন।" "দেশের জনগণ কি ভারতের গোলামি চায়?" বললাম, "জনগণ তো আপনার আমার সাথে নয়। জনগণ যাদেরকে প্রতিনিধির দায়িত্ব দিয়েছে, তারা যা করবে জনগণ তা মেনে নিতে বাধ্য হবে।"

এভাবে কিছুক্ষণ প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্ন চলার পর তিনি বললেন যে, জনাব নূরুল আমীনের বাড়িতে তিনি ও মুসলিম লীগের খাজা খায়রুদ্দীন গত রাতে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁরা নাকি একমত হন যে, টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন। আমি জানতে চাইলাম, "এ সাক্ষাতের উদ্দেশ্য কি?" তিনি বললেন, "এভাবে সাধারণ মানুষ হত্যা করা হলে জনগণের মধ্যে এর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা তাকে বুঝানো দরকার।"

আমি কিছুটা বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম, "এ সাক্ষাতের উদ্যোগ কে নিয়েছে?" জওয়াবে বললেন, "আমরাও সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন মনে করছি, টিক্কা খানও পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাসী নেতাদের সাথে আলোচনা করতে চান।" বুঝলাম যে, জেনারেল টিক্কা খানই উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি বললাম, "ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবের সাথে আপসে মীমাংসায় না যেয়ে যখন মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তখন তো আপনাদের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করেননি। টিক্কা খান আপনাদের সমর্থন অবশ্যই চাইবেন। সমর্থন করতে পারবেন?" তিনি বললেন, "আপনিও চলুন, তিনি কী বলেন, আমরা শুনি।" বললাম, আমি যাবো না, আপনারা যান। আপনাদের কাছ থেকে তাঁর বক্তব্য শুনার পর বুঝতে পারবো তিনি কী চান।" তিনি বললেন, নূরুল আমীন সাহেব বলেন যে, আমরা যারা একসাথে পিডিএম-এ কাজ করেছি তাদের সবাই মিলেই যাওয়া ভালো।" বললাম, "আমাকে সময় দিন,

সাথীদের সাথে পরামর্শ না করে সিদ্ধান্ত নেবো না।" তিনি জানালেন, "আগামীকাল (৪ এপ্রিল) সকাল ১০টায় সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আমাকে রাতের মধ্যে জানাবেন।"

মাওলানা আবদুর রহীম ২৬ তারিখেই গ্রামের বাড়িতে চলে গেছেন। আবদুল খালেক সাহেবও ঢাকায় অনুপস্থিত। ঢাকা শহর আমীর খুররাম মুরাদের সাথেই পরামর্শ করলাম। আমরা একমত হলাম যে, দেখা করা যায়, তবে শুধু শুনবার জন্য। কোন কথায়ই সায় দেওয়া যাবে না।

রাতেই ফরিদ সাহেবকে জানালাম। তিনি বললেন যে, সকাল সাড়ে ৯টায় নূরুল আমীন সাহেবের বাড়িতে সবাই একত্রিত হয়ে একসাথে যাবো।

টিক্কা খান যা বলবেন তা তো শুনতেই যাচ্ছি। কিন্তু তাঁকে কী কী বলা যায় তা মনে মনে ঠিক করে নিলাম।

১০৯.

জেনারেল টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ

পূর্ব-পাকিস্তানের মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর লে. জেনারেল টিক্কা খান তখনো ক্যান্টনমেন্টেই থাকেন। গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলে গভর্নর হাউজেই আমরা যেতাম। গভর্নর হিসেবে শপথ নিয়েছেন কিনা জানি না। সকাল সাড়ে ন'টায় জনাব নূরুল আমীনের বাড়িতে যেয়ে জানলাম যে, আমাদেরকে সেনানিবাসে যেতে হবে। ফরিদ সাহেব ও খাজা সাহেব কিছুক্ষণ পর পৌঁছলেন।

এ সাক্ষাতের সুযোগে টিক্কা খানকে কতক জরুরি প্রশ্ন করার সুযোগ পাবো– এটাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। রওয়ানা হবার আগে কয়েক মিনিট ৪ জন একসাথে বসা অবস্থায় আমি নূরুল আমীন সাহেবকে বললাম, "আপনি কি মনে করেন যে, সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব? কোন সামরিক উপায়ে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়নি। যে চেতনায় তখন ঐক্য সৃষ্টি করেছিলো তা শেষ হয়ে গেছে। এখন রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমেই ঐক্য কায়েম রাখা উচিত ছিলো।"

তিনি বললেন, "আমরা তো কোন 'ফ্যাক্টর' নই। টিক্কা খান কি বলতে চান শুনি।" আমরা রওয়ানা হলাম। টিক্কা খান তাঁর অফিসে আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করলেন। এ সাক্ষাৎ তাঁরই উদ্যোগে। তাই অবিলম্বে তিনি কথা বলা শুরু করলেন। বিনা ভূমিকায়ই বললেন, "গত এক মাস ঢাকায় কোন সরকার নেই। মার্শাল ল' প্রত্যাহার করা হয়নি। অথচ কোন আইনই প্রয়োগ করা যাচ্ছিলো না। প্রেসিডেন্ট আমাকে সামরিক আইন বহাল করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা জনগণের নেতা। আইন-শৃঙ্খলা বহাল রাখায় জনগণ যাতে সহযোগিতা করে সে বিষয়ে আপনারা জনগণকে পরামর্শ দিতে পারেন।" এ কথা বলে তিনি থামলেন।

বয়সে নূরুল আমীন সাহেব সবার মুরুব্বী। অপর দু'জনও বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়। তারা কিছু বলছেন না। ইতোমধ্যে চা-নাস্তা এসে গেছে। তাঁরা চায়ের পেয়ালায় হাত বাড়ালেন। আমি মুরব্বীদের দিকে তাকালাম। তিনি চোখের ইশারায় আমাকে বলার অনুমতি দিলেন মনে হলো। আমি বললাম, "জেনারেল সাহেব! নির্বাচনের ফলাফলকে প্রয়োগ করতে দিলে আইন-শৃঙ্খলা বহাল থাকতো।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, "এ কথা প্রেসিডেন্টকে বলুন। আমি রাজনৈতিক বিষয়ে কিছু বলতে অপারগ।"

আমি বললাম, "আপনাকে ফ্রাঙ্কলি দু'একটা প্রশ্ন করতে চাই, যা রাজনৈতিক নয়।" তিনি বললেন, 'ওয়েলকাম'। বললাম, "আইন-শৃঙ্খলা বহাল করার জন্য কি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি পুড়িয়ে দেবার প্রয়োজন ছিলো?" তিনি বললেন, "এবার এপ্রোপ্রিয়েট প্রশ্ন করেছেন। ইতঃপূর্বে কারফিউ উপেক্ষা করে ছাত্ররা যেভাবে ময়দানে নেমেছে এবং যেভাবে তারা ঐ রাতে রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে হাজারে হাজারে জমায়েত হয়েছিলো তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রাস্তা থেকে সরে যাবার জন্যই এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পথে পথে কিছু রিকশাওয়ালাকে হত্যা করে এবং কোথাও কোথাও আগুন লাগিয়ে ভীতি সৃষ্টি করা না হলে হাজার হাজার মূল্যবান জীবন নাশ করতে হতো। বিরাট সংখ্যক ছাত্র-জনতাকে বাঁচাবার জন্যই এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে।"

সুযোগ পেয়ে আবার প্রশ্ন করলাম, "ছাত্রদের হলে ঢুকেও তাদেরকে হত্যা করা কি দরকার ছিলো?" বললেন, "আমাদের রিপোর্ট অনুযায়ী কতক সশস্ত্র বিদ্রোহী সেখানে ছিলো। সেখানে অল্পসংখ্যক ছাত্রই নিহত হয়েছে।"

এবার ফরিদ সাহেব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন, "আপনারা সৈনিকরা সরকারি নির্দেশের অতিরিক্ত কিছু বাড়াবাড়ি করলে সে বিষয়ে যদি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের সুযোগ দান করেন তাহলে আপনার প্রশাসনকে দুর্নাম থেকে রক্ষায় আমরা সাহায্য করতে পারি।"

তিনি এ প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। সেখানে উপস্থিত ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী খানকে নির্দেশ দিলেন যে, প্রয়োজনীয় সকল ফোন নম্বর তাঁদেরকে দিয়ে দিন, যাতে যখন প্রয়োজন মনে করেন যোগাযোগ করতে পারেন। জেনারেল টিক্কা খান আমাদেরকে সাক্ষাতের জন্য শুকরিয়া জানিয়ে বিদায় দিলেন। ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী খান আমাদের সাথে বসে আলাপ শুরু করলেন।

টিক্কা খানের কণ্ঠস্বর রুক্ষ ও নীরস। তার চেহারায় কোন কমনীয়তা নেই, বরং কঠোর ভাবই লক্ষণীয়। এর সম্পূর্ণ বিপরীত রাও ফরমান আলী খান। উজ্জ্বল ফরসা রং এবং মিষ্টি চেহারার সাথে নম্র কণ্ঠ ও অত্যন্ত সৌজন্যমূলক আচরণে তিনি আমাদের সাথে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানালেন এবং প্রয়োজনীয় কয়েকটি ফোন নম্বর দিলেন। জেনারেল সাহেবের ডাইরেক্ট ফোনও দিলেন।

টিক্কা খানকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন করার ছিলো। ফরিদ সাহেব কথা বলার পর প্রসঙ্গই বদলে গেলো বলে আর সুযোগ পেলাম না। এরপরই তিনি বিদায় হয়ে গেলেন। এ প্রশ্নগুলো এখন রাও সাহেবকে করবো বলে স্থির করলাম। আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার পর তিনি আসল কথা তুললেন। বুঝা গেলো যে, আমাদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যই এটা। তিনি বললেন, "আমাদের ধারণা জনগণ তাদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যেই আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। তারা পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চায় না। তারা ভারতকেও বন্ধু মনে করে না। আওয়ামী লীগ এখন ভারতের সাহায্য নিয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চেষ্টা করবে। বিচ্ছিন্ন হলে যে ভারতের গোলাম হতে হবে জনগণকে একথা বুঝাবার যোগ্যতা আমাদের নেই। আপনারা নেতা হিসেবে জনগণের নিকট পরিচিত। আপনারা এসব কথা বুঝিয়ে বললে জনগণ সহজেই গ্রহণ করবে। আপনারা রেডিওতে ভাষণ দিলে মানুষের কানে কথাগুলো পৌঁছে যাবে। এ ভাষণ অবিলম্বে জনগণের নিকট পৌঁছা দরকার। তাই আমাদের ভাষণ রেকর্ড করার ব্যবস্থা এখানেই করা হয়েছে, যাতে আজই প্রচার করা সম্ভব হয়।"

তিনি কথাগুলো এমন চমৎকারভাবে আবেগের সাথে পেশ করলেন যে, জনাব নূরুল আমীন ভাষণ রেকর্ড করাবার জন্য রাজি হয়ে গেলেন এবং তাঁকে এ উদ্দেশ্যে অন্যত্র নিয়ে গেলো। বাকি দু'জনও সম্মত হলেন। তাঁদের দু'জনকেও ভাষণ রেকর্ড করার জন্য নিয়ে গেলো। আমি বললাম যে, এ মুহূর্তে আমি প্রস্তুত নই। ভাষণ লিখিত আকারে তৈরি করা ছাড়া আমার কথা সুন্দর করে এখন গুছিয়ে বলতে পারবো না। এভাবে আমি সময় নিলাম এবং সাথীদের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ পেলাম।

তাঁরা ফিরে এলে একসাথেই আমরা ফিরবো বলে আমি রাও সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম। আমি বললাম, "আপনি যা বললেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। কিন্তু এ পরিস্থিতি কেন সৃষ্টি করা হলো? নির্বাচনের পরপরই যদি গণপরিষদের বৈঠক ডেকে দেওয়া হতো তাহলে সমঝোতায় আসবার ঝামেলা রাজনৈতিক নেতাদেরই পোহাতে হতো। প্রেসিডেন্ট সরাসরি রাজনীতিতে না জড়ালেই সঙ্কট থেকে বেঁচে থাকতে পারতেন।" তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

তাঁকে একা পেয়ে আরও বললাম, "প্রেসিডেন্ট যদি শেখ মুজিবের সাথে আপস করে নিতেন তাহলেই সবদিক রক্ষা পেতো। জনগণ নির্বাচনে যেসব নেতাকে ভোট দেয়নি তাদের ভাষণ তাদেরকে কতটুকু প্রভাবিত করবে? রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কি সামরিক পন্থায় হয়" আমি একতরফা কথা বলছি, আর তিনি নীরবে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তিনি কিছুই বললেন না। আমাকেও চুপ করে যেতে হলো।

তখনো ভাষণ রেকর্ড করে তাঁরা ফিরে না আসায় এবং রাও সাহেবের একতরফা কথা বলে বিব্রত করা ঠিক হচ্ছে না মনে করে আমি বিদায় হয়ে চলে এলাম।

মুরাদ সাহেবের সাথে পরামর্শ

ঐদিনই বিকালে মুরাদ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করে প্রাদেশিক মজলিসে শূরার ঢাকায় অবস্থানরত সদস্যদের সাথে মিলিত হলাম। প্রাদেশিক সেক্রেটারি জনাব আবদুল খালেক তখনও ঢাকায় ফিরেননি। মাওলানা আবদুর রহীম কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর হলেও প্রাদেশিক মজলিসে শূরায় তাঁকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনিও তখন ঢাকায় অনুপস্থিত। যে কয়জন পরামর্শের জন্য বসলাম তাদের মধ্যে আমি ছাড়া সবাই উর্দুভাষী। আমি বললাম, "জনগণকে সম্বোধন করে কিছু বলার মতো কথা আমি তালাশ করে পাচ্ছি না। তাছাড়া জনগণের নিকট আমার মর্যাদা কী-ই-বা আছে? এ কঠিন পরিস্থিতিতে কী বলা যায়? সেনা অভিযানের বিরুদ্ধে কিছু বললে তা প্রচার করবে না। এর সমর্থনে তো বলার প্রশ্নই উঠে না। আওয়ামী লীগ বা স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধেও কিছু বলা মোটেই উচিত নয়। তাহলে কী বলা যাবে?"

জনাব নূরুল আমীনের ভাষণ

আমরা সবাই একমত হলাম যে, অন্য তিনজনের ভাষণ রেডিওতে শুনে আবার পরামর্শে বসতে হবে। রাতেই নূরুল আমীন সাহেবের ভাষণ রেডিওতে শুনলাম। পাকিস্তান আন্দোলনে একজন নেতা হিসেবে তিনি ৪০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে ১০ কোটি মুসলমানদের যে বিরাট ত্যাগের ফলে পাকিস্তান কায়েম হয়েছে সংক্ষেপে সে ইতিহাস বললেন। আওয়ামী লীগ নেতা শহীদ সোহওয়ার্দীর উল্লেখ করে তিনি বললেন, তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব না হলে বাঙালি মুসলমানদের শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট পাকিস্তানের পক্ষে আসতো না। '৪৬-এর নির্বাচনে বাঙালি মুসলমানদের ভোটই পাকিস্তান আন্দোলনকে সবচেয়ে বেশি শক্তি যুগিয়েছে।

খুবই সুন্দরভাবে গুছিয়ে আরো বললেন যে, পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ জন পূর্ব-পাকিস্তানি। জনগণকে সম্বোধন করে বললেন যে, আপনারাই পাকিস্তানের আসল শক্তি। পশ্চিম-পাকিস্তানিরা মাত্র শতকরা ৪৪ জন। পাকিস্তানের পার্লামেন্টের মেম্বারদের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। গত নির্বাচনে আপনারা পার্লামেন্টের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনই শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি ১টি আসনে বিজয়ী হয়েছি। সুতরাং আজ হোক কাল হোক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী তিনিই হবেন। আর কেউ হবে না। তিনি বহুবার জেলে গিয়েছেন। প্রত্যেক বারই আরও বড় নেতা হিসেবে জেল থেকে বের হয়ে এসেছেন। এখন আবার জেলে আছেন। কেউ তাঁকে চিরদিন আটক করে রাখতে পারবে না।

তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আমাদের অধিকার আদায় করতে চেয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাননি। চাইলে তিনি আত্মগোপন করে ভারতে পালিয়ে যেতেন, নিজের ইচ্ছায় গ্রেপ্তার হতেন না।

তাই আপনারা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। দেশে আইন-শৃঙ্খলা বহাল হলেই

আমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান জেল থেকে বের হয়ে আসবেন এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের সব দাবি পূরণ করবেন।

মৌলভী ফরিদ আহমদের ভাষণ

তিনি অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় জনগণকে ভারতের বিরুদ্ধে সর্তক থাকার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তব্য প্রধানত ভারতের বিরুদ্ধেই ছিলো। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগকে এখনও ভারত মেনে নেয়নি। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার চেষ্টা সব সময়ই করে এসেছে। বর্তমানে পাকিস্তানে যে রাজনৈতিক সঙ্কট চলছে এ সুযোগে ভারত আমাদেরকে সাহায্য করার নামে এ দেশকে দখল করতে চেষ্টা করবে। মুসলমানরা তাদের গোলামি থেকে বাঁচার জন্যই পাকিস্তান কায়েম করেছে। আমরা আবার তাদের গোলাম হতে চাই না। ভারতের খপ্পর থেকে আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে।

ফরিদ সাহেব অনেক কথাই বললেন। ভারত বিভাগের ইতিহাসও উল্লেখ করেন। তবে তার ভাষণের সার-কথাটুকুই উপরে তুলে ধরলাম। তিনি নির্বাচন, আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে কিছুই বললেন না। জনগণ যেন ভারতকে বন্ধু মনে না করে এবং ভারতের সাহায্য সহযোগিতাকে প্রতারণা মনে করে এ বিষয়েই তিনি জোর দিয়েছেন, যাতে ভারত এ দেশ দখল করতে না পারে।

খাজা খায়রুদ্দীনের ভাষণের উদ্ধৃতির প্রয়োজন বোধ করছি না। মুসলিম লীগ নেতা হিসেবে তিনিও জনাব নূরুল আমীনের মতোই পাকিস্তান কায়েমের ইতিহাস ও ভারতের ভূমিকা আলোচনা করে জনগণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনিও আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিব সম্পর্কে কিছুই বলেননি। তাঁর ভাষণ ঐ দু'জনের মাঝামাঝি ধরনের ছিলো।

ভাষণের পর্যালোচনা

দু'দিনের মধ্যে তিনজনের ভাষণ রেডিওতে কয়েকবার প্রচারিত হয়েছে। নূরুল আমীন সাহেবের ভাষণই বারবার প্রচার করা হয়েছে। এ সব ভাষণ শুনবার পর আমরা আবার পরামর্শের জন্য বসলাম। ভাষণগুলোর পর্যালোচনা করলাম।

ইতোমধ্যে ব্রিগেডিয়ার রাও ফরমান আলী টেলিফোনে দু'বার আমাকে তাগিদ দিয়েছেন ভাষণের জন্য। এ কথা সাথীদের জানালাম। ভাষণ দেবার ব্যাপারে আমি মোটেই আগ্রহ বোধ করছিলাম না। কি বলবো ভেবেও পাচ্ছিলাম না। এখন যা-ই বলবো তা হয় সরকারের পক্ষে, আর না হয় বিপক্ষে যাবে। বিপক্ষে বক্তব্য দেওয়া হলে আমরাও সরকারি নির্যাতনের শিকার হবো এবং সে বক্তব্য রেডিওতে প্রচার করাও হবে না। দায়সারা গোছের বক্তব্য দিলেও পরোক্ষভাবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বলে গণ্য হবে। তখন আমরা তাদের অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়ে যেতে পারি। আমাদের জন্য উভয় সঙ্কট। রাজনৈতিক ময়দান সব সময়ই এ রকমই। রাজনীতিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার উপায় থাকে না। থাকার চেষ্টা করলে দু'পক্ষের হাতেই মার খেতে হয়।

এসব কারণেই আমাদের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা কঠিন মনে হলো। এর মধ্যে 'আর্মি একশানে' বিপদগ্রস্ত মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে আমার কাছে এলো। তাদেরকে সাহায্য করতে হলে ফরমান আলী খানদের কাছেই ধরনা দিতে হবে। জনগণ তখন অসহায়। তাদের নির্বাচিত নেতারা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। বামপন্থি নেতারাও ভারতে পালিয়েছে। নির্বাচনে একমাত্র জামায়াতে ইসলামীই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তাই জনগণ আওয়ামী লীগের পর জামায়াতকেই রাজনৈতিক দল হিসেবে চেনে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সমস্যাগ্রস্ত মানুষকে কোন সাহায্য করতে পারছে না। তাই মানুষ ঐ তিন নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর কাছেই আসতে বাধ্য হচ্ছে। খবর আসতে লাগলো, সেনাবাহিনী যে জেলা শহরেই হামলা চালায়, সেখানে বিপদগ্রস্ত লোকেরা জামায়াত নেতাদের কাছেই সাহায্য চায়। আমরা তাদেরকে কেমন করে সাহায্য করতে পারি? আমরা টিক্কা খানকেও সমর্থন করি না।

আমরা যদি আওয়ামী লীগের বর্তমান আন্দোলনে শামিল হই তাহলে আমাদের সকল দায়িত্বশীলকেই ভারতে আশ্রয় নিতে হবে। আমরা ভারতবিরোধী হিসেবে পরিচিত বলে ভারতে যাবার পথও আমাদের জন্য বন্ধ। সেখানে আমাদের নিরাপত্তার কোন আশা নেই। আমরা উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলাম।

শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম

আমরা সবদিক বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হলাম তা হলো ঃ

এ দেশ আমাদের জন্মভূমি। আল্লাহই আমাদেরকে এ দেশে পয়দা করেছেন। আমরা দেশ ছেড়ে কোথায় যাবো? আমাদেরকে এখানেই বাঁচতে হবে, এখানেই মরতে হবে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র কায়েমের আন্দোলনে শরীক হতে আমাদের ঈমান অনুমতি দেয় না। দেশ স্বাধীন হলে ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের নির্যাতন সহ্য করেই আমাদেরকে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। পাকিস্তানেও সকল সরকারের আমলেই আমরা নির্যাতিত হয়েছি। ইসলাম বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থাই চলতে থাকবে।

নির্বাচনের পর ইয়াহইয়া খান ভুট্টোর সাথে আঁতাত করে যে রাজনৈতিক মহাসঙ্কট সৃষ্টি করেছে, আমরা বার বার এর প্রতিবাদ করেছি। রাজনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে সামরিক সরকার শক্তিপ্রয়োগ করার যে ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করেছে তা আমরা কিছুতেই সমর্থন করতে পারি না। কারণ এ দ্বারা রাজনৈতিক সমস্যা আরও জটিল হতে থাকবে। সামরিক অভিযানের ফলে জনগণ যে অসহায় অবস্থায় পড়ে আমাদের কাছে আসছে আমাদেরকে যথাসাধ্য তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। এ পরিস্থিতিতে জনগণের সামান্য খিদমত করতে হলেও সামরিক সরকারের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমেই তা সম্ভব। যারা কোন সঙ্কটে পড়ে আমাদের কাছে আসে তাদেরকে তা থেকে উদ্ধার কে করবে? সরকারই শুধু উদ্ধার করতে পারে। জনগণ কিভাবে সরকারের নাগাল পাবে? সুতরাং এ জাতীয় খিদমত করতে হলে সরকারের কাছেই যেতে হবে।

আমরা বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তাঁর সরকারের সাথে যে যোগাযোগ হয়েছে তা বজায় রেখেই এ জাতীয় সেবা করতে হবে। তাই দায়সারা গোছের একটি ভাষণ রেডিওর জন্য না দিলে সরকারের সাথে যোগাযোগ করার পথই বন্ধ হয়ে যাবে। ভাষণের একটা ড্রাফট তৈরি করে সাথীদের শুনালাম। এতে নির্বাচন, আওয়ামী লীগ, স্বাধীনতা আন্দোলন, সামরিক অভিযান ইত্যাদির কোন উল্লেখ না করে ভারতে মুসলমানদের দুর্দশার বিবরণ দিয়ে ভারত যে মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না তা প্রমাণ করলাম। আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের সুযোগে আমাদের বন্ধু সেজে ভারত এ দেশ দখল করতে চায়। এতে যদি তারা সফল হয় তাহলে আমাদেরকেও ভারতের মুসলমানদের মতোই দুর্দশা ভোগ করতে হবে। তাই জনগণকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা আত্যাবশ্যক। বার বার সংশোধন করে কোন রকমে একটা খসড়া দাঁড় করানো হলো।

আমার রেডিও ভাষণে সামরিক সরকার সন্তুষ্ট না হলেও আওয়ামী লীগ মহলের বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, আমরা তাদের বিরোধী। রেডিওতে এ ভাষণ প্রচারের পর সারাদেশেই জামায়াতের সাথে জড়িত সবাই আওয়ামীদের হুমকির সম্মুখীন হয়।

জনসেবার একটি উদাহরণ

বেলা ২টার সময় খেতে বসেছি। হঠাৎ কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেলো। বারান্দায় এক মহিলা বিলাপ করছেন। উঠে গেলাম। ৪০-এর মতো বয়সের এক সম্ভ্রান্ত মহিলা আমাকে দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, "ভাইজান আমার স্বামীকে মেরে ফেলবে। আপনি তাকে বাঁচান।" সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কি হয়েছে বলুন। বললেন, গত রাত ১২টায় আমার স্বামীকে আর্মির লোকেরা বাড়িতে এসে ধরে নিয়ে গেছে। পাগলের মতো সকাল থেকে কত জায়গায় গেলাম। অনেকেই আপনার কাছে আসতে বলায় আসলাম।

তার স্বামীর নাম ও পরিচয় নিলাম। সূর্য মিয়া ডাক নাম। আসল নাম সম্ভবত সাইফুদ্দীন। ফার্স্ট ক্লাস কন্ট্রাক্টর। শেখ মুজিবের আত্মীয়। আরও জানলাম সূর্য মিয়া আমার ছোট ভগ্নিপতি মগবাজারের কাজী সাহেবের সাথে সম্পর্কে খালাত ভাই। কাজী সাহেবকে ফোন করে জানলাম যে, খুবই ভালো লোক। রাজনীতির ধারে কাছেও নেই। শেখ মুজিবের আত্মীয় হওয়া ছাড়া তার আর কোন অপরাধ নেই। কাজী সাহেব থেকে সার্টিফিকেট পেয়ে ব্রিগেডিয়ার রাওকে ফোন করলাম। তিনি বললেন, আমি এক্ষুণি খবর নিচ্ছি। বিকেলে তিনি জানালেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠক হিসেবে সন্দেহ করে তাকে ধরেছে। আমি দায়িত্বশীলকে আপনার রেফারেন্স দিয়েছি। আগামীকালই ছেড়ে দেবে।

আমি তাকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, কোন দিন তাকে দেখিওনি। কাজী সাহেবের সার্টিফিকেট না পেলে সঙ্গে সঙ্গেই সুপারিশ করতাম না। আরও খোঁজ-খবর নিতে হতো।

পরের দিন দুপুরে সূর্য মিয়া আমার বাড়িতে হাজির। বললেন, চোখবাঁধা অবস্থায় তাকে জীপ থেকে এক সৈনিক লাথি মেরে রাস্তার পাশে ফেলে দিয়ে গেলো। লাথি মারার সময় নাকি বললো, কোন্ গোলাম আযম নাকি সুপারিশ করেছে, যা বেঁচে গেলি।

বললেন, রাস্তায় পড়ে বেহুঁশ হয়ে গেলাম। হুঁশ হলে চেয়ে দেখি সার্কিট হাউজের রাস্তার পাশে পড়ে আছি। হাতের ইশারায় রিকশা ডাকলাম। আপনার বাড়িতেই পয়লা পৌঁছলাম। আমি বাড়িতে যাবো না। আমার কয়েকটা সেয়ানা মেয়ে আছে। আমার ভীষণ ভয় লাগছে। আপনার বাড়িতেই ওদের থাকার ব্যবস্থা করুন। এতো লোকের জায়গা আমার বাড়িতে ছিলো না। তার ৪ মেয়েকে আমাদের এক কামরায় মাসখানেক রাখার পর আমার পাশের বাড়ি আমার ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকার্‌রমের দোতলা খালি হলে তিনি ঐ বাসা ভাড়া করে মেয়েদেরকে সেখানে রাখলেন।

সূর্য মিয়াকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রতি যে অমানবিক আচরণ করা হয়েছে তা ব্রিগেডিয়ার রাওকে জানালাম। বললাম, গ্রেপ্তার করা দরকার হলে করবে, কিন্তু এমন আচরণ যাতে না করে সে নির্দেশ দেবার পরামর্শ দিলাম। তিনি আশ্বাস দিলেন।

'৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর যখন ঢাকা শহরে বিরাট মুক্তি বাহিনী জমায়েত হয় তখন আমার বাড়িতে হামলার আশঙ্কায় আমার ছোট ভাই ড. গোলাম মুয়ায্যামের বড় ছেলে সোহায়ল একটা জীপ যোগাড় করে আমার আব্বা, আম্মা, স্ত্রী ও ছেলেদেরকে নিয়ে কোন আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় নেবার জন্য রওয়ানা হবার সময় ঐ কাজী সাহেবের বড় ভাই দেলওয়ার মিয়া তাদেরকে ঐ সূর্য মিয়ার বাড়িতে আশ্রয় নেবার পরামর্শ দিলেন। দুনিয়াতেই এভাবে উপকারের প্রতিদান পাওয়া গেলো।

সূর্য মিয়া এখনও বেঁচে আছেন। পুরানা পল্টনে তাঁর সেই বাড়িতেই তিনি এখনও থাকেন।

১১০.

ইয়াহইয়া সরকারের রেযাকার বাহিনী গঠন

বর্তমানে পুলিশ বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসেবে আমাদের দেশে যেমন আনসার বাহিনী আছে, ইয়াহইয়া সরকার তেমনি এক বাহিনী গঠন করলো। এর নাম রাখা হল 'রেযাকার'। এ শব্দটি দুটো ফারসি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'রেযা' মানে সন্তুষ্টি বা খুশি, আর 'কার' মানে কাজ। 'রেযাকার' মানে যে নিজের খুশিতে বা ইচ্ছায় কাজ করে। বাংলায় এর অর্থ হলো 'স্বেচ্ছাসেবক'। ইংরেজিতে বলা হয় 'ভলান্টিয়ার'। উর্দুতে এ অর্থেই রেযাকার শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে যাদেরকে থানা নির্বাহী-অফিসার (টিএনও) বলা হয়, ১৯৭১ সালে তাদেরকে সার্কেল অফিসার বলা হতো। সরকার এ সার্কেল অফিসারদের মাধ্যমে হাটে-বাজারে ঢোল পিটিয়ে জনগণের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট বয়সসীমা

অনুযায়ী লোক সংগ্রহ করে তাদেরকে 'রেযাকার' হিসেবে নিয়োগ দেয়। তাদেরকে সামান্য ভাতাও দেওয়া হতো।

রেযাকার বাহিনী জেলার পুলিশ সুপার ও থানার দারোগাদের নিয়ন্ত্রণে কাজ করতো। তাদের হাতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র দেওয়া হয়নি। শুধু লাঠিই তাদের হাতিয়ার ছিলো। তাদেরকে প্রধানত পাহারা দেবার কাজেই ব্যবহার করা হতো। যেসব জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের হামলার আশঙ্কা ছিলো সেখানেই তাদেরকে পাহারা দেবার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হতো।

সরকারি পুলিশ বাহিনীর একাংশ মুক্তিযুদ্ধে শরীক হওয়ায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশের অভাব ছিলো। তাই পাহারায় নিযুক্ত পুলিশদের সাথে রেযাকাররাও পাহারা দিতো। বহু জায়গায় বন্দুকধারী পুলিশ দেওয়া সম্ভব হতো না। সেসব জায়গায় লাঠিধারী রেযাকাররাই দায়িত্ব পালন করতো।

সশস্ত্র পাক-সেনাদের গাড়ি চলাকালে বিঘ্ন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তার পুল ও কালভার্ট বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতো। তাই প্রতিটি পুল ও কালভার্টকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য রেযাকারা পাহারা দিতো। মুক্তিযোদ্ধারা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আসে বলে কিছু সংখ্যক রেযাকারের জন্য পুল পাহারা দেবার উদ্দেশ্যে বন্দুকের ব্যবস্থাও করতে হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে ঠিকমতো লেখাপড়া চলে, সে জন্য সেখানেও পাহারায় রেযাকারদেরকে কাজে লাগানো হয়। মুক্তিযোদ্ধারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যুবক ও কিশোর বয়সের ছেলেদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে আসতো। তারা যেন আসতে না পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখার দায়িত্ব রেযাকাররা পালন করতো। একই কারণে ঢাকা শহরসহ জেলা শরহগুলোর হোস্টেলেও রেযাকাররা পাহারা দিতো।

ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য রেযাকাররা সর্বত্র পাহারা দিতো। এভাবে যতখানে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের আশঙ্কা ছিলো সবখানেই পাহারা দেবার প্রয়োজন দেখা দিলো। এভাবে সরকারকে ক্রমান্বয়ে রেযাকারদের সংখ্যা বাড়াতেই থাকতে হলো।

এতে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো যে, মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে রেযাকার ও মুক্তিযোদ্ধারা একে অপরের প্রতিপক্ষ ও দুশমনে পরিণত হয়ে গেলো। রেযাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে দেশের দুশমন মনে করতে লাগলো। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা ভারত থেকে ট্রেনিং, অস্ত্র ও বোমা নিয়ে এসে নানাভাবে নিজের দেশের ক্ষতি করছে। অপরদিকে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এ সব করে দলখদার পাক সেনাদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যেই ঐসব কাজ করছে।

কখনো খবর পাই যে, অমুক জায়গায় মুক্তিযোদ্ধারা এতজন রেযাকারকে নিহত করেছে। আবার খবর আসে যে, অমুক পুল বোমা দিয়ে উড়িয়ে দিতে এসে এতজন

মুক্তিযোদ্ধা ধরা পড়েছে। একদিন জানা গেলো যে, বখসীবাজারস্থ আলীয়া মাদরাসার বিপরীত পাশের মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের গেটে পাহারারত দু'জন রেযাকারকে দিনের বেলা লুঙ্গি পরা একজন লোক বাজার-ব্যাগে করে আনা স্টেনগান দিয়ে গুলী করে মেরে নিরাপদে চলে গেলো।

জনগণের মনোভাব

শিক্ষিত মহলের মনোভাব, আর জনসাধারণের মনোভাব এক রকম ছিলো না। শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অনুসারী তারা মহাখুশি। তারা দেখতে পেলো যে, ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সারাসরি সাহায্য করছে। তাই ভারত বাংলাদেশের পরম বন্ধু। তারা এ আশায় দিন গুনে চলেছেন যে, ভারতের মতো বড় দেশ যখন দায়িত্ব নিয়েছে তখন দেশ স্বাধীন হবেই হবে। শিক্ষিতদের মধ্যে যারা ভারতকে বন্ধু মনে করতে পারছিলেন না, ভারত সরকারের বিগত আচরণে যারা ভারতকে বিশ্বাস করা সম্ভব মনে করেননি, তারা খুব বিব্রত বোধ করলেন। তাদের মনে আশঙ্কা দেখা দিলো যে, ভারত আমাদেরকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করে তাদের কুক্ষিগত করে নেবে না তো? এই তো গেলো শিক্ষিত মহলের কথা।

সাধারণ মুসলিম জনগণের মনোভাব ১৯৭১-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত এক রকম ছিলো। তারপর মনোভাবে পরিবর্তন আসতে লাগলো। জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার হাসিল করার জন্য শেখ মুজিবের হাতে পাকিস্তানের ক্ষমতা তুলে দিতে চেয়েছিলো।

যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো এবং জনগণ জানতে পারলো যে, ভারত বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে তখন তারা দ্বিধায় পড়ে গেলো। ঐতিহাসিক কারণেই জনগণ ভারতকে মুসলমানদের বন্ধু বলে মনে করে না। এখনও বাংলাদেশের মুসলমান জনসাধারণের এ মনোভাব যথাস্থানেই বহাল আছে। তাই জনগণ ভাবনায় পড়ে গেলো। পাকিস্তান ভেঙে যাক তা জনগণ তখনও চায়নি।

কিন্তু জনগণের মধ্যে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আচরণে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে লাগলো। মুক্তিযোদ্ধাদের বোমায় কোন সেতু ধ্বংস হয়ে গেলে আশপাশের গ্রামগুলোকে জ্বালিয়ে দেবার ফলে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হলো। তাদের যুক্তি হলো যে, গ্রামবাসীরা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে আশ্রয় দেয় বলেই নাশকতা করতে সক্ষম হচ্ছে। গ্রামবাসীদের বক্তব্য হলো যে, মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে তাদের বাড়িতে উঠলে তাদেরকে তাড়াবার কোন সাধ্য তো তাদের নেই। এ কারণে গোটা গ্রামকে জ্বালিয়ে দেবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।

ঢাকার আশপাশের গ্রামগুলোতে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগীদের তালাশে সেনাবাহিনী অভিযান চালাতো। বাড্ডা গ্রামের ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ফজরের নামাযের পরপরই সেনাবাহিনী গ্রামটি ঘেরাও করে ফেললো। মাইকে ও

মেগাফোনে ঘোষণা করা হলো যে, ১০ বছরের বেশি বয়সের সকল পুরুষ অমুক মাঠে হাজির হয়ে যাও। লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মাঠে জমা হয়ে গেলো।

ঘেরাও পর্ব শেষ হবার পর ঐ এলাকার বাসিন্দা জামায়াতে ইসলামীর কর্মী আব্দুল হান্নান আমার বাড়িতে এসে রিপোর্ট দিলেন। মাঠে সমবেতদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। তিনি চল্লিশোর্ধ বয়সের ছিলেন। বললেন, মাঠে উপস্থিত সকলকে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড় করানো হলো। ১৫ থেকে ২৫ বছরের কিশোর ও যুবকদের আলাদা হয়ে দাঁড়াতে বললো। এদেরকে ছাড়া বাকি সবাইকে যার যার বাড়িতে চলে যেতে বলা হলো। এদের মধ্যে যাদেরকেই সন্দেহ হলো তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধরে নিয়ে গেলো।

এভাবে নিছক সন্দেহের শিকার যারা হলো তাদের পরিবারই শুধু নয়, গোটা বাড্ডাবাসী চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হলো। যারা সেনাবাহিনীর সামান্য বিরোধীও ছিলো না তারাও মুক্তিযোদ্ধাদের পরম বন্ধু হয়ে গেলো। এভাবেই পাক সেনারা তাদের ভ্রান্ত কর্মনীতির দ্বারা জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা চিন্তার দিকে ঠেলে দিলো।

আবদুল হান্নান সাহেব এমন একটি খবর দিলেন, যা সবচেয়ে মারাত্মক। পুরুষরা সব মাঠে জমা হবার পর কতক সৈনিক বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশি চালালো। কোন পুরুষ লুকিয়ে আছে কিনা তা দেখাই নাকি উদ্দেশ্য। পুরুষরা মাঠে চলে আসার পর মহিলারা তো এমনিতেই আতঙ্কিত ছিলো যে, তাদের লোকদের কি না কি হয়। যখন পুরুষদের অনুপস্থিতিতে সেনারা বাড়িতে ঢুকার খবর জানাজানি হলো তখন হান্নান সাহেবের পাড়ার কয়েকজন মহিলা তারই ঘরে একত্র হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করছিলো। এক সৈনিক ঐ ঘরে ঢুকে বললো, মায়েরা তোমাদের যার যার ঘরে গিয়ে কুরআন পড়ো। মহিলারা চলে গেলো। তাদের মধ্যে একজনই যুবতী ও সুন্দরী ছিলো। হান্নান সাহেবের স্ত্রী লক্ষ্য করলেন যে, সৈনিকটি তারই পেছনে পেছনে যাচ্ছে। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি ঐ মহিলার ঘরে যেয়ে দেখেন যে সে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। হান্নান সাহেব চোখের পানি ফেলে বললেন যে, ঐ মেয়েটি গ্রাজুয়েট এবং মাত্র একমাস আগে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিবাহিত হয়ে নিরাপদ জীবনের আশায় পাকিস্তানে এসেছেন।

আমি তখন তখনই ফরমান আলী খানকে তীব্র ক্ষোভের সাথে ঘটনাটি জানালাম। ইতোমধ্যে তিনি প্রমোশন পেয়ে মেজর জেনারেল হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, "আমি এক্ষুণি সার্কিট হাউজে অমুক ব্রিগেডিয়ারকে জানাচ্ছি। ব্রিগেডিয়ারের নামটা মনে নেই। তিনি আমাকে ফোন করে বললেন যে, আমি এখনি একজন ক্যাপ্টেনকে সেখানে পাঠাচ্ছি। পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কোন লোক দিতে পারেন কিনা? আমি বললাম, আপনি তাকে রমনা থানার সামনে আসতে বলুন। আমার বাড়ি তালাশ করতে করতে দেরি হয়ে যেতে পারে। আমি ঐ গ্রামের লোককেই সাথে দিতে পারবো। হান্নান সাহেবকে নিয়ে ২/৩ মিনিটের মধ্যেই থানার গেটের সামনে রাস্তায় ক্যাপ্টেনের ব্যাজপরা এক লোককে দু'জন সৈনিকসহ জীপে পেলাম। তিনি

আমাকে দেখেই জীপ থেকে নেমে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, "যদি অপরাধীকে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে ঐ মহিলার সামনেই তাকে গুলী করে মারা হবে।" তিনি হান্নান সাহেবকে জীপে তুলে নিয়ে গেলেন।

পরে হান্নান সাহেব থেকে জানলাম যে, ক্যাপ্টেন ঐ মহিলাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, "যারা এখানে ডিউটিতে ছিলো তাদেরকে আপনার সামনে হাজির করতে চাই। আপনি ঐ পশুকে চিহ্নিত করতে পারবেন কিনা?" মহিলা মাথা নেড়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। তিনি বারবার বললেন, "তাদেরকে আপনার সামনে নিয়ে আসার অনুমতি দিন।" মহিলা বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, "আমি তো ভয়ে ও ঘৃণায় চোখ বন্ধ করেই ছিলাম। আমি কি ঐ শয়তানের চেহারা দেখেছি?" ক্যাপ্টেন বললেন, "আপনার উপর যে যুলুম করা হয়েছে এর প্রতিকার তাহলে কেমন করে করা যাবে?" মহিলা বললেন, "এ গ্রামের যে ছেলেগুলোকে ধরে নিয়ে গেছে, তাদেরকে ছেড়ে দিন। এরা কোন দোষ করেনি।" এ মহিলার আবেগের প্রতি সম্মান দেখিয়ে ছেলেগুলোকে সেদিনই ছেড়ে দিলো। এ ঘটনায় গোটা গ্রামবাসী হান্নান সাহেব ও ঐ মহিলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

ঐ গ্রামে সেদিন এ একটি মহিলার সাথেই পাশব আচরণ করা হয়েছে। কিন্তু এ জাতীয় আচরণে একজন নরপশুর কারণে গোটা সেনাবাহিনীই কি কলঙ্কিত হলো না? নারী ধর্ষণ এমন এক জঘন্য কাজ যে, এ জাতীয় ঘটনার সংখ্যা যাই হোক পাক-বাহিনী এর ফলে ব্যাপকভাবে জনগণের আস্থা হারালো। মানুষ খুন করার চেয়েও নারীধর্ষণ অনেক বেশি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

একদিন আমি মেজর জেনারেল ফরমান আলী খানকে জনগণের মধ্যে ধর্ষণের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানালে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "এ কারণেই সব দেশে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে রাখা হয়। জনগণের সাথে মেশার সুযোগ দেওয়া হয় না। এখন এদেরকে জনগণের সাথে ময়দানে নামিয়ে দেওয়ার কারণে এ জাতীয় কিছু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সব দেশেই দেখা যায় যে, সেনাবাহিনীকে ময়দানে ছেড়ে দিলে এমন অবস্থা হয়।" আমি বললাম, "বর্তমান পরিস্থিতিতে এর চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনগণ পাকিস্তান-বিরোধী হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া সেনাবাহিনী আল্লাহর সাহায্যও হারাচ্ছে।" তিনি হতাশা প্রকাশ করে বললেন, "সেনাবাহিনীর নৈতিক মানের উন্নয়ন ছাড়া তাদেরকে জনগণের মধ্যে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।"

আমার মানসিক প্রতিক্রিয়া

১৯৭১-এর ঐ দিনগুলোর কথা মনে হলে এখনও যেন হৃদয়ে রক্তক্ষরণের অনুভূতি জেগে উঠে। রেযাকাররা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারতের দালাল বলে গালি দিতো। আর মুক্তিযোদ্ধারা রেযাকারদের পাঞ্জাবীদের গোলাম বলে ঘৃণা প্রকাশ করতো। আমার মনে বড়ই বেদনা বোধ হতো।

ভুট্টো ও ইয়াহইয়া খানের বিরুদ্ধে আমার মন বিষিয়ে উঠতো। এরা নিতান্তই ব্যক্তিগত স্বার্থে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রটিকে ভেঙে দেবার ষড়যন্ত্র করলো।

বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়ে একদিকে পাকিস্তানের চিরদুশমন ভারতকে আধিপত্য বিস্তারের মহাসুযোগ করে দিলো, অপরদিকে বাঙালি মুসলমানদেরকে ভারতপন্থি ও ভারত-বিরোধী ভূমিকা পালন করতে বাধ্য করে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলো।

পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে পশ্চিম-পাকিস্তানের মতো শিয়া-সুন্নী বিরোধও যেমন ছিলো না, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পাঠান ও বেলুচের মতো কোন বিভিন্নতাও ছিলো না। ভাষার দিক দিয়ে তো পূর্ণ ঐক্য ছিলোই; ধর্মের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকলেও কোন সাম্প্রদায়িক লড়াইয়ের পরিবেশ ছিলো না। ৭০-এর নির্বাচনে জনগণের মধ্যে কোন প্রকার রাজনৈতিক সংঘাতও দেখা দেয়নি। শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।

ভুট্টো ও ইয়াহইয়া চক্র নির্বাচনে জনগণের সুস্পষ্ট রায়ের প্রতি সামান্য সম্মান প্রদর্শনও করলো না। ব্যালটের ফায়সালাকে বুলেট দিয়ে দাবিয়ে রাখার জঘন্য সিদ্ধান্ত করে গণতন্ত্রকে হত্যা করলো। এদেরকে কি কোন সংজ্ঞায়ই মানুষ বলা চলে? তাদের মধ্যে সামান্য মুসলমানিত্ব থাকলেও এমন অন্যায় সিদ্ধান্ত নিতে পারতো না। ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানকে যে শক্তি ঐক্যবদ্ধ করে এক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিলো, সে ভিত্তিতে তো পাকিস্তানের শাসকরা ২৩ বছরে চরমভাবে দুর্বল করে ফেলেছিলোই, এ চক্র সে ভিত্তিমূলকেই ধ্বংস করে দিলো।

আমি ভাবতাম যে, মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারতের দালাল বলে গালি দিলেই কি তাদের দেশপ্রেম মিথ্যা হয়ে যাবে? এরা কেন ভারতে যেয়ে যুদ্ধের ট্রেনিং নিতে বাধ্য হলো? নির্বাচনের পর শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হতে দিলে কি তাদের ভারতে যাবার কোন প্রয়োজন হতো? এরা কি শখ করে মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে? ভুট্টো ও ইয়াহইয়া জোর করেই পূর্ব-পাকিস্তানকে মুক্তিযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ কুচক্রই আমাদের উপর মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে।

অপরদিকে যারা ভারতের গোলাম হয়ে যাবার আশঙ্কায় মুক্তিযুদ্ধে শরীক হতে পারলো না, তাদেরকে পাঞ্জাবীদের দালাল বলে বিদ্রূপ করলেই কি তাদের দেশপ্রেম মিথ্যা হয়ে যাবে? যে রেযাকাররা দেশকে নাশকতামূলক তৎপরতা থেকে রক্ষার জন্য জীবন দিচ্ছে তারা কি দেশকে ভালোবাসে না? তারা কি জন্মভূমির দুশমন হতে পারে? এসব ভাবনায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ভুট্টো-ইয়াহইয়ার প্রতি চরম ঘৃণা বোধ করতাম।

এতো বড় দুঃখজনক পরিস্থিতি এড়াবার জন্য যা করণীয় ছিলো, তা করতে ব্যর্থ হবার জন্য শেখ মুজিবকেও আমি দায়ী মনে করতে বাধ্য হতাম। ইতঃপূর্বে তাঁর সম্পর্কে আমি আলোচনায় লিখেছি যে, তাঁর মতো বড় নেতার যে দূরদৃষ্টি থাকা উচিত ছিলো এর বড়ই অভাব ছিলো। গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে যে আবার সামরিক শাসনের মুসীবত আসতে পারে তা যেমন তিনি বুঝতে পারেননি, ইয়াহইয়ার সাথে তাঁর সংলাপ সফল না হলে এর পরিণাম কি হতে পারে তাও তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সারাদিন তিনি ইয়াহইয়া খানের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় কাটালেন। ইয়াহইয়া যে সামরিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তা তিনি সামান্য আঁচও করতে পারলেন না।

ঐ সময় তাঁর যে সর্বোচ্চ অবস্থান ছিলো তাতে তিনি ইয়াহইয়া খানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা করে জনগণকে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার ডাক দিতে পারতেন। দেশে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা ছিলো না। নির্বাচনে যারা তাঁকে ভোট দেয়নি তিনি তখন তাদেরও নেতা। এমনকি পূর্ব-পাকিস্তান সরকারও তখন তাঁর নির্দেশ মেনে চলছিলো। ২৩ মার্চ রাজধানী ঢাকায়ও পাকিস্তানের পতাকা উড়েনি।

তিনি যদি বুঝতে পারতেন যে, ২৫-এর দিবাগত রাতে ইয়াহইয়া সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পুনর্দখলের চেষ্টা করবে, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তাজুদ্দীন ও সৈয়দ নজরুল ইসলামদের মতো ভারতে চলে যেতেন এবং সেখান থেকেই তিনি মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন। পূর্ব-পাকিস্তানের বেসামরিক সরকার তো ৩ মার্চ থেকেই তাঁর আনুগত্য করছিলো। তিনি প্রশাসন, পুলিশ, আদালত ইত্যাদিতে কর্মরত সবাইকে অফিস বর্জন করার নির্দেশ দিতে পারতেন। তাহলে টিক্কা খান সরকার পরিচালনার জন্য কোন কর্মকর্তা ও কর্মচারী না পেয়ে শেখ মুজিবের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতেন। তিনি এ সবের কিছুই না করায় এ কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হলো যে, তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেননি। এর কোন পরিকল্পনাও তাঁর ছিলো না।

যদি এমন কোন পরিকল্পনা তাঁর থাকতো এবং তেমন সিদ্ধান্ত তিনি নিতেন তাহলে নিছক একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি ইয়াহইয়া সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হবার অপেক্ষা করতেন না। ইতঃপূর্বে তিনি বহুবার যেমন গ্রেপ্তার হয়েছেন, এবারও তেমনি গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। ইয়াহইয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত থাকলে তিনি এভাবে গ্রেপ্তার হতেন না। কোন সেনাপতি যুদ্ধ ঘোষণা করে প্রতিপক্ষের হাতে নিজের ইচ্ছায় বন্দি হতে পারে না।

শেখ মুজিবের প্রতি আমার ক্ষোভের কারণ এটাই। স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার যখন কোন সিদ্ধান্ত ছিলো না, তখন ইয়াহইয়ার সাথে সংলাপকে ব্যর্থ হতে দিলেন কেন? প্রয়োজনীয় ছাড় দিয়ে হলেও সমঝোতায় পৌঁছা উচিত ছিলো। পরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে ক্ষমতা হাতে নিয়ে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ৬ দফার উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব হতো। কোন অবস্থায়ই সংলাপকে ব্যর্থ হতে দেওয়া উচিত ছিলো না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, শহীদ সোহরাওয়ার্দী যদি শেখ মুজিবের অবস্থানে থাকতেন তাহলে এমন ভুল করতেন না। রাজনৈতিক প্রয়োজনে সোহরাওয়ার্দীর মতো জাঁদরেল নেতাও ১৯৫৫ সালে মুহাম্মদ আলী বগড়ার কেন্দ্রীয় কেবিনেটে মন্ত্রী হতে সম্মত হয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের জুন মাসে আমি করাচী যাবার জন্য লাহোর বিমান বন্দরে

পৌঁছলাম। প্রখ্যাত আইনজীবী একে ব্রোহী এগিয়ে আমাকে ধরে তাঁর আসনের পাশে নিয়ে বসালেন। ১৯৬৪ সালে তিনি জামায়াতের উকিল হিসেবে পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টে বিজয়ী হন। আইয়ূব খান জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণা করেছিলেন। তখন থেকে ব্রোহী সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তিনিই প্রথমে কথা শুরু করলেন। বললেন, "শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলায় আমি তাঁর উকিল ছিলাম। মক্কেল কখনো উকিলের সাথে মিথ্যা বলে না। মামলার স্বার্থেই কোন কথা গোপনও করে না। উকিল হিসেবে তাঁকে বহু জেরা করে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, তিনি পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চাননি। নির্বাচনের ফলাফলকে উপেক্ষা করার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করে প্রমাণ করেছেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ ও বেসামরিক সরকার চায় যে, শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হোক। এখনও তিনি আশা করেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন।"

শেখ মুজিব যে স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেননি, এ কথার পক্ষে ব্রোহী সাহেবের মতামত আরও একটি মযবুত প্রমাণ।

১১১.

'৭১-এর বড় বড় দুটো ভুল

১৯৭১ সালে দু'পক্ষের দু'টো মারাত্মক ভুল পরিস্থিতিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিষাক্ত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ থেকে অবাঙালিদেরকে পাকিস্তানের সমর্থক হবার অপরাধে নির্বিচারে হত্যা করার সিদ্ধান্তটি যারাই নিয়ে থাকুক, তা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বাঙালিদের প্রতি অধিকতর হিংস্র হতে বাধ্য করেছে। আওয়ামী লীগের আসল নেতারা তো তখন ভারতে ছিলেন। এ সিদ্ধান্ত তারাই করে পাঠিয়েছেন কিনা আল্লাহই জানেন। এর কোন প্রয়োজন ছিলো না। এটাকে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে কোন কল্যাণকর সিদ্ধান্ত বলে গণ্য করা যায় না।

টিক্কা খান ঢাকাকে নিয়ন্ত্রণে নেবার পর জেলা ও মহকুমা শহরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে একমাস সময় লেগেছে। এ সময়ের মধ্যে দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, সান্তাহার, চট্টগ্রাম ইত্যাদি বেশ কয়টি জায়গায় নারী-শিশুসহ অবাঙালি মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থেকে এমন অমানবিক তৎপরতা চলতে দেয়। ঢাকায় সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব থাকায় এখানে ঐ রকম কিছু হতে পারেনি। সৈয়দপুর ও পার্বতীপুরে বিরাট সংখ্যায় অবাঙালিরা থাকায় এবং সংগঠিত অবস্থায় ছিলো বলে সেখানেও হত্যাকাণ্ড হতে পারেনি।

যেসব শহরে অবাঙালি হত্যার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে যখন সেনাবাহিনী পৌঁছে জীবিতদের কাছ থেকে ঐ লোমহর্ষক ঘটনার করুণ বিবরণ শুনেছে এবং অবাঙালিদের বাড়িঘরের অবস্থা দেখেছে, তখন স্বাভাবিকভাবে তাদের মধ্যে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পাকিস্তানের সমর্থক হওয়াই অবাঙালিদের একমাত্র

অপরাধ। এ অবস্থায় জীবিত অবাঙালিরা যাদেরকে হত্যাকাণ্ডের সহায়ক বা সমর্থক বলে চিহ্নিত করেছে, তাদেরকে সেনারা তীব্র আক্রোশের সাথে হত্যা করেছে।

এ অপকর্মটি কাদের সিদ্ধান্তে কারা করেছে তা তো সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের লোকেরাই তা করেছে। তখন প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থাকায় এমন জঘন্য কর্ম বিনা বাধায় করা সম্ভব হয়েছে। এ কর্মটি সেনাবাহিনীকে ক্ষিপ্ত করেছে এবং অনেক বাঙালি হত্যার নিমিত্ত হয়েছে। এ কর্মটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য ছিলো না। কোন দিক দিয়েই তা সহায়কও প্রমাণিত হয়নি।

যাদের নিকট মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই, নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করতে যাদের মনে কোন দ্বিধা জন্মে না, এমন পাষাণ হৃদয়ের লোকেরা বলতে পারে যে, এ কাজের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে ক্ষেপিয়ে দেওয়ায় তাদের হিংস্র আচরণ জনগণকে পাকিস্তান-বিরোধী বানাতে সহায়তা করেছে এবং পরোক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সহায়ক হয়েছে।

দ্বিতীয় ভুলটি সেনাবাহিনীর লোকেরা করেছে। তারা হিন্দুদেরকে পাকিস্তানের বিরোধী হিসেবে গণ্য করে কোথাও কোথাও তাদেরকে অনর্থকই হত্যা করেছে। যেমন ঢাকার শাঁখারী পট্টি। ইসলামপুর থেকে একটি দীর্ঘ গলিপথ কোর্ট-কাচারির দিকে এসে শেষ হয়েছে। গলিটি প্রশস্ত নয় বলে এ পথে গাড়ি চলে না। গলির দু'দিকে খুবই ঘনবসতি। অধিবাসীরা সবাই হিন্দু। এদের প্রধান পেশা শাঁখের অলংকারাদি তৈরি করা।

খবর পেলাম শাঁখারী পট্টি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং মানুষসহ পুড়ে গেছে। যতটুকু মনে পড়ে, এ ঘটনা '৭১-এর এপ্রিলের প্রথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহে হবে। দেখতে গেলাম। পূর্বদিক থেকে তিনচারটি বিল্ডিং যার মধ্যে দো'তলা দালানও ছিলো পুড়ে গেছে এবং ছাদ ও দেয়াল ভেঙে পড়েছে। এ ধ্বংসাবশেষের মধ্যেই মানুষের কয়েকটি অগ্নিদগ্ধ কঙ্কাল পড়ে আছে। ঘটনার বিবরণ জানার জন্য ঐ গলির কোন বাসিন্দা পাওয়া গেলো না। রাতে এ ঘটনা ঘটেছে, আর সকালের মধ্যেই ঐ দীর্ঘ গলিতে বসবাসরত শত শত মানুষ ভারতে চলে গেছে।

মোটা বুদ্ধির সৈনিকরা এভাবে কিছু হিন্দুকে অনর্থক মেরে হিন্দু সম্প্রদায়কে ভারতে যেতে বাধ্য করলো। এর রাজনৈতিক পরিণাম যে কত মারাত্মক তা বুঝবার সাধ্যও বন্দুকধারীদের নেই। লোকমুখে শোনা যায়, সেনারা নাকি বলে যে, পূর্ব-পাকিস্তানকে পাক করতে হলে হিন্দুদেরকে তাড়াতে হবে।

সেনাদের মধ্যে প্রায় সবাই পাঞ্জাবের লোক। পাঞ্জাবে হিন্দু নেই। পাঞ্জাবে মুসলমান ছাড়া শিখরাই বিরাট সংখ্যায় ছিলো। '৪৭-এ শিখ ও মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক দাঙ্গার ফলে পূর্ব-পাঞ্জাবে শিখ ও পশ্চিম-পাঞ্জাবে মুসলমানরা কেন্দ্রীভূত হয়। পশ্চিম-পাঞ্জাব পাকিস্তানে রয়েছে, যেখানে অমুসলিম বলতে শুধু কাদিয়ানীদেরকে

বুঝায়। হিন্দু বা শিখদের সাথে সেখানে মুসলমানদের সহ-অবস্থান নেই। তাই পাক সেনারা নাকি পূর্ব-পাকিস্তানকেও অমুসলিম থেকে পবিত্র করতে চায়।

আমি ফরমান আলী খানকে জিজ্ঞেস করলাম যে, হিন্দুদের ব্যাপারে সরকার এমন কোন মনোভাব পোষণ করে কিনা। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন যে, কোন সেনসিবল সরকার কি এমন উদ্ভট সিদ্ধান্ত নিতে পারে? আমি বললাম, তাহলে বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-হত্যা কেমন করে হলো? তিনি জওয়াবে বললেন, অস্ত্র দিয়ে ময়দানে নামিয়ে দিলে কেউ কেউ বাড়াবাড়ি করে ফেলে। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, যাতে আর একটি ঘটনাও না ঘটে। আমি মন্তব্য করলাম, "সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন এ হুঁশিয়ারিতে আর কোন ঘটনা না ঘটলেও কতক হিন্দুকে মেরে সবাইকে ভারত চলে যাবার নোটিশ দেওয়া হয়ে গেলো। এর পরিণাম অত্যন্ত মন্দ।"

হিন্দুরা বিরাট সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবার পরিণাম যা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১. তারা সেখানে যেয়ে হিন্দুদের উপর চরম নির্যাতনের করুণ কাহিনী শুনিয়ে জনগণ ও সরকারের সহানুভূতি অর্জন করেছে।
২. সরকার লাখ লাখ আশ্রয়প্রার্থীর থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হওয়ায় টিক্কা খান সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধকে সর্বদিক দিয়ে সুসংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গত যুক্তি পেয়েছে।
৩. মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতার জন্য ভারত সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থ সাহায্য ঐ আশ্রয় প্রার্থীদেরকে দেখিয়ে বিশ্বের দাতা সংস্থাগুলো থেকে অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।
৪. পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য আন্তরিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা কর্তব্য মনে করেছে, যাতে হিন্দু আশ্রয়প্রার্থীরা বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারে।

শান্তি কমিটি গঠন

পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল মৌলভী ফরিদ আহমদ ও পূর্ব-পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি সাইয়েদ খাজা খায়রুদ্দীনের উদ্যোগে ডেমোক্রেটিক পার্টির চেয়াম্যান জনাব নূরুল আমীনের বাড়িতে এক বৈঠক ডাকা হয়। এটা সম্ভবত '৭১-এর এপ্রিল মাসের শেষ দিকে। উক্ত বৈঠকে আমাকেও দাওয়াত দেওয়া হয়। উদ্যোক্তাগণ ছাড়া সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে যাদের নাম মনে পড়ে, তারা হলেন– প্রাদেশিক পাকিস্তান লীগের সেক্রেটারি এ.কিউ.এম শফীকুল ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মাহমুদ আলী, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল জব্বার খদ্দর, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা পীর মুহসীনুদ্দীন (দুদু মিয়া), কৃষক-শ্রমিক পার্টির এ. এস. এম সুলাইমান, আওয়ামী লীগের এ. কে. রফিকুল হোসেন

(খায়ের মিয়া) ও মাওলানা নুরুয্‌যামান। জনাব নূরুল আমীনের সভাপতিত্বে বৈঠক শুরু হলো।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে মৌলভী ফরিদ আহমদ প্রথম বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন ঃ

"আওয়ামী লীগ নেতারা সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে আন্দোলনে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা ভারতে পালিয়ে গেলেন। এদিকে সরকার সেনাবাহিনীকে দিয়ে আন্দোলন দমন করতে গিয়ে যে সশস্ত্র অভিযান চালাচ্ছে, তাতে নিরীহ জনগণই বেশি নির্যাতিত হচ্ছে। যারা আন্দোলনে সক্রিয় তারা সবাই আত্মগোপন করছে বা ভারতে চলে গেছে। শেখ মুজিবের নির্দেশে প্রশাসন, পুলিশ, ব্যাংক, আদালত সবই চলছিলো। টিক্কা খান ঐ সরকার পুনর্দখলের উদ্দেশ্যে যা কিছু করছেন তাতে নিরপরাধ লোকেরা যাতে বিপদগ্রস্ত না হয় এবং সেনাবাহিনী যেন বাড়াবাড়ি না করে এমন ব্যবস্থা হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। যারা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে তারা কার কাছে আশ্রয় পাবে? আমরা যারা রাজনীতি করি জনগণ তাদের কাছেই সাহায্যের জন্য আসছে ও আসবে। আমরা তাদেরকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সে বিষয়ে আমাদের মতবিনিময়ের উদ্দেশ্যেই এ বৈঠক ডাকা হয়েছে।"

এ. কে. রফিকুল হোসেন আরও অগ্রসর হয়ে কথা বললেন। তিনি আমার থানা নবীনগরেরই লোক। আমাদের পাশের ইউনিয়নেই তার বাড়ি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি যুক্ত ফ্রন্টের নমিনেশন পেয়ে নির্বাচিত হন। তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের লোক ছিলেন এবং জনাব আবুল মনসূর আহমদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন ঃ

"আমরা যাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তান কায়েম করেছিলাম, সে পাকিস্তানকে ভারত দখল করে নিক তা আমরা চাইতে পারি না। ভারত আমাদের বন্ধু হতে পারে না। আওয়ামী লীগ নেতারা এ দেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার জন্য ভারত সরকারের নিকট আশ্রয় নিয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, ভারত পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার এ মহা সুযোগ গ্রহণ করবে। আমার আশঙ্কা যে, আমরা দিল্লীর গোলামে পরিণত হতে যাচ্ছি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যে চেষ্টা করছে তাতে তাদের সাথে আমাদের সহযোগিতা করা কর্তব্য। ভারতীয় কংগ্রেসের অধীনতা থেকে মুক্তির জন্যই আমরা পাকিস্তান আন্দোলন করেছিলাম। আমরা আবার সে কংগ্রেসের অধীন হতে পারি না।"

আমি কথা বলার জন্য অনুমতি চাইবো এমন সময় আবদুল জাব্বার খদ্দর সাহেব অনুমতি না নিয়েই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খায়ের মিয়ার বক্তব্যকে জোরেশোরে সমর্থন করলেন। রফিকুল ইসলামের নামের শুরুতে যে 'এ. কে.' রয়েছে তা-ই আবুল খায়ের। তাই তিনি খায়ের মিয়া নামেই পরিচিত ছিলেন। খদ্দর সাহেব বেশ বয়স্ক লোক। তিনিও ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত হন। তিনি মাওলানা ভাসানীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং ১৯৪৯ সালে যখন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়, তখন থেকেই নেতাদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। তিনি আরও জোশের সাথে বললেন ঃ

"সেনাবাহিনী পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে এসে এ দেশকে ভারতের খপ্পর থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ভারত জয়ী হলে এরা কেউ পালাতেও পারবে না। এ অবস্থায় আমাদেরকে তাদের এ প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা কর্তব্য।"

সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি দাঁড়ালাম। অত্যন্ত শান্তভাবে ধীরস্থির হয়ে আবেগহীন স্বরে বললাম ঃ

"এ দেশের রাজনীতিতে আজকের সভাপতি সাহেব ছাড়া আমরা কেউ গণ্য নয়। গত নির্বাচনে আমাদের কারো কোন পাত্তা ছিলো না। একমাত্র নূরুল আমীন সাহেব নির্বাচিত হতে সক্ষম হন। আর সকল আসনই শেখ মুজিব পেয়েছেন। জনগণের নিকট আমাদের কতটুকু মূল্য আছে? নির্বাচনে জনগণ যাদেরকে ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান যে কেমন জঘন্য চক্রান্ত করেছেন তা জনগণ ও বিশ্ববাসী লক্ষ্য করেছে। নির্বাচনের ফলাফলকে চরম অবজ্ঞার সাথে উপেক্ষা করে, এমনকি পূর্ব-পাকিস্তান বেসামরিক সরকারকে শেখ মুজিবের আনুগত্য করতে দেখেও ইয়াহইয়া খান শেখ মুজিবের সাথে সংলাপে কোন সমঝোতায় পৌঁছতে সক্ষম হলেন না। রাজনৈতিক মতবিরোধকে রাজনৈতিকভাবেই মীমাংসা করতে হয়। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে তা করা যায় না।

ইয়াহইয়া খান জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে ভারতের হাতে তুলে দিলেন। আমরা জনগণের প্রতিনিধি নই। আমরা এ সমস্যার কি সমাধান দেবো? সবচেয়ে বড় কথা হলো, কোন সামরিক শক্তি ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ করেনি। শুধু সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এ ঐক্য বহাল রাখা যাবে না। আমরা কিভাবে টিক্কা খানের সাথে সহযোগিতা করবো? তারা যা করছেন তাতে কি আমাদের কোন পরামর্শ চেয়েছেন? তারা কি আমাদের কথামতো চলবেন?

এসব কথা বিবেচনা করেই আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। পাকিস্তান টিকে থাকুক, আমাদের দেশ ভারতের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকুক, এটা অবশ্যই আমাদের সবার আন্তরিক কামনা। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের হাতে কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। তাই আমি মৌলভী ফরিদ আহমদের প্রস্তাব সমর্থন করি এবং অসহায় জনগণের যতটুকু খিদমত করা সম্ভব সে প্রচেষ্টায়ই আমাদের সীমাবদ্ধ থাকা উচিত।"

অন্য কেউ কিছু বলার আগে সভাপতি সাহেব মন্তব্য করলেন, "আমাদের এট্ অল কিছু করা উচিত কিনা। কিছু করতে চাইলে কতটুকু করা উচিত সে বিষয়ে আপনারা মতামত দিন। আমরা কিছু করতে চাইলে কতটুকু করা সমীচীন এ বিষয়ে দু'রকম প্রস্তাব এসেছে। এখন আপনারা সবাই মতামত প্রকাশ করুন।"

বৈঠকে ১৪/১৫ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। সবার নাম স্মরণে আসছে না বলে তাদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না। সভাপতি সবাইকেই কথা বলার পরামর্শ দিলেন। আমার কাছে খুব ভালো লাগলো যে, যত কথাই তারা বলুন শেষ পর্যন্ত মৌলভী ফরিদ আহমদের প্রস্তাবই সবাই সমর্থন করলেন। যে দু'জন সেনাবাহিনীর

সাথে সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন তারা তাদের প্রস্তাবের পক্ষে আর কোন বক্তব্য দিলেন না।

সর্ব-সম্মতভাবে 'শান্তি কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠিত হলো। মুসলিম লীগ নেতা খাজা খায়রুদ্দীনকে আহ্বায়ক করা হয়। প্রচার বিভাগের দায়িত্ব মাওলানা নুরুয্যামানের উপর ন্যস্ত করা হয়। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের সালার ছিলেন। ৭০-এর নির্বাচনের পূর্বে তিনি ভুট্টোর পিপলস্ পার্টির পূর্ব-পাকিস্তান শাখার সভাপতি হন। ইতঃপূর্বে অন্যান্য দলও তিনি গঠন করেছেন এবং তিনি সেসব দলের সভাপতি ছিলেন।

বৈঠকে কমিটি গঠনের পক্ষে যে যুক্তি সবাই মেনে নেন তা নিম্নরূপ ঃ

"বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় জনগণের তেমন কোন খিদমত করা সম্ভব নয়। সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাদের পক্ষ থেকে কোন সংস্থা গঠিত হলে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। সামরিক সরকার ও জনগণের মধ্যে এ শান্তি কমিটি যোগসূত্রের দায়িত্ব পালন করবে। সরকারকে জানানো হবে যে, শান্তি কমিটি সকল রাজনৈতিক দলের দায়িত্বশীল ও সমাজের অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদের দ্বারা গঠিত একটি সংস্থা। দেশের সর্বত্র এ কমিটির পক্ষ থেকে কোন আবেদন করা হলে যেন বিবেচনা করা হয়। কোন নির্দোষ লোক যেন নির্যাতিত না হয় সে জন্যই এ সংস্থা সরকারকে সাহায্য করবে, যাতে সরকার জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে।"

শান্তি কমিটির তৎপরতা

শান্তি কমিটির উদ্দেশ্য উল্লেখ করে পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হবার পর অল্পদিনের মধ্যে থানা পর্যায় পর্যন্ত কমিটি কায়েম হয়ে গেলো। রাজনৈতিক দলের বাইরেও এলাকার প্রভাবশালী ও গণ্যমান্য লোকদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হলো। অবশ্য এমন লোকেরাই কমিটিতে সক্রিয় হন, যারা চান যে, পাকিস্তান কায়েম থাকুক।

সারা দেশে বয়স্ক লোকদের মধ্যে মুসলিম লীগের পুরানো যথেষ্ট এমন লোক ছিলেন, যারা কোন না কোন সময় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বার এবং মুসলিম লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। মুসলিম লীগের নেতৃত্বের কোন্দলে এবং মুসলিম লীগ তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ায় ঐ সব লোক রাজনীতিতে সবাই সক্রিয় না হলেও তারা জনগণের নিকট পরিচিত ও প্রভাবশালী। থানা পর্যায়ে এ জাতীয় লোকেরাই শান্তি কমিটিতে নেতৃত্ব লাভ করেছেন। কারণ আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক দলের সংগঠন সব জায়গায় ছিলো না। জামায়াতে ইসলামী অন্যান্য দল থেকে অধিকতর সংগঠিত হলেও জেলা মহকুমা পর্যায়ের নিচে থানা পর্যায়ে তখনো সংগঠন বিস্তার লাভ করেনি। শান্তি কমিটিতে অন্যান্য যেসব দল শরীক হয়েছে, তাদের সব জেলা ও মহকুমায়ও দলীয় কমিটি ছিলো না।

প্রধান যে উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটি কায়েম হলো, সে ব্যাপারে শান্তি কমিটি

কর্তৃপক্ষের নিকট মোটামুটি গুরুত্ব পাওয়ায় জনগণ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে।

মুক্তিযোদ্ধারা শান্তি কমিটিকে তাদের দুশমন হিসেবেই ধরে নিয়েছে। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে যে, শান্তি কমিটিতে যারা আসছে তারা মুক্তিযোদ্ধাদেরকে তাদের কাজে সহযোগিতা করে না, বরং তাদের তৎপরতা যাতে এলাকায় না হয় সে জন্য তারা চেষ্টা করে। তাদের কেউ ধরা পড়লে তাদেরকে ছাড়িয়ে নেয় না। অথচ অন্যদেরকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে। মুক্তিযোদ্ধারা বোমা ও অস্ত্রধারী হওয়ায় সুযোগ পেলে তারা শান্তি কমিটির লোকদের উপর কোথাও বোমা হামলা করে, কোথাও গুলী করে হত্যা করে। এর ফলে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে শান্তি কমিটিও অস্ত্রধারী রেযাকারদের সহায়তা নিতে বাধ্য হয়। মুক্তিযোদ্ধারা শান্তি কমিটির সাথে শত্রুতা না করলে জনগণের পর্যায়ে শান্তি কমিটি ও মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হতো না। এমন ঘটনা যথেষ্ট আছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের বাড়িতে বাপ-মায়ের সাথে দেখা করতে আসলে শান্তি কমিটির লোকেরা তাদেরকে ধরিয়ে দেবার কোন চেষ্টা না করে তাদেরকে নিরাপদে ফিরে যেতে সাহায্য করেছে।

শান্তি কমিটির কারো কারো অপতৎপরতা

আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে উন্নত নৈতিক মান খুব কম লোকেরই আছে। তাই সুযোগ পেলেই ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করার প্রবণতা দেখা দেয়। শান্তি কমিটিতে এ জাতীয় লোকদের দ্বারাই বিভিন্ন রকম অন্যায়ও হয়েছে। ছোট অন্যায়ের নমুনা হলো বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করে তার কাছ থেকে আর্থিক প্রতিদান আদায় করা। এ ত্রুটি ঢাকায়ও হয়েছে। এক লোক আমাকে খিদমতের বদলায় টাকা দিতে চাইলো। আমি তীব্র আপত্তি করলে বললো যে, অমুক অমুক তো হামেশাই নিচ্ছে। বিস্মিত ও দুঃখিত হলাম। এ কারণেই হয়তো আমার কাছেই বেশি লোক আসতো। দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রামের অভ্যাসও ত্যাগ করতে হলো। মাস দুয়েক এভাবে চলার পর বুকে একটু ব্যথা অনুভব করলাম। ডাক্তারের পরামর্শ নিলাম। আমার বয়স তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। ডাক্তার বললেন যে, এ বয়সে দুপুরে খাবার পর কমপক্ষে আধাঘণ্টা শুয়ে থাকবেন। শান্তি কমিটির কেউ কেউ সুযোগ মতো দুর্নীতির আশ্রয়ও নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশেষ করে প্রশাসনের দায়িত্বে দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার বা পুলিশের সহায়তায় অন্যায়ভাবে সম্পদ দখলের মতো কুকর্মও হয়েছে।

১১২.

বিদেশ সফর

ধনী লোকদের বিদেশ সফর হলো প্লেজার ট্রিপ বা সখের ভ্রমণ। কঠিন পেশাগত জীবনের একঘেঁয়েমি থেকে দায়িত্বমুক্ত অবস্থায় হালকা মন নিয়ে জীবনটাকে কিছুদিন উপভোগ করাই তাদের এ সফরের উদ্দেশ্য। আমার পক্ষে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবার সৌভাগ্য থাকার কথা নয়। বিশ্বের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও

স্থান এবং চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত দর্শনীয় কীর্তি দেখার উদ্দেশ্যে যারা বিদেশ ভ্রমণ করেন আমি তাদের মধ্যেও গণ্য নই। আমার ৬ ছেলের মধ্যে ৪ জনই বিদেশে থাকে। তাদের কাছে কিছুদিন অবসর জীবন যাপনের জন্যও আমি সফর করিনি। এ ব্যাপারে তাদের দাবি থাকলেও আমি শুধু ঐ উদ্দেশ্যে সময় দিতে পারিনি। ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েই আমি বেশ কিছু দেশ সফর করেছি। এ বছর (২০০৩ সাল) ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত সৌদী আরব ও বাহরাইন সফর অবশ্য একটু ভিন্ন রকমের। এ সফর সম্পর্কেই এখন লিখছি। এর আগের সফরগুলোর বিবরণ ধারাবাহিক আলোচনায় আসবে ইন-শা-আল্লাহ।

আমার এবারের সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো দুটো। একটা হলো হজ্জ করা। বিদেশে বাধ্যতামূলক নির্বাসিত জীবনে ১৯৭৭ সালে শেষ হজ্জ করার পর সৌদী আরবে কয়েকবার সফর হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করার সুযোগ হয়নি। ২০০০ সালে হজ্জ করার উদ্দেশ্য ছিলো। নভেম্বর মাসেই ভিজিট ভিসা পেয়ে গেলাম। কিন্তু শেখ হাসিনা সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার পাসপোর্ট আটক করায় ঐ বছর হজ্জের আশা পূরণ হয়নি। সে আশা আল্লাহ তাআলা এবার মেহেরবানী করে পূরণ করালেন। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝিই হজ্জের যাবতীয় করণীয় সমাধা হওয়া সত্ত্বেও আরও দু'মাস সৌদী আরবে থাকার কারণ হলো দ্বিতীয় প্রধান উদ্দেশ্য পূর্ণ করা। সেটা হলো মাওলানা আবুল আ'লা মওদূদীর অনূদিত কুরআনের উর্দু তরজমা থেকে সহজ বাংলায় অনুবাদ করা।

এ সফর শুরু হলো বাহরাইন থেকে

বাহরাইন যাবার কোন সিদ্ধান্ত প্রথমে ছিলো না। কিন্তু সৌদী আরবে আসার পথে গাল্‌ফ-এয়ারের বিমানে বাহরাইন হয়ে আসলে সামান্য বাড়তি খরচেই হয়ে যায় বলে শেষ পর্যন্ত তাই করা হলো। এর প্রধান কারণ হলো, আমাদের বংশের কনিষ্ঠতম সদস্যা এক বছর বয়সী নাতনী সাফাকে দেখা। আমার ছোট ছেলে সালমানের এ মেয়েটির কথা ইতঃপূর্বে এক কিস্তিতে লিখেছি যে, তিন মাস থেকে তাকে না দেখে আমার স্ত্রী ওর অভাবটা এতো তীব্রভাবে অনুভব করতে লাগলেন যে, ওর কথা উঠলেই তার চোখ ভিজে যায়। এটা তো সবারই জানা যে, শিশুই হচ্ছে বাড়ির সবার আকর্ষণ। আমরা দু'জন কয়েক মাসের জন্য সৌদী আরব যাচ্ছি। মাসখানিক পর সে যখন ঢাকা ফিরে যাবে তখন আমরা সেখানে থাকবো না। তাই ওকে বাহরাইনে দেখে সৌদী আরব যাওয়ার সিদ্ধান্তই নিতে হলো। তা না হলে ওকে ৬ মাস দেখতে পাবো না।

বাহরাইন যাবার দ্বিতীয় কারণটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমাদের বেহানকে (সাফার নানী) একরকম মৃত্যুর দুয়ার থেকে আল্লাহ পাক ফেরত দিলেন। ডাক্তাররা তো নিজেরাই নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। ঢাকায় আমরা সবাই দোয়া করেছি। বিশেষ করে আমার স্ত্রী অত্যন্ত কাতরভাবে বারবার আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়েছেন।

তাই তিনিও বেহানকে দেখার জন্য পেরেশান হয়ে গেলেন। তাকে না দেখা পর্যন্ত বেশ অস্থিরতা প্রকাশ করছিলেন।

সাফার নানা ড. আবু সুফিয়ান বাহরাইন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। সাফার নানীর মারাত্মক অসুখ হওয়ায় বিদেশে আত্মীয়-স্বজনের অভাবে বিরাট সমস্যা দেখা দিলো। সাফার মাকে তার মায়ের সেবার জন্য বাধ্য হয়ে বাহরাইন যেতে হলো। সালমান নিজেই ওদেরকে নিয়ে গেলো এবং দু'সপ্তাহ পর ঢাকায় ফিরে গেলো।

গুড-উইল এভিয়েশনের জনাব শামসুল হকের সাথে ইসলামী আন্দোলনের সাথী হিসেবে দীর্ঘদিনের পরিচয়। বিমানের চাকরি থেকে অবসর নেবার পর তিনি তার এ ট্রাভেল এজেন্সি শুরু করেন। তারই পরামর্শে ইকোনমি ক্লাসের বদলে বিজনেস ক্লাসের টিকেট নিলাম। দুই বুড়াবুড়ি একা সফর করছি বলেই তিনি এ পরামর্শ দিলেন। আমি ইকোনমি ক্লাসেই সফর করে থাকি। আর সংগঠনের প্রয়োজনেই সফর করি বলে একা সফর করতে হয় না। আমার এ সফর নিতান্তই ব্যক্তিগত বলে সংগঠনের কেউ সাথে ছিলেন না। বিজনেস ক্লাসে বেশ কয়েক দিক দিয়েই আরাম ও সুবিধা পেলাম।

২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি সকাল ৬ টায় বিমান ছাড়ার কথা। এর পূর্ব রাত ১২টা থেকে তরুণ-তরুণীরা নববর্ষের উৎসব পালন করলো। আর আমাকে ৪টায় বিমানবন্দরে রওয়ানা হবার জন্য তিনটায়ই ঘুম থেকে জাগতে হলো। ৪টার আগেই বিমান-বন্দর থেকে ভাগ্নী-জামাই ইলইয়াস ফোনে জানালো যে, গালফ-এয়ারের বিমান বিলম্বে পৌছবে। ইলইয়াসের শ্বশুর আড়াইবাড়ীর পীর সাহেব মাওলানা গোলাম হাক্কানী এবং তার শাশুড়ি আমার আপন মামাত বোন। সে বাংলাদেশ বিমানে কর্মরত বলে সব সময়ই বিমানবন্দরে তার মূল্যবান খিদমত পাই।

বিমানের বিলম্ব হওয়ার খবরে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কত বিলম্ব হবে তাও জানা গেলো না বলে অস্বস্তি বোধ করলাম। শেষ রাত সাড়ে ৪টায় ইলইয়াস জানালো যে, এখনও বিমান দিল্লী থেকে ছাড়েনি। অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়া এক মহাবিড়ম্বনা। ফজরের নামাযের পর ঘুমাবার উদ্দেশ্যে শুলাম। এমন পরিস্থিতিতে ঘুম আসাও স্বাভাবিক নয়। যাহোক বিমান আসার সময় জানার পর সকাল ৯টায় বিমান বন্দরে পৌছলাম।

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ আমাকে ভিআইপি লাউঞ্জের সুবিধার ব্যবস্থা করতে গিয়ে বিমানের অনিশ্চয়তার কারণে নিজেও কষ্ট করলেন এবং অন্যান্য যারা সংশ্লিষ্ট তারা সবাই কষ্ট ভোগ করলেন। বিমানে উঠার জন্য যাওয়া পর্যন্ত তিনি উপস্থিত থেকে আমাকে বিদায় দিলেন।

ফজরের নামাযের আগেই বাড়ি থেকে রওয়ানা হতে হবে বলে আমার সেক্রেটারি নাজমুল হক এবং আমার সাবেক সেক্যুরিটি দায়িত্বশীল আবদুল গফুর সরকার আমার

বাড়িতেই ঘুমাতে বাধ্য হলেন। আমার মতো তাদেরকেও শেষ রাতে উঠে রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত দুর্ভোগ পোহাতে হলো। জামায়াতের পক্ষ থেকে বরাদ্দ করা আমার অনেক বছরের খাদেম সেলিম, আমার বাড়িতেই থাকে। তারও একই দশা হলো।

প্লেনের গেইটে পৌঁছতেই এক ক্রু আমার বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়েই 'ওয়েলকাম প্রফেসার' বলে সমাদর করে আমাদের দু'জনের আসনে পৌঁছিয়ে দিলো। বিজনেস ক্লাসের সমাদর ও সুবিধা ভোগ করা শুরু হলো। সারা পথেই তাদের আপ্যায়ন ও খিদমত পেলাম। ইকোনমি ক্লাসে এমনটা কখনও পাইনি।

ঢাকার সাথে বাহরাইনের সময়ে পার্থক্য ৩ ঘণ্টা। ১১টায় রওয়ানা হয়ে ৫ ঘণ্টা সফর করে ঢাকার সময় বিকেল ৪টায় বাহরাইন বিমান বন্দরে পৌঁছলাম।

সাফার সাথে দেখা হলো কিন্তু ধরা দিলো না

সাফা যখন ঢাকা থেকে আসে তখন তার বয়স ১১ মাস। তখনও সে ভালোভাবে হাঁটা শেখেনি। ৩ মাস পর যখন আমরা বাহরাইন পৌঁছলাম তখন ১৪ মাসের সাফা তুরতুর করে দৌড়ায়। ওর নানাকে দেখে দৌড়ে এলো হাসতে হাসতে। আমাদেরকে দেখে পালিয়ে গেলো। এ বয়সে অল্প কিছুদিনের মধ্যে শিশুরা পরিচয় ভুলে যায়। এ অভিজ্ঞতা আমার আছে। ১৯৬৪ সালে আইয়ূব খাঁর শাসনামলে জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্যদেরকে গ্রেপ্তার করার সময় আমি লাহোর থাকায় সেখানেই জেলখানায় দু'মাস ছিলাম। ঢাকা জেলে পৌঁছার পর আমার আব্বা-আম্মা ও স্ত্রী আমার সাথে জেলখানায় দেখা করতে গেলেন। আমার পঞ্চম ছেলে নোমানের বয়স তখন দেড় বছর। সে আমার কোলে আসলোই না।

বাহরাইনে তিন দিন থেকে ৫ জানুয়ারি দুপুরে জেদ্দায় রওয়ানা হই। সাফার দাদু বাসায় থাকায় দু'দিনেই কোলে আসার মতো ঘনিষ্ঠতা জন্মে। কিন্তু আমার কাছেও আসে না। জোর করে কোলে নিলে জোর করেই নেমে যায়। দরজার কাছে এসে রুকুর মতো দু'হাটুতে হাত রেখে খিলখিল করে হাসে। হাত বাড়ালেই পালায়। আবার আসে, আবার পালায়। এভাবেই সে লুকোচুরি খেলা দিয়েই আমাকে আপ্যায়ন করা যথেষ্ট মনে করে।

বাহরাইনে বাংলাদেশী দীনী ভাইয়েরা রোজ তিনটা করে দু'দিনে মোট ৬টা প্রোগ্রামে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখায় বাসায় এমন সময় পাই না যে, সাফার সাথে খাতির বহাল করার চেষ্টা করতে পারি। কথায় বলে, "ঢেকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানতে বাধ্য হয়।" বাংলাদেশী ভায়েরা তিন দিনের প্রোগ্রামই করে ফেলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দরকষাকষি করে দু'দিনের মধ্যে কর্মসূচি শেষ করে একটা দিন খালি রাখা সম্ভব হলো।

সাফার নানার এক বাংলাদেশী সহপাঠী একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকর্মী। তার বাসাও খুবই কাছে। প্রায়ই এ বাসায় আসেন বলে সাফার সাথে ঘনিষ্ঠ। বৈঠকখানায়

আমার কোলে এলো না, তাঁর কোলে গিয়ে বসলো। দেখে হিংসাই লাগলো এবং হিংসার কথা তাঁকে বললাম। তিনি হেসে বললেন, আমি এর কারণেই রোজ আসতে বাধ্য হই। সত্যি, শিশুর প্রতি মমতাবোধ আল্লাহর এক নির্মল নিয়ামত।

তৃতীয়দিন সারাদিন অবিরাম চেষ্টা করে সম্পর্কের সামান্য উন্নতি হলেও ইচ্ছা করে কোলে আসলো না। তবে কোলে নিয়ে নাচালে জোর করে নেমেও গেলো না। পরের দিন ৫ জানুয়ারি জেদ্দা রওয়ানা হওয়া পর্যন্ত আমাকে এটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

১৫ এপ্রিল ঢাকা ফিরে দাদা-নাতনীর সঠিক সম্পর্ক বহাল করতে হয়তো কয়েকদিন লেগে যাবে। এ লেখা আজ ১৩ এপ্রিল জেদ্দায় লিখছি। আগামীকাল সন্ধ্যায় রওয়ানা দিয়ে পরশু সকাল ৬টায় ঢাকায় পৌঁছার কথা। প্রায় সাড়ে তিন মাস পর দেখা হবে। ইতোমধ্যে সে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ভুলে গেছে।

সাফার নানী মন্তব্য করলেন, সাফার দাদুকে শুনিয়ে, "সাফা! তোমার এতো শক্তি যে, দাদা-দাদুকে বাহরাইন আসতে বাধ্য করতে পেরেছো।"

বাহরাইনের ভিসা সংগ্রহ

ঢাকায় বাহরাইনের দূতাবাস নেই বলে বাংলাদেশ থেকে বাহরাইন যেতে হলে সেখান থেকে ভিসা যোগাড় করে ঢাকায় পাঠাতে হয়। আমার বেহাই সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের দু'জনের জন্য ভিসার ব্যবস্থা করলেন। বেশ বিলম্বে ভিসা পৌঁছলো। বিলম্বের কারণটি দুঃখজনক। ব্যাপারটা বলেই ফেলি। সমাজকল্যাণমন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ কিছুদিন আগে বাহরাইন গিয়েছিলেন। বাহরাইনের সমাজকল্যাণমন্ত্রীর আতিথেয়তা তিনি পেলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের স্বাভাবিক কারণেই মুজাহিদ সাহেবের সাথে বারবার সাক্ষাৎ হয়। ঐ সময়ই আমার বাহরাইন সফরের কথা বেহাই সাহেবকে জানাই। ভিসা সংগ্রহ সহজ করার আশায় বেহাই সাহেব মুজাহিদ সাহেবের সামনেই বাংলাদেশী রাষ্ট্রদূতকে আমার ভিসার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে পারেন কিনা জিজ্ঞেস করলেন। রাষ্ট্রদূত খুব উৎসাহের সাথে ভিসার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিলেন। এমনকি আমি বাহরাইন বিমানবন্দরে পৌঁছলে আমাকে ভিআইপি হিসেবে অভ্যর্থনা করবেন বলে আশ্বাস দিলেন। আমাদের পাসপোর্টের ফটোকপি তাঁকে দেবার জন্য পরামর্শ দিলেন। আমরা কুরিয়ার সার্ভিসে পাসপোর্টের ফটোকপি পাঠালাম।

ফটোকপি পাওয়ার সাথে সাথে বেহাই সাহেব তা রাষ্ট্রদূতকে পৌঁছিয়ে দিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রদূত গড়িমসি করে প্রায় দু'সপ্তাহ কাটিয়ে দিলেন। ভিসার ব্যবস্থা করার ওয়াদা তিনি পালন করলেন না। শেষ পর্যন্ত বেহাই সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হলেন। ভিসার বিলম্ব দেখে বাহরাইন সফর সম্ভব হচ্ছে না মনে করে সরাসরি জেদ্দার জন্যও আসন বুক করে রাখা হলো। রাষ্ট্রদূতের এ অদ্ভুত আচরণের কারণে আমাকে ভিসার ব্যাপারে ৮/১০ দিন অনিশ্চয়তার যাতনা ভোগ

করতে হয়েছে। তাঁর এ আচরণে বেহাই সাহেব এবং বাহরাইনের দীনী ভায়েরা খুবই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। তারা আমাকে পূর্বাপর ঘটনা বিস্তারিত জানালেন। আমি বাহরাইন থাকাকালেই রাষ্ট্রদূত বেহাই সাহেবকে ফোন করে আমার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি হিসাব করে দেখলাম যে, এ সাক্ষাৎকার কারো জন্যই সুখকর হবে না। কারণ তিনি নিশ্চয়ই নিজের সাফাই গাইবেন ভিসার ব্যাপারে। সাক্ষাতের সময় বেহাই সাহেব ছাড়াও আরও কতক বিক্ষুব্ধ ভাই উপস্থিত থাকবেন। তখন এমন অসুন্দর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে, যা হতে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। আমার তো সময় দেওয়া সত্যিই কঠিন ছিলো। তাই সময় বের করা সম্ভব না বলে জানিয়ে দেওয়া হলো। তিনি ঢাকায় আমার সাথে দেখা করবেন বলে বেহাই সাহেবকে জানালেন।

পরে বেহাই সাহেব বাহরাইন থেকে ফোনে জানালেন যে, ঐ রাষ্ট্রদূত বদলি হয়ে চলে গেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বল্পকালীন ভাইস চ্যান্সেলর ড. আনওয়ারুল্লাহ চৌধুরী সাহেব নতুন রাষ্ট্রদূত হয়ে যোগদান করেছেন এবং তিনি নাকি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাকে সালাম পৌঁছাতে বলেছেন। আমি শুকরিয়ার সাথে তাঁকে আমার সালাম পৌঁছাবার জন্য অনুরোধ করলাম।

বাহরাইনে আমার প্রোগ্রাম

২ ও ৩ জানুয়ারি, এ দু'দিনে ৬টা প্রোগ্রাম হলো। একটা মহিলাদের সমাবেশে প্রশ্নোত্তর ও আমার বক্তব্য। এছাড়া দু'টো প্রোগ্রাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১টি হলো বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানি দীনী ভাইদের সমাবেশ। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বিভিন্ন কোম্পানিতে কর্মরত উচ্চশিক্ষিত বেশ কিছুসংখ্যক লোকসহ প্রায় শ'খানেক শ্রোতা ছিলেন।

সভাপতিত্ব করলেন জনাব নিজামুদ্দীন মোল্লা নামে ওখানকার এক হাইস্কুলের হেড মাস্টার। স্কুলটি বেশ উচ্চমানের এবং ইংরেজি ভাষা মাধ্যম হওয়ায় বিভিন্ন দেশের ছেলে-মেয়েরা সেখানে পড়ে। সভাপতি সাহেবের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। তিনি বিয়ে করেছেন আলীগড়ে এবং সেখানেই এখন বাড়ি। তিনি বাংলা, উর্দু ও ইংরেজিতে স্বচ্ছন্দে বক্তৃতা করতে পারেন। সমাবেশে তিন দেশের মানুষ। আমি কোন্ ভাষায় বক্তৃতা পেশ করবো জানতে চাইলাম। সভাপতি সাহেব প্রস্তাব করলেন যে, উর্দুতে বললে সকল শ্রোতাই বুঝবেন। ইংরেজি বললে কিছু লোকের জন্য অসুবিধা হতে পারে। শ্রোতারা এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এ সমাবেশের আয়োজকদের নেতা বাংলাদেশী মাওলানা জমীর উদ্দীনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম। তিনিও উর্দুতে বলার পরামর্শ দিলেন। জানতে চাইলাম, বাংলাভাষী ভাইয়েরা কি করে বুঝবেন? বললেন ইংরেজির তুলনায় উর্দুই বেশি বুঝতে পারবেন।

১৯৭৩ সাল থেকে সৌদী আরব, কুয়েত, দুবাই, বাহরাইন, কাতার, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, সিঙ্গাপুর, জাপান ইত্যাদি দেশে অনেকবার আমার সফর করার সুযোগ হয়েছে। হিমালয়ান উপমহাদেশে যারা ইসলামের কর্মসূচি নিয়ে চর্চা

করেন, তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমই হলো উর্দু। শ্রীলংকা, নেপাল, আফগানিস্তান ও মায়ানমারসহ গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের কমন ভাষা একমাত্র উর্দুই। উচ্চশিক্ষিতদের জন্য ইংরেজি কমন ভাষা হলেও সকলের জন্য উর্দুর কোন বিকল্প নেই। মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন কারণে এ ভাষায়ই সবচেয়ে সহজে ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব। বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মুসলমানদের বিরাট জনশক্তি ঐসব দেশে রয়েছে। তাদের মধ্যে যারা ইসলামী কর্মকাণ্ডে জড়িত, তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। উপমহাদেশের কোন দেশ থেকে কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব আসলে তারা যৌথ সমাবেশের আয়োজন করে থাকেন। তাদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের মাধ্যম প্রধানত উর্দু ভাষা। তাই বাংলাদেশীরাও উর্দু মোটামুটি বুঝে এবং কিছু কিছু বলতেও পারে।

আমার ইংরেজি ও উর্দুতে বলার অভ্যাস থাকলেও ১৯৭১-এর পর থেকে উর্দু বলার সুযোগ নেই বলে অভ্যাস কমে গেছে। পাকিস্তান আমলে দেশে অনেক উর্দুভাষী লোক জামায়াতে ইসলামীতে সক্রিয় থাকায় এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের সব প্রদেশে বহু জনসভায় উর্দুতে বক্তৃতা করতে হতো বলে যে সাচ্ছন্দ্য বোধ করতাম এখন ততোটা বোধ হয় না। মাঝে মাঝে সঠিক উর্দু শব্দের অভাবে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করতে বাধ্য হই। যা হোক, উর্দুতেই আধঘন্টা প্রশ্নোত্তর ও একঘন্টা বক্তব্য রাখলাম। প্রশ্ন পেলাম বাংলা, উর্দু ও ইংরেজিতে, আর জওয়াব দিলাম উর্দুতে। আলোচ্য বিষয় ছিলো, 'মুসলিম উম্মাহর বর্তমান দুর্গতি থেকে মুক্তির উপায়'।

আমার বক্তৃতায় সারকথা ছিলো ঃ

মুসলিম জাতি যতদিন ইসলামের পতাকাবাহী ছিলো ততোদিন আল্লাহ তাআলা তার জমিনে তাদের নেতৃত্ব বহাল রাখতে সাহায্য করেছেন। কুরআনে এটাই আল্লাহর ওয়াদা। ইসলামের হেফাযত করার দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং পালন করেন। ইসলামই মুসলমানদের রক্ষক এবং উন্নতি ও সমৃদ্ধির মাধ্যম। হাদীসে আছে যে, "কুরআন কতক জাতিকে উন্নত করেছে এবং কতক জাতিকে লাঞ্ছিত করেছে।

কুরআনের ধারক ও বাহকের দায়িত্ব পালন না করায় মানবজাতি কুরআনের আলো থেকে বঞ্চিত। অর্ধশত মুসলিম শাসকরা যদি কুরআনভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার বাস্তব নমুনা নিজ নিজ দেশে প্রদর্শন করতেন, তাহলে মানবজাতি নিশ্চিতভাবে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হতো। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মানব জাতির নেতৃত্বের মর্যাদা দিয়েছিলেন। অল্প ক'টি ব্যতিক্রম ছাড়া সকল মুসলিম শাসকই কাফির শাসক ও রাষ্ট্রব্যবস্থার নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন।

কুরআনে বার বার ইহুদী জাতিকে আল্লাহ অভিশপ্ত বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ মুসলিম উম্মাহ ঐ অভিশপ্ত জাতির হাতেই জুতা খাচ্ছে। আল্লাহর নিকট কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। ফিলিস্তিনীদের সংগ্রামী নেতা ইয়াসির আরাফাত বার বার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ফিলিস্তিনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কায়েম করতে চান। আল্লাহ তাকে কেন সাহায্য করবেন? সেখানকার ইসলামপন্থিদের সমর্থনও তিনি পাচ্ছেন না।

বিশ্বের নেতৃত্ব যাদের হাতে রয়েছে, তাদের কাছে শক্তির দাপট দেখানো ছাড়া মানব জাতির কল্যাণের জন্য দেবার মতো কোন আদর্শই নেই। মুসলিম উম্মাহ যদি কুরআনকে বাস্তবায়িত করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায়, তবেই বিশ্বের নেতৃত্ব আবার তাদের হাতে আসতে পারে।"

সমাবেশের শেষে সবাই মহব্বতের সাথে আমার সাথে হাত মেলালেন। একজন ভারতীয় ভাই আমাকে বললেন, "আমার নিকট এটা এক বিস্ময় যে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের জামায়াতে ইসলামীর আমীরগণের চেহারা, ফিগার ও টুপি একই রকম কেন? পত্রিকায় তাদের ছবি দেখে পার্থক্যই করা যায় না।" সভাপতি জনাব নিযামুদ্দীন মোল্লার বাসায় রাতের খাবার খেলাম। সেখানে তার আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম।

১১৩.

ঢাকায় ফিরে এলাম

২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকা থেকে বাহরাইন রওয়ানা হলাম। আর ১ বৈশাখ (১৪১০) জেদ্দা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে প্লেনে উঠলাম। পরদিন ১৫ এপ্রিল সকালে ঢাকা বিমানবন্দরে প্লেনের দরজা খুলতেই হ্যাঙ্গারে ভাগ্নীজামাই জুনিয়র গ্রাউন্ড অফিসার ইলিয়াসকে হাজির পেলাম। হ্যাঙ্গার পার হতেই জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ আরও কয়েকজন জামায়াত নেতাসহ আমাকে খোশ আমদেদ জানালেন। তাঁর সাথে যারা ছিলেন তারা হলেন, জামায়াতের কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি অধ্যাপক তাসনীম আলম, ঢাকা মহানগরী আমীর জনাব মুমিনুল ইসলাম পাটোয়ারী, সেক্রেটারি ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান, সহকারী ও তারবিয়াত সেক্রেটারি জনাব আহমদুল্লাহ, আমার একান্ত সচিব নাজমুল হক এবং আমার দীর্ঘদিনের খাদেম সেলিম।

মাল-সামান সংগ্রহ করতে প্রায় ঘণ্টাখানিক সময় লেগে গেলো। এ সময় ভিআইপি লাউঞ্জে মুজাহিদ সাহেবের কাছ থেকে দেশ, সরকার ও জামায়াত সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম। তাঁরই গাড়িতে তাঁর সাথে আলাপ করতে করতে প্রায় আটটায় বাড়িতে পৌঁছলাম। সাড়ে তিন মাস বিদেশে থাকায় যেসব বিষয় জানা প্রয়োজন ছিলো তা এ সুযোগে তাঁর কাছ থেকে জেনে নিলাম।

সালমান বিমান-বন্দর থেকে অন্য গাড়িতে একই সময়ে বাড়িতে পৌঁছে আমার আগেই ঘরে ঢুকে আদরের সাফাকে কোলে করে আমার ঘরে ঢুকবার সাথে সাথে আমার কোলে তুলে দিলো। আমি মোটেই আশা করিনি যে, সাড়ে তিন মাস পর দেখার সাথে সাথেই কোলে আসতে রাজি হবে। আমার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো। চুমু দিতে চাইলাম, গ্রহণ করলো না। চোখ বন্ধ করে মুখ সরিয়ে নিলো।

চুমু গ্রহণ করতে সম্মত করতে কয়েকদিন লেগে গেলো। এর পর গাল পেতে দিয়ে নিজেই এগিয়ে এসে চুমু নেয়। ওর বয়স এখন দেড় বছর। আমাকে দেখলেই তর্জনী উঁচিয়ে আমার দিকে ইশারা করে ঐ দাদা বলতে থাকে। আমার স্ত্রীকে বললাম, "সাফা তোমাকে ডাকে না বলে হিংসা করো না।" অবশ্য মাঝে মাঝে দাদুও বলে। দাদা উচ্চারণ সহজ বলেই শিশুরা প্রথমেই তা বলে। কয়েকটি শব্দ বলা শিখেছে মাত্র। কথা না ফুটলেও সে এমন কিছু বলতে থাকে, যা বুঝবার যোগ্যতা আমাদের নেই। আমি তাকে সালাম দেওয়া শেখাতে সক্ষম হয়েছি। আমাকে দেখলেই কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে নীরবে সালাম জানায়। সালামের উচ্চারণ শিখতে আরও ক'দিন হয়তো লেগে যাবে। সে বাড়ির ছেলে-মেয়েসহ সকলের আদর কুড়িয়ে বেড়ায়।

আমার কনিষ্ঠ নাতনী সম্পর্কে এতো কথা লেখায় সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাগণ বিরক্ত হবেন কিনা জানি না। আমার ধারণা, যাদের ঘরে এক-দেড় বছরের কোন শিশু নেই তারা এ লেখা পড়ে তাদের সন্তানদের শৈশবের স্মৃতিচারণ করে আনন্দ উপভোগ করবেন। আর যাদের কোলে এ বয়সের শিশু আছে তারা আমার অনুভূতিকে নিজেদের মনে করে পুলকিত হবেন।

আমার ১৯ জন নাতী-নাতনীর মধ্যে যারা বয়সে বড় তারা দাদার কলমে সাফার এমন মর্যাদায় একদিকে খুব খুশি হলেও কিছুটা ঈর্ষা বোধ করে। তাদেরকে বলি, "তোমরা যদি আবার ওর মতো ছোট হতে পারো তাহলে তোমাদের কথাও এভাবে লিখবো। তোমরা ছোট থাকাকালে এমন আদরই পেয়েছো। সাফার সৌভাগ্য যে আমার 'জীবনে যা দেখলাম' লেখার সময় সে দুনিয়ায় এসেছে। বড় হয়ে যখন বইতে ওর সম্পর্কে এ সব লেখা পড়বে তখন সত্যিই ও গৌরব বোধ করবে।"

বাহরাইনে মোল্লা সাহেবের কথা

জনাব নিজামুদ্দীন মোল্লার বাড়িতে দাওয়াত খেতে যেয়ে তাঁকে আমি বললাম, "আমি নিজামুদ্দীন মোল্লা নামের একজনকে জানি, যিনি মাওলানা মওদূদীর তরজমায়ে কুরআন মাজীদের ফুটনোটের বাংলায় অনুবাদ করেছেন।" তিনি মুচকি হেসে হাতে নিজের দিকে ইশারা করে বললেন, "আমিই সেই মোল্লা।" সুধী সমাবেশে যোগ্যতার সাথে সভাপতির দায়িত্ব পালনের কারণে তো আমি মুগ্ধ ছিলামই, এ পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা বোধ করলাম।

আশির দশকের শুরুতে মাওলানা মওদূদীর রচিত 'তরজমায়ে কুরআন মাজীদ'-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হলে জানা গেলো যে, কলকাতায় তা আগেই প্রকাশিত হয়েছে। একজন দায়িত্বশীলকে (নাম মনে পড়ছে না) কলকাতায় পাঠানো হলো। সেখানে যেয়ে তিনি জানালেন যে, ১৫ পারা পর্যন্ত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড মুদ্রণের অপেক্ষায় রয়েছে। অর্থাভাবে বিলম্ব হচ্ছে। ট্রেসিং পেপারও রেডি আছে।

কলকাতার প্রকাশক সেখানকার জামায়াতেরই প্রকাশনী বিভাগ। আমরা এখানে একসাথে সবটুকু ছাপিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার আগ্রহ দেখে তাঁরা মুদ্রিত প্রথম খণ্ডের এক কপি ও দ্বিতীয় খণ্ডের ট্রেসিং পেপার আমাদেরকে দিতে সম্মত হলেন। ঢাকায় ১৯৮২ সালে ফালাহ-ই-আম ট্রাস্ট সর্বপ্রথম একটি বিরাট গ্রন্থাকারে তা প্রকাশ করে। এরপর আধুনিক প্রকাশনী প্রকাশ করে আসছে।

এ গ্রন্থের ফুটনোটগুলো কোলকাতার জনাব নূরুল ইসলাম খান এবং আলীগড়ের জনাব নিজামুদ্দীন মোল্লা অনুবাদ করেন। কুরআনের আয়াতসমূহের যে অনুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম করেছেন সে অনুবাদই এতে রয়েছে।

বাহরাইনে আমার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম

বাহরাইনে কর্মরত বাংলাদেশীদের এক বিরাট সমাবেশ। বাহরাইনের সব চেয়ে বড় পাবলিক হলের সকল চেয়ারে বসার পরও বেশকিছু লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

আমার জন্মভূমির বিরাট সংখ্যক দীনী ভাইদেরকে দেখে আমি অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলাম। চট্টগ্রামের মাওলানা জমীরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সমাবেশে উপস্থিত শ্রোতাদের চেহারায় প্রবল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে আমি রীতিমতো অভিভূত হলাম।

আধ-ঘন্টারও বেশি সময় তাদের লিখিত প্রশ্নাবলির জওয়াব দেবার পর প্রায় দেড় ঘন্টায় আমার বক্তব্য পেশ করলাম। তাদের উৎসাহ দেখে বক্তব্য সংক্ষিপ্ত না করে প্রাণভরে কথা বললাম। আমার বক্তব্য বিষয় ছিলো, 'ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহী জযবা'। এ নামে আমার লেখা বইটি কেউ পড়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে ১০/১৫টি হাত উত্থিত দেখলাম। বুঝা গেলো যে, এ বিষয়টি তাদের জন্য নতুনই। বইটিতে ৬টি জযবা কুরআনের বহু আয়াত ও বেশ কতক হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পয়লা জযবা হলো, আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জযবা। আল্লাহর দীনের প্রতি ঈমান আনার তাওফীক দেবার জন্য আল্লাহর প্রতি গভীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করার জযবার দাবি হলো ঃ ব্যাপকভাবে দীনের দাওয়াত পেশ করা। দ্বিতীয় জযবা হলো, খাঁটি নিয়তের জযবা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সাফল্যের নিয়তে দীনের জন্য কাজ করতে হবে। নিয়ত সহী না হলে কোন নেক আমলই আল্লাহ কবুল করেন না। হাদীসে আছে যে, নিয়ত খাঁটি না হলে জিহাদের ময়দানে নিহত হলেও দোযখেই যেতে হবে।

তৃতীয় জযবা হলো, বেহেশতে যাবার জযবা। বেহেশতের মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতে বেহেশতে যেতে হলে জান ও মাল আল্লাহর নিকট বিক্রয় করার শর্ত দিয়েছেন। অর্থাৎ যারা আল্লাহকে তাদের জান ও মালের মালিক মনে করে তাঁরই মরজিমতো সময় ও সম্পদ ব্যয় করে তাদেরকেই এর বিনিময়ে বেহেশত দান করবেন বলে ঐ আয়াতে ঘোষণা করেছেন। আখিরাতে বিশ্বাসী কোন মানুষই দোযখে যেতে চায় না। অথচ

অনেকেই বেহেশতে যাবার ঐ শর্ত পূরণের চেষ্টা করে না। মরার আগে তাওবা করে সব গোনাহ মাফ করিয়ে নিতে পারবে মনে করে অনেকেই শরীআতের বিধানের কোন পরওয়া করে না। যেমন প্রত্যেকেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাস করার আশায় ভর্তি হয়। কিন্তু পাস করতে হলে যা করা দরকার তা না করার কারণেই ফেল করে। তেমনি বেহেশতে যাবার যত আশাই করা হোক, আল্লাহর দেওয়া ঐ শর্ত পূরণ না করলে ফাঁকি দিয়ে বেহেশতে যাবার কোন উপায় নেই।

চতুর্থ জযবা হলো, আল্লাহর গোলাম বা দাস হবার জযবা। আল্লাহর গোলামের মর্যাদা পেতে হলে নাফসের গোলামি ও আল্লাহ ছাড়া আর সকল গোলামি থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে এবং তাকওয়ার জীবন-যাপন করতে হবে। আল্লাহর গোলামিই আর সকল শক্তির গোলামি থেকে মুক্তি দেবে।

পঞ্চম জযবা হলো, আল্লাহর খলীফা হওয়ার জযবা। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের উদ্দেশ্যে চেষ্টা না করে আল্লাহর খলীফা হওয়ার বিকল্প কোন পথ নেই। খিলাফতের এ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যেই তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন। যে আল্লাহর খলীফা হওয়ার চেষ্টা করে না সে ইবলিসের খলীফা হতেই বাধ্য হয়। কারণ দুনিয়াতে মানুষকে খলীফাই হতে হবে, মনিব বা মালিক হওয়ার কোন সুযোগ নেই। খলীফা হওয়া ছাড়া আর কিছু হওয়ার উপায় নেই। তাই হয় আল্লাহর খলীফা হবে, আর না হয় শয়তানের খলীফা হতে হবে।

ষষ্ঠ জযবা হলো, আল্লাহর পথে শহীদ হবার জযবা। এ জযবার আসল মর্ম হলো মৃত্যুভয় ত্যাগ করা। মৃত্যুকে ভয় করা একেবারেই বোকামি। ভয় করে কোন লাভ নেই। মৃত্যু নির্দিষ্ট সময়ে আসবেই। তাকে রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। তাই মৃত্যুকে ভয় করা অর্থহীন। মৃত্যুভয়ই সকল প্রকার দুর্বলতার মূল। এ ভয় থেকে যে নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয় সে দুনিয়ার কোন শক্তিকে পরওয়া করে না। সেক্সপিয়ার কি চমৎকার করেই বলেছেন, "Cowards die many times before their death, the valiant tastes death but once." ভীরুরা যতবার ভয় পায় ততবারই মরে। আল্লাহর সৈনিক কখনো মৃত্যুকে ভয় করে না; বরং সে আল্লাহর পথে শাহাদাত কামনা করে। মৃত্যুভয় ত্যাগ করতে পারলে যে মনোবল সৃষ্টি হয় এর কোন তুলনা নেই। এর চেয়ে বড় তৃপ্তিও আর নেই। মরতেই যখন হবে, সাধারণ মৃত্যু কেন? শহীদী মৃত্যুই কাম্য হওয়া উচিত। যে মৃত্যু বিনা হিসেবে বেহেশতে নিয়ে যায় তাই হলো শহীদী মৃত্যু। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, "যে সত্যি সত্যি শাহাদাত চায়, সে যদি বিছানায়ও মৃত্যুবরণ করে তবু তাকে আল্লাহ শাহাদাতের মনযিলে পৌঁছিয়ে দেবেন।" এতো বড় সুসংবাদ পাওয়ার পর শহীদ হওয়ার জযবার ব্যাপারে দ্বিধা করা চরম বোকামি।

আমার বক্তব্যের উপসংহারে উৎসাহী শ্রোতাগণকে বললাম, "আমরা যদি নিজেদেরকে এ ৬টি জযবায় সজ্জিত করতে পারি তাহলে নাফসের ধোঁকা, শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও বস্তুজগতের আকর্ষণকে জয় করে আমাদের একমাত্র

হুকুমকর্তা প্রভু আল্লাহ এবং একমাত্র আদর্শ নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর যথাযথ আনুগত্য করতে সক্ষম হবো ইনশা-আল্লাহ।"

সভাপতির ভাষণে মাওলানা জমীরুদ্দীন সকলকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং সবাই জযবার সাথেই সাড়া দিলেন।

সৌদী আরব রওয়ানা

৫ জানুয়ারি (২০০৩) দুপুরে বাহরাইন বিমান-বন্দর থেকে রওয়ানা হয়ে এক ঘণ্টা পরই জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। জেদ্দা বিমান বন্দরে যারা ট্রলিতে মালামাল গাড়িতে তুলে দেয় (পোর্টার) তাদের মধ্যে বাংলাদেশীদের সংখ্যাই বেশি। ইমিগ্রেশন পার হয়ে যাত্রীদের মাল-সামানের কাছে পৌঁছার সাথে সাথে তাদের একজন দৌড়ে এসে হাত মিলিয়ে দীনী ভাই হিসেবে পরিচয় দিলেন। তিনি আমার হাত থেকে লাগেজ-টেগ্‌গুলো নিয়ে আমাদের দু'জনের সব সুটকেস ও কার্টোন সংগ্রহ করে ট্রলিতে তুলে আমাদের নিয়ে চললেন।

আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা অনুযায়ী আমি বই-এর কার্টোন সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলাম। বিশ কেজি ওজনের বই-এর কার্টোনটি একটা রসিদ দিয়ে রেখে দেবে এবং কী বই সে বিষয়ে যাচাই করার পর অনুমতি পেলে তা ছাড়িয়ে আনা যাবে। বই-এর ব্যাপারে এটাই সেখানকার নিয়ম। আমি আশা করিনি যে, বইগুলো আমার সাথে নিয়ে যেতে পারবো।

কর্মীদের মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি লেখা আমার বইগুলো ওখানকার দীনী ভাই-বোনদের হাতে পৌঁছবার আশায় নিয়ে গেলাম। তারা ইসলামী বই পেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হন। কারণ সেখানে বই নেওয়া সহজ নয়। তাছাড়া ওজন সমস্যার কারণে এক সাথে বেশি বই নিতে পারেন না। তারা নতুন কোন বই পেলে লুফে নেন। আমি যে বইগুলো নিয়ে গেলাম এর কোনটাই সেখানে এর আগে পৌঁছেনি। বইগুলো হলো, 'আসুন আল্লাহর সৈনিক হই', 'মযবুত ঈমান', 'জীবন্ত নামায', 'আল্লাহর খিলাফত কায়েমের দায়িত্ব ও পদ্ধতি', 'সৎ লোকের এতো অভাব কেন? ও 'রাষ্ট্র ক্ষমতার উত্থান পতনে আল্লাহর তাআলার ভূমিকা'। এসব বই এক, দেড় ও দু'ফর্মার চটি বই। অনেকেই বড় বই পড়তে সাহস করে না সময়াভাবে। চটি বই হলে অল্প সময়ে পড়া যায় বলে বেশি পছন্দ করে।

যেখানে যাত্রীদের সামান চেক করা হয় সেখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে আমাদেরকে ও ট্রলিকে না নিয়ে ট্রলির বাহক তাঁর কাছে যেয়ে আরবীতে কথা বলে বিনা চেকেই আমাদের ট্রলি ছাড়িয়ে নিতে সক্ষম হলেন। আমি রীতিমতো বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে গেলাম। আমি বহুবার সৌদী আরবে গিয়েছি। বই খুলে যাচাই না করে কখনো ছেড়ে দেয় না। ইসলামী বই-এর ব্যাপারেই এতো কড়াকড়ি। বইতে ইসলামের বিকৃত ধারণা, শিরক-বিদআত ও কাদিয়ানী সাহিত্য আছে কিনা তা যাচাই করাই নাকি উদ্দেশ্য। আমাদের যোগ্য পোর্টার ট্রলি নিয়ে বিমান-বন্দর

থেকে বের হবার লাউঞ্জে পৌঁছিয়ে দিলেন। সেখানে জেদ্দা রেডিওতে বাংলা বিভাগে কর্মরত ড. মাওলানা হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন ও পঞ্চগড় জেলার সাবেক আমীর জনাব নাসির উদ্দীন-এর ছেলে শহীদুল ইসলাম আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কোলাকুলি করলেন। আমার ছেলে তখনো পৌঁছেনি কেন জানতে চাইলে তাঁরা বললেন যে, গাড়ি পার্ক করতে দেরি হচ্ছে।

আমার ৬ ছেলের মধ্যে সবার বড় হলো মামুন। জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের অফিসার। সে ১৯৯৬ সাল থেকে এখানেই আছে। একটু পরেই সে এলো। ট্রলি বাহক ভাইটিকে বিদায় দিয়ে মাল বোঝাই ট্রলি অন্যরা মামুনের গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। ঘণ্টাখানিক পরেই মামুনের বাসায় পৌঁছলাম।

সৌদী আরব সফরের উদ্দেশ্য

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, দু'টো উদ্দেশ্যে এবার সৌদী আরবে গেলাম। প্রথম উদ্দেশ্য হজ্জ করা। আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মাওলানা মওদূদী (র)-এর 'তরজমায়ে কুরআন মাজীদ'-এর সহজ বাংলায় অনুবাদ করা। মাওলানা 'তাফহীমুল কুরআন' নামে যে বিরাট তাফসীর লিখেছেন, তা ছাড়াও 'তরজমায়ে কুরআন মাজীদ' নামে আরও একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। মাওলানার তাফসীর উর্দুতে ৬টি গ্রন্থে প্রকাশিত। এর বাংলা অনুবাদ ১৯ খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। এ বিরাট তাফসীর সর্বসাধারণের পক্ষে অধ্যয়ন করা কষ্টসাধ্য। যারা তাফসীর না পড়লেও নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করেন, তারা যাতে মোটামুটি কুরআন বুঝে পড়তে পারেন সে উদ্দেশ্যেই তিনি তরজমায়ে কুরআন মাজীদ রচনা করেছেন। এতে তাফহীমুল কুরআন তিনি উর্দুতে আয়াতসমূহের যে অনুবাদ করেছেন সে অনুবাদই রয়েছে। তবে তাফসীরের বদলে অতি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখেছেন। শুধু অনুবাদ পড়ে যেসব আয়াতের মর্মকথা বুঝা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রেই তিনি টীকা লিখেছেন। আমি এরই অনুবাদ সহজ বাংলায় করার অনুমতি বহু আগেই মূল গ্রন্থের প্রকাশক থেকে নিয়ে রেখেছি।

এ কাজে কেন হাত দিলাম?

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হবার পর প্রায় ৭ বছর আমাকে বাধ্য হয়ে নির্বাসনে থাকতে হয়। সাড়ে চার বছর পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর ১৯৭৬ সালে আমার স্ত্রী ছোট দু'ছেলে নোমান ও সালমানকে নিয়ে লন্ডন পৌঁছেন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে সপরিবারে দেশে ফিরে আসি। আমার স্ত্রী জামায়াতে ইসলামীর রুকন হবার উদ্দেশ্যে সিলেবাস অনুযায়ী অধ্যয়ন করতে গিয়ে তাফহীমুল কুরআনের বাংলা অনুবাদ পড়ে বুঝতে বেশ কষ্ট বোধ করেন। আমাকে মাঝে মাঝে কঠিন শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করেন। তিনি মাদরাসা লাইনে আলিম পাস হওয়ায় কঠিন বাংলা বুঝতে বেগ পান।

আমি অনুভব করলাম যে, আমাদের কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশই অল্পশিক্ষিত। মাওলানা আব্দুর রহীমের অনূদিত তাফহীমুল কুরআন যে কঠিন ভাষায় লেখা তা

পড়ে বুঝা অনেকের জন্যই কষ্টকর হওয়ারই কথা। উচ্চশিক্ষিতদের জন্য তা অবশ্যই উপযোগী। পাকিস্তান আমলেই এ বিষয়ে আমি মাওলানার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবেই কঠিন ভাষায় লিখতেন। আমাকে বললেন, আমি দেখিয়ে দিতে চাই যে, আলেমরাও উচ্চ মানের বাংলাভাষা জানে। তাছাড়া তিনি মনে করতেন যে, কুরআন সাধারণ আরবীভাষীদের মুখের ভাষার মতো নয়, বরং কুরআন উচ্চমানের গুরুগম্ভীর আরবী সাহিত্য। তাই এর অনুবাদও সে মানের বাংলায় হওয়াই প্রয়োজন। এমনকি তিনি চলিত ভাষায়ও কুরআনের অনুবাদ করা সঠিক মনে করতেন না। এ নির্ধারিত নীতি অনুযায়ীই তিনি অনুবাদ করেছেন।

১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে মাওলানা মওদূদীর ইন্তিকালের পর পরই 'আল্লামা মওদূদী ইসলামী রিসার্চ একাডেমী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয় এবং শুরু থেকেই জনাব আব্বাস আলী খানকে এর ডাইরেক্টরের দায়িত্ব দেওয়া হয়। আজীবন তিনি এ দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে গেছেন।

১৯৮১ সালে একাডেমীর ডাইরেক্টর হিসেবে তাঁকে দায়িত্ব দিলাম যে, তাফহীমুল কুরআনের সহজ বাংলায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করুন। আমি তাঁকে জানালাম যে, কুরআনের আয়াতসমূহের যে অনুবাদ মাওলানা মওদূদী উর্দু ভাষায় করেছেন আমি সহজ বাংলায় এর অনুবাদ করতে চাই। তাফসীরের অনুবাদ করার জন্য কয়েকজন অনুবাদক বাছাই করার জন্য চেষ্টা করুন। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে ১৯ জন অনুবাদক আসলেন। তাদের অনুবাদের মান যাচাই করার জন্য খান সাহেব কোন একটি সূরা সবাইকে অনুবাদ করতে দিলেন। পরীক্ষকের দায়িত্ব খান সাহেব নিজেই নিলেন।

আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম যে, তিন থেকে পাঁচজন অনুবাদক বাছাই করতে পারলে অল্প সময়ে অনুবাদের কাজ সমাধা হতে পারে। আমি উৎসাহের সাথে অনুবাদ কাজ করলাম। প্রথমে সূরা ফাতিহার পর সূরা বাকারার অনুবাদ করতে থাকলাম।

খান সাহেব ১৯ জনের অনুবাদ মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলেন। এক সপ্তাহ পর তিনি জানালেন যে, সাহিত্যের মানে একজনের লেখাও টিকলো না। আমি বললাম, সাহিত্যের মানের চেয়ে আমার নিকট সহজ ভাষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বললেন, সাহিত্যের সর্বনিম্ন মান না হলে তো চলতে পারে না। খান সাহেব নিজে উচ্চ মানের সাহিত্যিক। তাই সে মানেই তিনি যাচাই করেছেন এবং সবাইকে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দিয়েছেন। আমি হতাশ হলাম এবং আয়াতসমূহের অনুবাদ করার উৎসাহও হারিয়ে ফেললাম। সহজ বাংলায় তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদের স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেলো।

অল্পশিক্ষিত কর্মীদেরকে তাফহীমুল কুরআনের স্বাদ উপভোগ করাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আমাকে আমপারার তাফসীরের সার-সংক্ষেপ লিখতে বাধ্য করলো। নামাযীরা আমপারার সূরাই নামাযে বেশি পড়েন। যেসব সূরা তাদের মুখস্থ আছে

সেগুলোর তাফসীর সহজ ভাষায় সংক্ষেপে জানতে পারলে নামাযের মজাই বেড়ে যাবে। ১৯৮৩ সালেই আমপারা প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিআইসি-এর ডাইরেক্টর অধ্যাপক নাযির আহমদ আমার পেছনে লেগে থেকে ২৯ পারার সার-সংক্ষেপ লিখতে বাধ্য করলেন। এভাবেই ২৬ পারা পর্যন্ত লেখা হলো। প্রতিটি পারা লিখতে দুটো রমাদানের দুটো ই'তিকাফ খরচ হয়েছে। এ সময় ছাড়া লিখার সময় বের করার উপায় ছিলো না।। শেষ পাঁচ পারা আলাদা আলাদা খণ্ডে এবং গ্রন্থেও প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক নাযির আহমদ সাহেবের উদ্যোগেই এটা সম্ভব হয়েছে।

১৯৯২ ও '৯৩ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবকাশ যাপনকালে প্রথম ১০ পারার অনুবাদ করা হয় এবং আধুনিক প্রকাশনী 'আল কুরআনের সহজ অনুবাদ' নামে ১৯৯৪ সালেই তা প্রকাশ করে। মাঝখানে ১১ থেকে ২৫ পারার অনুবাদের জন্যই সৌদী আরবে কয়েক মাস থাকতে হলো। আল হামদুলিল্লাহ মাঝের ১৫ পারার অনুবাদ সমাপ্ত করে দেশে ফিরে এলাম।

১১৪.

অনুবাদের কাজ শুরু হলো

'তাফহীমুল কুরআন' নামক তাফসীরের সহজ বাংলায় অনুবাদের আশা পূরণ হলো না। আমার পক্ষেও এতোবড় কাজ সমাধা করা সম্ভব নয়। শেষের ৫ পারার সার-সংক্ষেপ ১০ বছরে সমাধা হওয়ার পর ঐভাবে আরও লিখার হিম্মত পেলাম না। তাই অন্তত তরজমায়ে কুরআন মাজীদের অনুবাদ করতে পারলে মাওলানা মওদূদীর তাফসীরের স্বাদ সামান্য পরিমাণে হলেও পাওয়া যাবে– এ আশায় ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত অল্পশিক্ষিত ভাই-বোন এবং সর্বসাধারণের মধ্যে কুরআন বুঝার আগ্রহীদের নিকট কুরআনের আলো পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে এটুকু কাজ হওয়া অত্যন্ত জরুরি মনে করলাম।

তাফহীমুল কুরআনের দু'রকম অনুবাদ বাজারে চালু আছে। মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের অনুবাদ বাংলা সাধু ভাষায় রচিত। অত্যন্ত কঠিন ভাষায় তিনি লিখেছেন বলেই আমি সহজ বাংলায় অনুবাদ করতে আগ্রহী ছিলাম। অপর অনুবাদটি জনাব আব্বাস আলী খানের তত্ত্বাবধানে ও সম্পাদনায় কয়েকজনের দ্বারা অনূদিত। এ অনুবাদটি বাংলা চলতি ভাষায় লিখিত। অপর অনুবাদটির তুলনায় এটি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সহজ বাংলায় বলা চলে। কিন্তু কঠিন শব্দের সংখ্যা যা আছে, তাতে আমার হিসাবে সহজ বাংলার আশা পূরণ হয়নি। অবশ্য এ অনুবাদটিই জামায়াত মহলে বেশি চালু আছে। মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব ও মাওলানা মুজাম্মিল হক এ অনুবাদটি করেছেন। আধুনিক প্রকাশনী এর প্রকাশক।

৫ জানুয়ারি (২০০৩) বাহরাইন থেকে জেদ্দা পৌঁছলাম। পরদিনই অনুবাদের কাজ

শুরু করলাম। ৮ এপ্রিল অনুবাদের কাজ সমাধা হয়। ৯ তারিখ মক্কা শরীফ যেয়ে ১১ তারিখে বিদায়ী তাওয়াফ করে জেদ্দায় ফিরে এলাম।

যে কয়টি কাজের জন্য আমি জামায়াতের ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলাম, এর মধ্যে অনুবাদের এ কাজটি অন্যতম। ২০০১ সালের জানুয়ারি থেকে দায়িত্বমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ২০০২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ণ দু'বছরের মধ্যেও অনুবাদের কাজটি শুরু করা সম্ভব না হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ কাজটি সম্পন্ন করতে হলে বিদেশেই যেতে হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৌদী আরবে গেলাম। এ উদ্দেশ্যে ম্যানচেস্টারেও (ইংল্যান্ড) যাওয়া যেতো। সেখানে আমার ৩ ছেলে আছে। কিন্তু জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে হজ্জের নিয়তে সৌদী আরব যাবার গত ৩৫ বছরের কামনা পূর্ণ করার জন্যই এ সিদ্ধান্ত নিতে হলো।

নিরিবিলি লেখার পরিবেশ

এ জাতীয় লেখার কাজ করতে হলে যে রকম পরিবেশ প্রয়োজন এর ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে আমার পক্ষ থেকে আমার বড় ছেলে মামুন জেদ্দাস্থ সকল দীনী ভাইদেরকে জানিয়ে দিলো যে, কেউ যেন আমাকে ফোন না করেন এবং দেখা করার জন্য কেউ যেন বাসায় না আসেন। দেখা করতে হলে মাগরিব ও ইশার নামাযের সময় বুখারী মসজিদে আসতে পারেন। অথবা জুমআর নামাযের সময় ইসলামিক এডুকেশন ফাউন্ডেশনে দেখা করতে পারেন।

সেখানে ২০/২৫ বছর থেকে আছেন আমার এমন ঘনিষ্ঠ বেশ কয়জন দীনী ভাইও সবর করেছেন। অনুবাদের কাজ সমাধা করার পরও তাদের সাথে যোগাযোগ করার সময় পাইনি। অবশ্য তাদের সাথে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে যায়। দেশে তো বহু আগে থেকেই দীনী ভাইয়েরা আমাকে 'বিয়ের মোল্লা' বানিয়ে ছেড়েছেন। জেদ্দায়ও বিয়ে পড়াবার জন্য যেতে হলো এবং এ উপলক্ষে পুরনো ভাইদের সাথে এবং অনেক নতুন ভাইদের সাথেও দেখা হয়ে গেলো।

সৌদী আরবের যে ক'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে আমার দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, তাঁদের কারো সাথে দেখা করা তো দূরের কথা ফোনেও সালাম-কালাম হয়নি। যোগাযোগ করলে দেখা না করে আসা সম্ভব হতো না। অথচ এর জন্য আমার হাতে সময় ছিলো না।

মামুনের বড় মেয়ে লুবাবা ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু জানবার জন্য সময় চেয়েও নিরাশ হয়েছে। অনুবাদ শেষ হওয়ার পর ২/৩ দিন বাসায় ছিলাম। কিন্তু তখন লুবাবার পরীক্ষা থাকায় ওর হাতে সময় ছিলো না। সে এবার 'এ-লেভেল' দিচ্ছে। আমার বৌ-মা সালমা মুন্নী মাশাআল্লাহ যথেষ্ট পড়াশুনা করে এবং বিশ্বপরিস্থিতি ও মুসলিম উম্মাহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। সেও বেশ কয়বার আলোচনার জন্য সময় চেয়েছে। আমি শুধু খাবার সময় আলোচনার অনুমতি দিতে সক্ষম হয়েছি।

এভাবে পূর্ণ নিরিবিলির পরিবেশ সৃষ্টি না করলে এ সময়ের মধ্যে অনুবাদ সম্পন্ন

করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। হজ্জের কারণে কমপক্ষে ১০ দিন এবং মদীনা শরীফ যিয়ারতে ৩ দিন, আমার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হলো বলে হজ্জের পর ৫ দিন অনুবাদের কাজ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া 'জীবনে যা দেখলাম'-এর জন্য ১২ কিস্তি লেখায় কমপক্ষে ১৫ দিন খরচ হয়ে গেছে।

আমাকে গড়ে প্রতি ৫ দিনে ১ পারা পরিমাণ অনুবাদ করতে হয়েছে। রোজ ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা অনুবাদের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। উর্দু থেকে বাংলা ও আরবী থেকে বাংলা অভিধান থেকে সাহায্য নিয়েছি বটে, কিন্তু সহজ শব্দ তালাশ করার জন্য অতিরিক্ত কিছু সময়ও খরচ করতে হয়েছে। যারা অনুবাদের কাজ করেন তারা জানেন যে, এ কাজটি বেশ টেকনিক্যাল ধরনের। ভাষার অনুবাদ নয়; ভাবের অনুবাদই করতে হয়। তাই ভাবটুকু আয়ত্ত করে তা ভাষায় রূপান্তর করা খুব সহজসাধ্য নয়।

ভিসা-সমস্যায় পড়লাম

আমি ও আমার স্ত্রী সৌদী আরবে গেলে ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে ভিজিট ভিসায় যাই। সৌদী দূতাবাস মাত্র একমাসের ভিসা দেয়। সৌদী আরব পৌঁছার পর ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির বেলায়ও একসাথে একমাসের বেশি বৃদ্ধি করে না। তারা সরকারিভাবে হিজরী বর্ষপঞ্জি ব্যবহার করে। আমি যিলকদ মাসের মাঝামাঝি জেদ্দায় পৌঁছেছি। তাই হজ্জে যাবার আগেই ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। আমার স্পন্সর ইসলামী ব্যাংক যথারীতি আমার পাসপোর্ট ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির সুপারিশ করে পাঠালো। জওয়াব আসলো যে, সৌদী সরকার যিলকদ মাসে ভিজিট ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করে না। নিয়মের ফেকড়ায় পড়ে গেলাম।

সরকারের এ সিদ্ধান্তের কারণ আছে। বিশ্বের সর্বত্র থেকে হজ্জ ভিসায় এতো মানুষ আসে যে, হজ্জের মওসুমে তাদেরকে সামলাতেই বিরাট ঝামেলা পোহাতে হয়। তাই হাজীদের সংখ্যা সীমিত করার উদ্দেশ্যে যিলকদ মাসে ভিজিট ভিসা বৃদ্ধি করা হয় না, যাতে হজ্জ ভিসা ছাড়া কেউ হজ্জ করতে ভিড় না করে। এ সমস্যার কথা আগে জানতাম না। মহাচিন্তায় পড়লাম। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি না করলে হজ্জ না করেই চলে আসতে হবে এবং অনুবাদের উদ্দেশ্যে সেখানে থাকার সুযোগও পাওয়া যাবে না।

হজ্জের মওসুমে জেদ্দা থেকে মক্কা শরীফ যাবার পথে পুলিশ একাধিক জায়গায় পাসপোর্ট চেক করে। যিলকদের ২৫ তারিখের পর হজ্জ ভিসা ছাড়া কোন বিদেশীকে মক্কায় যেতে দেয় না। তাই ২৩ যিলকদেই মক্কা শরীফ চলে গেলাম। মামুনের অভিজ্ঞতা হলো যে, প্রাইভেটকারে মহিলা থাকলেও ইহরাম পরিহিত না হলে পুলিশ চেক না করেই ছেড়ে দেয়। আমরা বিনা চেকেই চলে গেলাম। আল্লাহর কাছে ধরনা দিতে থাকলাম, যেন আমাদের ভিসা সমস্যার সমাধান হয়।

কয়েকদিন পর ফোনে জানা গেলো যে, ২৯ যিলহজ্জ পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ব্যাংকের পক্ষ থেকে চেষ্টা করায়ও আমার পাসপোর্টে দু'বার সৌদী

সরকারি মেহমান হিসেবে ভিসা থাকায় হয়তো বিবেচনাযোগ্য মনে করেছে। সাধারণত সরকারি নিয়মের বাইরে তারা কিছুই করতে রাজি হয় না। আল্লাহ পাক হজ্জ করার সুযোগ দিলেন বলেই কর্তৃপক্ষের দিলে (অন্তরে) ভিসার মেয়াদ বাড়াবার ব্যাপারে সরকারি নিয়ম ভঙ্গ করার জযবা দান করেছেন। তা না হলে স্বাভাবিক নিয়মে তা হবার কথা নয়।

হজ্জ উপলক্ষে জেদ্দার বাইরে ২১ দিন অবস্থান

হজ্জের মওসুমে সবাই কাবা শরীফের কাছে থাকার জায়গা যোগাড়ের চেষ্টা করে, যাতে ৫ ওয়াক্ত হারাম শরীফে জামায়াতে নামায পড়া যায়। তখন এতো ভিড় হয় যে, কোন রকমে একটু শোবার মতো জায়গা পেলেই মানুষ খুশি হয়ে থাকে। অবশ্য বেশি ধনী লোকেরা হারামের নিকটবর্তী বড় বড় হোটেলে বিরাট অংকে ভাড়ায় থাকে বলে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে।

আমার জন্য এ দু'অবস্থার কোনটাই উপযোগী নয়। তাই আমার অতি ঘনিষ্ঠ পরিচিত দীনী ভাই মাওলানা আবদুল জব্বারের সহযোগিতা চাইলাম। তিনি বহু বছর থেকে মক্কা শরীফের বাসিন্দা। একবার ওমরাহ উপলক্ষে তার বাসায় ছিলাম। তাকে জানালাম যে, বাংলাদেশী ভাইদের মধ্যে এমন কেউ আছেন কিনা, যিনি সপরিবারে থাকেন এবং আমার ও আমার স্ত্রীর জন্য একটা কামড়া ছেড়ে দিতে পারেন এবং আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে পারেন। তদুপরি আমার লেখাপড়া করার বন্দোবস্তও করে দিতে পারেন।

আল্লাহর অসীম মেহেরবানীতে এমন একটি পরিবার পাওয়া গেলো, যেখানে হজ্জের আগে ১৫ দিন ও পরে দু'দিন অত্যন্ত স্বচ্ছন্দে ও আরামে থাকা, খাওয়া ও লেখাপড়া করার চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেলাম। তার নাম জনাব আবদুর রহীম। তিনি ১৮ বছর থেকে মক্কা শরীফে আছেন। ব্যবসা করেন। তিনি দেশে থাকাকালেও ইসলামী আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তার বাড়ি শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলায়।

তার বাসা কাবা শরীফ থেকে দু'কিলোমিটার দূরে হওয়ায় জুমআর নামায ছাড়া অন্যান্য নামাযে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। তার বাসায় যেসব প্রয়োজনীয় সুবিধা ভোগ করেছি তা পাওয়ার মতো কোন বাসা কাবা শরীফের কাছে যোগাড় করা গেলো না। থাকা ও লেখাপড়া করার উপযোগী বিরাট কামরা ও রুচিমতো খাবার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। তার স্ত্রী আমাদের দু'জনের থাকা-খাওয়ার ব্যাপারে তেমনি যত্ন নিয়েছেন, যেমন বাপ-মায়ের জন্য মেয়েরা করে থাকে। তাদের ৪ সন্তানের মধ্যে দু'মেয়ে বড় এবং ছেলে দুটো ছোট। বড় মেয়ের বয়স ১১ এবং ছোট ছেলের বয়স ৩ বছর। এরা সবাই আমাদের দু'জনকে আসল দাদা-দাদু বানিয়ে নিলো। আমার স্ত্রী তো দু'নাতনীর সাথে এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন যে, ওরা সারাক্ষণ দাদুর সাথেই থাকতে চায়।

আমি তো পড়ালেখায় ব্যস্ত। আমার স্ত্রীর তো এমন কোন ব্যস্ততা নেই। তাই তিনি নাতনীদের নিয়ে ব্যস্ত রইলেন। ওদের কুরআন তিলাওয়াতে সাহায্য করা ও দীনের

কথা শিখানো এবং মায়ের কাছে সব রকম কাজ শেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি নিয়ে তার সময় কাটতো।

ছেলে দুটো ৫ ও ৩ বছরের। খুবই চঞ্চল। ওরা দাদা দাদা করে আমাকে অস্থির করতে চাইতো। তাদেরকে সময় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না বলে দাদুর কাছেই বেশি যেতো। আমি দরজা বন্ধ করে ওদের হামলা থেকে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হতাম। আবদুর রহীম সাহেব প্রথমেই আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, আমি যেন দরজা লক করে লেখাপড়া করি। আমি নামাযের জন্য মসজিদে চলে গেলে ওরা ৪ ভাই-বোন হুমড়ি খেয়ে আমার কামরায় এসে পড়তো। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগাবার ব্যবস্থা ছিলো না। হজ্জের উদ্দেশ্যে মিনায় যাবার আগে ১৫ দিন একটানা ঐ বাসায় থেকেই লেখার কাজ চালিয়ে গেলাম। এর মধ্যে অনুবাদের কাজ মাত্র ৫ দিন করেছি। বাকি ১০ দিন 'জীবনে যা দেখলাম'-এর ৭টি কিস্তি লিখতে খরচ হয়েছে। ঢাকায় জানুয়ারি মাসের জন্য ৪ কিস্তি লেখা তৈরি করে রেখে গেলাম। জানুয়ারির মাঝামাঝি দু'কিস্তি ডাকযোগে জেদ্দা থেকে পাঠালাম। মক্কা শরীফে থাকাকালে বেশি করে লিখার উদ্দেশ্য ছিলো হাতে হাতে ঢাকায় পাঠাবার সুযোগ নেওয়া।

বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের অন্যতম নেতা ডা. রুহুল আমীন আবার হজ্জ মেডিকেল মিশনের ৬০ সদস্যবিশিষ্ট ডাক্তার ও নার্সদের টিমের লিডার হিসেবে গিয়েছিলেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রফেসর। ছাত্রজীবন থেকে তার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আমি যে বাসায় ছিলাম এর কাছেই বাংলাদেশ হজ্জ মিশন অফিস। কাবা শরীফে যাবার পথেই অফিসটি অবস্থিত। হজ্জের পর ৭ কিস্তি লেখা তার হাতে দিলাম। তিনি ঢাকায় এসে আমার সেক্রেটারি নাজমুল হকের হাতে দিলেন এবং পাওয়ার সাথে সাথেই সেক্রেটারি ই-মেইলে আমাকে প্রাপ্তি সংবাদ জানিয়ে নিশ্চিত করলো।

ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখ দিবাগত রাত মিনায় রওয়ানা হয়ে ১৩ তারিখ দিবাগত মধ্যরাতে মক্কা শরীফের বাসায় ফিরে আসলাম। ১৫ তারিখ দুপুরে খাবার পর জেদ্দায় ফিরে গেলাম। মামুন তার গাড়ি নিয়ে এসেছিলো। এক ঘণ্টায়ই জেদ্দায় পৌঁছলাম। মাঝখানে ৫ দিন হজ্জ উপলক্ষে মিনা, আরাফাহ, মুযদালিফা, মক্কা ও আবার মিনায় কাটলো। এ ৫ দিনের বিবরণ নিয়ে একটি আলাদা কিস্তি লেখার আশা রাখি।

আবদুর রহীম সাহেবের বাসা থেকে বিদায় হয়ে আসার সময় তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে দুটো মামুনের মাকে জড়িয়ে এমনভাবে কাঁদলো, যেমন আপন মা ও দাদীর জন্য কাঁদে। তাদের সাথে এমন মহব্বতের সম্পর্ক হয়ে গেলো, যেমন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সাথে হয়ে থাকে।

অনুবাদে পূর্ণ মনোযোগ দিলাম

হজ্জের আগে মাত্র ৩ পারা পরিমাণ অনুবাদ করা সম্ভব হয়েছে। ১২ পারা অনুবাদ করা বাকি থাকায় বিরাট বোঝার অনুভূতি নিয়ে অনুবাদে সিরিয়াস হয়ে গেলাম।

১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু করলাম। এপ্রিলের মাঝামাঝি যাতে সমাপ্ত হয় সে টার্গেটে অনুবাদের গতি বৃদ্ধির চেষ্টা করলাম। ১০ মার্চ পর্যন্ত সন্তোষজনক গতিতেই এগুচ্ছিলাম। কিন্তু আমার স্ত্রীর অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ায় তাকে ১২ তারিখে কিং ফায়সাল স্পেশালাইজড হসপিটালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যেতে হলো। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরের দিন আবার নিয়ে গেলে হাসপাতালে ভর্তি করে নিলো। ১৭ তারিখে হাসপাতাল থেকে বাসায় আনলাম। ঠিক এ সময়েই মামুনের প্রবল ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে কয়েকদিন একটানা আমাকেই হাসপাতালে থাকতে হলো। এভাবে আমার এক পারা পরিমাণ অনুবাদের সময় চলে গেলো।

হজ্জের আগেও মদীনা শরীফ যাইনি। হজ্জের পর হাজীদের ভিড় কমলে যাবো বলে মনস্থ করে রাখলাম। দেশে ফিরবার আগে মক্কা শরীফে বিদায়ী তাওয়াফের জন্যও যেতে হবে। ১৪ এপ্রিল ঢাকা রওয়ানা হবার জন্য প্লেনে সীট বুক করা হয়ে গেলো। দু'জায়গায়ই যাবার জন্য সিদ্ধান্ত হলো যে, বুধবার রাতে সেখানে পৌছে জুমআবার বিকেলে ফিরে আসতে হবে। এ দু'মসজিদে জুমআর নামাযের মজাই আলাদা।

এ সময়সীমা অনুযায়ী অনুবাদে আরও বেশি সময় লাগালাম। ২ এপ্রিল দুপুরে ২৪ পারার অনুবাদ সমাপ্ত করে ঐদিনই বিকেলে মদীনা শরীফ রওয়ানা হলাম। এর পরের সপ্তাহে মক্কা শরীফ যাবার কথা। আর মাত্র ১ পারার অনুবাদ বাকি রইলো, যা মদীনা থেকে ফিরে এসে মক্কা যাবার আগে সমাপ্ত করতে হবে। আল্লাহর মেহেরবানীতে এ রুটিন অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা গেলো। ৮ এপ্রিল রাত ৯টায় ২৫ পারার অনুবাদ শেষ করার সাথে সাথে ঐ রাতেই আমীরে জামায়াতকে ই-মেইলে এ সুখবর দিলাম এবং ১৪ তারিখে সন্ধ্যায় রওয়ানা হয়ে ১৫ তারিখ সকালে ঢাকা পৌছার সংবাদও জানালাম।

মদীনা শরীফ যিয়ারত

হাজীদের জন্য মদীনা শরীফ যিয়ারত ফরয বা ওয়াজিব না হলেও যারা হজ্জের উদ্দেশ্যে আসেন তারা মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের জন্য এবং রাসূল (স)-এর মাযার শরীফে সালাম জানাবার জন্য মদীনা শরীফে অবশ্যই যান। এটা রাসূল (স)-এর প্রতি মহব্বতেরই দাবি। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রাসূল (স)-কে ভালোবাসা খাঁটি ঈমানেরই পরিচায়ক। তাই কোন হাজী মদীনা শরীফ যিয়ারত না করে বাড়ি ফিরে যান না।

আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, জিলহজ্জ মাসের শেষ দিকেও হাজীদের ভিড় থাকে বলে মহররম মাসের কোন এক সময় মদীনায় যাবো। মহররমের ১০ তারিখ পর্যন্ত শিয়া মুসলমানদের মদীনায় খুব ভিড় থাকে। এ সময় তারা বদর ও ওহুদের শহীদগণের মাযারে এবং মসজিদে নববীর নিকটস্থ 'জান্নাতুল বাকী' নামক কবরস্থানে মর্সিয়া (শোক প্রকাশ) করতে যান। অবশ্য পুলিশ তাদেরকে উচ্চৈঃস্বরে মর্সিয়া গাইতে দেয় না। তারা সেখানে খুব কান্নাকাটি করেন।

আমরা মহররমের শেষ দিন ২ এপ্রিল গেলাম। মক্কা শরীফে আমাদের মেযবান জনাব আবদুর রহীম সপরিবারে মদীনা যাবার সময় জেদ্দা থেকে আমাদেরকে সাথে নিয়ে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তার ১৫ আসনবিশিষ্ট একটা মাইক্রোবাস আছে। তিনি নিজেই তা যোগ্যতার সাথে চালান। তিনি বিকাল চারটায় জেদ্দায় এসে পৌছলেন। আসরের নামায আদায় করেই ৫ টায় মদীনা রওয়ানা হয়ে রাত সাড়ে ১০টায় পৌছলাম। মদীনার এক দীনী ভাই আমীনুল ইসলাম মসজিদের খুব নিকটেই একটা বড় হোটেলে আগেই আমাদের জন্য দুটো কামরা ঠিক করে রেখেছিলেন। হজ্জের মওসুমে এসব কামরার ভাড়া অনেক। হাজীরা মদীনায় সাধারণত ৮ দিন থাকেন। এ ৮ দিনেই ৩/৪ হাজার রিয়াল ভাড়া দিতে হয়। ফোর স্টার ও ফাইভ স্টার হোটেলগুলোই মসজিদের কাছে আছে। আমরা দু'কামরায় দু'রাত ছিলাম। মাত্র ৫০০ রিয়াল নিলো। ১৪ তলা হোটেল তখন খালি। উক্ত ভাই আমীন এক সময়ে এ হোটেলে চাকরি করায় তাঁর খাতিরে ভাড়া কমই নিয়েছে।

এক সময় মসজিদের কাছেও অল্প খরচে থাকার মতো বাড়ি পাওয়া যেতো। কিন্তু মসজিদের সম্প্রসারণের প্রয়োজনে মসজিদের তিন দিকের বিরাট এলাকার বাড়িঘর ভেঙে মসজিদের বিশাল চত্বর বানানো হয়েছে। তাই স্বল্প আয়ের লোকদেরকে মসজিদ থেকে বেশ দূরে অল্প খরচের বাড়িতে থাকতে হয়।

আমি ৯৯ সালে মদীনা শরীফে মসজিদের নিকটবর্তী এলাকা যে অবস্থায় দেখেছিলাম, এবার যেয়ে বিরাট পরিবর্তন দেখলাম। মসজিদের কাছে ১০/১৫ তলার নিচে কোন বিল্ডিং নেই। আর সব বিল্ডিং-এরই নীচতলা একই ডিজাইনের। তাই মক্কার কাবা শরীফের চারপাশের বিল্ডিংগুলো থেকে মদীনা শরীফের দৃশ্য বেশি সুন্দর মনে হলো।

মক্কা শরীফে মহিলারা পুরুষদের সাথে সকল দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে পারে। কাবাঘর তাওয়াফও নারী পুরুষ একই সাথে করে। অবশ্য নামাযের সময় মহিলাদের জন্য ঘের দেওয়া জায়গায়ই তারা নামায আদায় করেন। কিন্তু মদীনা শরীফে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট দরজা ছাড়া তারা মসজিদে ঢুকতে পারেন না। রাসূল (স)-এর মাযারে যেয়ে সালাম জানানো ও রওযাতুল জান্নাতে নামায আদায়ের জন্য মহিলাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ে সুযোগ দেওয়া হয়। তখন সেখানে কোন পুরুষকে যেতে দেওয়া হয় না।

আমরা যে হোটেলে ছিলাম তা 'বাবুন-নিসা'-এর অতি নিকটে। আমাদের সাথের মহিলাদের জন্য খুব সুবিধা হয়ে গেলো। মসজিদে নববী এখন এতো বিশাল যে, গেট দিয়ে ঢুকবার পর ইমামের কাছাকাছি পৌছতে অনেক দূর পর্যন্ত হাঁটতে হয়। '৭১ সালের ডিসেম্বরে সর্বপ্রথম সেখানে যাই। এখন মসজিদ ঐ সময়ের তুলনায় দশগুণ বড়। কিবলার দিক ছাড়া তিন দিকে মসজিদ এতো প্রশস্ত হওয়ার পরও বাইরে পাকা করা বিরাট চত্বর রয়েছে। হজ্জ মওসুমে মসজিদ ও চত্বর মিলেও হাজীদের স্থান সঙ্কুলান হয় না। চত্বরের বাইরে রাস্তায়ও নামায আদায় করতে হয়।

মসজিদের দুটো প্রধান আকর্ষণ

হাদীস অনুযায়ী মক্কার বাইতুল্লাহতে এক রাকাআত নামাযের জন্য মসজিদের তুলনায় এক লাখ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়। আর মদীনার মসজিদে দশ হাজার গুণ বেশি সওয়াব হয়। এ আকর্ষণ ছাড়া আরও দুটো বড় আকর্ষণ সেখানে রয়েছে। একটি হলো মাযার শরীফ যিয়ারত। রাসূল (স), হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এ তিন জনের কবর পাশাপাশি অবস্থিত। এ কবর মসজিদের ভেতরেই আছে। এর চারপাশেও জামাআতে নামায আদায় করা হয়। ইমাম সাহেব যে জায়গায় দাঁড়ান, এর কয়েক কাতার পেছনেই মাযার শরীফ। রাসূল (স)-এর মাযারের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে তাকে সালাম জানিয়ে পরপর দু'খলীফাকে সালাম জানানোর জন্য সবাই সেখানে ভিড় করেন। ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সেখানে পুলিশ মোতায়েন থাকে।

দ্বিতীয় বড় আকর্ষণ হলো 'রাওযাতুল জান্নাত'। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, "আমার ঘর ও আমার মিম্বারের মাঝখানের জায়গাটুকু বেহেশতের বাগানগুলোর মধ্যে একটি।" এ হাদীসটি সোনালি হরফে সেখানে লেখা আছে। 'রাওযা' মানে বাগান। রাসূল (স)-এর কবর হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরে অবস্থিত। রাসূল (স) যেখানে দাঁড়িয়ে জুমআর সময় খুতবা দিতেন, সেটাই হলো মিম্বার। কবর ও মিম্বারের মাঝখানের জায়গাটুকুকে বেহেশতের একটি বাগান ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে নামায পড়া, দোয়া করা ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য প্রচণ্ড ভিড় হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী কিস্তিতে আরও আলোচনা করতে হবে।

১১৫.

মসজিদে নববী

রাসূল (স) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনা শহরে 'কাসওয়া' নামে এক উটনীর পিঠে চড়ে ঢুকলেন। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) ও অন্য অনেকেই রাসূল (স)-কে বসবাস করার জন্য জায়গা দিতে চাইলেন। রাসূল (স) বললেন যে, আমার উটনী আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট স্থানে যেয়ে বসে পড়বে। সেটাই হবে আমার বসবাসের স্থান। সবাই অত্যন্ত উৎসুক হয়ে দেখতে থাকলেন যে, উটনী কোথায় যেয়ে থামে।

শেষ পর্যন্ত উটনীটি এক জায়গায় যেয়ে যখন বসে পড়লো তখন জানা গেলো যে, ঐ জমির মালিক দু'জন ইয়াতীম। রাসূল (স) সাহাবীগণকে জমির মূল্য যাচাই করতে বললেন। সাহাবীগণ ইয়াতীম দু'জনকে হাজির করে তাদেরকে বিনামূল্যে জমিটুকু দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। কিন্তু রাসূল (স) বিনামূল্যে ইয়াতীমের জমি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাই জমির মূল্য নিরূপণ করে কিনে নিলেন।

ঐ জমির এক পাশে রাসূল (স)-এর স্ত্রীদের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করা হলো। বাকি

অংশে মদীনার প্রথম মসজিদ তৈরি করা হলো। এ মসজিদ তখন খেজুর পাতার বেড়া ও ছাউনিবিশিষ্ট ছিলো এবং মসজিদ ও থাকার ঘরের মাঝখানে খেজুর পাতার বেড়া-ই ছিলো।

মদীনা থেকে মক্কা দক্ষিণ দিকে। তাই এ মসজিদ থেকে কিবলা দক্ষিণ দিকে। এ মসজিদটিই 'মসজিদে নববী' বা 'নবীর মসজিদ' নামে খ্যাত। রাসূল (স)-এর সময় যেখানে মেহরাব ছিলো, সে জায়গাটি মেহরাবের আকারেই রাখা হয়েছে এবং সেখানে দু'রাকাআত নামায পড়ার জন্য ভিড় থাকে। তাঁর সময়ে যেখানে মিম্বর ছিলো, সেখানে বিরাট আকারের মিম্বর নির্মাণ করা হয়েছে। সে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব খুতবা দেন। কিন্তু ইমাম সাহেব নামাযের জন্য যেখানে দাঁড়ান, সে জায়গাটা রাসূল (স)-এর মেহরাব থেকে আরও কয়েক কাতার দক্ষিণে অবস্থিত। রাসূল (স)-এর মসজিদ কিবলার দিকে (দক্ষিণ দিকে) মাত্র কয়েক কাতার বাড়ানো হয়েছে। মসজিদটি তুর্কি শাসনামলে অত্যন্ত মযবুতভাবে নির্মাণ করা হয়। সৌদী শাসনামলে উত্তর ও পূর্ব-পশ্চিমে সম্প্রসারণ শুরু হয়। উঁচু ছাদবিশিষ্ট বিশাল প্রাসাদের বাইরেও তিনদিকে বিরাট পাকা চত্বর রয়েছে।

মসজিদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

তুর্কি আমলে নির্মিত বিল্ডিং-এর গোটা ছাদই অনেক গম্বুজের সমষ্টি। গম্বুজের ভেতরকার সাজ-সজ্জার মধ্যে কুরআনের আয়াতগুলো এমন সুন্দর দেখায় যে, দেখতেই থাকতে হয়। চোখ ফেরানো দায়। কিবলার দিকে দেয়ালে আরবী ক্যালিওগ্রাফির আকারে কয়েক লাইনে বহু আয়াত খচিত। এর নিচে রাসূল (স)-এর বহু উপাধি লেখা রয়েছে। সৌদী আমলে নির্মিত অংশে ছাদ গম্বুজের আকারে নয় বটে; অনেক উঁচু। সারা মসজিদের পিলারগুলোতে তেমন কারুকার্য নেই। কিন্তু উপর দিকে অত্যন্ত চমৎকার শিল্পোন্নত কারুকার্য রয়েছে, যা দেখলে চোখ জুড়ায়।

তুর্কি আমলের বিল্ডিং ও সৌদী আমলের বিল্ডিং মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রয়েছে, যা ১৯৭১ সাল থেকে '৭৭ সাল পর্যন্ত দেখে এসেছি। তখন ফাঁকা জায়গায় ছোট ছোট পাথরকণা ছিলো। নামাযের সময় এর উপর কার্পেট বিছিয়ে দেওয়া হতো। জালালী কবুতর নামে এদেশে পরিচিত বহু পাখি কঙ্করে ফেলে রাখা গম খেতে ভিড় জমাতো। এ পাখি মনে হয় সারা দুনিয়াতেই বড় বড় পার্কে দেখা যায়। সবগুলো কবুতর একই রঙের।

১৯৯৫ সালে ১৮ বছর পর যেয়ে দেখলাম, কঙ্করের জায়গায় মার্বেল পাথর। উপরে আগে কোন ছাদ বা ঢাকনা ছিলো না। এখন এক বিস্ময়কর ঢাকনা দেখলাম। বেশ কয়টা পিলার দেখা গেলো, যার উপর দিক থেকে বিশাল এক ছাতা রোদের সময় খুলে ছায়া দান করে। আবার সন্ধ্যার সময় গুটিয়ে নেয়। তখন দেখতে মনে হয়, পিলারটি অনেক উঁচু ও উপর দিকে ক্রমে সরু হয়ে আছে। উপরের অংশটিই ছাতার মতো ছড়ায়। এটা খোলা ও গুটিয়ে নেবার সময়কার দৃশ্যটি চমৎকার।

এ মসজিদের আর একটি দৃশ্য আরও চমকপ্রদ। এতো বিশাল মসজিদের ছাদের আটটি অংশ আট জায়গায় এমনভাবে বসানো হয়েছে যে, অধিক গরমের সময় যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সেগুলোকে সরিয়ে নেওয়া যায়। ধীরে ধীরে সরে যেতে দেখে অলৌকিক কারবার বলে মনে হয়। গোটা মসজিদেই এয়ার-কন্ডিশনের ব্যবস্থা আছে। এ সত্ত্বেও প্রচণ্ড গরমের সময় ছাদ এভাবে খুলে দেওয়া হয়।

মক্কা শরীফের মসজিদে এয়ার-কন্ডিশনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। কারণ কাবা শরীফের চারপাশে বিরাট এলাকায় কোন ছাদ নেই। এ খোলা এলাকার পর তুর্কি আমলের বিল্ডিং রয়েছে। এরপর সৌদী আমলের সুউচ্চ ছাদবিশিষ্ট বিশাল মযবুত মসজিদ। ২৪ ঘণ্টা মানুষ তাওয়াফ করার জন্য আসে বলে চারদিকের গেটসমূহ কোন সময় বন্ধ রাখা হয় না। এসব কারণে এয়ার-কন্ডিশনের ব্যবস্থা সেখানে নেই।

মদীনার মসজিদে রাত দশটার সময় সকল গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফজরের সময় শুরু হবার এক ঘণ্টা আগে তাহাজ্জুদের আযান দেওয়া হয় এবং তখন গেট খুলে দেয়। এ আযানে 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা হয় না।

রাসূল (স)-এর মাযার শরীফ

আগেই বলা হয়েছে যে, মসজিদের সাথেই রাসূল (স)-এর থাকার ঘর ছিলো। সকল বিবির জন্য আলাদা আলাদা ঘর ছিলো। এ ঘরগুলো তুর্কি আমলেই লোহার জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। কিবলার দিক থেকে প্রথম ঘরটি হযরত আয়েশা (রা)-এর ছিলো। এ ঘরেই রাসূল (স) ইন্তিকাল করেন। ইন্তিকালের পর তাঁর লাশ কোথায় দাফন করা হবে এ বিষয়ে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ চলাকালে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এ হাদীস পেশ করলেন যে, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, "নবী যে স্থানে ইন্তিকাল করেন, সেখানেই কবর দিতে হয়।"এ হাদীস অনুযায়ী ঐ ঘরেই রাসূল (স)-এর মাযার শরীফ রয়েছে।

রাসূল (স)-এর বিখ্যাত একটি হাদীস হলো, "আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝে যা আছে তা বেহেশতের বাগানগুলোর মধ্যে একটি বাগান।" বাগানের আরবী হলো 'রওযা'। সে হিসেবে রাসূল (স)-এর মাযার শরীফ ও মিম্বরের মাঝখানের জায়গাটুকুকে 'রওযা শরীফ' বলা হয়। কিন্তু খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে রাসূল (স)-এর কবর শরীফ বা মাযার শরীফকে রওযা শরীফ বলা হচ্ছে। আরব দেশে এ ভুলটি কেউ করে না। তারা কবর শরীফ বা মাযার শরীফই বলে। মাযার শব্দটি যিয়ারত শব্দ থেকেই তৈরি হয়েছে। যিয়ারত মানে দেখা। মাযার অর্থ দেখার স্থান বা দেখার জন্য যেখানে লোকজন আসে।

বাবে জিবরীল

রাসূল (স)-এর মাযারের সামনে কিবলা মুখি হয়ে দাঁড়ালে ডান দিক পশ্চিম ও বাঁ দিক পূর্ব। মদীনা থেকে মক্কা দক্ষিণ দিকে। মাযার শরীফের পশ্চিম দিকে মসজিদ বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব দিকে মাত্র কয়েক হাত পরই মসজিদের

সীমানা শেষ। রাসূল (স)-এর বিবিগণের ঘরগুলো যেখানে শেষ হয়েছে এরই বরাবর পূর্ব দিকে মসজিদের যে গেটটি রয়েছে এরই নাম বাবে জিবরীল বা জিবরাঈলের দরজা। রাসূল (স)-এর নিকট তো হযরত জিবরাঈল (আ) বারবারই আসতেন। একদিন ভোরে তিনি মানুষের বেশে উটে চড়ে আসলেন। যাবার সময় রাসূল (স)-এর এক বিবি দেখলেন যে, এক লোক উটে চড়ে চলে গেলেন। তখন তিনি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার কাছে কে এসেছিলেন?" রাসূল (স) বললেন, "তুমি কি লোকটিকে দেখেছো?" জওয়াবে বললেন, "দেখেই তো জানতে চাইলাম।" রাসূল (স) বললেন, "তিনি হযরত জিবরাঈল (আ)।" এ ঘটনার পর থেকে এ জায়গার নাম দেওয়া হলো 'বাবে জিবরীল'। বাব মানে দরজা।

এ গেট দিয়ে মসজিদে ঢুকলে প্রথমে বাঁ দিকে রাসূল (স)-এর বিবিগণের ঘরগুলোর শেষ সীমানা এবং ডান দিকে আসহাবে সুফফার আস্তানা। এ দু'য়ের মাঝখানের পথ দিয়ে সামান্য এগুলেই বাঁ দিকে 'রওযাতুল জান্নাত'। শেষ রাতে এ জায়গায় নামায, দোয়া ও তিলওয়াতের জন্য হাযির হবার উদ্দেশ্যে বাবে জিবরীলের বাইরে তাহাজ্জুদের আযানের আগেই মানুষ জড়ো হতে থাকে। আযান শুরু হবার সাথে সাথেই গেট খুলে দেওয়া হয়। খুলবার সাথে সাথে জড়ো হওয়া লোকেরা দৌড়াতে থাকে, যাতে রাওযাতুল জান্নাতে রাসূল (স)-এর মাযারের সবচেয়ে কাছে জায়গা নিতে পারে।

হজ্জের সময় এখানে সবচেয়ে বেশি ভিড় হয়। ভিন্ন ধরনের কার্পেট দিয়ে মসজিদের অন্য এলাকা থেকে রওযাতুল জান্নাতের স্থানটুকুকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এ এলাকাটিতে হাজার খানিক লোক নামায পড়তে পারে। কিন্তু যখন ভিড় বেশি হয় তখন কাতার এতো ঘন ঘন করতে হয় যে, পেছনের কাতারের নামাযীকে সামনের কাতারের লোকদের পিঠে সিজদা করতে হয়। এ এলাকার মধ্যেই রাসূল (স)-এর ইমামতির জায়গা বা মেহরাব অবস্থিত। মেহরাবের সাথেই রাসূল (স)-এর মিম্বর রয়েছে।

আসহাবে সুফফা

সুফফা মানে ছাপড়া ঘর, চাল, শামিয়ানা ইত্যাদি। 'আসহাবে সুফফা' অর্থ ছাপড়া ঘরের বাসিন্দা। রাসূল (স)-এর সময় যারা ঈমান আনার অপরাধে বাড়িঘর থেকে বিতাড়িত হতেন তারা রাসূল (স)-এর নিকট এসে আশ্রয় নিতেন। মক্কা থেকে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় যারা মদীনায় হিজরত করে আসলেন, তাদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক রাসূল (স)-এর কাছে থাকতেন। দীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এ সাহাবীগণ মসজিদের পাশে একটি গাছের নিচে থাকতেন। কোন কারণে গাছের নিচে থাকা না গেলে মসজিদেও থাকতে হতো। তাঁরা সব সময় রাসূল (স)-এর সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁরা কখনো কখনো সুযোগ পেলে শ্রমিক হিসেবে সামান্য আয় করার চেষ্টাও করতেন। আসলে তাঁরা সব সময় রাসূল (স)-এর সান্নিধ্যে থাকাই পছন্দ করতেন। রাসূল (স) তাঁদের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতেন। তাঁদেরকে ভুখা রেখে নিজে খেতেন না।

আসহাবে সুফফাগণ যেখানে থাকতেন এ স্থানটুকু মসজিদের মেঝে থেকে এক হাত উঁচু করে রাখা হয়েছে এবং এ অংশটুকু পিতলের তৈরি রেলিং দিয়ে চিহ্নিত করা আছে। বাবে জিবরীল দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে ডান পাশেই এ স্থানটুকু রয়েছে। এখানেও হাজীগণ নামায পড়ার জন্য সুযোগ তালাশ করেন।

আসহাবে সুফফা হিসেবে যারা পরিচিত তাদেরকে আধুনিক পরিভাষায় ইসলামী আন্দোলনের 'Whole time worker' বলা যেতে পারে। কুরআনের সূরা আল বাকারার ২৭৩ নং আয়াতে তাঁদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "বিশেষ করে ঐ সব অভাবী লোকেরাই সাহায্য পাওয়ার হকদার, যারা আল্লাহর কাজে এমনভাবে লেগে গেছে যে, তারা নিজেদের ব্যক্তিগত রুজি-রোজগারের জন্য চেষ্টা তদবীর করতে পারে না। তারা কারো কাছে চেয়ে বেড়ায় না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সচ্ছল মনে করে। তোমরা তাদের চেহারা দেখে তাদের ভেতরের অবস্থা জেনে নিতে পারো। কিন্তু তারা এমন লোক নয় যে, নাছোড় বান্দার মতো মানুষের কাছে কিছু চায়। তাদের সাহায্যে তোমরা যে মাল খরচ করবে তা আল্লাহ থেকে গোপন থাকবে না।"

রাসূল (স)-এর কবরের পাশে আরও দু'জনের কবর

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা)-এর ঘরেই রাসূল (স)-কে দাফন করা হয়। ঐ ঘরে তিনটি কবরের জায়গা রয়েছে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীকের ইন্তিকাল হলে রাসূল (স)-এর কবর শরীফের পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। হযরত আয়েশা (রা) মনে মনে আশা পোষণ করতেন যে, বাকী জায়গাটিতে যেন তার কবর হয়। যে দু'জনের কবর সেখানে আছে তাদের একজন তাঁর স্বামী, আর অপরজন তাঁর পিতা। তাই তাঁর জন্য এমন বাসনা স্বাভাবিক ছিলো।

হযরত ওমর (রা) আহত হবার পর যখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না। তখন তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ (রা)-কে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশার নিকট তাঁর পক্ষ থেকে একটি আবেদন পেশ করার জন্য পাঠালেন। আবেদনটি হলো, "আপনার ঘরে যে দু'জনের কবর রয়েছে তাদের ঘনিষ্ঠ সাথী হিসেবে আমার জীবন কেটেছে। মৃত্যুর পর তাঁরা দু'জন এক সাথেই আছেন। আমার একান্ত কামনা যে, আমার মৃত্যুর পরও যেন আমি তাদের সাথে জায়গা পাই। ওখানে আর একটা কবরের জায়গাই আছে। আপনি সম্মতি দিলেই আমার এ আশা পূরণ হতে পারে। আমি আপনার সম্মতির অপেক্ষায় আছি।"

এ আবেদনের কথা শুনবার পর হযরত আয়েশা অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন, "আমার স্বামী ও আমার আব্বার পাশে আমার কবর হবে বলে আমি একান্তভাবে কামনা করে আসছিলাম। এখন ওমর যদি এটা দাবি করেন তাহলে আমাকে বিবেচনা করতেই হবে। তিনি দীনের যে বিরাট খিদমত করেছেন, সে কারণে আমি তাঁর খাতিরে আমার কামনা ত্যাগ করলাম।"

এ সম্মতি পাওয়া সত্ত্বেও হযরত ওমর (রা) তাঁর ছেলেকে অসীয়ত করলেন,

"আমার জীবিতকালে তিনি হয়তো আমার খাতিরে সম্মতি না দিয়ে পারেননি। তাই আমার মৃত্যুর পর আবার তাঁর নিকট অনুমতি চাইবে। তিনি যদি খুশী মনে সম্মতি দেন তাহলেই কেবল সেখানে আমাকে দাফন করবে।"

হযরত ওমর (রা)-এর ইন্তিকালের পর আবার অনুমতি চাইলে হযরত আয়েশা অত্যন্ত স্পষ্ট করে পূর্ব সম্মতির কথা প্রকাশ করলেন।

কবর যিয়ারত

বিশ্বের সকল এলাকা থেকে লাখ লাখ মুসলিম নারী ও পুরুষ হজ্জের আগে বা পরে অবশ্যই মদীনা শরীফে যান এবং সাধারণত সবাই মসজিদে নববীতে ৪০ ওয়াক্ত জামাআতে নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে ৮ দিন থাকেন। প্রত্যেক নামাযের পরই রাসূল (স)-এর প্রতি সালাম পেশ করার জন্য প্রচণ্ড ভিড় হয়। পুলিশ সবাইকে শৃঙ্খলার সাথে সালাম দিয়ে চলে যাবার জন্য তাগিদ দেয়। ওখানে কাউকে দাঁড়াতে দেয় না। দাঁড়াতে হলে মাযার থেকে একটু দূরে থাকতে হয়। মাযারের একেবারে সামনের ২/৩ সারি মানুষ সালাম পেশ করতে করতে পূর্ব দিকের গেট দিয়ে বের হয়ে যায়।

নামাযের সময় ছাড়াও আমি কখনো সেখানে জনশূন্য অবস্থা দেখিনি। মানুষ খুব কম থাকলে মাযার বরাবর কিছু সময় দাঁড়িয়ে সালাম ও দরূদ পেশ করা যায়। সকাল ৭টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মহিলাদের যিয়ারতের জন্য সময় নির্দিষ্ট আছে। তখন কোন পুরুষকে সেখানে যেতে দেওয়া হয় না। হজ্জ ও মদীনা শরীফ যিয়ারত সম্পর্কে প্রচুর বই পুস্তক পাওয়া যায়। তাতে রাসূল (স) ও অপর দু'জনের প্রতি সালাম জানাবার জন্য চমৎকার ভাষায় অনেক কথা লেখা আছে। স্বাভাবিক কারণেই সবাই অত্যন্ত আবেগের সাথে সালাম জানায়। মাযারটি সোনালি রঙের আবরণে লোহার জাল দিয়ে ঘিরে রাখা আছে। কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলে জালের ফাঁকে চাদর দিয়ে ঢাকা আছে বলে মনে হয়। ঐ জালের মধ্যে দু'হাত উঁচুতে কয়েকটা বড় ছিদ্র আছে তা দিয়ে ভেতরে দেখা যায়। কিন্তু পুলিশ খুব কাছে যেতে দেয় না।

১৯৭২ থেকে ৭৭ সালের মধ্যে যতবার গিয়েছি, তখন খুব কাছে যাওয়া যেতো। কিন্তু ৯৫ সালে যেয়ে দেখলাম, মাযারের জালের পাশে এক হাত উঁচু ও হাত দেড়েক পাশ পাকা সিঁড়ি তৈরি করে পুলিশের দাঁড়াবার ব্যবস্থা করেছে। তাই জালের খুব কাছে যাবার উপায় নেই। আগে এতো কাছে যাওয়া যেতো যে, জালে সহজেই হাত লাগানো যেতো। ঐ সময়ের কথা মনে আছে যে, পুলিশের হাতে কাপড়ে পাকানো মোটা দড়ি থাকতো। কেউ জালে হাত দিলে বা চুমু দিতে চাইলে পুলিশ ঐ কাপড়ের দড়ি দিয়ে পিটাতো। আমি কয়েকবারই লক্ষ্য করেছি যে, পোশাকে পাক-ভারত-বাংলাদেশের মানুষ বলে চিনতে পারলেই পুলিশ সতর্ক হয়ে যেতো। কারণ পুলিশের আশঙ্কা হতো যে, এরা বে-শরীআতী কিছু করে ফেলতে পারে। একবার দেখলাম যে, পুলিশকে অন্যদিকে চেয়ে থাকা অবস্থায় দেখে এক

বিহারী মধ্যবয়সী লোক মাযারের দিকে মুখ করে সিজদা দিয়েই ফেললো। পুলিশকে পিটাতে আসতে দেখে উঠে গেটের দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেলো। মাজারের দিকে মুখ করে হাত তুলে দোয়া করতে দেখলে পুলিশ ওখান থেকে গেটের দিকে সরে গিয়ে কিবলা রুখ হয়ে দোয়া করতে পরামর্শ দেয়। মাযার হলো কিবলার বিপরীত দিকে।

এক ইহুদী চক্রান্ত

তুর্কি শাসনামলে সুলতান নুরুদ্দীন জঙ্গী একাধারে তিনদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, রাসূল (স) দু'জন দীর্ঘ শ্মশ্রুধারী সুদর্শন গৌরবর্ণ ব্যক্তিকে দেখিয়ে বললেন, "এরা আমাকে জ্বালাতন করছে। এদেরকে প্রতিরোধ করো।" তিনি এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে মদীনা শরীফ হাজির হলেন। মদীনার গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন যে, মদীনার সকল পুরুষকে সুলতানের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের সবাইকে খাবার দাওয়াত দিতে হবে।

এক এক মহল্লার লোক এক-এক দিন হাজির হয়ে দেখা করে খেয়ে যেতে থাকলো। সুলতান তাদের মধ্যে স্বপ্নে দেখা দু'জন লোক তালাশ করতে লাগলেন। মদীনার সকল পুরুষকে হাজির করা সত্ত্বেও ঐ দু'জনের কোন সন্ধান পাওয়া গেলো না। সুলতান পেরেশান হয়ে গভর্নরকে নির্দেশ দিলেন যে, সর্বত্র জনগণকে যেন জিজ্ঞেস করা হয় যে, উপরে বর্ণিত দু'জন মানুষ সম্পর্কে তারা কিছু জানে কিনা। জানা গেলো যে, এমন ধরনের দু'জন লোক মদীনার মসজিদে রাতদিন থাকে। তারা সব সময় ইবাদতে মশগুল থাকে। মসজিদের এলাকার বাইরে কখনো যায় না। তারা রোজ মদীনাবাসীদেরকে বহু কিছু উপহার দেয় এবং ব্যাপক দান খয়রাত করে। তারা বড় বুজুর্গ হিসেবে মদীনাবাসীর ভালোবাসা অর্জন করেছে। গভর্নর তাদের দু'জনকে সুলতানের কাছে হাজির করলেন। সুলতান তাদেরকে দেখেই চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আল্লাহর কসম, এদের তালাশেই আমি এসেছি।"

তাদেরকে বহুভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করেও এমন কিছু জানা গেলো না, যার ভিত্তিতে তাদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়। সুলতান তাদেরকে নিয়ে মসজিদে এলেন। মসজিদে যে নির্দিষ্ট স্থানে এরা থাকে সেখানে পৌছে তাদের বিছানাপত্র সরিয়ে দেখা গেলো যে, সেখানে কয়েকখণ্ড কাঠ রয়েছে। পাকা মসজিদের এক জায়গায় কাঠ থাকা তো স্বাভাবিক নয়। তাই কাঠ তুলে দেখা গেলো নিচে সুরঙ্গ। সুরঙ্গে ঢুকে সুলতান রাসূল (স)-এর কবরের একেবারে কাছে গিয়ে দেখলেন যে, রাসূল (স)-এর পায়ের আঙুল দেখা যাচ্ছে। তিনি মহব্বতের সাথে পায়ে চুমু দিলেন।

সুরঙ্গ থেকে বের হয়ে এ দু'জনকে কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলেন যে, তারা গত কয়েক মাস থেকে গভীর রাতে সুরঙ্গ কেটে মাটি নিকটবর্তী করবস্থানে নিয়ে ফেলেছে। ঐ কবরস্থানটিই জান্নাতুল বাকী নামে খ্যাত। কবরস্থান থেকে সুরঙ্গ করা শুরু হয়ে রাসূল (স)-এর কবরে পৌছে গেছে। আর দিন দু'তিনের মধ্যেই তারা রাসূল (স)-এর অবিকৃত দেহ মুবারক সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে

যেতো। এরপর তাদের উদ্দেশ্য ছিলো ঘোষণা করা যে, এখানে রাসূল (স)-এর লাশ নেই। তিনি নবী হয়ে থাকলে লাশ থাকবে না কেন? এভাবে ইহুদীরা রাসূল (স) নবী ছিলেন না বলে প্রমাণ করতে চেয়েছিলো।

সুলতান মদীনাবাসীদেরকে সমবেত করে তাদের জঘন্য ও ঘৃণ্য চক্রান্ত প্রকাশ করেন এবং সবার সামনে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন।

সুলতান কবর শরীফের স্থায়ীভাবে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন। কবরের চারপাশে ৫ ফুট প্রশস্ত করে সীসা গলিয়ে এতোটা নিচ পর্যন্ত ঢালাই করে দিলেন যে, এ জাতীয় চক্রান্ত যেন আর করা সম্ভব না হয়।

এরপর থেকে মদীনার মসজিদ রাতে বন্ধ রাখার নিয়ম চালু করা হয়।

১১৬.

শেখ মুজিবের গ্রেপ্তার ঃ আগের ও পরের অবস্থা

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পাকিস্তান সরকারের আনুগত্য ত্যাগ করে শেখ মুজিবের নির্দেশ পালন করা শুরু করেন। ব্যাংকসমূহও তাঁরই নির্দেশ মেনে চললো।

ঐ ৭ মার্চই পূর্ব-পাকিস্তানের নবনিযুক্ত গভর্নর লে. জেনারেল টিক্কা খান ঢাকায় পৌছেন। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছলো যে, ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী তাঁকে গভর্নর হিসেবে শপথ পরিচালনা করতে অস্বীকার করেন। শেখ মুজিবের নির্দেশ হাইকোর্টও মেনে চলছিলো। তখনকার বিবরণ পূর্বের এক কিস্তিতে আলোচনা করেছি। মোটকথা, সেই সময় যে পরিস্থিতি ছিলো, শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে সক্রিয় জনগণ ও পূর্ব-পাকিস্তানের বেসামরিক সরকার অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সাড়া দিতো। ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে শেখ মুজিব নিজের বাড়িতে অবস্থানকালে জেনারেল ইয়াহইয়া সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হতে রাজি হয়ে প্রমাণ করলেন যে, তিনি পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তাকে ঐ সময় বিচ্ছিন্ন করার কোন সিদ্ধান্ত নেননি।

তাই শেখ মুজিবের গ্রেপ্তারের পর দু'সপ্তাহের মধ্যে পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন এলো। প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিকী ৯ এপ্রিল পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে টিক্কা খানের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। সচিবালয়ে সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে তৎপর হলেন। তাদের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি হলো যে, টিক্কা খানের শাসন টিকে গেলো। ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপ ব্যর্থ হওয়ায় জনগণ হতাশ হয়ে ধারণা করলো যে, আপাতত নির্বাচিত সরকার কায়েম হবার সম্ভাবনা আর রইলো না।

মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা

'৭১-এর মে মাসের মধ্যেই গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের সরকার জেলা ও মহকুমা শহরে নিয়ন্ত্রণ শক্তি লাভ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা শহরের বাইরেই সীমাবদ্ধ ছিলো। শহরে কোথাও কোথাও চোরাগোপ্তা হামলা করার জন্য লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে বাজার ব্যাগে বোমা ও অস্ত্র নিয়ে একেবারে ছদ্মবেশে মুক্তিযোদ্ধারা আসতো এবং নির্জনতার সুযোগ পেলে বোমা ফেলে নীরবে চলে যেতো। পাহারায় নিযুক্ত রেযাকারকে সুযোগ মতো গুলী করতো। শহরে এর চেয়ে বেশি তৎপরতা তাদের ছিলো না।

শহরের বাইরে রাতের বেলায় তারা এসে কোন সচ্ছল বাড়িতে উঠতো এবং খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করার দাবি জানাতো। শেষ রাতে চলে যেতো। যেসব বাড়িতে তারা উঠতো এর মালিকদের কেউ আন্তরিকতার সাথে আবার কেউ অস্ত্রের ভয়ে তাদের দাবি মেনে নিতো। তাদের লক্ষ্য ছিলো, সেনাবাহিনীকে গাড়ি নিয়ে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করা। এ উদ্দেশ্যে কালভার্ট ও ছোট ছোট পুল বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দিতো। এ সবের পাহারায় কোথাও রেযাকার থাকলে তাদের সাথে সংঘর্ষ হতো। এলাকার জনগণ বাধা দিলে তারা নীরবে চলে যেতো। শুধু রেযাকার থাকলে গুলী করে তাদের কাজ সমাধা করতো।

মুক্তিযোদ্ধাদের আর একটি টার্গেট ছিলো থানা শহরে এবং সম্ভব হলে জেলা ও মহকুমা শহরে শান্তি-কমিটির নেতাদেরকে হত্যা করা। এর ফলে নিজেদের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই তারা রেযাকার ও এলাকার কিছু স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করে রাতে পাহারার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হতেন। এমন সব জায়গায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কোথাও কোথাও লড়াই হতো।

একদিন সন্ধ্যার পর খুলনা সার্কিট হাউজের এক কামরায় শান্তিকমিটির দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বোমা মেরে চলে গেলো। এতে বেশ কয়েকজন আহত হলেও কেউ নিহত হয়নি। ঢাকায় মুসলিম লীগ নেতা জনাব শফিকুল ইসলামের মগবাজারস্থ বাড়িতে শান্তি কমিটির অফিসের দিকে রাতে বোমা ছুঁড়া হয়। যারা ঘরের ভেতরে ছিলেন তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। আমাদের গ্রামের মুসলিম লীগ নেতা মোমতাজ মাস্টারের গ্রাজুয়েট ছেলে ঘরের বাইরে থাকায় মারাত্মকভাবে আহত হলে নিকটবর্তী হলি ফেমিলি হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

১৯৭১-এর জুন মাসে মনে হলো যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা বহাল হয়ে গেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতাসত্ত্বেও দেশ অচল হয়ে পড়েনি তখনও। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর তল্লাশি ব্যাপক হওয়ায় জনগণের মধ্যে অস্বস্তি বেড়ে চললো।

বেসামরিক গভর্নর নিয়োগ

১৯৭১ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত মনে হলো যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলা মোটামুটি বহাল

হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথারীতি চালু আছে। টিক্কা খান গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণের পর সেনাছাউনি থেকে গভর্নর হাউজে চলে গেলেন। প্রধান সামরিক শাসনকর্তার পদবি তিনি ত্যাগ করেন। লে. জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজি পূর্ব-পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশে বেসামরিক সরকার চালু আছে এমন ধারণা দেবার যত চেষ্টাই করা হোক, টিক্কা খান গভর্নর থাকা অবস্থায় জনগণ এ সরকারকে সামরিক সরকারই মনে করতো।

পূর্ব-পাকিস্তানে এ এলাকার কোন বেসামরিক ব্যক্তিকে গভর্নর করে তাঁর অধীনে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হলে জনগণকে এ ধারণা দেওয়া যাবে যে, এখানে এ দেশী লোকের শাসনই কায়েম করা হয়েছে। সম্ভবত এ জাতীয় চিন্তা-ভাবনা করেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী এএম মালিককে ৩ সেপ্টেম্বর গভর্নরের দায়িত্ব অর্পণ করেন। তিনি একটি মন্ত্রিসভা গঠন করে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার পরিচালনা করতে লাগলেন।

কিন্তু জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ঠেকাবার যে চেষ্টা করছিলো, তারা সবাই পশ্চিম-পাকিস্তানি হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিরূপ মনোভাব আরও বেড়ে গেলো। বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধাদের তল্লাশি করতে গিয়ে সৈনিকরা যেসব অন্যায় আচরণ করতো তাতে তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। এর ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি জনগণের সহযোগিতা বাড়ছিলো। ভারতের সাথে বিশাল সীমান্ত সেনাবাহিনী কতটুকু পাহারা দিতে পারে? সদর রাস্তা ছাড়া সীমান্ত পার হয়ে আসা ঠেকানো কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ জনগণ সেনাবাহিনীর বিপক্ষে ও মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে থাকায় সীমান্ত বন্ধ করা মোটেই সহজ ছিলো না।

ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্ত

১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপ ব্যর্থ হওয়ার পর জেনারেল টিক্কা খানের পরিচালনায় ঢাকায় ব্যাপক সামরিক নির্যাতন চলে। এর প্রতিক্রিয়ায় শেখ মুজিব ছাড়া আওয়ামী লীগের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ভারতে আশ্রয় নেন।

১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কায়েম হওয়ার পর এ সরকারের পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধীর নিকট বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবেদন জানানো হয়। আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর লেখা 'রাজনীতির তিন কাল' নামক পুস্তকে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ভারতীয় কংগ্রেসের পশ্চিম-বঙ্গীয় ও আসামের কোন্ কোন্ নেতার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর দরবারে পৌঁছা সম্ভব হয় সে বিষয়ে তিনি যা লিখেছিলেন, তাতে মনে হয় তিনি স্বয়ং মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

পাকিস্তানের চিরশত্রু ভারত সরকার এতোবড় মহাসুযোগ পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই

অত্যন্ত উৎসাহ ও আন্তরিকতার সাথে সব কিছু করার আশ্বাস দিলেন। টিক্কা খানের সৈন্যদের অত্যাচারের ভয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা ভারতে আশ্রয় নিলো, তাদের জন্য উদ্বাস্তু শিবিরের ব্যবস্থা করা, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারকে ভারতে অবস্থান করার সুবন্দোবস্ত করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তৎপরতা চালাবার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভারত সরকার পালন করে। এমনকি ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পূর্ণ সহযোগিতা করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে একটি বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে পূর্ব-পাকিস্তানে বেসামরিক গভর্নর ও মন্ত্রিসভার পরিচালনায় জনগণের মনে পাকিস্তানের প্রতি আস্থা পুনর্বহালের আশঙ্কায় ইন্দিরা গান্ধী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে স্বাধীনতা আন্দোলন চলতে দিলে কত বছর লেগে যায় তা অনিশ্চিত। তাই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করা প্রয়োজন। তাই ইন্দিরা গান্ধী এ সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি উপলব্ধি করলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকলে ভারত সরকারের কয়েকটি বড় ঝামেলা পোহাতে থাকতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ও যুদ্ধ পরিচালনার বিরাট ব্যয়ভার বহন করতে থাকতে হবে। সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় নিয়োজিত থাকতে হবে। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে এবং তাদের ত্রাণকার্য দীর্ঘদিন চলতে থাকলে বিরাট অর্থনৈতিক চাপ সহ্য করতে হবে।

অপরদিকে পূর্ব-পাকিস্তানে বেসামরিক সরকার বেশিদিন ক্ষমতায় থাকতে পারলে জনগণ স্বাধীনতার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া পাকিস্তানের ভারত বিরোধী প্রচারণায় জনগণের মধ্যে ভারত সম্পর্কে পূর্বের বিরূপ ভাব বৃদ্ধি পেতে পারে। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ব্যাপারে জনগণের মনে সন্দেহ সৃষ্টির সময় ও সুযোগ দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। তাই ঐ সিদ্ধান্ত নেওয়া অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়েছে।

১৪ আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস পালন

১৯৭১ সালের ১৪ আগস্ট পূর্ব-পাকিস্তানে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে রাজধানী ঢাকাতে গভর্নর হাউজ ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের পতাকা দেখা যায়নি। সচিবালয়ে পর্যন্ত বাংলাদেশের পতাকা উড়ানো হয়। অথচ ১৪ আগস্ট ঢাকায় কোথাও পাকিস্তানি পতাকা ছাড়া অন্য কোন পতাকা উড়তে দেখা যায়নি।

১৪ আগস্ট শান্তি কমিটির উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কার্জন হলে এক বিরাট সুধী সমাবেশ হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন '৭০-এর কেন্দ্রিয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে একমাত্র মুসলিম বিজয়ী ব্যক্তি পূর্ব-পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব নূরুল আমীন।

বক্তাদের তালিকায় আমার নাম তিন নম্বরে ছিলো। প্রথম দু'বক্তা তখনো সমাবেশে হাজির না হওয়ায় আমাকেই প্রথম বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হলো। বক্তার তালিকা দীর্ঘ থাকায় ১০/১২ মিনিটের বেশি সময় না নেবার জন্য বক্তাগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়। আমার বক্তৃতা চলাকালে জামায়াতে ইসলামীর প্রাদেশিক প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি ইংরেজি দৈনিক পাকিস্তান অবজারভারের সাংবাদিক জনাব নূরুয্যামান দু'বার আমার হাতে কাগজের টুকরা তুলে দেন। প্রথম টুকরায় তিনি গভর্নর টিক্কা খানকে লক্ষ্য করে দেওয়া বক্তব্য আরও সংযত করার পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শ সত্ত্বেও আমার বক্তব্যের ধারা বহাল রাখায় দ্বিতীয় কাগজে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করেন যে, এ বক্তৃতার কারণে আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে। আমার বক্তৃতার সারকথা নিম্নরূপ ছিলো ঃ

"১৯৪৬ সালে গোটা ভারতবর্ষে পাকিস্তান ইস্যুতে মুসলিম লীগ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ঐ নির্বাচনের ফলাফলে ভারত বিভাগের পক্ষে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় (৯৭%) বাঙালি মুসলমানরাই ভোট দেয়। পশ্চিম-পাকিস্তানের কোন প্রদেশে এতো বেশি ভোট মুসলিম লীগ পায়নি। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে কোন সামরিক শক্তি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেনি। দুর্ভাগ্যবশত বিগত নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান নির্বাচিত নেতাদের সাথে রাজনৈতিক মীমাংসায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয়ে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতা থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যদি উন্নত নৈতিক চরিত্রের পরিচয় দিতে পারতো তাহলে জনগণের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হতো। সীমান্ত প্রদেশের মিলিশিয়া ও পাঞ্জাবী পুলিশ জনগণের সাথে যে আচরণ করছে তাতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।

শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে গভর্নর সাহেবকে বারবার এসব বিষয় অবহিত করা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন। কিন্তু শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে জনগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাকে যেসব পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা যদি বাস্তবায়িত করতে না পারেন তাহলে এ সেনাবাহিনী, মিলিশিয়া ও পুলিশই জনগণকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেবে । জনগণ শান্তিতে থাকতে চায়। যদি অন্যায় আচরণ করা হয় তাহলে তাদের আস্থা কী করে থাকবে? জনগণের মন যদি পাকিস্তানের প্রতি বিরূপ হয় তাহলে শক্তি প্রয়োগ করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।"

শ্রোতাদের চেহারা দেখে আমি অনুভব করলাম যে, আমার বক্তব্যে তাদের মনের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। আমি এ অবস্থা লক্ষ্য করে সন্তোষবোধ করলাম যে, আমার পরবর্তী বক্তাগণ নমনীয় ভাষা ব্যবহার করলেও ঐ ধারায়ই সবাই বক্তব্য দিতে থাকলেন। এমনকি সভাপতি অত্যন্ত সতর্কতা ও শালীন ভাষায় বিচক্ষণতার সাথে বক্তাদের মনোভাব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুললেন।

৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সংহতি দিবস পালন

১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভারত লাহোর দখল করার ঘোষণা দিয়ে পশ্চিম-পাকিস্তানে হামলা করে বসলো। ঐ যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ব-পাকিস্তানি অফিসার ও জোয়ানরা যথেষ্ট দক্ষতা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। যুদ্ধে সেনাবাহিনী জনগণের এমন আবেগপূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়েছে যে, তারা জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। সশস্ত্র বাহিনীর লোকেরা যে পথে আসা-যাওয়া করতো সেসব রাজপথে হাজার হাজার নারী-পুরুষ, শিশু তাদের জন্য ফলমূল, পিঠা ও তৈরি খাবার নিয়ে অপেক্ষা করতো। আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতো।

ঐ যুদ্ধে আল্লাহর রহমতে ভারত সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এরপর প্রতিবছর ৬ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান সংহতি দিবস পালন করা হতো। ১৯৭১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকার ফরাশগঞ্জের পূর্বে নর্থব্রুক হলে (লালকুঠি) এক সমাবেশ হয়। এতে আমিও একজন বক্তা ছিলাম। আমার বক্তৃতায় দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং সেনাবাহিনী, মিলিশিয়া এবং পাঞ্জাব পুলিশের আচরণে জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার কথা উল্লেখ করে আমি রীতিমতো হতাশা প্রকাশ করলাম। যারা পাকিস্তান রক্ষার নামে ময়দানে তৎপর তাদের কারণেই পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিপন্ন বলে আমি অত্যন্ত আবেগের সাথে বক্তৃতা করলাম। পত্রিকায় সেন্সর করা খবর ছাড়া অন্য কোন খবর প্রকাশিত হতো না বলে আমার কোন বক্তৃতাই জনগণের নিকট পৌঁছতে পারেনি।

আমার পর পাকিস্তান নেযামে ইসলাম পার্টির প্রাদেশিক সভাপতি মাওলানা সিদ্দিক আহমদ বক্তৃতা করেন। তিনি আমার হতাশা প্রকাশের সাথে একমত না হয়ে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করলেন। আমি তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম যে, তিনি পরিস্থিতি সম্পর্কে সঠিক খবর রাখেন না। তিনি বললেন যে, বেসরকারি গভর্নর নিয়োগ হবার পর পরিবেশ দ্রুত উন্নত হচ্ছে।

'৭১-এর শেষদিকে

সেপ্টেম্বরের ৩ তারিখ ডা. এএম মালিকের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ ও ঐ মাসের প্রথমার্ধেই মন্ত্রিসভা গঠনের পর বাহ্যিক দিক দিয়ে প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দেশে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ ধারণা সঠিক প্রমাণিত হয়নি।

ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তখনো ভারতীয় সেনাবাহিনী সরাসরি ময়দানে তৎপরতা শুরু করেনি। তবে মুক্তিবাহিনীকে সামনে ব্যাপক তৎপরতা চালাবার জন্য পেছন থেকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলো।

৭১-এর অক্টোবরের শেষদিকে রমযান মাস শুরু হলো। এ মাসে পরিস্থিতি তুলনামূলক

শান্তই মনে হলো। ২০ নভেম্বর ঈদুল ফিতরের একদিন পর ২২ নভেম্বর আমি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে যোগদান করার উদ্দেশ্যে লাহোর রওয়ানা হই। ৩ ডিসেম্বর আমি পিআইএ'র বিমানযোগে করাচী থেকে ঢাকা রওয়ানা হই। ঐদিনই ভারতীয় বিমান-বাহিনী ঢাকা বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করায় আমার বিমান উড়িষ্যা থেকে ফিরে যেয়ে শ্রীলংকার কলম্বো বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

১১৭.

এবারের হজ্জ

এবার (২০০৩ সাল) ১০ ফেব্রুয়ারি আরাফাতের বিশাল ময়দানে প্রায় বিশ লক্ষ লোকের হজ্জ-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এটাই হজ্জের প্রধান অনুষ্ঠান। হজ্জের তিনটি ফরয– হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে তালবিয়া উচ্চারণ করা, আরাফাতের ময়দানে ৯ জিলহজ্জ তারিখে দিনের বেলা হাজির থাকা এবং ১০ থেকে ১২ জিলহজ্জের মধ্যে কাবাঘরের তাওয়াফ করা, যাকে তাওয়াফে জিয়ারত বলা হয়। হজ্জের ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি মাসআলা-মাসাইল আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই।

বহু বছর পর এবার আমার হজ্জ করার সৌভাগ্য হলো। সে প্রসঙ্গেই হজ্জের ফরয কয়টি দ্বারা আলোচনা শুরু করলাম। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত আমাকে বিদেশে বাধ্য হয়ে নির্বাসনে থাকাকালে হজ্জ করার সুযোগ পেলেও, আমার জন্মভূমি থেকে হজ্জে যাবার সৌভাগ্য এবারই প্রথম হলো। ১৯৭৮ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৪-এর জুন পর্যন্ত ১৭ বছর আমি আমার জন্মভূমিতেই সরকারের নিকট বিদেশী হিসেবে গণ্য থাকায় আমার পক্ষে পাসপোর্ট যোগাড় করা সম্ভব ছিলো না বলে হজ্জে যাওয়ার কোন উপায়ই ছিলো না। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট আমাকে জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক ঘোষণার পর বেশ কয়েকবার সৌদী আরবে সফরে গেলেও হজ্জের উদ্দেশ্যে এবারই প্রথম যাওয়া সম্ভব হলো।

আমার বড় ছেলে আবদুল্লাহিল মামূন আল-আযামী জেদ্দাস্থ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট' হিসেবে কর্মরত থাকায় আমি ঐ ব্যাংকের মাধ্যমে ভিজিট ভিসায় সৌদী আরব গেলাম। হজ্জের পরেও আমাকে অনেক দিন লেখা-পড়ার উদ্দেশ্যে সেখানে থাকতে হবে বলে হজ্জ ভিসা নিয়ে যাইনি।

ভিসার জটিলতায় পড়লাম

আমি জানুয়ারির ৫ তারিখে জেদ্দা পৌঁছলাম। ঢাকা থেকে সৌদী দূতাবাস মাত্র এক মাসের জন্য ভিসা দেয়। একসাথে এক মাসের বেশি সময়ের জন্য ভিসা ইস্যুই করা হয় না। ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করলে সে দেশের স্বরাষ্ট্র বিভাগও একসাথে এক মাসের বেশি মেয়াদ বাড়ায় না। আমি জিলকদ মাসের ২ তারিখে জেদ্দা পৌঁছার পর ঐ মাসের মাঝামাঝি ভিসার মেয়াদ বাড়াবার জন্য ব্যাংকের পক্ষ

থেকেই কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত পেশ করা হলো। জানা গেলো যে, সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জিলকদ মাসে ভিজিট ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় না, যাতে ভিজিট ভিসা নিয়ে কেউ হজ্জ করতে না পারে।

সরকারের এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। কারণ সারা দুনিয়া থেকে হজ্জ ভিসা নিয়ে যে লাখ লাখ লোক আসে তাদেরকে সামাল দিতেই হিমশিম খেতে হয়। ভিজিট ভিসায় হজ্জ করতে দিলে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। সৌদী আরবের নাগরিকদেরকেও প্রতিবছর হজ্জ করার অনুমতি দেওয়া হয় না। সৌদী আরবে কর্মরত প্রবাসীরা একবার হজ্জ করলে পরবর্তী ৫ বছর হজ্জ করার অনুমতি পায় না।

মহাচিন্তায় পড়লাম। সে দেশে সরকারি নিয়ম অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে পালন করা হয়। এ অবস্থায় যদি ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি করা না হয় তাহলে হজ্জ করার কোন সুযোগই পাওয়া যাবে না। আরও একটি জটিলতার কথা জানা গেলো। হজ্জের মৌসুমে জেদ্দা থেকে মক্কার পথে কয়েক জায়গায় পাসপোর্ট চেক করা হয়। ২৫ জিলকদের পর ভিজিট ভিসাধারী কোন লোককে মক্কা শরীফে ঢুকতেই দেয় না। তাই ২৩ জিলকদই মক্কা শরীফ পৌঁছার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলাম।

আমার ছেলের অভিজ্ঞতা হলো যে, কোন প্রাইভেট কারে যদি মহিলা থাকে এবং আরোহীদের মধ্যে কেউ যদি ইহরাম অবস্থায় না থাকে তাহলে চেকপোস্টে কর্তব্যরত পুলিশ চেক না করেই যেতে দেয়। হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে প্রবেশ করলে ওমরাহ করা ওয়াজিব। আমরা জেদ্দায় পৌঁছার পর পরই ঐ ওয়াজিব ওমরাহ আদায় করেছি বলে জেদ্দা থেকে ইহরাম ছাড়াই মক্কায় পৌঁছার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। গাড়িতে আমার স্ত্রী ও দু'নাতনী ছিলো। মামুন গাড়ি চালাচ্ছিলো। কোথাও পুলিশ এ গাড়ি থামালো না। নিরাপদে পৌঁছলাম।

মক্কায় অবস্থান

আগেই উল্লেখ করেছি যে, মক্কায় হজ্জযাত্রীরা কাবাঘরের কাছেই থাকার চেষ্টা করে, যাতে ৫ ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে হারাম শরীফেই আদায় করা সহজ হয়। কিন্তু আমার পক্ষে এ চিন্তা করা সম্ভব হলো না। ৮ জিলহজ্জ পর্যন্ত ১৫ দিন আমাকে মক্কায় থাকতে হলো। লেখাপড়া ও রুচিমতো নাস্তা ও দু'বেলা খাবার সুব্যবস্থা ছাড়া সস্ত্রীক অবস্থান সম্ভব নয় বলে কাবা শরীফ থেকে দু'কিলোমিটার দূরে এক দীনী ভাই-এর বাসায় থাকার ব্যবস্থা করতে হলো।

৫ ওয়াক্ত নিকটবর্তী মসজিদে জামাআতে নামায আদায় করি আর আল্লাহর দরবারে ধরনা দিতে থাকি, যাতে ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তা দূর হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা ব্যাংকের প্রচেষ্টা সফল করলেন এবং সরকারি নিয়মের ব্যতিক্রম কেস হিসেবে ভিসার মেয়াদ এক মাস বৃদ্ধি পেলো। এ সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ায় হজ্জ করার পথে আর কোন বাধা রইলো না।

হজ্জ উদযাপনের বিশেষ ব্যবস্থা

হজ্জ করতে হলে কোন এক মুআল্লিমের পরিচালনাধীন থাকতে হয়। জেদ্দা বিমান বন্দরে হজ্জ টারমিনালেই মুআল্লিমের তদারকি শুরু হয়ে যায়। বিদেশী হজ্জযাত্রীদের পাসপোর্ট নির্ধারিত মুআল্লিমের কবজায় চলে যায়। মুআল্লিমের ব্যবস্থাপনায়ই জেদ্দা থেকে মক্কায় যেতে হয়। মক্কা ও মদীনায় থাকার ব্যবস্থা করা, হজ্জের অনুষ্ঠানমালা সম্পন্ন করার জন্য মিনায় যাওয়া, আরাফাতে অবস্থানের পর মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করে আবার মিনায় ফিরে আসা, মিনা থেকে তাওয়াফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মক্কায় এসে তাওয়াফ সমাধা করে মিনায় ফিরে যাওয়া এবং মিনা থেকে শেষবারের মতো মক্কায় চলে আসা, মদীনায় যিয়ারতের জন্য যাওয়া ও আসা এবং সর্বশেষে জেদ্দা বিমান বন্দরে হাজীদেরকে দেশে ফিরে যাবার জন্য পৌছিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সবই মুআল্লিমের তদারকিতে হয়ে থাকে।

১৯৭৯ সাল থেকে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত যারা হজ্জ করেন, তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হচ্ছে। চাকরি বা ব্যবসা উপলক্ষে যে দীনী ভাইয়েরা মক্কায় থাকেন তাদের প্রচেষ্টায়ই এ ব্যবস্থাপনা হয়ে থাকে। ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে যারা পরিচিত, তাদের জন্যই তারা এ বিশেষ ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশী হাজীদের মধ্যে যারা দেশ থেকে যান বা অন্য কোন দেশ থেকে আসেন তাদের মধ্যে যারা ব্যবস্থাপকদের সাথে যোগাযোগ করেন তারাই এ সুযোগ পান। যারা এ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন তারাও কোন মুআল্লিমের কাছ থেকেই মিনা ও আরাফাতে তাঁবু ভাড়া নেন এবং হাজীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। এবারও তেমনিভাবে ব্যবস্থা করা হয় এবং আমি এতে শরীক হই।

ইজতিমায়ী হজ্জ

এ বিশেষ ব্যবস্থার নাম রাখা হয়েছে ইজতিমায়ী হজ্জ। বাংলায় বললে সমবেতভাবে বা সামষ্টিকভাবে হজ্জ করা। যারা এতে শরীক হন তারা হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করেন। ইজতিমায়ী হজ্জের বৈশিষ্ট্য হলো ঃ

১. ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে কোন সম্মেলন করা হলে তাতে ডেলিগেট হিসেবে যারা যোগদান করেন, তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবেশ গড়ে উঠে ইজতিমায়ী হজ্জে তেমনি পরিবেশ উপভোগ করা যায়।

২. সাংগঠনিক দিক দিয়ে সবাই শৃঙ্খলা মেনে চলায় অভ্যস্ত হওয়ায় কোন রকম বিশৃঙ্খলার কারণ ঘটে না। কিছু লোক সংগঠনে নতুন এসে থাকলেও পরিবেশ তাদেরকে সুশৃঙ্খল হতে সহায়তা করে।

৩. ৮ জিলহজ্জ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত ৫ দিন মিনা, আরাফাত ও মুযদালিফায় একই সাথে থাকা, খাওয়া ও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালনের মাধ্যমে পরস্পর এমন মহব্বত অনুভব করে, যা পরিবেশকে আরও উন্নত করে।

৪. হজ্জের উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি হাসিল করার জন্য অভিজ্ঞ ও যোগ্য প্রশিক্ষকগণের খিদমত গ্রহণ করা হয়। হজ্জ পালনে যাতে সামান্য ত্রুটিও না হয়, সেদিক দিয়ে প্রয়োজনীয় তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা হয়।

৫. হজ্জের যেসব অনুষ্ঠান পালন করা বৃদ্ধ, রুগ্ন ও মহিলাদের অসাধ্য সেসব অক্ষম হাজীদের পক্ষ থেকে তা পালনের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ করে তিন দিন শয়তানকে পাথর মারার কাজটি যুবকদের জন্যও কষ্টসাধ্য। ইজতিমায়ী হজ্জে যুবকগণ অক্ষমদের পক্ষ থেকে এ কঠিন কাজটি সমাধা করে দেন।

৬. সবার মধ্যে দীনী ভ্রাতৃত্ববোধ থাকায় খাওয়ার সময় এবং তাঁবুতে ঘুমাবার সময় সবাই সবার সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখায় কারো সামান্য কষ্টবোধ হয় না এবং কোন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

মিনায় রওয়ানা

৮ জিলহজ্জ সকালে ইহরাম বেঁধে মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে মিনায় রওয়ানা হওয়া সুন্নাত। কিন্তু অস্বাভাবিক ভিড়ের কারণে ৭ তারিখ দিবাগত রাতেই যেয়ে মিনার তাঁবুতে পৌঁছা প্রয়োজন মনে করা হয়, যাতে ৮ তারিখে পৌঁছতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়ে না যায়।

মক্কা শরীফে যার বাসায় আমি ছিলাম, সেই আবদুর রহীম সাহেবের ১৫ আসনবিশিষ্ট মাইক্রোবাসে রাত এগারোটায় রওয়ানা হয়ে তিন মাইল পথ পাড়ি দিতে আড়াই ঘণ্টা লেগে গেলো। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই বড়, মাঝারি ও ছোট বাসে সারা রাস্তা ভর্তি। যাবার সময় পাইকারি বাজার থেকে সকালের নাস্তা ও তরিতরকারি কিনে নেওয়া হলো।

তাঁবুতে পৌঁছে আমীরে জামাআত কর্তৃক নিযুক্ত 'আমীরুল হজ্জ' জনাব মকবুল আহমদকে পেলাম। তিনি সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। প্রত্যেক বছরই ইজতিমায়ী হজ্জের জন্য এভাবে 'আমীরুল হজ্জ' নিয়োগ করা হয় এবং ঢাকা থেকে কোন না কোন দায়িত্বশীল সেখানে যান। ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম ডাইরেক্টর জনাব শহীদুল ইসলাম মক্কায় দীর্ঘদিন থেকে অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদের নিকট 'মক্কার শহীদ' হিসেবেই পরিচিত। ইজতিমায়ী হজ্জের ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব তিনিই পালন করতেন। গত বছর তিনি সেখান থেকে চলে এসেছেন। হজ্জের মৌসুমে তিনি সম্পূর্ণ সময় এ কাজে লেগে থাকতেন। তিনি চলে আসায় যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ না হওয়ায় এবার অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার এ দায়িত্ব যিনি পালন করেছেন তিনি হজ্জের মৌসুমে তার নিজস্ব ব্যবসায় ব্যস্ত থাকেন। তিনি বহু বছর মক্কা শহরে সপরিবারে ছিলেন। বর্তমানে তার পরিবার জেদ্দায় আছে। তিনি মাওলানা আবদুল জাব্বার। ব্যবসার জন্য মক্কায় এবং পারিবারিক প্রয়োজনে জেদ্দা তাকে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এ ব্যস্ততার মধ্যেও এবার তিনিই ইজতিমায়ী হজ্জের ব্যবস্থাপনার প্রধান দায়িত্ব পালন করেন।

এবারের ইজতিমায়ী হজ্জ

সরকার এ বছর হজ্জ সংক্রান্ত নতুন কিছু বিধি-নিষেধ জারি করায় বাধ্য হয়ে বিলম্বে উদ্যোগ নিতে হয়। রিয়াদ ও তায়েফ থেকে বেশ কিছু সংখ্যক দীনী ভাই ও বোনের ইজতিমায়ী হজ্জ করার কথা ছিলো। তারা সে দেশে কর্মরত থাকায় যথাসময়ে অনুমতি না পাওয়ায় পৌছতে পারেননি। মুআল্লিমের নিকট থেকে কতজনের জন্য তাঁবু ভাড়া নেওয়া হবে তা অনিশ্চিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মাত্র ৩টি তাঁবু পাওয়া গেলো। প্রতিটি তাঁবুতে ১০ জন করে থাকার জায়গা রয়েছে। আমরা সর্বমোট ২০ জন পুরুষ ও ১২ জন মহিলা ইজতিমায়ী হজ্জে শরীক ছিলাম। দুটো তাঁবুর মাঝের পর্দা সরিয়ে দিয়ে দু'তাঁবুতে ২০ জন পুরুষ এবং তৃতীয় তাঁবুতে ১২ জন মহিলাকে কোন রকমে থাকতে হয়েছে।

আমেরিকায় বাংলাদেশীদের ইসলামী সংগঠন মুসলিম উম্মাহ ইন আমেরিকার সাবেক সেক্রেটারি নিউইয়র্ক প্রবাসী জনাব মাহতাবুদ্দীন আহমদের স্ত্রী মহিলাদের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মাহতাবকে আমি ছাত্রজীবন থেকে চিনি। তিনি সপরিবারে আগেই ঢাকায় পৌছেন। ঢাকা শহরেই তার বাড়ি। তিনি তার আম্মাকেও হজ্জের উদ্দেশ্যে নিয়ে যান। জনাব মকবুল আহমদ তার স্ত্রী ও শাশুড়িকে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে যারা ইজতিমায়ী হজ্জে ছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মতিউর রহমান আকন্দ ও বর্তমান সভাপতি মুজীবুর রহমান মনজু। আমাদের তাঁবুতে যারা ছিলেন, তাদের অধিকাংশই সৌদী আরবে কর্মরত। এর মধ্যে দু'জন ডাক্তার এবং একজন ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা। একজন ডাক্তারের স্ত্রীও ডাক্তার। তিনি মহিলাদের অন্যতম ছিলেন।

আরাফাতের ময়দানে রওয়ানা হবার আগের সন্ধ্যায় হজ্জের মাসআলা-মাসাইলসহ হজ্জ সম্পর্কে খুবই চমৎকার আলোচনা পেশ করেন ড. হাফিয মাওলানা হাসান মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন। এ বিষয়ে তার সুলিখিত পুস্তিকাটিও সেখানে বিতরণ করেন। মাইকের ব্যবস্থা থাকায় মহিলারাও ভালোভাবে শুনতে পেয়েছেন। তিনি হজ্জ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নেরও জওয়াব দেন। তিনি জেদ্দায় সৌদী রেডিওতে বাংলা বিভাগে কর্মরত। তিনি শুধু বক্তব্য পেশ করার উদ্দেশ্যেই জেদ্দা থেকে মিনায় পৌছেন এবং বক্তব্য শেষে জেদ্দায় ফিরে যান।

১০ জিলহজ্জ সকালে মুযদালিফা থেকে মিনায় ফিরে আসার পরে ১২ তারিখ ইশা পর্যন্ত মিনার তাঁবুতে তিনটি বৈঠকে আমি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঈমান, ইলম ও আমলের উন্নয়নের ব্যাপারে আলোচনা করি। এ কয়টি দিন সবাই অত্যন্ত চমৎকার দীনী পরিবেশে হজ্জের অনুষ্ঠানসমূহ পালন করি এবং দীনের চর্চায় অতিবাহিত করি।

হজ্জের প্রধান অনুষ্ঠান 'ওকূফে আরাফাহ' বা আরাফাতে অবস্থান। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা যথাসময়েই পৌছতে সক্ষম হই। যে মুআল্লিমের তাঁবুতে

আমরা ছিলাম, তাতে ঐ মুআল্লিমের অধীনস্থ আরও হাজীর অবস্থানের কথা ছিলো। কিন্তু তারা সেখানে না পৌঁছায় গোটা তাঁবুটাই আমরা ব্যবহার করার সুযোগ পেয়ে যাই। প্রত্যেকেই আল্লাহর দরবারে আলাদা আলাদাভাবে দীর্ঘ সময় ধরনা দেবার পর সবাই একসাথেও দোয়া করি। পর্দার আড়াল থেকে আমাদের সাথী মহিলারাও ইজতেমায়ী দোয়ায় শরীক হন।

হাজীদের জন্য সরকারি ব্যবস্থাপনা

হাদীসে হজ্জ যাত্রীদেরকে 'যুয়ূফুর রাহমান' বা আল্লাহ তাআলার মেহমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সৌদী বাদশাহর উপাধি হচ্ছে 'খাদিমুল হারামাইন শরীফাইন' বা মক্কা ও মদীনার দুটো হারাম শরীফের খাদিম।

হারাম শব্দের এক অর্থ নিষিদ্ধ বটে; কিন্তু এটাই একমাত্র অর্থ নয়। হারাম অর্থ পবিত্র, পবিত্র স্থান, সম্মান ও মর্যাদা ইত্যাদি। মক্কা ও মদীনার দুটো পবিত্র স্থানকে এ অর্থেই হারাম বলা যায়। হুরমত শব্দ থেকে হারাম শব্দটি গঠিত, যার অর্থ মর্যাদা, সম্মান, পবিত্রতা ইত্যাদি।

সৌদী সরকার কোটি কোটি রিয়াল খরচ করে এ দুটো মসজিদকে সম্প্রসারিত করে এতো বিশাল আকারে পরিণত করেছে যে, হজ্জের মৌসুমে আল্লাহর মেহমানদের জন্য বিরাট খিদমত হিসেবে সবাই প্রশংসা করে থাকে।

মিনার বিস্তীর্ণ এলাকায় হাজীদের জন্য তাঁবু, ওযূ-গোসল ও পেশাব-পায়খানার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা রীতিমতো বিস্ময়কর ও অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আগে মুআল্লিমগণ কাপড়ের ও ত্রিপলের তাঁবু হজ্জের সময়ের জন্য তৈরি করতেন। হাজীরা তাঁবুতেই খাবার রান্না করতেন। এর ফলে প্রতি বছরই তাঁবুতে ছোট আকারে বা বিরাট এলাকা জুড়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটতো। একবার আমি যে তাঁবুতে ছিলাম তাও পুড়ে ছাই হয়ে গেলো। কোন রকমে জিনিসপত্র বহন করে দৌড়িয়ে নিকটবর্তী পাহাড়ে আশ্রয় নিলাম। সে বছর ৭ জনে মিলে একটা উট কুরবানী দিলাম। উটের কলিজা তাঁবুতেই পাক করা হলো। খাওয়ার সৌভাগ্য হলো না। খাবার আগেই আগুনের ভয়ে পালাতে হলো। আমি যে পাহাড়ে চড়লাম সেখান থেকে পাশের পাহাড়ে দলে দলে এতো লোক উঠেছে যে, ধাক্কা লেগে বেশ কয়েকজন গড়াতে গড়াতে নিচে পড়তে থাকলেন। দেখে স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, তারা তুরস্কের লোক।

এবার মিনাতে ফায়ার প্রুফ উপাদান দিয়ে তৈরি সুদৃশ্য তাঁবু দেখে বিস্মিত ও পুলকিত হলাম। লক্ষ লক্ষ হাজীর জন্য এতো বিরাট সংখ্যার এ সব তাঁবু তৈরি করতে কত বিরাট পরিকল্পনা ও বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে তা বিবেচনা করলে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। প্রতিটি তাঁবুতে ১০ জনের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার জায়গা রয়েছে। পাশেই সেনিটারি লেট্রিন এবং বাথরুম। পানি এমন হালকা গরম যে, ওযূ ও গোসলে কারো অসুবিধা হবার কোন কারণ নেই। ওযূর জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। কয়েকটি তাঁবুর জন্য এক একটি বড় এয়ার কন্ডিশন মেশিন বসানো আছে, যেখান থেকে প্রয়োজন হলে প্রত্যেক তাঁবুতে সুইচ টিপলেই ঠাণ্ডা হাওয়া পৌঁছে।

সৌদী সরকার আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাজীদের জন্য আল্লাহর মেহমান হিসেবে যে বিরাট খিদমতের বন্দোবস্ত করেছেন তা সত্যিই প্রাণে তৃপ্তি দেয়। এর আগে আমি যতবার হজ্জে গিয়েছি মিনায় ওযূ, গোসল, থাকা ও পেশাব-পায়খানার ব্যাপারে খুবই কষ্ট পেয়েছি। এবার এতো আরাম বোধ করেছি যে, ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রাণ থেকে দোয়া বের হয়েছে।

পঞ্চাশের দশকে আব্বা গরমের মৌসুমে হজ্জ করেছিলেন। তিনি বলেছেন যে, গরমে যত কষ্ট হয়েছে এর মধ্যে একটি হল বারবার ঘামাচি হয়ে পিঠ ব্যাঙের পিঠের মতো হয়ে গেলো। এখন গরমে আর কোন কষ্ট হবার কারণ নেই। বছরে মাত্র ৫ দিন মিনার এ সব তাঁবু ব্যবহার করা হয়। অথচ এর জন্য এতো মহা আয়োজন করা হয়েছে। এ সব তাঁবু স্থায়ী থাকে। শুধু হজ্জের সময় ব্যবহার করা হয়।

অবশ্য আরাফাতে মাত্র একদিন কয়েক ঘণ্টা থাকতে হয় বলে সেখানে মোটা কাপড়ের অস্থায়ী তাঁবু লাগানো হয়। সেখানেও এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আল্লাহর মেহমানদের জন্য সৌদী সরকারের এ মেহমানদারির শুকরিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অন্তর থেকে বের হয়।

১১৮.

হজ্জ সমাধা হলো

ইজতিমায়ী হজ্জের সুযোগ পাওয়ায় এবার হজ্জে যে তৃপ্তি বোধ করেছি তা এর আগের কোন হজ্জে অনুভব করিনি, আল হামদুলিল্লাহ। ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত যে ভাই-বোনেরা হজ্জ করতে চান তারা যদি ইজতিমায়ী হজ্জের সুযোগ নিতে চান তাহলে জামায়াতের সেক্রেটারি-জেনারেলের সাথে যোগাযোগ করবেন। অবশ্য এ সুযোগ নিতে হলে অতিরিক্ত খরচের প্রয়োজন হয়। যারা সৌদী আরবে কর্মরত, তাদের কোন অতিরিক্ত খরচ হয় না। কিন্তু যারা বাইরে থেকে জেদ্দায় হজ্জ ভিসায় পৌঁছেন তাদের যাবতীয় খরচের টাকা আগেই মুআল্লিমকে দিয়ে দিতে হয়। তাদের কেউ ইজতিমায়ী হজ্জের সুযোগ নিতে চাইলে মুআল্লিম অনুমতি দিবে বটে; কিন্তু টাকা ফেরত দিবে না। তাদেরকে তাঁবু ভাড়া, কুরবানী, খাওয়া ও যাতায়াত খরচ আলাদা দিতে হবে। এবার এসব বাবদ প্রায় দু'জার রিয়াল খরচ হয়েছে, যা বাংলাদেশী টাকায় ৩০ হাজারেরও বেশি। তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আরো কয়েকজনই ইজতিমায়ী হজ্জে শরীক হতে পারেননি।

আরাফাত থেকে মিনায় ফিরে আশার পথে মুযদালিফায় (মাশআরুল হারাম) রাত যাপন করতে হয়। পুলিশ আমাদেরকে যেখানে স্থান চিহ্নিত করে থামিয়ে দিলো সেটা প্রশস্ত পাকা রাস্তার পাশে। এখানে তাঁবু খাটানো নিষেধ। খোলা আকাশের নিচে চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। নিকটেই পুরুষ ও মহিলাদের পেশাব-পায়খানা ও ওযূ করার সুবন্দোবস্ত ছিলো। আগে এমন ব্যবস্থা না থাকায় বেশ অসুবিধা পোহাতে হতো।

মিনায় তিন জায়গায় শয়তানকে পাথর মারার জন্য এখানে কঙ্কর সংগ্রহ করতে হয়। আমাদের সাথের যুবকরা সবার জন্য ৫০টি করে কঙ্কর সংগ্রহ করে নিলেন। আরাফাতে যোহরের নামাযের সাথেই আসরের নামায আদায় করতে হয়। আর মুযদালিফায় ইশার নামাযের সাথে মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়তে হয়।

১০ জিলহাজ্জ (১১ ফেব্রুয়ারি) সকালে মুজদালিফা থেকে মিনা রওয়ানা হলাম। সেখানে শয়তানকে কঙ্কর মারা হলো পয়লা কাজ। আমাদের তাঁবুর যুবকেরা নিজেদের কঙ্কর মারার পর অন্য যারা সেই প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে যেতে অক্ষম তাদের পক্ষ থেকে এ কঠিন দায়িত্ব পালন করে বাধিত করেছে। যারা এ সুবিধা ভোগ করেছে তাদের মধ্যে আমার স্ত্রী ও নাতনী লুবাবা এবং আমি শামিল ছিলাম।

ইবরাহীম (আ) তাঁর প্রিয় ছেলে ইসমাঈলকে কুরবানী দেবার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবার সময় তিন জায়গায় শয়তান তাদেরকে ওয়াসওয়াসা (কুমন্ত্রণা) দেবার চেষ্টা করে। ঐ তিন জায়গাই হাজীদেরকে শয়তানের উদ্দেশ্যে কঙ্কর মারতে হয়। এটা এক প্রতীকী কর্ম। আল্লাহর নির্দেশ পালনে শয়তান বাধা দেবার উদ্দেশ্যে কুমন্ত্রণা দেওয়া এখানে কঙ্কর মারার মাধ্যমে শয়তানের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব সৃষ্টি করাই আসল উদ্দেশ্য।

কঙ্কর নিক্ষেপ করার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে বিরাট স্তম্ভ তৈরি করে এবং চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরাও করে রাখা হয়েছে, যাতে কঙ্করগুলো সেখানে জমা হলে সরিয়ে নেওয়া যায়। কঙ্কর মারার আসল মর্ম না বুঝে কিছু বে-ওকূফ লোক অত্যন্ত জযবার সাথে স্যান্ডেল ও জুতা নিক্ষেপ করে। এমন কি শয়তানকে মেরে ফেলার আজব জযবা নিয়ে কেউ কেউ ঐ স্তম্ভে গুলী করে বলেও জানা যায়।

এরপর জরুরি ওয়াজিব কাজ হলো পশু কুরাবানী। আগে আমি কুরবানীর জায়গায় গিয়ে নিজের হাতে পশু কুরবানী দিয়েছি। তাতে প্রচণ্ড ভিড়ে মানুষও কুরবানী হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়। তাই এখন উন্নত ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাজীদেরকে সেখানে যেতে হয় না। পশুর টাকা দায়িত্বশীলদের হাতে দিলে তারা কুরবানীর ব্যবস্থা করে দেন।

কুরবানী দেওয়া হয়েছে বলে খবর পৌছার পরই মাথা কামিয়ে ফেলতে হয়। মাথার চুল ছোট করলেও চলে। তবে কামালে সওয়াব বেশি। চুল কাটার পর ইহরাম খুলে ফেলে স্বাভাবিক পোশাক পরা হয়। ইহরাম অবস্থায় যেসব কঠোর বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয় তা থেকে রেহাই পাওয়া যায় মাথা কামাবার পর।

জিলহাজ্জ-এর ১০, ১১, ও ১২ তারিখ মোট তিন দিন মিনায় থাকতে হয়। অবশ্য এ সময়ের মধ্যে কাবা শরীফ তাওয়াফ করে আবার মিনায় ফিরে যেতে হয়। প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে এটাও হজ্জের অন্যতম কষ্টকর অনুষ্ঠান।

মিনা থেকে মক্কা শরীফ ফিরে আসতে ৩ মাইল পথ পাড়ি দিতে ৩ ঘণ্টা লেগে গেলো। আমরা যারা ৫ দিন হজ্জ উপলক্ষে একসাথে ছিলাম, তাদের মধ্যে এমন

পারস্পরিক ভালোবাসা জন্মালো, যা স্মরণে থাকার যোগ্য। একসাথে যারা হজ্জ করে তাদের মধ্যে আরাফাতী ভাই ও বোনের সম্পর্ক অনুভূত হয়।

সুস্থ-সবল অবস্থায়ই হজ্জ করা উচিত

হজ্জ পালনকালে যা কিছু করতে হয় তাতে যথেষ্ট কষ্ট ও পরিশ্রম হয়। যে বয়সে কঠোর পরিশ্রম করার মতো দৈহিক অবস্থা থাকে, সে বয়সেই হজ্জ করা উচিত। কিন্তু আমাদের দেশ থেকে (পাকিস্তান ও ভারত থেকেও) বৃদ্ধ বয়সেই হজ্জ করতে যাওয়ার রেওয়ায বেশি। হজ্জ ফরয হবার পর বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা রীতিমতো অন্যায়। মৃত্যু যে কোন সময় আসতে পারে। তাই এ বিরাট ফরয কাজটি করতে বিলম্ব করা মারাত্মক ভুল। রাসূল (স) বলেছেন, হজ্জ করার সাধ্য থাকা সত্ত্বেও যে হজ্জ না করেই মারা গেলো, সে ইহুদী হয়ে মরলো না খ্রিস্টান হয়ে মরলো তাতে আল্লাহর কিছুই আসে যায় না। হজ্জ ফরয হবার পর সন্তানদের লেখা-পড়া সমাপ্ত করা, মেয়ের বিয়ে দেওয়া বা ব্যবসা-বাণিজ্য আরও একটু গুছিয়ে নেবার অজুহাত তুলে বিলম্ব করা কিছুতেই উচিত নয়।

ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া থেকে এবং আফ্রিকা থেকে কম বয়সের নারী-পুরুষই বেশি সংখ্যায় হজ্জে আসে। এককালে তাদের দেশে এ রেওয়ায ছিলো যে, বিয়ের আগেই হজ্জ করতে হবে। এমন কি হজ্জে এসে মক্কা শরীফেই বিয়ে পড়াবার কাজটি সমাধা করা সৌভাগ্যজনক মনে করতো।

হজ্জ ধনীদের কী শেখায়

নামায-রোযা যেমন শুধু অনুষ্ঠান নয়, তেমনি হজ্জও অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করার বিষয় নয়। কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে মুমিন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে তার জীবনের পলিসি (নীতি) ঘোষণা করে। কালেমায়ে তাইয়েবা কোন মন্ত্র নয় যে, না বুঝে উচ্চারণ করলেই বেহেশতে যেতে পারবে। এতে যে লাইফ পলিসি বা জীবন যাপনের নীতি ঘোষণা করা হয়, তা উপলব্ধি করতে হবে।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হলো যে, "আমি জীবনের সব ক্ষেত্রে, সব সময় একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে চলবো, আল্লাহর হুকুমের বিরোধী কারো হুকুম মানবো না। আর আল্লাহর হুকুম একমাত্র ঐ তরীকায় বা পদ্ধতিতে পালন করবো, যে তরীকায় রাসূল (স) পালন করেছেন। রাসূলের তরীকা ছাড়া আর কারো তরীকা অবলম্বন করবো না।"

যারা কালেমায়ে তাইয়েবা বা কালেমায়ে শাহাদাত এভাবে বুঝে জীবনের পলিসি হিসেবে গ্রহণ করে, তাদের জীবনেই নামায ও রোযার উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। যেসব গুণাবলি অর্জনের জন্য আল্লাহ তাআলা নামায ও রোযা ফরয করেছেন, সেসব গুণাবলি হাসিল করা ছাড়া কালেমার ঐ পলিসি অনুযায়ী জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আমি অত্যন্ত চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী ধারণা পেয়েছি মাওলানা মওদূদী (র)-এর কয়েকটি চটি বই থেকে। বইগুলোর নাম হলো, 'ঈমানের

হাকীকত', 'ইসলামের হাকীকত' ও 'নামায-রোযার হাকীকত'। নামায হলো দীনী জিন্দেগীর মূল ভিত্তি। এ নামাযের আসল উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় সম্পর্কে আমার রচিত 'জীবন্ত নামায' পুস্তিকাতে প্রয়োজনীয় আলোচনা করেছি।

যারা ধনী তাদের জীবনকে কালেমায় ঘোষিত পলিসি অনুযায়ী পরিচালনা করার জন্য নামায ও রোযা যথেষ্ট নয়। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের উপর যাকাত ও হজ্জ ফরয করেছেন। মাওলানা মওদূদী (র)-এর 'যাকাতের হাকীকত' ও 'হজ্জের হাকীকত' পুস্তিকা দু'টো পড়ার আগে এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণাই আমার ছিলো না।

টাকা-পয়সা বেশি থাকলেই অপচয় ও গোনাহের কাজ করার যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তাই দেখা যায়, আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ যেমন মদ, জুয়া, যিনা, নাচ-গান, বেহুদা খরচ ইত্যাদিতে ধনী লোকেরাই লিপ্ত হয়।

'দীন ইসলামের ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক ধারণা' নামে আমার পুস্তিকাটিতে লিখেছি ঃ

যাকাত ধনীকে শিক্ষা দেয়

১. ধনের আসল মালিক আল্লাহ। তাই হালাল পথে আয় করতে হবে এবং হালাল পথেই খরচ করতে হবে। কারণ যাকাত হালাল উপায়ে আয় থেকেই দিতে হয়।

২. আল্লাহর হুকুমে যাকাত দেবার পর যে মাল ধনীর হাতে থাকে, তাও আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে খরচ করা চলবে না।

৩. ধনীর মালে অভাবীদেরও হক আছে। তাই সমাজের অভাবীদের প্রতিও দায়িত্ব পালন করতে হবে।

হজ্জ ধনীকে শেখায়

১. ধন বেশি আছে বলেই বিলাসিতায় মত্ত হয়ো না। ধন আছে বলেই ননীর পুতুল সেজো না। হজ্জের কষ্ট সহ্য করার যোগ্য হও।

২. যত বড়লোকই হয়ে থাকো, সেলাইবিহীন দু'টুকরো কাপড় পরে সকল পদবির মুকুট ফেলে খালি মাথায় মক্কা, মিনা ও আরাফাতে আল্লাহর প্রেমিকদের সাথে একাকার হয়ে যাও।

৩. ধনের ও মানের তুচ্ছ ভালোবাসা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর প্রেমে কাবাঘর তাওয়াফ করো। তাওয়াফকারী কারোর চেয়ে তুমি নিজেকে বড় মনে করো না।

৪. আরাফার ময়দানে মহান মনিবের সামনে মাথা নত করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে ধনের অহঙ্কার ত্যাগ করো। তুমি রাজা, বাদশাহ, শাসক এবং বড় কর্তা হয়ে থাকলে একথা স্মরণ করো যে, ইহরামের মতো দু'টুকরো কাপড়ে মুড়েই তোমাকে কবরে রাখা হবে। ধন ও ক্ষমতার জোরে যত পাপ করেছো, তা থেকে মাফ চাও এবং আর পাপ না করার সিদ্ধান্ত নাও।

৫. হজ্জের পর গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার তৃপ্তি নিয়ে বাকি জীবন কালেমার ওয়াদা পালন করে চলো।

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বিরাট হওয়াকে অনেকে আপদ মনে করে। আমি এটাকে আল্লাহর রহমত মনে করি। জনসংখ্যা বেশি হওয়ার কারণেই এতো বিরাট সংখ্যায় আমরা বিদেশে গিয়েছি। পশ্চিমে ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য (আরব দেশসমূহ) এবং পূর্ব দিকে সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া, বলতে গেলে বিশ্বের বহু দেশে বাংলাদেশী বিপুল সংখ্যায় পৌঁছে গেছে। আমি যত দেশে গিয়েছি সর্বত্রই আমার প্রিয় জন্মভূমির বাসিন্দাদের বিপুল সংখ্যায় দেখে গর্ববোধ করেছি। আমার মনে হয়েছে যে, আমরা সারা দুনিয়ায়ই পরিচিত এবং সবদেশেই বাংলাদেশীরা কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হচ্ছে।

দুঃখের বিষয় যে, আমাদের সরকারসমূহের ব্যর্থতার কারণে আমাদের জনশক্তির অধিকাংশই টেকনিক্যাল শিক্ষার অভাবে নিম্নমানের কাজ ও অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। সরকারি অবহেলার কারণেই জনশক্তি রপ্তানিকারী এজেন্সিগুলো শুধু নিজেদের স্বার্থে প্রবাসীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে অতি নগণ্য বেতনে লোক পাঠায়। সৌদী আরবে ফিলিপাইন থেকে অনেক লোক গিয়েছে। এরা সবাই টেকনিক্যাল লোক। তাই ভালো বেতন পায়। ফিনিপাইন সরকার ১ হাজার রিয়ালের কম বেতনে কোন লোককে সৌদী আরব যেতে দেয় না।

আমাদের সরকার যদি অল্পশিক্ষিত, এমনকি প্রাইমারি পড়া বেকার যুবকদের ইলেট্রিক মিস্ত্রি, পানির কলের মিস্ত্রি, মোটর গাড়ি মেরামতের মিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি ও কাঠমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করার জন্য ট্রেনিং দিয়েও বিদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে, তাহলে ১০ বছরের মধ্যে আমাদের লাখ লাখ দরিদ্র পরিবার ধনী হয়ে যেতে পারে এবং প্রবাসীদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রার আয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

সরকারি উদ্যোগে বিদেশে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলে গরীব লোকদেরকে জমিজমা, বাড়ি-ঘর, সহায়-সম্পত্তি খরচ করে জনশক্তি রফতানিকারী এজেন্টদেরকে বিরাট অঙ্কের টাকা দিতে বাধ্য হতে হবে না। বর্তমান পদ্ধতি চালু থাকায় প্রবাসী যাত্রী ও ঐ এজেন্টদের মধ্যবর্তী দালালরা বহু লোকের টাকা মেরে গবীরদেরকে আরও নিঃস্ব করছে।

সৌদী আরবের সর্বত্র, বিশেষ করে জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় বাংলাদেশীদের সংখ্যা বিরাট। কিন্তু অদক্ষ জনশক্তি হওয়ায় তারা যে বিরাট অঙ্ক খরচ করে গিয়েছে তা শোধ করার জন্য চাকরি করে যা পায়, তা কম বলে আরও বিভিন্ন রকম কাজ করতে বাধ্য হয়। উপরিউক্ত তিনটি শহরে রাস্তা পরিষ্কার রাখার কাজে যারা চাকরিরত তাদের মধ্যে বাংলাদেশীর সংখ্যাই বেশি। ১৯৯৯ সালে কাবা শরীফ ও মদীনার মসজিদে 'ক্লিনার' (ঝাড়ুদার) হিসেবে বাংলাদেশী কেউ ছিলো না। এবার বেশি সংখ্যায়ই বাংলাদেশী দেখলাম। এর কারণ এটাই যে, এতো অল্প বেতনে

অন্য দেশের লোক পাওয়া যায় না। শহরের রাস্তায় হলুদ রংয়ের বিশেষ ধরনের পোশাক পরিহিত লোক দেখলেই মনে করতে হবে যে, লোকটি বাংলাদেশীই হবে। ঝাড়ুদারের মতো এতো ছোট চাকরি করায় আমার কোন আপত্তি হতো না; যদি ভালো বেতন দেওয়া হতো। এদের বেতন মাত্র মাসিক আড়াই শ' রিয়াল শুনে খুব দুঃখবোধ করেছি। অবশ্য এদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ঐ কোম্পানিই করে থাকে, যাদের অধীনে তারা চাকরি করছে।

আমি ফজরের নামায ৮/৯ মিনিটের পথ হেঁটে জেদ্দা শহরের বোখারী মসজিদে আদায় করতাম। সেখানে দেখলাম, ক্লিনারের পোশাক পরা একজন নামায পড়েই রাস্তায় কাজ শুরু করলো। লোকটি বাংলাদেশী হবে বলে নিশ্চিত হয়েই কাছে গিয়ে সালাম দিলাম। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, টাঙ্গাইল। আরও কিছু কথা বলে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে 'বেতন কত' জানতে চাইলাম। বললেন, "আড়াইশ রিয়াল।" জিজ্ঞেস করলাম, "কত টাকা খরচ করে আসলেন।" বললেন, "সে কথা শুনে কী করবেন।" বললাম, "এতো কম বেতনে কেন রাজি হলেন?" তিনি বললেন, "সে দুঃখের কথা আর কী বলবো?" আমাকে ৫০০ রিয়ালের কথা বলে ঢাকা থেকে পাঠিয়েছে। এখানে এসে জানলাম যে, আড়াইশ।" শুনে বিস্মিত হলাম। এখান থেকে যারা পাঠিয়েছে তাদের এ প্রতারণার শিকার যারা হচ্ছে তারা কিভাবে এর প্রতিকার করবে?

মক্কায় এক ক্লিনার থেকে জানলাম যে, তিনি দেড় লাখ টাকা খরচ করে এসেছেন এবং বেতন পাচ্ছেন ২৫০ রিয়াল। জানতে চাইলাম, "কবে এসেছেন?" বললেন, ৩ বছর হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, "দেড় লাখ কি শোধ করতে পেরেছেন?" বললেন, "এক বছরেই শোধ করতে পেরেছি।" জিজ্ঞেস করলাম, "এতো কম বেতন পেয়ে কেমন করে তা সম্ভব হলো?" বললেন, "এ চাকরির ডিউটি করে যে সময় হাতে থাকে তখন বহু রকমের কাজ পাওয়া যায়।" বললাম, "এতো কাজ করতে জানে কুলায়?" বললেন, "দায়ে ঠেকে করি।"

জেদ্দায় আমার স্ত্রীকে 'বাদশাহ ফায়সাল স্পেশালাইজড্ হাসপাতালে' ভর্তি করতে হলো। সেখানে 'ক্লিনার' হিসেবে বেশ কতক বাংলাদেশীর সাথে দেখা হলো। তাদের মধ্যে গ্রাজুয়েটও আছে। অবশ্য এখানে বেতনের হার ভালোই। সৌদী আরবে লাখ লাখ বাংলাদেশী কর্মরত রয়েছে। এর মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও কিছু প্রশাসনিক পদে যারা, তাদের বেতন খুবই আকর্ষণীয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই কম।

ব্যবসা-বাণিজ্যে বাংলাদেশী

জেদ্দায় কোন কোন মার্কেটে বহু দোকান বাংলাদেশীদের। মনে হয়, যেন ঢাকার কোন মার্কেটেই আছি। কিন্তু আইনগতভাবে এ সবের কোন মালিকানা তাদের নয়। কোন সৌদী নাগরিক এসব দোকানের মালিক। পুঁজি ও শ্রম সবটুকুই বাংলাদেশীদের। প্রতি মাসে শুধু দোকান ভাড়া নয়, দোকান বাবদ বেশ বড় অঙ্ক

সৌদী মালিককে দিতে হয়। সৌদী নাগরিকদের বিনা পুঁজি ও বিনা শ্রমে বিপুল আয়ের সুযোগ রয়েছে।

সৌদী নাগরিক তার ব্যক্তিগত কর্মচারী হিসেবে বিদেশ থেকে লোক নেবার আইনগত অধিকার ভোগ করে। এটা তাদের আয়ের আরও একটা বিরাট উৎস। তারা ঐ অধিকারবলে বিরাট অঙ্কের বিনিময়ে বিদেশ থেকে লোক নেয়। কিন্তু তাকে নিয়ে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করে না। কারণ আসলে এমন কোন কাজ তার নেই, যার জন্য লোক নিয়োগ করা দরকার। তার ভিসা কিনে যে লোকটি সে দেশে গেলো, সে নিজের চেষ্টায় কোথাও চাকরি যোগাড় করে বা ব্যবসা করে। আইনগতভাবে সে ঐ লোকেরই কর্মচারী। বছর শেষে তার ভিসার মেয়াদ বাড়াবার জন্য ঐ লোকের কাছেই যেতে হবে। সে লোক তার কর্মচারী হিসেবেই ভিসার মেয়াদ বাড়াবার ব্যবস্থা করবে এবং এর জন্য আবার তাকে মোটা অঙ্কে ভিসার মূল্য দিতে হবে।

মক্কা ও মদীনার যত দোকান আছে, এসবের পুঁজি ও পরিচালকের শতকরা ৮০ ভাগই বিদেশের। অথচ এ সবের আইনগত মালিক সৌদী নাগরিকরা। শুধু সৌদী আরবেই নয়, কোন আরব দেশেই কোন বিদেশী বহু বছর কর্মরত থাকলেও একখণ্ড জমি, একটি বাড়ি বা দোকান কিনে আইনগতভাবে মালিক হতে পারবে না। মালিকানায় শরীক হবার কোন অধিকার বিদেশীদেরকে দেওয়া হয় না। এ সত্ত্বেও সেখানে বিদেশীদের সংখ্যা স্থানীয়দের চেয়ে বেশি।

সৌদী আরবে বাংলাদেশীদের সান্নিধ্য

এবার সৌদী আরবে তিন মাসেরও বেশি সময় অবস্থান করা সত্ত্বেও লেখার কাজে মহাব্যস্ত থাকায় বাইরে ঘুরাফেরা করার সময় পায়নি। বাজারে একদিনও যাইনি। সমুদ্র উপকূলে আমার ছেলে ও বৌমা এবং নাতনীরা আমার স্ত্রীকেও বেড়াতে নিয়ে গেছে। এর আগে আমিও গিয়েছি। যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে জেদ্দার সমুদ্র উপকূল দেখার মতোই বটে। কিন্তু এবার সময় খরচ করা সম্ভব হলো না।

সৌদী আরবে চলাফেরা করলে সর্বত্রই বাংলাদেশী ভাইদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু এবার তাদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিতই থাকতে হলো। বিদেশে দেশী ভাইদের সাথে সাক্ষাতের তৃপ্তিই আলাদা।

মা-শা-আল্লাহ, সে দেশে বাংলাদেশীদের সংখ্যা এতো বিরাট যে, কোথাও গেলে কারো না কারো সাথে দেখা হয়েই যায়। জেদ্দায় এক শুক্রবার টেক্সি ভাড়া করে জুমআর নামাযে গেলাম। আমার ছেলে মামুন সাথে ছিলো। ড্রাইভারের সাথে আলাপ করে জানা গেলো, তার বাড়ি ফেনী জেলার ছাগলনাইয়াতে। আমার পরিচয় পেয়ে আবেগের সাথে বললেন, "আপনার কথা এতো শুনেছি যে, দেখার ইচ্ছা ছিলো। কোন দিন দেখিনি। আজ এভাবে দেখা হয়ে গেলো, এটা আমার সৌভাগ্য। শুনেছি আপনার ছেলে ইসলামী ব্যাংকে আছেন। ছেলের পরিচয় পেয়ে আরও খুশি হলেন। ভাড়া নিতে মোটেই রাজি ছিলেন না, জোর করে পকেটে দিতে হলো।

রাতে খাওয়ার পর ১৫/২০ মিনিট রাস্তায় হাঁটতে বের হতাম। একজন ফর্সা যুবক দ্রুত এসে হাত মিলিয়ে পরিচয় পেয়ে রীতিমতো আবদার করে এক দোকানে নিয়ে গেলো। দোকানটিও এক বাংলাদেশী ভাইয়ের। আমাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়বেই না। আমি অসময়ে কিছু খাই না। শেষ পর্যন্ত এক শিশি ফলের রস খেতে হলো। ছেলেটি পরিচয় দিলো যে, সে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথী ছিলো। এখানে এক সৌদীর প্রাইভেট কার চালায়। গাড়ির মালিক নাকি খুব আদর করে। ছেলেটির বাড়ি বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)। এ জাতীয় অনেক সাক্ষাৎ পথে-ঘাটে হয়েছে। তাদের সান্নিধ্যে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি।

১১৯.

জামায়াতের কর্মপরিষদে আমার রিপোর্ট

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ১৯৭১ সালের ২২ নভেম্বর আমি জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য লাহোর গেলাম। মাওলানা মওদূদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করলাম। আমীরে জামায়াতসহ বেশ কয়েকজন প্রশ্ন করে যা কিছু জানতে চাইলেন তাও জানালাম।

আমার রিপোর্টের সারকথা ছিলো নিম্নরূপ ঃ

১. বেসামরিক গভর্নর ও মন্ত্রিসভার পরিচালনায় প্রাদেশিক সরকারের ভূমিকায় জনগণের মধ্যে যারা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, তারা মোটামুটি সন্তুষ্ট। শহরাঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও সন্তোষজনক।

২. সেনাবাহিনীর আচরণে জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করছে। যারা পূর্বে বিরোধিতা করতো তারাও আর বাধা দেয় না। সীমান্ত এলাকায় রেযাকাররাও মুক্তিযোদ্ধাদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসে না। কারণ তারা আর জনসমর্থন পায় না।

৩. শহরাঞ্চলেও পাঞ্জাবী পুলিশ ও সীমান্ত মিলিশিয়ার আচরণে তাদের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ উন্নত নৈতিক চরিত্র দ্বারা জনগণের মন জয় করা সম্ভব ছিলো।

৪. সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারতের সেনাবাহিনী সরাসরি পেছন থেকে সাহায্য করছে। এটা জানা গেছে যে, ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, শীতের মওসুমেই বাংলাদেশ স্বাধীন করার কাজ সমাধা করতে হবে এবং প্রয়োজনে সেনাবাহিনী সরাসরি যুদ্ধ করবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান এ খবর পেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। ভারতীয় বিমান-বাহিনী হামলা করলে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে ভারতের উপর দিয়ে বিমান-বাহিনীকে পূর্ব-পাকিস্তানে যেতে দেওয়া হবে না। এ অবস্থায় ভারতকে প্রতিহত করার উপায় সম্পর্কে সরকার কি চিন্তা করছেন, তা পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নরেরও জানা নেই।

৫. কোলকাতা থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' যা প্রচার করছে জনগণ তাই বিশ্বাস করছে। পাকিস্তান বেতার কেন্দ্রের কথা তারা বিশ্বাস করে না। জনগণ সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে বিবিসি থেকে প্রচারিত খবর ও পর্যালোচনা। বিবিসি স্বাধীন বাংলা আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

সেনাবাহিনীর অন্যায় আচরণের খবর শতগুণ বাড়িয়ে কোলকাতা থেকে প্রচারিত হচ্ছে। বিশেষ করে নারী-নির্যাতনের ব্যাপক প্রচার জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে। পাকিস্তান রেডিও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মুকাবিলা করতে ব্যর্থ হচ্ছে।

আমার এ রিপোর্ট শুনবার পর মাওলানা মওদূদী আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, আমি যেন প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অবহিত করি। কর্মপরিষদের বৈঠক শেষে আমি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রাওয়ালপিণ্ডি গেলাম। জামায়াতের অফিস থেকেই প্রেসিডেন্ট হাউজে যোগাযোগ করা হলো। জানা গেলো, তিন দিন পর ছাড়া সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমার হাতে এতো সময় নেই যে, কয়েকদিন বসে থাকি। আর এমন কোন কাজও নেই যে, সময়টা কাজে লাগাতে পারি। জামায়াতের কয়েকজন আইনজীবী বার লাইব্রেরীতে আইনজীবীদের সমাবেশে বক্তব্য রাখার প্রস্তাব করলেন। বিকালে সমাবেশে পূর্ব-পাকিস্তানের হাল অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখার শেষ দিকে ক্ষোভ প্রকাশ করে বললাম, "প্রেসিডেন্ট সাহেব ২৫ মার্চ ঢাকায় সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেবার পর গত ৮ মাসের মধ্যে একবারও পূর্ব-পাকিস্তানে যাওয়ার কোন প্রয়োজন মনে করেননি। তিনি কি শুধু পশ্চিম-পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট? যদি পূর্ব-পাকিস্তানেরও প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে তার সেনাবাহিনী সেখানে কেমন দায়িত্ব পালন করছে এবং জনগণের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করার জন্য একবারও গেলেন না কেন? আমি সেখানকার হাল অবস্থা সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করার জন্য সময় চাইলে প্রেসিডেন্ট হাউজ থেকে বলা হলো যে, তিন দিন পর সময় দেওয়া হবে। আমি আগামী দিনই চলে যেতে চাই। সাক্ষাতের জন্য তিন দিন অপেক্ষা করা সম্ভব নয়।" কথাগুলো ক্ষোভের সাথে বলায় কড়া ভাষাই প্রকাশ পেলো।

সমাবেশ শেষে মাগরিবের আগেই বিদায় নিয়ে জামায়াত অফিসে ফিরে যাবার সময় বার এসোসিয়েশন গেটেই সাদা পোশাকের এক ভদ্রলোক আমার সাথে হাত মেলালেন। পরিচয় দিলেন সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের লোক। বললেন, আগামীকাল সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট সাহেবের সাথে আপনার সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত করা হয়েছে। আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম যে, একটু আগেই তো আমি ক্ষোভ প্রকাশ করলাম। এরই মধ্যে কেমন করে এপয়েন্টমেন্ট হয়ে গেলো? তিনি বললেন, আপনার বক্তব্য চলাকালেই প্রেসিডেন্ট হাউজের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা করেছি। আমি তার তৎপরতায় মুগ্ধ হলাম এবং সাক্ষাতের ব্যবস্থা করায় শুকরিয়া জানালাম।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়ার সাথে সাক্ষাৎ

আইয়ূব খান থেকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ইয়াহইয়া খান ঢাকায় এসে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তার সাথে তখনই প্রথম সাক্ষাতের সুযোগ হয়। ৭০ সালের মাঝামাঝি ঢাকায় তার সাথে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। ৭১-এর নভেম্বরের শেষদিকে তার সাথে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎ হয়।

আমি যথাসময়েই প্রেসিডেন্ট হাউজে পৌছলাম। আমাকে সামরিক পোশাক পরিহিত একজন অফিসার গেট থেকে নিয়ে গেলেন এবং সরাসরি প্রেসিডেন্টের সামনে পৌছিয়ে দিলেন। প্রেসিডেন্ট তার আসন থেকে উঠে আমার সাথে হাত মিলালেন এবং হাত ধরে একই সোফায় তার পাশে বসালেন। জানালেন যে, অন্য প্রোগ্রাম কেনসেল করে আমার জন্য এ সময়টা বের করা হয়েছে। আমি শুকরিয়া জানালাম এবং বললাম যে, আজ সাক্ষাতের সময় না পেলে আপনার সাথে দেখা না করেই আমাকে চলে যেতে হতো। আমি অবিলম্বে ঢাকা ফিরে যেতে চাই।

প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কবে এসেছেন? সেখানকার অবস্থা কেমন? জওয়াবে বললাম যে, ৫/৬ দিন আগে লাহোর পৌছেছি। সেখানকার অবস্থা আপনাকে অবগত করার জন্যই পিণ্ডি এসেছি। তা না হলে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক শেষে ঢাকা ফিরে যেতাম। তারপর বললাম, "আপনি তো পূর্ব-পাকিস্তানেরও প্রেসিডেন্ট। ২৫ মার্চ জেনারেল টিক্কা খান সামরিক অপারেশন শুরু করার পর গত আট মাসের মধ্যে আপনি একবারও সেখানকার অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য গেলেন না। জনগণের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আপনার সাক্ষাতের সুযোগ পেলো না। সেখানে গেলে জনগণের প্রতিক্রিয়া স্বচক্ষে দেখে আসতে পারতেন।"

তিনি যেতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং কিছু অজুহাতও দেখালেন।

আমি তাঁর নিকট পূর্ব-পাকিস্তানের অবস্থা ঠিক ঐ ভাষায়ই পেশ করলাম, যেভাবে জামায়াতের কর্মপরিষদে পেশ করেছিলাম। তিনি এ সব শুনে বললেন যে, আমি যা বলেছি মোটামুটি অনুরূপ রিপোর্ট তিনিও পেয়েছেন। তবে সেনাবাহিনীর অন্যায় আচরণের খবর পাননি বলে বুঝা গেলো তার একটি কথায়।

তিনি আমাকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে বললেন, "আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পূর্ব-পাকিস্তান সঙ্কটের সমাধানের একটা ফর্মুলা নিয়ে কথাবার্তা চলছে। এ মুহূর্তে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন ধারণা দেওয়া সম্ভব নয়। একটা মীমাংসা হয়ে যাবে বলে আশা করি।"

আমি বললাম, "জনগণের নির্বাচিত নেতা ও দলের সাথে মীমাংসা করা ছাড়া কোন সমাধানই টিকবে না। তারা তো পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত ও রাশিয়ার সমর্থন পেয়েই গেছে। এ অবস্থায় মীমাংসার পথ কী করে আছে?

এর জওয়াবে বললেন, "তাদের সাথেই মীমাংসা করার চেষ্টা চলছে। দেখা যাক কি করা যায়।"

আমার শেষ কথা ছিলো, "আপনি পূর্ব-পাকিস্তানে কবে যাবেন এবং সেখানে

আপনার সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে কিনা?

তিনি এ কথা বলে আমাকে বিদায় করলেন, "মীমাংসার ফর্মুলা নিয়ে এখন মহাব্যস্ত। এ প্রচেষ্টা সফল হলে অবশ্যই যাবো।"

মীমাংসার প্রচেষ্টা

শেখ মুজিবের সাথে মীমাংসার কোন্ ধরনের চেষ্টা চলছে তা আমি জানার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। কোন ধারণাই করতে পারলাম না। আমার সাথে ইয়াহইয়া খানের উক্ত সাক্ষাতের ৬ দিন পর ৩ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান-বাহিনী ঢাকা বিমান বন্দরে বোমা ফেলার মাধ্যমে বুঝতে পারলাম যে, কোন ফর্মুলাই কোন কাজে আসেনি। ইয়াহইয়া খানের ঐ প্রচেষ্টা সম্পর্কে ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি লন্ডনে আমার পুরানো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. জি. ডব্লিউ চৌধুরীর মুখে বিস্তারিত শুনলাম। তাঁর 'The last Days of united Pakistan' নামক বইটি ১৯৭৪ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি সেখানেই আমাকে বইটি দিয়েছিলেন। এই বইতে ঐ সব তথ্য পাওয়া যায়।

১৯৯১ সালে এ বই-এর লেখক আমার বাড়িতে এসে বললেন, "দেখুন তো কারবারটা! আমাকে না জানিয়েই আমার ঐ বইটি বাংলায় অনুবাদ করে ছাপিয়ে বইটি আমাকে প্রেজেন্ট করেছে। আমার অনুমতি নেবার প্রয়োজনবোধ করেননি। অবশ্য বইটি বাংলায় প্রকাশিত হওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি।"

'অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলো' নামে বইটির অনুবাদক জনাব সিদ্দীক সালাম, প্রকাশক আবদুল্লাহ্ সালাম, হক কথা প্রকাশনী, ঢাকা। প্রকাশনীর কোন ঠিকানা বইটিতে নেই। যে প্রেসে মুদ্রিত হয়েছে এর ঠিকানা আছে। ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস লিমিটেড, ৪৩৫ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে সৌদী আরব থাকাকালে আমার সেক্রেটারিকে এ বইটি সংগ্রহ করে হাজী সাহেবদের কারো হাতে পাঠাতে বলেছিলাম। কিন্তু কোথাও পাওয়া যায়নি বলে জানালে হতাশ হলাম। কারণ ঐ সব তথ্য আর কোথাও পাওয়া যায় না। গত এপ্রিল মাসের শেষদিকে সেক্রেটারি নাজমুল হক বইটি পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে আমার হাতে দিলো। জানতে চাইলাম, "কোথায় পেলে?" বললো, "জামায়াতের প্রকাশনীতেই পাওয়া গেলো।" "তাহলে আগে পেলে না কেন?" সেলসম্যানের জানা ছিলো না। পুরাতন বইয়ের সাথে পড়ে ছিলো। হঠাৎ আমার চোখে পড়লো। বিস্মিত হলাম। এতো কাছে থাকা সত্ত্বেও যখন চাইলাম তখন পেলাম না।

ড. জি. ডব্লিউ চৌধুরী

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ও ইসলামী চিন্তাবিদ ডক্টর গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী মাদারীপুর জেলার অধিবাসী। প্রচারবিমুখ এ বিদ্বান ব্যক্তিটি ১৯৯৭ সালে আমেরিকায় ৭১ বছর বয়সে নীরবেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। চলাফেরা ও পোশাক-পরিচ্ছদে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর মানের জ্ঞানী ও দেশপ্রেমিক খাঁটি মুসলিমের সংখ্যা আমাদের দেশে নগণ্য।

১৯৭০ সালে লন্ডনে প্রকাশিত তার 'Islam and the Contemporary world' নামক ২২১ পৃষ্ঠার বইটি ইসলামী আন্দোলনের এক অমূল্য সম্পদ।

এ মানুষটিকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসতাম। তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সম্পর্ক বহু বছর থেকে। তিনি উদ্যোগ নিয়ে এবং এগিয়ে এসে আমাকে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। তাঁর আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর তিরোধানে আমি একজন মুসলিম বন্ধুর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হলাম।

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের পর পরই তাঁর প্রিয় ছাত্র তখনকার সেনাপ্রধান জেনারেল নূরুদ্দীন খানের অনুরোধে তিনি আমার কাছে আসেন। বিএনপি ও জামায়াতের কোয়ালিশন সরকার গঠনের জন্য তিনি ভূমিকা পালন করেন। তারই বাসায় বেগম খালেদা জিয়ার সাথে আমার বৈঠক হয় এবং সেখানেই বিএনপিকে সরকার গঠনে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত হয়। অবশ্য জামায়াত মন্ত্রিসভায় যোগদান করেনি।

সে সময় বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের প্রেসিডেন্ট। ঘটনাক্রমে তিনিও ড. চৌধুরীর প্রিয় ছাত্র। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. চৌধুরী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৬ সালে যখন পৃথক নির্বাচন ও যুক্ত নির্বাচনের তীব্র বিতর্ক চলে এবং উভয় পক্ষের আন্দোলনে ময়দান উত্তপ্ত ছিলো, তখন ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজে পৃথক নির্বাচনের পক্ষে এবং যুক্ত নির্বাচনের বিরুদ্ধে শাণিত যুক্তি প্রদর্শন করে তাঁর রচিত বিরাট এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমার সাথে তখনো তাঁর কোন পরিচয় ছিলো না। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে উক্ত প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল হলে ব্যাপকভাবে বিলি করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্ত নির্বাচনপন্থিদের প্রবল শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ঘাবড়াননি; বরং তাঁর লেখাটা প্রচারিত হওয়ায় তিনি বিস্মিত হলেও, খুব আনন্দিত হন। পুস্তিকাতে জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক প্রচারিত বলে উল্লেখ থাকায় আমার সাথে তাঁর সম্পর্কের সূচনা হয়।

আইয়ূব খানের শাসনামলের শেষ দিকে তিনি পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে গবেষণা সেলের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে রীডার ছিলেন। চীনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করার ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। ঐ সময় তিনি ঢাকায় এসে আমার সাথে দেখা করেন। আমি সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বক্তব্যে রাশিয়ার সাথে সাথে চীনের কথাও উল্লেখ করতাম। রাশিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সাথে গাঁটছড়া বাঁধায় পাকিস্তানকে ভারতের মুকাবিলায় চীনের সাথে বন্ধুত্ব করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ড. চৌধুরী চীনের সাথে এ বন্ধুত্বের খাতিরে আমি যেন শুধু রাশিয়ার বিরুদ্ধে বলি এবং চীনের বিরুদ্ধে না বলি এ বিষয় আমাকে পরামর্শ দেন। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলার জন্য রাশিয়ার উদাহরণই যথেষ্ট বলে আমি এ পরামর্শ গ্রহণ করলাম। চীন ভারতের শত্রু হিসেবেও পাকিস্তানের বন্ধু। শত্রুর শত্রু হিসেবেই গণ্য।

আইয়ূব খানের পতনের পর সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহইয়া খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

হবার পর ড. জি. ডব্লিউ চৌধুরীকে শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞ হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন। মন্ত্রী হিসেবে ঢাকায় এলে আমার সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করতেন। ইয়াহইয়া-মুজিব সংলাপ ব্যর্থ হবার পর তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করে পাকিস্তান থেকে সপরিবারে লন্ডন চলে যান। দেশের অবস্থা দেখার জন্য '৭১-এর মাঝামাঝি ঢাকা এলেন এবং রাওয়ালপিণ্ডি যেয়ে সেনাবাহিনীর আচরণের বিরুদ্ধে ইয়াহইয়া খানের নিকট অভিযোগ করলেন।

শেখ মুজিব যাদেরকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছিলেন, সে তালিকায় ড. চৌধুরীও ছিলেন। তাই তিনি লন্ডনে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে কিছুদিন অবস্থানের পর আমেরিকায় কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব পান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি তিনি লন্ডনেই কাটাতেন। তাঁর বাসায় বহুবার দাওয়াত খেয়েছি। তিনি সপরিবারে ছিলেন বলে তাঁর বাসায়ই আমাকে যেতে হতো। আমি একাই এক আত্মীয়ের বাড়িতে ছিলাম।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শুক্রবার আমি ফজরের নামাযের সময়ের অপেক্ষায় জায়নামাযে বসা। ফোন বেজে উঠলো। এ সময়ে কেউ ফোন করা স্বাভাবিক নয় বলে আমি ফোন ধরতে চাইলাম না। কিন্তু ফোনের আওয়াজ বন্ধ হয় না বলে বিরক্তির সাথেই ফোন উঠালাম। ড. চৌধুরী কথা বললেন। জিজ্ঞেস করলেন, "ঘুমের ডিস্টার্ব করলাম না তো?" জওয়াব দিলাম। তিনি বললেন, "আধাঘণ্টা পর্যন্ত ফোন বাজতে থাকলেও আমি ছাড়তাম না।" বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, "এমন অসময়ে জিদ করে ফোন ধরে থাকলেন, ব্যাপার কী?" জওয়াবে বললেন, "ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর। ঢাকা থেকে ফোনে এমন এক খবর পেলাম, যা সর্বপ্রথম আপনাকে জানাবার জন্য ফোন ধরে আছি। খবরটা পাওয়ার সাথে সাথেই আপনাকে ফোন করলাম। আমি বললাম, "আমাকে আর উৎকণ্ঠায় না রেখে খবরটা বলে ফেলুন।" তিনি শেখ মুজিবের হত্যার খবরটা যে ভাষায় দিলেন তা এখানে উদ্ধৃত করলাম না। খবরটা পরিবেশন করার পর আমাকে রেডিও থেকে কনফার্ম করতে বললেন। আরও বললেন, "রাশিয়া ও ইন্ডিয়ান রেডিও এ বিষয়ে কিছুই বলেনি। বিবিসি শুনে দেখুন।"

ফজরের নামাযের পর বিবিসি থেকে খবরটির সত্যতা জানা গেলো। ড. চৌধুরী থেকেই এ খবর পয়লা জানলাম।

ড. চৌধুরীর স্ত্রী ড. দিলারা চৌধুরী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর। ফোনে খবর নিলাম যে, তাঁর দু'ছেলেই আমেরিকায় আছে। ক'জনের দাদী হয়েছেন জানতে চাইলে বললেন যে, বড় ছেলের দু'সন্তান হয়েছে, ছোটজনের এখনও হয়নি। আমার মতো তাঁরও কোন কন্যা সন্তান নেই।

ড. চৌধুরীর লেখা 'অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলো' বইটি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের পড়ার মতো একটি মূল্যবান বই। শেষ দিকে সমঝোতার কী চেষ্টা ইয়াহইয়া খান করেছিলেন, সে অজানা তথ্য এ বইটিতে

আছে। বইটির ভূমিকা এখানে আমি তুলে দিচ্ছি, যাতে বইটির আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোর ভূমিকা

কেন পাকিস্তান একটি জাতীয় সত্তা অর্জনে ব্যর্থ হলো? আর কেনইবা পাকিস্তান একটি স্থিতিশীল রাজনৈতিক পদ্ধতি গড়তে বিফল হলো, যাতে পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান এ উভয় অংশ সমান অংশীদার হিসেবে বসবাস করতে পারতো? পাকিস্তান কি সত্যিই ভাষার, আবহাওয়ার এবং জীবনযাত্রার এক অবন্ধনযোগ্য বিভাগ ছিলো? এবং এটাই কি সত্য যে, (১৯৭১ সালে) পাকিস্তানের দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্তি এ ধারণারই বিলম্বিত স্বীকৃতি যে, এটা ছিলো এক অবাস্তব রাষ্ট্র, যার দুই অংশ হাজার মাইল ব্যবধানে অবস্থিত? পাকিস্তানে জাতীয়তাবাদের উদ্ভবে নিঃসন্দেহে ভাষা, জাতিসত্তা, সংস্কৃতির বিভিন্নতা এবং সর্বোপরি ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা দ্বারা জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই আঞ্চলিক, জাতিগত ও ভাষাগত চরম বৈষম্য ও প্রকট উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফেডারেল পদ্ধতি বহু নব্য-স্বাধীন আফ্রো-এশীয় দেশেই বিচিত্র জাতিসত্তাগত, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, ভাষাগত এবং গোষ্ঠীগত সমস্যা সমাধানে সফল প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান ফেডারেশন অনুরূপ সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হলো কেন?

দেশের দুই অংশের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা নিঃসন্দেহে এর বিকাশমান জাতীয়তাবাদের পক্ষে বিরাট হুমকি ছিলো। কিন্তু উপগ্রহ-যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জেট বিমানের এই আধুনিক যুগে এই ভৌগোলিক দূরত্ব অনতিক্রম্য কিছু ছিলো না। এটা প্রায়শই বলা হতো যে, পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মাঝে কেবল ধর্ম ছাড়া আর কিছুরই বন্ধন ছিলো না। যদি সেটাই পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার একমাত্র যুক্তি হতো, তাহলে এটা স্বতঃই প্রশ্ন জাগে যে, এমন কী সাধারণ অভিন্নতা পশ্চিম-বাংলার বাঙালি ও মাদ্রাজিদের একই ভারত ইউনিয়নে একসঙ্গে বসবাস সম্ভবপর করে তুলেছে?

১৯৭১ সালে পাকিস্তান বিভক্তি এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিষাদময় কাহিনী হচ্ছে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জেনারেলদের এই ভুল ধারণা যে, তারা হচ্ছে "জাতীয় স্বার্থের রক্ষক" এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিব ও 'নব' পাকিস্তানের জেডএ ভুট্টো–এই দুই অসৎ, অসংযমী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতার সন্দেহজনক ভূমিকা। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্কট ছিলো বহিঃশক্তি জড়িত দলাদলির ব্যাপার, যাতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উপাদানসমূহ এবং আন্তর্জাতিক পরিবেশ-পরিস্থিতির যোগসূত্র ছিলো।

পাকিস্তান ছিলো এক জাতীয় আন্দোলনের ফসল, যখন অখণ্ড ভারতে অসহনশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীসমূহের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। এটা সত্যিই দুঃখজনক যে, পাকিস্তান তার নিজের ইতিহাস হতে লাভবান হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির পেছনে চালিকাশক্তি ছিলো গণতন্ত্র। কিন্তু দেশ গঠনের পরপরই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে হত্যা করা হলো।

প্রথমে অপূর্ণ সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে এবং পরে সামরিক সরকারসমূহের অধীনে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্তর্ধানই ছিলো পাকিস্তানের জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষায় ব্যর্থতা এবং পরিশেষে ১৯৭১ সালে বিভক্তির পিছনে মূল কারণ। নিঃসন্দেহে অন্যান্য কারণ যেমন– পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়ের বৈষম্যতা, ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুই অংশের লোকজনের সাংস্কৃতিক সংঘাত এবং সবশেষে জটিল বহিঃশক্তিগত কারণ অভ্যন্তরীণ বিবিধ শক্তিসমূহকে জোরদার করেছে। কিন্তু এ সমস্ত কারণকেই এক অর্থে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতিরই ফসল বলা যায়।

এই বইয়ে আমি ১৯৬৯ সালের মার্চে আইয়ুব খানের পতন হতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকার পতন পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের ঘটনাবলির বর্ণনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছি। এই বইয়ে ধর্ম, অঞ্চল এবং বাস্তবতা এই তিনটি বিষয়ের সংঘাতে সৃষ্ট বাঙালি উপজাতীয়তাবাদের জন্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আইয়ূবী আমলের একটি মূল্যায়ন করেছি, যে আমলে পাকিস্তানকে অনেকেই উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য আপাতদৃষ্টিতে 'রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা', 'অর্থনৈতিক অগ্রগতি' এবং 'স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি' প্রভৃতি ভোগ করছিলো। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ ও অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণে এটা প্রতীয়মান হবে যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মৃত্যু এবং আইয়ূবের অধীনে স্বৈরতন্ত্রী পদ্ধতির উদ্ভব ছিলো অখণ্ড পাকিস্তান খতম হয়ে যাওয়ারই শুরু মাত্র। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার আসল কারণ হচ্ছে, আইয়ূব খানের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার অধীনে বাঙালির জাতীয় ব্যাপারে সব রকমের উদ্যোগ হারিয়ে ফেলেছিলো। অনুরূপভাবে তার ১৯৬৫ সালে ভারতের সাথে সামরিক মুকাবিলার মতো ধ্বংসাত্মক নীতিও অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্বের উপর সর্বনাশা প্রভাব ফেলেছিলো।

১৯৬৯ সালের মার্চে যখন ইয়াহইয়া খান ক্ষমতায় বসলেন, তখন তিনি এবং তার সামরিক সরকার পূর্ব-পশ্চিম পাকিস্তানের ভিতর বিরাজমান উত্তেজনা নিরসনের জন্য আন্তরিক সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে এটা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী বাইশ বছরের দুঃশাসনের সৃষ্ট জটিল পরিস্থিতি মুকাবিলা করার মতো সামর্থ্য ইয়াহইয়া খানের ছিলো না। অনুরূপভাবে পরিশেষে তাঁকে যে দু'জন রাজনৈতিক নেতার সাথে বুঝাপড়া করতে হয়েছিলো, তাদেরও না ছিলো সততা, ন্যায়পরায়ণতা কিংবা রাষ্ট্রনায়কসুলভ কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গি। বাইরের উপাদানও উত্তপ্ত পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিলো।

ফল যা দাঁড়ালো তা হলো, সামরিক সরকারের নিকট হতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বড় মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধে পর্যবসিত হয়। অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ এবং শত্রুভাবাপন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্মিলনের কারণে এই সাংঘর্ষিক অবস্থা সমাধানযোগ্য ছিলো না। কেন নির্বাচিত জনপ্রিয় বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহইয়ার পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো? ঐ পরিকল্পনা কি বাঙালিদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির জন্য অপর্যাপ্ত ছিলো? নাকি বাঙালিরা আগেই শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন রাষ্ট্রের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করে ফেলেছিলো? ইয়াহইয়া খান এবং তার সামরিক সরকার কি বাঙালি প্রভাবিত বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন? শেখ মুজিবের ৬ দফা পরিকল্পনারই বা কী তাৎপর্য ছিলো? এটা কি বিচ্ছিন্নতার জন্য এক লুক্কায়িত ষড়যন্ত্র ছিলো, নাকি এটা শুধু আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিলো? মুজিব কি তার নিজ জনগণ এবং ইয়াহইয়া খানের সামরিক সরকারের সাথে বুঝাপড়ায় আন্তরিক ও অকপট ছিলেন? তার পলিসি কি সংঘর্ষকে ডেনে আনেনি? ভুট্টোর ভূমিকা এবং লক্ষ্যই বা কী ছিলো? এটা কি সত্য যে, তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের চেয়ে ক্ষমতার প্রতিই বেশি মোহগ্রস্ত ছিলেন? ১৯৭১ সালের জানুয়ারি-মার্চে অনুষ্ঠিত সর্বশেষ আলোচনায় অংশীদার তিনপক্ষের রাষ্ট্রনায়কসুলভ ও আত্মসংযমী নীতি কি মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধকে পরিহার করতে পারতো না?

বাংলাদেশ সঙ্কটের আন্তর্জাতিক তাৎপর্যাবলি কি ছিলো? এটা কি পাক-ভারত বিবাদ এবং উপমহাদেশীয় উত্তেজনার সাথে গ্রথিত ছিলো না? আর এই সঙ্কটে ভারতের ভূমিকাই বা কী ছিলো? তার ভূমিকা কি পুরোপুরি মানবতার খাতিরেই পরিচালিত ছিলো, যে রকমটা সে দাবি করতো? নাকি তা তার 'এক দুশমনের' বিনাশ সাধনে এক উত্তম সুযোগের সন্ধান ছিলো? দুই পরাশক্তির বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতা এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীন-সোভিয়েত বৈরিতা বাংলাদেশ সঙ্কটের উপরেই বা কী প্রভাব ফেলেছিলো?

এগুলো এবং এরূপ আরো অনেক প্রশ্নই পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই বইয়ে। পাকিস্তানের ভাঙন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার। এখানে আমরা দেখাবো যে, একটি রাজনৈতিক চরিত্রবিহীন সরকার তা যতই সদিচ্ছার অধিকারী হোক না কেন, তৃতীয় বিশ্বের একটি নতুন দেশের জটিল সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলির সুরাহা করতে সমর্থ নয়। এটা আরো প্রতিভাত হয় যে, কিভাবে অধিকতর শক্তিশালী এক প্রতিবেশী দেশ এক দুর্বল দেশের অভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে এবং কিভাবে পরাশক্তিসমূহ তাদের এজেন্টের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বে তাদের বিশ্ব-প্রতিযোগিতা চালিয়ে যেতে পারে।

১২০.

ঢাকা রওয়ানা হলাম

প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানের সাথে সাক্ষাতের পর ঐ দিনই লাহোর ফিরে গেলাম। পরদিন এ সাক্ষাতের রিপোর্ট মাওলানা মওদূদীর নিকট পেশ করলাম। তিনি মন্তব্য করলেন, "সামরিক শক্তি প্রয়োগের আগেই সমঝোতার সঠিক সময় ছিলো। তখন যারা ব্যর্থ হয়েছে এখন কেমন করে সফল হবে? ভারত কিছুতেই কোন সমঝোতা হতে দেবে না।"

আমার ঢাকা রওয়ানা হবার জন্য পিআইএ (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স)-এর ২ ডিসেম্বরে সিট বুক করা হলো। আমি এক তারিখেই করাচী পৌঁছে

গেলাম। বিমান দুপুর একটায় ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার কথা। সকালে হঠাৎ ইসলামাবাদ থেকে জনাব নূরুল আমীন ফোন করে ২ তারিখের বদলে ৩ তারিখে যাবার পরামর্শ দিলেন। ঢাকায় নিয়ে যাবার জন্য কিছু জিনিস তিনি করাচী পৌঁছাবার ব্যবস্থা করলেন, যা আমার সাথে নিয়ে যেতে হবে।

খবর নিয়ে জানা গেলো যে, ৩ তারিখে প্লেনে কোন আসন খালি নেই। পিআই-এর ট্রেড ইউনিয়ন 'পিয়ানী' তখন জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের হাতে। পিয়ানীর সভাপতিকে জামায়াতের করাচী শাখার আমীর নির্দেশ দিলেন যে, ৩ তারিখেই আমার জন্য একটি আসনের ব্যবস্থা করতে হবে। জানা গেলো যে, ইকোনমি ক্লাসে কোন আসন যোগাড় করা সম্ভব নয়। অনেক চেষ্টা করে ফার্স্ট ক্লাসে একটি আসন খালি করার ব্যবস্থা করা যায়। তা-ই ব্যবস্থা করতে বলা হলো। আমি এর আগে কখনো ফার্স্ট ক্লাসে ভ্রমণ করার বিলাসিতা করিনি। দায়ে ঠেকে তখন সর্বপ্রথম ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট নিতে হলো।

করাচী বিমান বন্দরে যোহরের নামায আদায় করে প্লেনে চড়লাম। করাচী থেকে ঢাকা পৌঁছতে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগার কথা। কিন্তু ভারতের উপর দিয়ে যাবার অনুমতি ছিলো না। গঙ্গা নামে ভারতের একটি অভ্যন্তরীণ বিমান হাইজ্যাক করে কাশ্মীরী মুজাহিদরা লাহোর নিয়ে যায়। লাহোর অবতরণের সুযোগ দেবার প্রতিশোধ নেবার জন্য ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমানের যাতায়াত নিষিদ্ধ করা হয়। তাই আমার বিমান শ্রীলংকার উপর দিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এতে মোট ৬ ঘণ্টা সময় লাগে।

আমি জানালার পাশের আসনে ছিলাম। তিন ঘণ্টা পর লক্ষ্য করলাম যে, বিমান শ্রীলংকা পার হচ্ছে। এতো উপর থেকেও শ্রীলংকার নারিকেল গাছ দেখা গেলো। মনে হয় গোটা দেশটাই এক বিরাট নারিকেল বাগান।

এক ঘণ্টা পর আসরের নামায আদায় করার জন্য আমার আন্দাজ মতো জায়নামায বিছালাম। ফার্স্ট ক্লাসে প্রচুর জায়গা থাকে। ককপিটের কাছে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা। আমি প্লেনের ককপিটকে পেছনে রেখে কিবলা রুখ করে জায়নামায পাতলাম। প্লেনের ক্রু বললো, "স্যার আপনি উল্টো দিকে রুখ করেছেন।" সে আমার জায়নামায ককপিটের দিকে রুখ করে পেতে দিলো। আমি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, "প্লেন কি ঢাকার দিকে যাচ্ছে না? আমি তো সে হিসেবে ঢাকার বিপরীত দিকে কিবলার হিসেবে করেছি।" ক্রু বললো, "আমরা প্লেনের গতিবিধি জানি। আমার কথামতোই নামায পড়ুন।" মনে খুঁতখুঁতি নিয়েই নামায আদায় করলাম।

কলম্বো বিমান বন্দরে অবতরণ

এক ঘণ্টা পর প্লেনের ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলো যে, আমরা অনিবার্য কারণে কলম্বো বিমান বন্দরে অবতরণ করছি। শুনে আমি রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গেলাম। দু'ঘণ্টা আগে কলম্বো পার হয়ে যেতে দেখলাম। শ্রীলংকা পার হবার এক ঘণ্টা পর আসরের নামায পড়লাম। এখন শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বো ফিরে এলাম কেন? এ

প্রশ্নের কোন জওয়াব কেউ দিলো না। তবে এটা বুঝলাম যে, আমি নামায পড়ার সময় প্লেন ঢাকার দিকে না যেয়ে উল্টো দিকেই আসছিলো।

কলম্বোতে আমাদের প্লেন অবতরণের সময় দিনের আলো পড়ন্ত অবস্থায় থাকলেও স্পষ্ট দেখা গেলো যে, পিআইএ'র আরও একটা বিমান টারমাকে আগে থেকেই থেমে আছে। ক্রুকে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো যে, ঢাকা থেকে করাচীগামী প্লেনই সেখানে ল্যান্ড করে আছে। বিমানের ক্যাপ্টেন কিছুই জানালো না যে, প্লেন ঢাকা না গিয়ে কলম্বো এলো কেন? অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। চিন্তা করে কুল-কিনারা পাচ্ছিলাম না।

কলম্বো বিমান বন্দরে ক্লিনাররা প্লেনের টয়লেট পরিষ্কার করতে আসলো দেখলাম। প্রায় দু'ঘণ্টা পর প্লেন আবার আকাশে উড়লো। মাগরিবের নামায কলম্বো বিমান বন্দরে আদায় করলাম।

জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ

প্লেন কোথায় যাচ্ছে তা জানাচ্ছে না বলে পেরেশানী বেড়েই চললো। ক্রুরাও কিছুই বলতে পারছে না বা বলছে না। করাচী থেকে দুপুর একটায় প্লেন ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলো। আমার ঘড়ি অনুযায়ী ঢাকায় সন্ধ্যা সাতটায় অবতরণের কথা। কলম্বো থেকে আটটায় রওয়ানা হয়ে ঢাকায় পৌঁছতে তিন ঘণ্টার বেশি লাগা উচিত নয়। সে হিসেবে আমার ঘড়িতে ১১টা বাজার পরও যখন প্লেন চলছেই তখন বুঝলাম যে, ঢাকার দিকে যাচ্ছে না। যদি করাচী ফিরে যেতো তাহলে এ সময় পৌঁছে যেতো। তাহলে প্লেন কোথায় যাচ্ছে? ঘড়িতে বারোটা বাজার পরও প্লেন একই গতিতে চলছে। অথচ জানতে পারছি না যে, কোথায় যাচ্ছি। এটা যে কত বড় অস্বস্তিকর অবস্থা তা অন্যদের পক্ষে উপলব্ধি করা অসম্ভব।

আমার ঘড়িতে যখন রাত দু'টা বাজে তখন প্লেনের ক্যাপ্টেন জানালো যে, আমরা জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণ করছি। কোথায় ঢাকা আর কোথায় জেদ্দা। জেদ্দার নাম শুনেই চমকে উঠলাম। ঢাকা পৌঁছতে না পারার দুঃখ ভুলে গেলাম। মক্কা ও মদীনার যে আকর্ষণে প্রতিটি মুসলিম আজীবন সেখানে পৌঁছার স্বপ্ন দেখতে থাকে, সেখানে হঠাৎ করে পৌঁছে গেলাম! এক বিস্ময়কর আবেগ মনকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেললো। একদেশ থেকে আর এক দেশে যেতে হলে পাসপোর্ট লাগে, ভিসা সংগ্রহ করতে হয় এবং বিমানের টিকেট খরিদ করতে হয়। ভেবে বিমুগ্ধ হলাম যে, বিনা পাসপোর্টে, বিনা ভিসায়, বিনা টিকেটে, এমন কি বিনা নিয়মে এমন জায়গায় পৌঁছে গেলাম, যেখানে আসার শুধু স্বপ্নই দেখতাম। বাস্তবে কবে তা সম্ভব হবে তা কল্পনায়ও আসেনি।

যা হোক, বিমান থেকে নামার পর প্লেনের সকল যাত্রীকে বিমান বন্দরের এক এলাকায় সমবেত করা হলো। বিদেশ সফরের আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। অবশ্য ১৯৫০ ও ১৯৫৩ সালে আমি তাবলীগ জামায়াতের মাধ্যমে ভারতে গিয়েছি। কিন্তু তখনও পাসপোর্টের প্রয়োজন হয়নি বলে ভিসারও ব্যবস্থা করা লাগেনি।

বিদেশে গেলে বিমান বন্দরেই ইমিগ্রেশন কাউন্টারে পাসপোর্ট দেখাতে হয়। তারপর কোন বাধা না থাকলে সে দেশে ঢুকতে দেয়। আমাদের ব্যাপার আলাদা। যেহেতু আমাদের পাসপোর্টই নেই।

পিআই-এর কান্ট্রি ম্যানেজার জেদ্দাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের সহায়তায় ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারদেরকে হোটেল হারামাইনে থাকার ব্যবস্থা করলেন। ইকোনমি ক্লাসের এতো যাত্রীকে কোথায় নিয়ে গেলো জানি না। তখন জানতে পারলাম যে, ইকোনমি ক্লাসের সবাই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সৈনিক, যাদেরকে ঢাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। ফার্স্ট ক্লাস যাত্রীদের মধ্যে আমি ছাড়া মাত্র একজনই বাংলাভাষী ছিলেন। তিনি নারায়ণগঞ্জের কোন একটি টেক্সটাইল মিলের ম্যানেজার। আর বাকি সবাই সাদা পোশাকে আর্মি অফিসার।

জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছার সময় ওখানকার সময় ছিলো রাত ১১টা। যে জায়গায় আমাদেরকে সমবেত করা হলো, সেখানেও প্লেনের ক্যাপ্টেন এগিয়ে এসে আমার সাথে হাত মিলিয়ে বললেন, "আপনাকে আমি চিনি। ঢাকায় কাকরাইল মসজিদে আপনার আব্বার সাথে পরিচয় হয়েছে। পিআই-এর দু'টো প্লেনকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, জেদ্দা অথবা তেহরান চলে যাও। ভারতের সাথে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বলে করাচীতেও ফিরে আসা সম্ভব নয়। ঢাকা থেকে করাচীগামী প্লেনটি তেহরান চলে গেছে। আমি জেদ্দা আসাই বেশি পছন্দ করেছি, যাতে ওমরাহ করার সুযোগ হয়। আমি আপনাকে ওমরাহ করার সুযোগ দিলাম। দোয়াতে আমাকে মনে রাখবেন।"

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঢাকায় কী হয়েছে, যার কারণে কলম্বোতে অবতরণ করতে হলো?" জওয়াবে বললেন, "সেখানে বিমান বন্দরেই ভারতীয় বিমান-বাহিনী বোমা ফেলেছে।"

ক্যাপ্টেন সাহেব ছ'ফুট লম্বা মনে হলো। বিরাট দাড়ি। তাবলীগ জামায়াতের লোক। ভারতের ভূপাল রাজ্য থেকে হিজরত করে পাকিস্তানে গিয়েছে। এই ভদ্রলোকের সাথে লন্ডনে জুমআর নামাযে কয়েকবার দেখা হয়েছে।

হোটেলে অবস্থান

রাত ১১টায় জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরণের তিন ঘণ্টা পর হোটেলে পৌঁছলাম। নারায়ণগঞ্জের ম্যানেজার সাহেব ও আমাকে পাশাপাশি রুমে থাকতে দেওয়া হলো। ঘটনার আকস্মিকতা ও কাবা শরীফ দেখার আবেগ আমাকে ঘুমাতে দিলো না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তায় পড়লাম যে, ওমরাহ করার নিয়ম-কানুন কিছুই জানি না। নিশ্চয়ই এ বিষয়ে বই-পুস্তক আছে। কিন্তু বই কোথায় পাবো? এ কথা খেয়াল করে আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর শুকরিয়া জানালাম যে, ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট করা না হলে এ ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পেতাম না, যা এখন পাচ্ছি। প্রথম শ্রেণীর হোটেলে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়ায় অনেক দিক দিয়ে সুবিধা পেয়ে গেলাম। পিআইএ কর্তৃপক্ষ পরদিন ওমরাহ করাবার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফ নিয়ে যাবার কথা।

হোটেলের বিছানায় নিদ্রাহীন অবস্থায় রাত কেটে যাচ্ছে। ফজরের আযান শুনে উঠে নামাযের প্রস্তুতি নিলাম। নিকটে কোন মসজিদ আছে কিনা জিজ্ঞেস করার লোকও খুঁজে পেলাম না। এমনকি কিবলা কোন্ দিকে তা জানার জন্যও কাউকে দেখলাম না। পাশের রুমে আমার সহযাত্রীকে জাগাবো কিনা চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত সমীচীন মনে করলাম না। অনুমান করে এক দিকে রুখ করে নামায আদায় করলাম।

নামাযের পর ঘুমাবার উদ্দেশ্যে বিছানায় গেলাম। গত ২৭ ঘন্টার মধ্যেও ঘুমাইনি। এ সত্ত্বেও ঘুম আসার কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। দেহে তেমন ক্লান্তিও বোধ করলাম না। মন-মস্তিস্ক আবেগে পূর্ণ। উঠে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে দেখলাম যে রোদ উঠেছে। রাস্তায় কিছু লোক চলাচলও করছে। কিছুক্ষণ পর লক্ষ্য করলাম যে, ছোট ছোট ছেলেরা স্কুলে যাচ্ছে। আমি জানতাম যে, পশ্চিম-পাকিস্তানের অধিবাসী জামায়াতের কিছু লোক সৌদী আরবে আছে। তাদের মধ্যে স্কুল শিক্ষকও থাকতে পারে। নিচে নেমে রাস্তায় পায়চারি করতে লাগলাম। আরবী পোশাক পরা এক তরুণকে যেতে দেখে সালাম দিয়ে তার সাথে হাত মিলালাম। জিজ্ঞেস করলাম, "Do you speak in English?" জওয়াবে বললেন, "Very little." খুশি হয়ে বললাম, "Sufficent, are you a teacher?" "yes", "Is there any pakistani teacher in your School?" "yes." "Please tell him to see me in Hotel Haramain," তিনি আমার নাম ও হোটেলের রুম নম্বর নোট করে নিলেন। বারবার Thanks দিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পর হোটেল থেকে নাস্তা এলো। নাস্তার পর একটু অবসাদ বোধ করলাম। বিছানায় শোয়ার পর ঘুমিয়ে গেলাম।

কলিং বেলের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো। ঘড়িতে তখন দুপুর সাড়ে বারোটা। দরজা খুলে দেখলাম, একজন মধ্যবয়সী লোক। সালাম দিয়ে তিনি বললেন, আপনি কি প্রফেসর গোলাম আযম? সাদরে আলিঙ্গন করে ভেতরে এনে বসালাম। বুঝতে পারলাম, তিনি ঐ স্কুল শিক্ষক, যাকে সৌদী তরুণ শিক্ষক আমার খবর দিয়েছেন। আমি তাঁর বিস্তারিত পরিচয় জানতে চাইলাম। বললেন, তাঁর বাড়ি করাচী। স্কুলে ইংরেজির শিক্ষক। ৫ বছর থেকে এখানে আছেন। জেদ্দায় জামায়াতে ইসলামীর কোন লোক আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, "আমি জামায়াতের সক্রিয় না হলেও সমর্থন করি। এখানকার যারা জামায়াতে সক্রিয় তাদের সাথে যোগাযোগ আছে। এখনি ফোনে যোগাযোগ করতে পারি। এ কথা বলেই তিনি ফোন করে মুহাম্মদ আলী নামে একজনের সাথে কথা বললেন। ফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন, মুহাম্মদ আলী সাহেব ইংরেজী 'দৈনিক আরব নিউজ' পত্রিকায় কাজ করেন। খুব কাছেই থাকেন। এখনি এসে পৌঁছবেন।

স্কুল শিক্ষকটির নাম মনে নেই। তিনি বসা থাকা অবস্থায়ই ৩০-৩৫ বছর বয়সী মুহাম্মদ আলী সাহেব এসে আবেগের সাথে কোলাকুলি করলেন। বললেন, "ইস্ট পাকিস্তান জামায়াতের আমীর হিসেবে আপনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আপনজন। জেদ্দায় এলেন বিনা খবরে! লাহোর থেকে জামায়াত আমাদেরকে জানাতে পারতো।"

আমি তাঁকে সংক্ষেপে ঘটনার বিবরণ দিলাম। চিন্তিত হয়ে বললেন যে, তাহলে ভারতের সাথে যুদ্ধ লেগেই গেলো।

আমার রুমে বসেই মুহাম্মদ আলী সাহেব সৌদী আরবে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতিনিধি রাও আখতার আহমদকে ফোন করলেন, যোগাযোগের প্রথম মাধ্যম স্কুল শিক্ষক বিদায় হয়ে গেলেন। তাঁকে আন্তরিক শুকরিয়া জানিয়ে বিদায় দিলাম। মুহাম্মদ আলী সাহেবের পরিচয় নিলাম। তিনি ছাত্র জীবনে ইসলামী জমিয়তে তালাবা-এর রুকন ছিলেন। দৈনিক আরব নিউজে প্রশাসন বিভাগে কর্মরত। বেশ কয়েক বছর আগে এসেছেন। এখানে সাংগঠনিক তৎপরতায় জড়িত আছেন। অধীর আগ্রহে ইস্ট-পাকিস্তানের হাল অবস্থা জানতে চাইলেন। আমার সম্বন্ধেও অনেক কিছু জেনে নিলেন।

ইতোমধ্যে রাও আখতার সাহেব পৌঁছে গেলেন। চল্লিশোর্ধ কাঁচা দাড়ি শোভিত রাও সাহেব থেকে আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে দু'জনেই বসলাম। আমার জেদ্দায় পৌঁছার কাহিনী শুনলেন। পাক-ভারত যুদ্ধের কথা জেনে বেশ উদ্বিগ্ন হলেন। পিআইএ'র কান্ট্রি ম্যানেজারের সাথে রাও সাহেবের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় তিনি আমার কামরা থেকেই ফোনে তাঁর সাথে যোগাযোগ করলেন। ম্যানেজার সাহেব জানালেন যে, মাগরিবের আগেই একটা গাড়ি হোটেলে পৌঁছবে এবং মাগরিবের পর আমাকে ওমরাহ করাবার জন্য মক্কা শরীফ নিয়ে যাবে। তিনি রাও সাহেবকে ইহরামের কাপড়ের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। আসরের পর রাও সাহেব আসবেন বলে বিদায় হয়ে গেলেন। মুহাম্মদ আলী সাহেব তাঁর সাথেই চলে গেলেন।

আমি গোসল করে যোহরের নামায আদায় করার পরপরই হোটেল বয় খাবার নিয়ে এলো। খেয়ে ঘুমাবার উদ্দেশ্যে শুয়ে পড়লাম। সংগঠন যে কত বড় নিয়ামত তা উপলব্ধি করলাম। হঠাৎ করে অপরিচিত জায়গায় অসহায়ত্ববোধ করছিলাম। আল্লাহ তাআলা অল্প সময়ের মধ্যে দীনী ভাইদের সন্ধান দিলেন। এখন বিদেশে অপরিচিত পরিবেশের অসহায়ত্ববোধ আর রইলো না। যারা আমাকে এমন আপন করে নিলেন, তাদের কারো সাথে এর আগে সামান্য পরিচয়ও ছিলো না। ইসলামী সংগঠনের এ ফযীলত দেখে অত্যন্ত পুলকিত হলাম এবং আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানালাম।

আসরের আযানের আওয়াজে ঘুম থেকে জাগলাম। সাড়ে ৪টার সময় রাও আখতার সাহেব ইহরামের প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে এলেন। এক জোড়া বড় আকারের সাদা রং-এর তোয়ালে ও কোমরের একটা বেল্ট এবং এক জোড়া স্যান্ডেল। ইহরাম অবস্থায় এমন জুতা পরা নিষেধ, যা পায়ের পাতা সবটুকুকে ঢেকে দেয়। তাই পায়ের পাতা খোলা থাকে এমন স্যান্ডেল পরতে হয়।

আমি রাও সাহেবকে অকপটে বললাম, "আগে জানলে ওমরাহ সম্পর্কে বই পড়ে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করে নিতাম। এখন এ ব্যাপারে আমি একেবারেই মূর্খ। তিনি আমাকে ইহরাম বাঁধার নিয়ম বুঝিয়ে দিলেন এবং ইহরামের তোয়ালে পরায় সাহায্য করলেন।

আমার সাথে মক্কা শরীফ আর কেউ যাবেন কিনা এবং সেখানে যা কিছু করণীয় সে বিষয়ে অভিজ্ঞ কেউ সাথে যাবেন কিনা জানতে চাইলাম। তিনি আমার অসহায়ত্ব টের পেয়ে অত্যন্ত জযবার সাথে বললেন, "আপনি বড়ই ভাগ্যবান। জামায়াতের এক ভাইতো আপনার সাথে যাচ্ছেনই। সবচেয়ে খুশির বিষয় হলো যে, মদীনা শরীফ থেকে একজন অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তি অন্য কাজে জেদ্দা এসেছেন। তিনি আপনার কথা জানতে পেরে আপনাকে ওমরাহ্ করাবার জন্য সাথে যেতে প্রস্তুত হয়েছেন।

মাওলানা শারকী

মদীনা শরীফ থেকে যিনি এলেন, তিনি মাওলানা আবদুল আযীয শারকী। শারকী তাঁর কাব্যিক নাম। তিনি না'তে রাসূল সম্পর্কে উর্দু ভাষায় অনেক কবিতা লিখেছেন। এ সব না'তের যে সংকলন বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে এর ভূমিকা মাওলানা মওদূদী লিখেছেন। তিনি আমাকে ঐ বইটি উপহার দিয়েছেন। এ সব কথা অনেক পরে জেনেছি। জেদ্দায় যখন তাঁকে দেখেছি এর আগে তার নামও জানা ছিলো না। অথচ তিনি জামায়াতে ইসলামী কায়েম হওয়ার সময় থেকেই মাওলানা মওদূদীর ঘনিষ্ঠ সাথী।

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে লাহোরে সারা ভারত থেকে আগত মাত্র ৭৫ জন লোক নিয়ে জামায়াতে ইসলামী কায়েম হয়। শারকী সাহেব তাদেরই একজন। এরপর পূর্ব-পাঞ্জাবের পাঠান কোটে 'দারুল ইসলাম' নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়। মাওলানা মওদূদীসহ মাত্র ৫ জন লোক সেখানে কর্মরত হন। গবেষণার সাথে সাথে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের যোগ্য লোক তৈরি করার জন্য সেখানে স্থায়ী ট্রেনিং ক্যাম্প ছিলো। গবেষণা ও ট্রেনিং-এ যে ৫ জন নিবেদিত প্রাণ ছিলেন মাওলানা শারকী তাদের একজন।

পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতের সূচনা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে লিখেছি যে, ১৯৫২ সালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে সূরার ৬ জন সদস্য পূর্ব-পাকিস্তানে কয়েক সপ্তাহ সফর করে বিভিন্ন শহরে জামায়াতকে পরিচিত করেন। মাওলানা শারকী ঐ টিমের একজন সদস্য ছিলেন। আশিকে রাসূল হিসেবে শেষ জীবন মদীনা শরীফ কাটাবার উদ্দেশ্যে এবং জান্নাতুল বাকীতে দাফন হবার কামনা নিয়ে তিনি মাওলানা মওদূদী থেকে ছুটি নিয়ে মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন।

মাওলানা আবদুল আযীয শারকী আমাকে ওমরাহ করাবার দায়িত্ব নিলেন। মাগরিবের আগেই হোটেলে পৌঁছলেন। আমাকে যে রকম আবেগ নিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং কপালে ও মুখে চুমু খেতে লাগলেন তাতে তিনি আমার নিকট যুবকের পরিচয়ই দিলেন। তিনি জযবার সাথেই বললেন, "যে পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতের সূচনায় আমি শামিল ছিলাম। সেখানকার আমীরে জামায়াতের প্রতি গভীর ভালোবাসা জ্ঞাপন করা আমি কর্তব্য মনে করি।" আমি বললাম, "আমি আপনার সন্তান তুল্য। আপনার কাছ থেকে আমি পিতৃস্নেহই পেলাম।"

মাগরিবের নামায পড়ে গাড়িতে উঠলাম। মিনিবাসের সামনের দু'আসনে আমার

পাশেই শারকী সাহেব বসলেন। আমার বাম দিকে ড্রাইভার। আমি মাঝখানে। পেছনে আরও কয়েকজন ইহরাম বেঁধে ওমরাহ করার উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলেন। মাওলানা শারকী গাড়িতে সারা পথেই আমার পরম স্নেহপরায়ণ মুরুব্বীর ভূমিকা পালন করলেন। তিনি এমন আবেগময় ভাষায় কাবাঘর যিয়ারত, তাওয়াফ ও সায়ী (সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দৌড়ানো) সম্পর্কে তারবিয়ত দিলেন যে, আমার মনে আল্লাহর মহব্বতের ঢেউ উঠে গেলো। ওমরাহ সমাপ্ত হবার পর উপলব্ধি করলাম যে, এ সব নিছক কতক অনুষ্ঠান নয়। এ সবই আল্লাহর প্রেমিকের আবেগময় আচরণ। সারা পথে তিনি প্রেমের আগুন জ্বালাতে থাকলেন। এর ফলে আল্লাহর মহব্বতের জোশে আমি অবিরাম কাঁদতে থাকলাম। আল্লাহর কথা স্মরণ করে কাঁদার মধ্যে এতো মজা ও তৃপ্তি পেলাম, যা আমার অন্তরকে সমৃদ্ধ করে দিলো। মনে হলো যে, আল্লাহ তাআলা আমার জন্যই অলৌকিকভাবে এমন মুরব্বী যোগাড় করে দিলেন। এটা সত্যি আশাতীত।

১২১.

হারামের সীমানায় পৌঁছার আগে হুদাইবিয়া

জেদ্দা থেকে মক্কা বর্তমানে ৭০ কিলোমিটার দূরে। আমি '৭১ সালে যখন গেলাম তখন ৭৫ কিলোমিটার দূরত্ব ছিলো। বর্তমানে পাহাড় কেটে নতুন রাস্তা তৈরি করে দূরত্ব কমানো হয়েছে।

ষষ্ঠ হিজরীতে হুদাইবিয়া নামক বিখ্যাত স্থানটিতে রাসূল (স)-এর সাথে কুরাইশ নেতাদের যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছিলো তা নতুন রাস্তার পথে পড়ে না। তাই এবার বিদায়ী তাওয়াফ করে জেদ্দা ফিরে আসার সময় পুরাতন রাস্তায় আসায় হুদাইবিয়া দেখে আসলাম। হুদাইবিয়া থেকে মক্কা ২০ কিলোমিটার। আরও ৫ কিলোমিটার পর হারামের সীমা শুরু হয়। কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে মক্কার চারপাশে অনেক দূর পর্যন্ত হারাম শরীফের এলাকা বিস্তৃত। অবশ্য সবদিকে হারামের সীমানা সমান দূরত্বে নয়। তবে মক্কা থেকে জেদ্দার দিকেই দূরত্ব বেশি।

হারামের সীমানায় প্রশস্ত নতুন রাস্তার উপর বিরাট গেট তৈরি করা হয়েছে, যা মক্কা গেট নামে পরিচিত। রাস্তার মাঝখানে গেটের উপর বিরাট আকারে রিয়াল খুলে রাখা কুরআনের নকশা তৈরি করা আছে। এখান থেকেই হারামের সীমানা শুরু হয়েছে। রাতে যখন এটা আলোকিত করা হয় তখন চমৎকার দেখায়।

এখান থেকেই তায়েফ যাবার জন্য হারামের এলাকার বাইরে দিয়ে অমুসলিমদের যাতায়াতের জন্য আলাদা রাস্তা রয়েছে। ঐ রাস্তার নাম লেখা আছে শারেয়ে কুফ্ফার (কাফিরদের পথ)। কোন অমুসলিমকে হারামের সীমানার ভেতর ঢুকতে দেওয়া হয় না। মক্কা গেটে পৌঁছার আগেই পুলিশের চেকপোস্ট আছে। পাসপোর্টে যাদেরকে অমুসলিম পাওয়া যায় তাদেরকে মক্কা গেটে ঢুকতে দেওয়া হয় না।

১৯৭১ সালের ৪ ডিসেম্বর মাগরিব বাদ জেদ্দা থেকে রওয়ানা হয়ে প্রায় এক ঘণ্টা পরে হুদাইবিয়া পৌঁছলাম। মাওলানা শারকী আমাকে সাইন বোর্ড দেখালেন, আরবীতে লেখা হাদায়েকে হুদাইবিয়া (হুদাইবিয়ার বাগানসমূহ)। বাগানের আরবী হলো হাদীকাতুন। এর বহুবচন হচ্ছে হাদায়েক। হুদাইবিয়া নাম শুনেই ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত ঘটনা হিসেবে হুদাইবিয়ার সন্ধির কথা স্মরণ হলো। দীনের দাওয়াতের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও বিজয়ের সূচনা হয় এ সন্ধির ফলেই। কুরাইশ নেতারা বার বার মদীনা আক্রমণ করে রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্রটিকে খতম করার উদ্দেশ্যে যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলো, উক্ত সন্ধির মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি হওয়ায় তিন বছরের মধ্যেই ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় সম্ভব হয়েছে। সন্ধির কথাগুলো আপাতঃদৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হওয়ায় সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে গেলেন। তাঁরা রাসূল (স) থেকে জানতে চাইলেন যে, এ জাতীয় চুক্তি কবুল করার জন্য আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন কিনা। আল্লাহর নির্দেশেই এ চুক্তিতে তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে সাহাবায়ে কেরাম আর আপত্তি না করলেও তাঁদের মন খুশি হলো না।

মনঃক্ষুণ্ন অবস্থায়ই তাঁরা মদীনায় ফিরে যাচ্ছিলেন। ১৪০০ সাহাবী হুদাইবিয়াতে বিখ্যাত বাইয়াতে রিদওয়ানের মাধ্যমে আল্লাহর দীনের স্বার্থে শহীদ হবার যে জযবা দেখালেন, তাতে আল্লাহ তাআলা এতো সন্তুষ্ট হলেন যে, তিনি তাঁর এমন একান্ত প্রিয় দাসদেরকে খুশি করা প্রয়োজন বোধ করে পথেই সূরা আল ফাত্হ নাযিল করেন। সূরাটি শুরুই হয়েছে বিজয়ের বার্তা দিয়ে। "ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম্ মুবীনা।" অর্থ ঃ "হে রাসূল! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।"

সূরাটি নাযিল হওয়ার পরপরই রাসূল (স) সফর মুলতবি করে এক জায়গায় সকল সাহাবীকে সমবেত করে সূরাটি শুনিয়ে দিলেন। সূরাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিজয়ের সূচনা হিসেবে 'খাইবার' বিজয়ের স্পষ্ট ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। এ সূরা মনঃক্ষুণ্ন সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আনন্দের বন্যা বইয়ে দিলো। হযরত ওমর (র) ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি আপত্তি করেছিলেন বলে সূরাটি শুনবার পর তিনি রাসূল (স)-এর নিকট লজ্জাবনত হয়ে অনুশোচনা প্রকাশ করলেন।

হুদূদে হারামে পৌঁছলাম

কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে যাবার পর রাস্তার দু'পাশে দু'টো পিলার দেখিয়ে শারকী সাহেব বললেন যে, এখান থেকেই হারামের সীমানা শুরু হয়েছে। এখানে যে দোয়া পড়ে হারামে ঢুকতে হয় তা তিনি শেখালেন। দোয়াটি হলো ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা হারামুকা, ওয়া হারামি রাসূলিকা, ফা-হাররিম লাহমী ওয়া দামী ওয়া আযমী ওয়া বাশারী মিনান নার।

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! এটাই তোমার পবিত্র সম্মানিত এলাকা ও তোমার রাসূলের পবিত্র সম্মানিত এলাকা। তাই আমার গোশত, রক্ত, হাঁড় ও গোটা দেহের উপর দোযখের আগুনকে হারাম (নিষিদ্ধ)) করে দাও।" দোয়াটি কতই না আবেগময়।

মক্কা শরীফ আর ১৪/১৫ কিলোমিটার দূরে। এ সময় শারকী সাহেব আমাকে সামনে যেসব দোয়া করতে হবে তা শেখাতে থাকলেন।

মক্কা শরীফের যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছি, ততোই আমার হৃদয়ের স্পন্দন বেড়ে চলছে। বিশ্বের সকল মুসলিম যে কিবলা রুখ হয়ে দিনে ৫ বার নামায আদায় করে, আল্লাহর ঐ পবিত্র ঘরটি দেখার আবেগ মুমিনের দিলে অত্যন্ত তীব্র হওয়াই স্বাভাবিক।

সৌদী আরবে চাকরি ও ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে লাখ লাখ বাংলাদেশী যায়। ওখানেই আমি বিশ্বস্ত লোকদের মুখে শুনেছি যে, জীবনে নামায-রোযার ধার ধারেনি এমন লোকও কাবাঘরের পরিবেশে কিছু সময় অবস্থান করার পর বিশেষ করে গেলাফে ঘেরা ঘরটি দেখা ও তাওয়াফ করার পর এতোটা প্রভাবিত হয় যে, নিয়মিত নামাযী হয়ে যায়। বিরূপ সামাজিক পরিবেশের শিকার হয়ে যারা মুসলিম চরিত্র থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, তাদের মধ্যে যদি ক্ষীণ মুসলিম চেতনাবোধও অবশিষ্ট থাকে তাহলে তারাও কাবা শরীফ যিয়ারতের পর খাঁটি মুসলিম হবার জযবায় আপ্লুত হয়ে যায়।

মক্কা শহরে ঢুকবার আগেই কাবা শরীফের চারদিকে নির্মিত মসজিদের সুউচ্চ মিনার দেখা গেলো। প্রাণভরে শারকী সাহেবের শেখানো দোয়া পাঠ করতে লাগলাম। দোয়াটির অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! এই ঘরটির সম্মান, বড়ত্ব, মর্যাদা ও মহিমা বাড়িয়ে দাও।" উম্মতে মুহাম্মাদীর সম্মান ও মর্যাদা এ ঘরটিকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠিত। এ ঘরটিকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্যবোধ জন্মে। তাই আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়েই এ ঘরটি তাওয়াফ করা হয়। এ ঘরের দেওয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহকে ভালোবাসার স্বাদ টের পাওয়া যায়। এ ঘরের চৌকাঠ ধরে আল্লাহর দরবারে ধরনা দেবার তৃপ্তি বোধ হয়। এ ঘরের সাথে লাগোয়া কালো পাথরটিকে চুম্বন করে প্রশান্তি বোধ হয়।

আমাদের দেশে নিয়মিত নামায-রোযা করে এমন অনেক সচ্ছল লোকও কাবাঘর যিয়ারতে যাবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অযৌক্তিক অজুহাতে বছরের পর বছর বিলম্ব করে। অথচ কোন কাজ ফরয হবার সাথে সাথেই আদায় করা জরুরি। হজ্জ ফরয হয়েছে এমন অনেক নামাযী লোকও হজ্জে যেতে অনেক বিলম্ব করে। যার ফলে হজ্জ করার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যেতে পারে। রাসূল (স) বলেছেন, যার হজ্জে যাবার সাধ্য থাকা সত্ত্বেও গেলো না, সে ইহুদী হয়ে মরলো না খ্রিস্টান হয়ে মরলো তাতে আল্লাহর কিছুই আসে-যায় না।

মাসজিদুল হারামে পৌছলাম

কাবা শরীফ যিয়ারতে যাবার আর্থিক সাধ্য আমার ছিলো না। যদিও কামনা অবশ্যই ছিলো। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে এতোবড় সৌভাগ্য হয়ে গেলো। এর ফলে আমি ঢাকা পৌছতে পারলাম না বলে দুঃখবোধ তো দূরের কথা, আমার আব্বা-আম্মা ও স্ত্রী-সন্তানদের কথাও ভুলে গেলাম। আমি কেন পৌছতে পারলাম না, আমি কোথায় কী অবস্থায় আছি ইত্যাদি দেশে জানাতে না পারার কারণে যে অস্বস্তি বোধ করার কথা তা টেরও পেলাম না। সত্যি কথা এটাই যে, বাড়ি ও পরিবার-পরিজনের

কথা ওমরাহ শেষ করে জেদ্দা ফিরে যাওয়ার আগে মনেই আসেনি।

আমাদের গাড়ি থেকে বাইতুল্লাহর বিল্ডিং দেখার সাথে সাথে ঐ দোয়া পড়তে থাকলাম, যা মিনার চোখে পড়ার সময় পড়েছিলাম। গাড়ি বাবে মালিক আবদুল আজিজ বরাবর এসে থামলো।

মাওলানা শারকীর শেখানো দোয়া যেখানে যা পড়া দরকার তিনি সাথে থেকেই নিজেও পড়লেন, আমিও পড়তে থাকলাম। মসজিদে ঢুকবার সময়ের দোয়া, কাবা শরীফ চোখে পড়ার সাথে সাথে যা পড়তে হয় তা পড়তে পড়তে একেবারে কাবাঘরের কাছে পৌঁছে গেলাম। ইশার নামাযের আযান শুরু হলো। আযানের পর দু'রাকাআত নামায পড়তে বললেন। ইশার জামাআতের পর তাওয়াফ শুরু করবেন বলে শারকী সাহেব জানালেন। এ সময়ে তিনি তাওয়াফের নিয়মাবলি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন। আমি কানে তাঁর কথা শুনছি, আর অপলক দৃষ্টিতে কাবাঘরের দিকে আবেগাপ্লুত হয়ে চেয়ে রইলাম। কালো গেলাফে ঢাকা চতুষ্কোণ এ ঘরটির এমন প্রচণ্ড আকর্ষণ শক্তি অনুভব করে অভিভূত হলাম।

ওমরাহ করা হলো

ইশার নামায জামাআতে আদায় করার পর মাওলানা আবদুল আযীয শারকীর পরিচালনায় ওমরাহ আদায় করা শুরু হলো। প্রথমে তাওয়াফ এবং পরে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ (দৌড়ানো বা দ্রুত চলা) করা, এ দুটোই ওমরায় করণীয়।

সাধারণত তাওয়াফ ও সাঈ করার জন্য কিছু লোক টাকার বিনিময়ে ওমরাহ ও হজ্জ পালনকারীদের খিদমত করে থাকে। যারা যিয়ারতে আসে তারা তাদের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়। কারণ শুধু বই পড়ে বিধিবিধান পালন করা সহজ নয়। তাদেরকে মুআল্লিম বা শিক্ষক বলা হয়। তারা তাওয়াফের সাত চক্করে লম্বা সাতটি দোয়া ও সাঈতে ৭ বার দৌড়াতে আরও লম্বা সাতটি দোয়া ওমরাহ পালনকারীদেরকে উচ্চারণ করায়।

এ সব দোয়ার কোন ভিত্তি হাদীসে নেই। ওমরাহ ও হজ্জ পালনকারীরা মুআল্লিমদের মুখে শুনে অথবা বই দেখে দেখে এ সব দোয়া পড়তে থাকে। এভাবে তাওয়াফ ও সাঈ প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। যে জযবা ও আবেগ নিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করা উচিত তা এভাবে হয় না। বিশেষকরে মুআল্লিমের সাথে যারা দল বেঁধে তাওয়াফ ও সাঈ করে তাদের সবটুকুই শুষ্ক আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়।

তাওয়াফ ও সাঈ-এর আসল মজা পেতে হলে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সহী জযবায় আল্লাহর ভালোবাসার চেতনা নিয়ে একা একা কাবাঘরের চারপাশে ৭ চক্কর ঘুরতে হবে। তেমনিভাবে সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে দীর্ঘপথ চলতে থাকতে হবে। কুরআন ও হাদীসের দোয়াগুলো থেকে বাছাই করে সাধ্যমতো দোয়া পড়লেই চলবে। মুখে উচ্চারণের চেয়ে অন্তরের অনুভূতি ও আল্লাহর ভালোবাসার চেতনাই আসল।

আল্লাহ প্রেমের জযবা প্রকাশের জন্যই তাওয়াফের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর ঘরের চারপাশে প্রেমিকের মন নিয়েই তাওয়াফ করতে হয়। আল্লাহকে তো আর ধরা যায় না। তাই কাবাঘরের দরজার চৌকাঠ ও দেয়াল ধরে তাঁর দরবারে ধরনা দিতে

হয়। এসব কিছুই আবেগের প্রকাশ। এখানে মুখের চেয়ে মনের কারবারই প্রধান।

সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাঈ করার মধ্যেও আবেগই প্রধান হলেও জযবা ভিন্ন। একটি ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি বহনকারী এ অনুষ্ঠানটিকে উপলব্ধি করতে হলে ঐ ঘটনাটি স্মরণ করা প্রয়োজন।

হযরত ইবরাহীম (আ) নমরূদের আগুন থেকে নিস্তার পাওয়ার পর তাঁর পিতা নমরূদের রাজ-পুরোহিত আযরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে জন্মভূমি ত্যাগ করে হিজরত করেন।

সূরা আস্ সাফফাতের ৪র্থ রুকূতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর হিজরতকালের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি বললেন, "আমি আমার রবের দিকে চললাম। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন।" তখন তিনি এ দোয়াও করলেন, "হে আমার রব! আমাকে একজন নেক সন্তান দান করো।" তখন আল্লাহ বললেন, "আমি তাকে একজন সবরকারী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দান করলাম।"

ইবরাহীম (আ)-এর বয়স তখন ৯০ বছর। তাঁর এ হিজরতকালেই আল্লাহ তাআলা পরম সান্ত্বনার ধন হিসেবে ইসমাঈল নামে এক পুত্র সন্তান দান করলেন। আল্লাহ হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আ) ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে মক্কার বিরান ভূমিতে অবস্থানের নির্দেশ দিলেন। এ নির্দেশ পালন করে তিনি তাঁর রবকে বললেন, "হে আমাদের রব! আমি আমার পরিবারকে তোমার পবিত্র ঘরের কাছে এক অনুর্বর উপত্যকায় এনে আবাদ করলাম, যাতে হে আমাদের রব! এরা নামায কায়েম করতে পারে। তুমি মানুষের মনকে তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দাও। আর তুমি ফলমূল দিয়ে তাদের রিযকের ব্যবস্থা করো, যাতে তারা তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারে।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ৩৭)।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে ধৈর্যের ব্যাপারে অনেক পরীক্ষা করেছেন। জন্মভূমি ত্যাগের পরীক্ষার পর হিজরত পরবর্তী জীবনেও পরীক্ষায় ফেলেছেন। এর একটি পরীক্ষা হলো স্ত্রী হাজেরা (আ) ও শিশুপুত্র ইসমাঈলকে জনমাবনহীন অনুর্বর মক্কায় রেখে অন্যত্র চলে যাবার নির্দেশ। অল্প কিছু খাবার ও পানির যেটুকু সম্বল ছিলো তা স্ত্রীকে দিয়ে তিনি কিছুই না বলে যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন বিবি হাজেরা (আ) বিস্মিত হয়ে পেছন থেকে দৌড়ে এসে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদেরকে এখানে ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন?" ঐ সময় কথা বলা নিষেধ থাকায় তিনি জওয়াব না দিয়ে এগিয়ে চলছেন। স্ত্রী জানেন যে, তাঁর স্বামী নবী। আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া এমন কাজ করতে পারেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি আল্লাহর হুকুমে এভাবে চলে যাচ্ছেন?" তিনি ইশারায় জানালেন যে হ্যাঁ, তা-ই।

আল্লাহর স্নেহের বান্দী হাজেরা নিশ্চিন্ত মনে বললেন, "তাহলে যান। আমার রব আমাকে ধ্বংস করবেন না।" আল্লাহর উপর কি অপরূপ ভরসা! অল্পদিনের মধ্যেই খাবার ও পানীয় ফুরিয়ে গেলো। তাই মায়ের বুকের দুধেরও অভাব দেখা দিলো। ক্ষুধার্থ শিশু দু'পা মাটিতে আছড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। পানির তালাশে মা এদিক-সেদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। নিকটেই সাফা ও মারওয়া পাহাড়। তিনি

একবার দু'বার নয় ৭ বার দু'পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়াদৌড়ি করলেন। কোথাও পানির সন্ধান না পেয়ে একা রেখে আসা শিশুর কাছে হতাশ হয়ে ফিরে আসলেন।

বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, শিশুর পায়ের আঘাত যে জায়গায় পড়ছে, সেখান থেকে ঝরনার বেগে পানি বের হচ্ছে। পানি যাতে ছড়িয়ে না যায় এবং প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায় সে উদ্দেশ্যে তিনি মাটি ও পাথর দিয়ে বাঁধ দিয়ে পানি আটক করতে লাগলেন। এ কাজ করার সময় মুখে উচ্চারণ করলেন 'যম-যম' অর্থাৎ 'থাম-থাম'। আরবী যম-যম শব্দের অর্থ হলো প্রাচুর্য, প্রচুর। প্রচুর পানি উঠতে লাগলো, যা ঘের দিয়ে জমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে মা চেষ্টা করলেন।

বিবি হাজেরার আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও পূর্ণ নির্ভরতা সত্ত্বেও মা হিসেবে শিশুর প্রতি আল্লাহর দেওয়া স্নেহ-মমতায় অস্থির হয়ে দু'পাহাড়ের মাঝখানে যে দৌড়াদৌড়ি করলেন, তা আল্লাহ তাআলার নিকট এতো পছন্দ হয়ে গেলো যে, তিনি তাঁর দাস-দাসীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ ঘটনার স্মরণে ওমরাহ ও হজ্জ করার সময় ৭ বার সাঈ করা বাধ্যতামূলক করে দিলেন।

এ সাঈ করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাহ-বান্দীদেরকে একথাই শিক্ষা দিচ্ছেন যে ঃ

১. আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি করলে ইবরাহীম (আ)-এর মতো মানসিকতার অধিকারী হতে হবে। আল্লাহর নির্দেশে স্ত্রী ও সন্তানকে ত্যাগ করা এবং কলিজার টুকরা ছেলেকেও নিজ হাতে যবেহ করার হিম্মত থাকতে হবে।

২. বিবি হাজেরার মতো আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা থাকতে হবে, তিনি যে ফায়সালাই করেন তাতে অবশ্যই কল্যাণ রয়েছে। তিনি সব সময়ই মেহেরবান। তাঁর নির্দেশ পালন যত কঠিন ও কষ্টদায়কই হোক, তা সন্তুষ্টচিত্তে পালন করতে হবে।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ) ও বিবি হাজেরা (আ) চরম কঠিন পরীক্ষায়ও যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হননি, তেমনি আল্লাহর মুখলিস দাস-দাসীর মর্যাদা পেতে হলে আল্লাহর উপর এ ভরসা রাখতে হবে যে, আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহর নির্দেশ যত কঠোরই মনে হোক, শেষ পর্যন্ত তা কল্যাণকর বলেই প্রমাণিত হবে।

৪. আল্লাহ বিনা পরীক্ষায় কাউকে প্রমোশন দেন না। আরও বড় কথা হলো যে, তিনি প্রমোশনের সুযোগ দেবার জন্যই পরীক্ষায় ফেলে থাকেন।

ইবরাহীম (আ) সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে আল্লাহ তাআলা কুরআনে স্পষ্ট সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

সূরা আল বাকারার ১২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যখন ইবরাহীমকে তাঁর রব কতক বিষয়ে পরীক্ষা নিলেন, তখন তিনি সবটাতেই উত্তীর্ণ হলেন।" তারপর আল্লাহ বললেন, "আমি আপনাকে মানবজাতির নেতা বানাতে চাই।" হযরত ইবরাহীম (আ) এ মহাসাফল্য আল্লাহর পক্ষ থেকে করা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার

কারণেই সম্ভব হয়েছে। হিজরত করে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হননি, স্ত্রী হাজেরা (আ) ও শিশু সন্তান ইসমাঈলকে আল্লাহর নির্দেশে ফেলে যাওয়ার কারণে তাঁরা তো ধ্বংস হনইনি; বরং বিশ্ব-মুসলিমের নিকট স্মরণীয় হয়ে আছেন এবং তাদের স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদেরকে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করতে হয়। পরম স্নেহের দুলাল কিশোর ইসমাঈলকে পিতা ইবরাহীম নিজ হাতে যবেহ করার আদেশ পালন করতে গিয়ে তিনি সন্তান হারাননি এবং যবেহ হতে রাজি হয়ে ইসমাঈল যবীহুল্লাহ উপাধি পেলেন, অথচ যবেহ হতে হলো না। পিতা-পুত্র দু'জনই আল্লাহর আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে মানবজাতির নিকট সর্বোচ্চ আদর্শের প্রতীক হয়ে রইলেন।

আমার ওমরাহ করা সমাপ্ত হলো

মাওলানা আবদুল আযীয শারকীর ন্যায় একজন অভিজ্ঞ ও আল্লাহর মুখলিস বান্দাহ ও আশিকে রাসূলকে উস্তাদ হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ্য হওয়ায় আমার জীবনের পয়লা ওমরাহটি যথাযথ পদ্ধতিতে পালন করতে সক্ষম হওয়ায় যে প্রশান্তি, তৃপ্তি ও স্বাদ উপভোগ করার সুযোগ পেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এরপর যতবারই ওমরাহ ও হজ্জ করেছি শারকী সাহেবের নিষ্ঠাবান ছাত্রের অনুভূতি নিয়েই করেছি। ওমরাহ সমাপ্ত হবার পর গভীর রাতে হোটেল হারামাইনে ফিরে এলাম। মাওলানা শারকীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় করলাম।

১২২.

যমযমের পানি

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ৯৬ ও ৯৭ নম্বর আয়াতে বলেন, "নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম যে ইবাদত-ঘর তৈরি হয় তা ঐ (ঘরই), যা মক্কায় আছে। তাকে বরকত দান করা হয়েছিলো এবং সকল দুনিয়াবাসীর জন্য হেদায়াতের কেন্দ্র বানানো হয়েছিলো। এর মধ্যে 'স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ' রয়েছে ও ইবরাহীমের ইবাদাতের জায়গা রয়েছে।"

কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে এমন অনেক 'স্পষ্ট নিদর্শন' রয়েছে, যা একথা প্রমাণ করে যে, সত্যিই এ ঘরকে আল্লাহ তাআলা নিজের ঘর হিসেবে মনোনীত করে মর্যাদা দান করেছেন। আবরাহা হস্তিবাহিনী নিয়ে যখন এ ঘরটিকে ধ্বংস করতে এসেছিলো, তখন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ এ ঘরকে রক্ষা করেনি। এ ঘরকে কেন্দ্র করে আল্লাহর যত নিদর্শনের কথা তাফসীরে আলোচনা করা হয়েছে, সে সবের মধ্যে যমযমও একটি।

১৯৭১-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৭-এর হজ্জ মৌসুম পর্যন্ত যতবারই সেখানে যাবার সৌভাগ্য হয়েছে, প্রত্যেকবারই কাবা শরীফের পাশে তাওয়াফের জন্য প্রশস্ত চত্বরের লেবেল থেকে ৮/১০ হাত নিচে সিঁড়ি দিয়ে যমযমের কুয়ার কাছে গিয়েছি এবং ওখানে রক্ষিত বালতি দিয়ে পানি তুলে খেয়েছি। কুয়ার পাড় থেকে মাত্র ৫/৬

হাত নিচেই পানি দেখা যায়। কিন্তু ১৯৯৫ সালে যখন গেলাম তখন দেখা গেলো যে, কুয়া ঢেকে দিয়ে সেখান থেকে মেশিনে পানি তুলবার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ওযূ-গোসল করার জন্য ১০/১২টি টেপ লাগানো আছে। এবার শুনে আসলাম যে, তাওয়াফের চত্বর প্রশস্ত করার জন্য সবটুকু জায়গাই চত্বরে শামিল করা হবে। কাবার চত্বরে আর ওযূ-গোসলের সুযোগ থাকবে না।

যমযমের পানির প্রাচুর্য

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দেখেছি যে, ভিস্তিওয়ালারা মসজিদে মশকভর্তি পানি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং যারা যমযমের পানি খেতে চায় তাদের হাতে পানির গ্লাস তুলে দেয় এবং পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু পয়সা নেয়। ১৬ বছর পর ১৯৯৫ সালে যেয়ে দেখলাম যে, বিশাল মসজিদের সর্বত্র যমযমের পানি চমৎকার পাত্রে রাখা আছে এবং কাগজের তৈরি গ্লাস সেখানেই রাখা আছে। টেপ টিপে পানি খেয়ে ব্যবহৃত গ্লাস আলাদাভাবে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশির ভাগ পাত্রের গায়েই লেখা আছে 'ঠাণ্ডা পানি'। কতক পাত্রে আছে নরমাল পানি। যার যে পানি ইচ্ছা খেতে পারে।

কাবাঘরের চারপাশে নির্মিত বিশাল মসজিদের বাইরের প্রশস্ত চত্বরের নিচের দিকে মাটির গভীরে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে দো'তলা পর্যন্ত হাজার হাজার লোক একসাথে ওযূ-গোসল ও পেশাব-পায়খানা করতে পারে এমন বিরাট ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যুৎচালিত সিঁড়িতে উঠা-নামার সুবিধা থাকায় হজ্জের মৌসুমে প্রচণ্ড ভিড়েও বৃদ্ধদের পর্যন্ত কোন অসুবিধা হয় না। সেখানে ওযূ-গোসলের পানি যমযমের কুয়া থেকেই নেওয়া হয়।

যমযমের পানি মক্কা শহরের ঘরে ঘরে পান করা হয়। মসজিদে মসজিদেও যমযমের পানি পান করার সুযোগ রাখা হয়েছে। হজ্জ উপলক্ষে তিন সপ্তাহ মক্কায় যার বাসায় ছিলাম সেখানে যমযমের পানিই সারা দিন-রাত খেয়েছি। বিশ গ্যালনের পাত্রগুলো ভরে পানি এনে রাখা হয়। জেদ্দায় যে কয়মাস ছিলাম সেখানেও মাত্র ৩ রিয়ালে বিশ গ্যালন পানি সরবরাহের দোকান আছে। আমার ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম যে, দোকানের পানি যমযমের বলে নিশ্চিত জানা যায় কিনা। সে বললো যে, এক গ্যালন বিশুদ্ধ পানির বোতলের দাম দু'রিয়াল। ৩ রিয়ালে ২০ গ্যালন পানি দিতে পারে না। মক্কা থেকে ট্রাক ভর্তি করে এনে এখানে সরবরাহ করার খরচ হিসেবেই যা নেয়। যমযমের পানি পান করে অভ্যস্ত যারা, তারা এর বিশেষ ধরনের স্বাদ থেকেই চিনতে পারে। আমিও তাদের একজন। খেয়ে নিশ্চিত হলাম যে, দোকান থেকে আনা পানিতে ভেজাল নেই। ভেজাল দিয়ে পোষাবার কোন উপায় নেই।

সৌদী আরবে পেট্রোলের চেয়ে পানির দাম দ্বিগুণেরও বেশি। এক গ্যালন পানি দু'রিয়াল, আর এক গ্যালন পেট্রোলের দাম এক রিয়ালেরও কম।

মদীনার মসজিদেও মক্কার মতোই যমযম পানির পাত্র সর্বত্র সাজানো আছে। মক্কা থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে মদীনা শরীফেও যমযমের পানির প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। জেদ্দায় মসজিদগুলোতেও পানি পান করার ব্যবস্থা রয়েছে।

সারা দুনিয়া থেকে যারা হজ্জ ও ওমরাহ্ করতে মক্কা শরীফে আসেন, তারা সবাই প্লাস্টিকের ছোট-বড় পাত্রে যমযমের পানি নিয়ে যান। বিভিন্ন আকারের পাত্রভর্তি পানি নিয়ে রাস্তার ফুটপাতে ও ভ্যানে কিশোররা বসে থাকে। গত এপ্রিলে মক্কা থেকে বিদায়ী তাওয়াফ শেষে হোটেলে ফিরে আসার পথে এক ভ্যান বাহকের কাছ থেকে ১০ গ্যালনের দুটো পাত্র ১২ রিয়াল দিয়ে নিলাম ঢাকায় আনার জন্য। আমি বেশ চিন্তিত ছিলাম যে, ওজন সমস্যার কারণে এতো পানি ঢাকায় নিয়ে যেতে পারবো কিনা। মামুন বললো যে, যমযমের পানি ওজনে গণ্য করা হয় না। সত্যি দেখা গেলো, জেদ্দা বিমান বন্দরে অন্যান্য মালের ওজন করলো, কিন্তু পানির পাত্র দুটো আলাদা করে নিয়ে মোটা প্লাস্টিক কভার দিয়ে সীল করে দিলো, যাতে এক ফোঁটা পানিও বের হতে না পারে। কোন কারণে পাত্রের মুখ ঢিলা হয়ে গেলে বা পাত্র ফেটে গেলেও পানি কভার থেকে বাইরে আসবে না। সীল করার খরচ প্রতি পাত্রের জন্য ৫ রিয়াল।

এ মহা সুযোগ থাকায় বড় বড় পাত্র ভর্তি করে হাজীগণ সারা দুনিয়ায় যমযমের পানি নিয়ে যায় এবং এ বরকতময় পানি প্রিয়জনদের মধ্যে বিলি করে।

এ বিবরণ থেকে যমযম পানির প্রাচুর্য সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এটা সত্যিই বিস্ময়কর যে, একটি কুয়া থেকে পাম্প করে রোজ কোটি কোটি গ্যালন পানি তোলা সত্ত্বেও এ পানি ফুরিয়ে যায় না। এভাবে পানি তুলতে থাকলে তো একটা হ্রদও শুকিয়ে যাবার কথা। পৃথিবীতে কি এমন কুয়ার সন্ধান পাওয়া যাবে, যাতে এমন প্রচুর পানি থাকতে পারে? তাই এ বিষয়ে সামান্য সন্দেহও নেই যে, এ কুয়াটি আল্লাহ তাআলার এক অলৌকিক নিদর্শন।

১৯৭৩ সালে মক্কা মিউনিসিপ্যালিটির চীফ ইঞ্জিনিয়ারের সাথে পরিচয় হলো। তিনি পাকিস্তানের নাগরিক এবং ইসলামী আন্দোলনের মযবুত সমর্থক। ছাত্র জীবনেও সক্রিয় ছিলেন। আমি জানতে চাইলাম যে, যমযমের পানির কোন উৎস আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা? মাটির নিচে পানি সরবরাহের কোন উৎস না থাকলে কুয়ার পানি সামান্যও কমে না কেন? কুয়ার পানি এক সময় কমে আবার এক সময় বাড়ে। যমযমের পানি সারা বছর একই অবস্থায় দেখা যায়। আমি যখন তাঁকে এ প্রশ্ন করি তখন কুয়া খোলা থাকতো এবং পানি দেখা যেতো।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন যে, বেশ কয়েক বছর আগে কাবা শরীফ থেকে একটু দূরে কাবার চারপাশে ২০০ ফুট নিচে পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে তালাশ করা হয়েছে। কিন্তু বাইরে থেকে পানি আসার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আরো বললেন যে, যমযমের পানির রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পানির প্রয়োজনীয় উপাদানের অতিরিক্ত এমন কিছু উপাদান আছে, যা খাদ্যাভাব পূরণে সহায়ক। এ কারণেই এ পানি শুধু পানীয়ই নয়; খাদ্যও বটে। শুধু যমযমের পানি খেয়েই মানুষ বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে। সম্ভবত ঐ সব উপাদানের কারণেই এ পানি অনেক দিন পাত্রে থাকলেও তলানি পড়ে না এবং স্বাদ বিনষ্ট হয় না। অন্য কোন পানিতে এ বৈশিষ্ট্য নেই।

যমযমের পানি পানের বিশেষ নিয়ম

রাসূল (স) পানি পান করার আদব শিক্ষা দিয়েছেন। পানি বসে পান করা উচিত। কমপক্ষে তিন ঢোকে পান করা ভালো। একটানা গড়গড় করে পান করা সঠিক নয়। প্রত্যেক ঢোকের আগে বিসমিল্লাহ এবং পরে আলহামদুলিল্লাহ বলা উচিত। কিন্তু যমযমের পানি পান করার জন্য রাসূল (স) বিশেষ আদব শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

১. ওমরাহ করার সময় পেট ভরে এ পানি খেতে হবে। মুনাফিকরা এ পানি বেশি পরিমাণে খেতে পারে না। মুমিন হলে বেশি পান করতে সক্ষম হয়।

২. এ পানি দাঁড়িয়ে পান করা ভালো।

৩. কিবলামুখ হয়ে এ পানি খেতে হবে।

৪. একটি বিশেষ দোয়া পড়ে পানি খেতে হবে। দোয়াটি হলো ঃ

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইলমান নাফিয়ান, রিযকান ওয়াসিআন ওয়া শিফাআন মিন কুল্লি দায়িন।" অর্থাৎ "হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, প্রশস্ত রিযক ও সব রকম রোগের আরোগ্য চাই।" একীনের সাথে রোগমুক্তি কামনা করে এ পানি পান করলে আরোগ্য লাভের সুসংবাদ দিয়েছেন রাসূল (স)।

জেদ্দায় আমার মেহমানদারী

১৯৭১-এর ৩ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে জেদ্দায় পৌছলাম এবং পরদিন ওমরাহ করে মধ্যরাতে জেদ্দা ফিরে এলাম। জেদ্দায় অবস্থানরত পাকিস্তানি দীনী ভাইদের সাথে যোগাযোগ হওয়ার ফলে ৫ তারিখ থেকে আর হোটেলের খানা দায়ে ঠেকে খেতে হলো না। হোটেলের খাদ্য যত উচ্চ মানেরই হোক তাদের পাক করা খাদ্য বাঙালি মুখের দাবি পূরণে অক্ষম। ৫ তারিখ থেকে ৮ তারিখ পর্যন্ত দুবেলা দীনী ভাইদের বাসায়ই যেয়ে খেলাম। শুধু নাস্তা হোটেলে করতে হয়েছে। হোটেলে আমি পিআই-এর (পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্সের) মেহমান ছিলাম। কিন্তু খাওয়ার মেহমানদারীর দায়িত্ব দীনী ভাইয়েরা নিয়ে নিলেন।

পিআইএ'র কান্ট্রি ম্যানেজার আমাকে পাকিস্তানি দূতাবাসে নিয়ে গেলেন। দূতাবাসের থার্ড সেক্রেটারি জনাব এএইচএম নূরুদ্দীন আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তিনি আমাকে পাসপোর্টের জন্য দরখাস্তের ফরম পূরণ করতে দিলেন। তাঁর কাছে জানলাম যে, পাকিস্তান সরকারের নির্দেশক্রমেই দূতাবাস আমার পাসপোর্টের ব্যবস্থা করছে। আমাকে তারা বিমানযোগে কাবুল পাঠাবে এবং সেখান থেকে সড়ক পথে ইসলামাবাদ পৌছানো হবে।

নূরুদ্দীন সাহেব একান্তে আলাপের সময় জানালেন যে, তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারি হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের দ্বিতীয় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার মাসউদ নূরুদ্দীন সাহেবের ছোট জামাতা। আর বাংলাদেশের একমাত্র স্পাইন সার্জন প্রখ্যাত ডাক্তার ইদ্রিস আলী তার বড় জামাতা।

জেদ্দাস্থ পিআইএ'র কান্ট্রি ম্যানেজার ৯ ডিসেম্বর সকালে সড়ক পথে আমাকে মদীনা শরীফ পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন, যাতে জুমআর আগেই পৌঁছা যায়। কিন্তু সৌদী বিমানে কর্মরত পাকিস্তানি ইঞ্জিনিয়ার জনাব মুঈনুদ্দীন আমাকে বিমানযোগে মদীনা নিয়ে যেতে চাইলে ম্যানেজার সাহেব খুশি হয়ে সম্মতি দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, মসজিদে নববীর অতি নিকটে পাকিস্তান সরকারের গেস্ট হাউজে যেয়ে উঠতে হবে।

মদীনায় অনেক বেশি শীত হবে বলে সৌদী আরবে জামায়াতের দায়িত্বশীল জনাব রাও আখতার আমাকে একটা সিঙ্গল কম্বল এবং এটা বহনের জন্য হালকা সুটকেস কিনে দিলেন। আমি রিক্তহস্ত হলেও আল্লাহ অভাব পূরণ করলেন। আমি তো খালি হাতেই ঢাকা ফিরে যাচ্ছিলাম। ঢাকা বিমান বন্দরে পোর্টারকে দেবার জন্য কিছু টাকা ছিলো মাত্র। আমার আর কিছু লাগবে কিনা রাও সাহেব বারবার জিজ্ঞেস করলেন। জওয়াবে বললাম, যা দরকার তা তো আপনিই ব্যবস্থা করলেন।

মদীনা শরীফ

হোটেল হারামাইনের কামরা দখলে রেখেই মদীনা শরীফ রওয়ানা হলাম। ইঞ্জিনিয়ার মুঈনুদ্দীন ভারত থেকে হিজরত করে এসে পাকিস্তানে লেখাপড়া করেছেন। ছাত্র জীবনেই ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হন। তিনি বিমানে আমাকে মদীনা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নিয়ে গেলেন। তিনিই টিকেটের ব্যবস্থা করলেন। পিআই-এর কান্ট্রি ম্যানেজার পাকিস্তান সরকারের মেহমানখানায় থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা মদীনা বিমান-বন্দর থেকে ট্যাক্সিতে হারামে মদীনায় পৌঁছলাম। সরকারি মেহমানখানাটি মসজিদের এতো নিকটে যে, মসজিদ ও এর মাঝখানেই রাস্তা। আমরা মেহমানখানায় পৌঁছলে ওখানকার কেয়ারটেকার আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। গোসল করে জুমআর জন্য প্রস্তুত হবার তাগিদ দিলেন।

মেহমানদেরকে রাসূল (স)-এর মাযার যিয়ারত ও মদীনা শরীফে অন্যান্য করণীয় সমাধা করার জন্য একজন অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল ছিলেন। তিনিই আমাদেরকে জুমআর নামাযে নিয়ে গেলেন এবং নামাযের পর মাযার যিয়ারতের ব্যবস্থা করলেন। ভিড়ের দরুন মোটেই তৃপ্তি হলো না। ইশার নামাযের ঘণ্টাখানিক পর ভিড় কমলে আবার আমাদেরকে মাযার যিয়ারতে নিয়ে গেলেন।

রাসূল (স)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অনুভূতি তো মুমিনের মধ্যে থাকাই স্বাভাবিক। নামাযে তাশাহুদ পড়ার সময় "আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু" পড়ে যার প্রতি সালাম জানানো হয় তাঁর কবরের সামনে হাযির হয়ে সালাম জানানোর সময় প্রচণ্ড আবেগ প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক। আবেগের আতিশয্যে মুখে কিছুই উচ্চারণ করতে পারলাম না। শুধুই ভালোবাসার অশ্রু নিবেদন করতে থাকলাম।

মেহমানখানার গাইড আমাকে যা কিছু উচ্চারণ করা শেখাচ্ছিলেন তিনি আমার হাল-অবস্থা দেখে থেমে গেলেন। মিনিট দশেক পর আমাকে অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থায় দেখে তিনি সালাম পেশ করার জন্য যা যা উচ্চারণ করা প্রয়োজন তা করালেন।

অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে যিয়ারতের কাজ সমাধা করে মেহমানখানায় ফিরে গেলাম।

উক্ত গাইড শেষ রাতে রাওযাতুল জান্নাতে নিয়ে যাবেন বলে প্রস্তুত থাকতে বললেন। পৌনে চারটায় বাবে জিবরীলের সামনে হাযির হলাম। ঠিক চারটায় তাহাজ্জুদের আযান শুরু হবার সাথে সাথে ওখানে অপেক্ষমাণ প্রায় ৫০/৬০ জন লোক দৌড়ে একেবারে সামনের কাতারে পৌঁছার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলেন। বাম দিকে প্রথম দু'কাতারের শেষ মাথায় পৌঁছলে নবী করীম (স)-এর কবরের সবচেয়ে নিকটে হাজির হওয়া যায়। সেখানে পৌঁছার জন্যই প্রতিযোগিতা হয়। এটা হলো কবরের মাথার দিক। রাওযাতুল জান্নাতে যে কোন জায়গায় নামায ও দোয়ার জন্য অবস্থান করলেই চলে। কিন্তু আবেগ তাতে সন্তুষ্ট হয় না বলেই দৌড়াদৌড়ি লেগে যায় কবরের সবচেয়ে নিকটে পৌঁছার জন্য।

দুনিয়ার বুকে ঐ স্থানটুকুই বেহেশতের বাগান। বেহেশতের অভিলাষীদের জন্য এর আকর্ষণ খুবই স্বাভাবিক। সেখানে নামাযের মজাই আলাদা। ওখানে বসে দোয়া করার মধ্যে বিশেষ তৃপ্তি বোধ হয়। তাই মদীনা শরীফে বেশ কয়েকদিন থেকে যাবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগলো। মসজিদের এতো নিকটে থাকা ও খাওয়ার সুবন্দোবস্ত থাকায় এ বাসনা আরও মযবুত হলো।

১০ ডিসেম্বর নাস্তার পর বদর ও ওহুদের ময়দান, এ দু'যুদ্ধে শহীদগণের মাযার যিয়ারত, মসজিদে কুবা ও মসজিদে কিবলাতাইনে নফল নামায আদায় করে যোহরের নামাযের আগেই মেহমানখানায় ফিরে এলাম। ইশার নামাযের পর মেহমানখানায় পৌঁছেই টেলিগ্রাম পেলাম। পিআইএ'র কান্ট্রি ম্যানেজার জানিয়েছেন যে, রাতের মধ্যেই জেদ্দায় ফিরে যেতে হবে এবং আগামীকাল করাচী রওয়ানা হতে হবে। মদীনায় কয়েকদিন থাকার আশা পূরণ হলো না। রাতের ফ্লাইটেই জেদ্দা রওয়ানা হলাম।

মেহমানখানার কাহিনী

মেহমানখানার কেয়ারটেকারের মুখেই এর কিস্‌সা শুনলাম। গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদ মদীনা যিয়ারতে এলেন। তখন সউদ বিন আবদুল আযীয (ইবনে সৌদ নামে পরিচিত) সৌদী আরবের বাদশাহ। যে বাড়িটিতে মেহমানখানা অবস্থিত এটা সৌদী বাদশাহর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাজকীয় মেহমানদেরকে যিয়ারতের জন্য ব্যবহৃত হতো। মসজিদের এতো নিকটে মেহমানখানায় থেকে গভর্নর জেনারেল এতো খুশি হলেন যে, বাদশাহর কাছে এর জন্য শুকরিয়া জানিয়ে মেহমানখানার অনেক প্রশংসা করলেন। কোন জিনিস মেহমানের খুব বেশি পছন্দ হলে, আরবদের নাকি এটাই ঐতিহ্য যে, সে জিনিস মেহমানকে দান করে দেয়। সৌদী বাদশাহ তখন তখনই ঐ দোতলা বাড়িটি গভর্নর জেনারেলকে দান করে দেন। পাকিস্তান সরকার এ বাড়িটি সরকারি মেহমানখানা হিসেবে ব্যবহার করছিলো।

মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজনে বহু আগেই ঐ বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এরপর তা আরও বহুদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হওয়ায় বিরাট বিরাট বিল্ডিংও ভেঙে ফেলতে হয়েছে।

একটি শিশুর হৃদয়বিদারক মৃত্যু

আমার লেখার ধারাবাহিকতার সাথে সম্পর্কহীন একটা করুণ ঘটনা অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটি সবারই হৃদয় স্পর্শ করবে।

ঢাকা শহরের মিরপুরস্থ দারুস সালাম নামে খ্যাত ফুরফুরার পীর সাহেবের মাদরাসার বোখারী শরীফের উস্তাদ হাফেয মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ মুজাদ্দেদী এদেশের শ্রেষ্ঠ আলেমগণের অন্যতম। তিনি জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারি এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর শরীয়া কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান। ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা তাকে অগাধ জ্ঞান দিয়েছেন। মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি (র) ও মাওলানা নূর মুহাম্মদ আযমীর মতো প্রশস্ত ও উদার মনের আলেম হিসেবে তাঁকে আমি অন্তর দিয়ে ভালোবাসি। দীনের বিজয়ের ব্যাপারে তাঁর ইখলাস ও জযবার কারণে আমি তাঁকে দীনী বন্ধু হিসেবে ভালোবাসি।

গত ২ জুলাই সকাল ১০টায় তিনি ফোনে জানালেন, "আমার ৪ বছর বয়সের শিশুপুত্র ওবায়দুল্লাহকে ১ তারিখ বিকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। দোয়া করবেন।" রোজ একবার খবর নিচ্ছিলাম, ছেলে পাওয়া গেলো কিনা। ৪ তারিখে মুফতী সাহেব ফোনে বললেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এ বিষয়ে যদি বলেন, তাহলে ভালো হয়, যাতে পুলিশ বিশেষ তৎপর হয়।" খবর নিয়ে জানলাম, মন্ত্রীমহোদয় পটুয়াখালী গেছেন। ৫ তারিখ দুপুরেও ফিরে আসেননি বলে জানলাম। বিকেলে মন্ত্রণালয় থেকে খবর পেলাম যে, তিনি সংসদে চলে গেছেন। ৬ তারিখে দুপুরে মন্ত্রণালয় থেকে জানতে পারলাম যে, এখনো অফিসে আসেননি।

৬ তারিখ বিকালে মুফতী সাহেব ফোনে জানালেন যে, ছেলের লাশ পাওয়া গেছে, কাছেই এক গ্যারেজে পরিত্যক্ত এক গাড়িতে। মনে হয় সে হয়তো গাড়িতে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে আর খুলতে পারেনি। জিজ্ঞেস করে জানলাম যে, শরীরের কোথাও কোন আঘাত নেই। কয়েক মিনিট পরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমি খোঁজ করছি জেনে ফোন করলেন। তখন মাননীয় মন্ত্রীকে যা বলতে চেয়েছিলাম, এর আর কোন প্রয়োজন বাকি রইলো না।

হৃদয়বিদারক এ দুঃসংবাদটি আমার স্ত্রী, ছেলে ও বৌমাকে দিলে সবার মুখ শিশুটির এমন করুণ মৃত্যুতে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে গেলো। আমাদের দেশে অগণিত শিশুর মৃত্যুর খবর জানা যায়। পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে, গাড়ির নিচে চাপা পড়ে, সন্ত্রাসীর গুলীতে, কারো প্রতিহিংসার শিকার হয়ে শিশুর মৃত্যু হয়। কিন্তু এ নিষ্পাপ ছেলেটি পরম স্নেহপরায়ণ পিতা-মাতার এতো কাছে ৬ দিন পর্যন্ত ধুকে ধুকে, তিলে তিলে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে, কেঁদে কেঁদে এতো কষ্ট পেয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেলো। এভাবে বাপ-মায়ের আদরের শিশুটি দীর্ঘ ৬ দিন এতো কষ্ট পেলো, এ কথা চিন্তা করে আমাদের হৃদয়ে যে বেদনা বোধ করছি, শিশুটির পিতা-মাতার তো কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার কথা। ঈমানদার পিতা-মাতাকে আল্লাহই শুধু সান্ত্বনা দিতে পারেন। তাদেরকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা ও সাধ্য আর কারো নেই।

আমি আমার মহব্বতের দীনী ভাইকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ফোন করলাম। শিশুটির এভাবে মৃত্যুর অবস্থাটা বিবেচনায় আনায় আমি স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে পারছিলাম না। তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমিই তাঁর মনের অবস্থা অনুভব করে আবেগতাড়িত হয়ে গেলাম। সান্ত্বনা দেবার পরিবর্তে তাঁকে কাঁদালাম, আমি কাঁদলাম। তাঁর গভীর বেদনায় এভাবেই আমি শরীক হয়ে কিছুটা সান্ত্বনা বোধ করলাম। আল্লাহপাক শিশুটির পিতা-মাতাকে এ হৃদয়বিদারক শোকে 'সাবরে জামীলে'র তাওফীক দান করুন। আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাহদেরকে বড় বড় পরীক্ষায় ফেলেন। মুফতী সাহেব তেমনি এক পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। তিনি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন বলে আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

১২৩.

জেদ্দার পথে বিমানে

আমি চিন্তা করে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। বিমানে সারাপথে অস্থিরচিত্তে ভাবতে লাগলাম যে, পাক-ভারত যুদ্ধ কি শেষ হয়ে গেলো? যুদ্ধের ফলাফল কী হতে পারে? আগামী দিন বিমান করাচী যাচ্ছে কেমন করে? আমাকে কাবুল হয়ে যেতে হচ্ছে না বলে খুশিই হলাম। কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হয়ে থাকলে বিমান করাচী যাবে কিভাবে?

রাত প্রায় একটার সময় জেদ্দা আল হারামাইন হোটেলে পৌঁছলাম। ফজরের সময়ই ম্যানেজার সাহেবের ফোন এলো। বললেন যে, সকালে ঠিক নয়টায় হোটেল থেকে বের হতে হবে। বিমান সাড়ে দশটায় উড়বে। আমি যুদ্ধের খবর জানতে চাইলাম। সেদিন ১১ ডিসেম্বর। জানা গেলো, যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। জিজ্ঞেস করলাম যে, তাহলে বিমান করাচী যাচ্ছে কেমন করে? বললেন যে, উভয় দেশে অবস্থানরত বিদেশীদের মধ্যে যারা নিজ দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে যাবার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে আজ ১১ ডিসেম্বর তিন ঘণ্টার জন্য যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই ফাঁকে আমাদের বিমান করাচীতে আমাদেরকে নামিয়ে দিয়ে নিরাপত্তার জন্য বিমানটি আবার জেদ্দায় ফিরে আসবে।

এ ব্যবস্থার ফলে আমার পাসপোর্টেরও আর প্রয়োজন হলো না। কাবুল হয়ে ইসলামাবাদ পৌঁছার ঝামেলাও পোহাতে হলো না। যথাসময়ে জেদ্দা বিমান-বন্দর থেকে পিআইএ'র বিমান করাচীর উদ্দেশ্যে উড়লো। বিমানে সারাপথ অস্বস্তিতেই কাটলো। যুদ্ধের অবস্থা কিছুই জানা নেই। ৩ ডিসেম্বর থেকে ১০ তারিখ ইশার নামায পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানের কথা ও যুদ্ধের অবস্থা জানার খেয়াল তেমন মনেই জাগেনি। গত একটা সপ্তাহ অন্য এক দুনিয়ায় ছিলাম। মক্কা ও মদীনার প্রতি গভীর আবেগ মনকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। বিমানে প্রায় চার ঘণ্টা সময় হাজারো দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার জালে আবদ্ধ হয়ে রইলাম। বিকালে করাচী বিমানবন্দরে বিমান অবতরণ করলো।

করাচীতে একদিন

আমার বিমান ঢাকা যেতে পারেনি, জেদ্দা আশ্রয় নিয়েছে, এটুকু খবর পিআইএ সূত্রে করাচী ও লাহোরে জামায়াতের দায়িত্বশীলগণ জানতেন। কিন্তু করাচী ফিরেছি এ খবর না জানার ফলে বিমান বন্দরে আমাকে নেবার জন্য কেউ আসতে পারেনি। তাই ট্যাক্সি নিয়ে করাচী জামায়াত অফিসে পৌঁছলাম। যুদ্ধের অবস্থা জানার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করলাম। যা জানা গেলো তা হতাশাব্যঞ্জক।

ভারতীয় বিমান-বাহিনী ৩ ডিসেম্বর ঢাকা বিমান বন্দরে বোমা হামলা করায় আমার বিমান ঢাকা আসতে পারলো না। এর পরের কোন খবর ১১ ডিসেম্বর করাচী পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত আমার জানা ছিলো না। করাচী থেকে ঢাকা যোগাযোগের কোন সুযোগই ছিলো না।

আমি কোথায় কি অবস্থায় আছি বাড়িতে তা কিছুই জানতে না পেরে আব্বা-আম্মাসহ সবাই যে অত্যন্ত পেরেশান আছে এ চেতনা করাচী পৌঁছার পর আমার মনকে নাড়া দিলো। আফসোস হলো যে, জেদ্দা থেকে ডাকযোগে একটা চিঠি তো অবশ্যই লিখে পাঠাতে পারতাম। ৩ ডিসেম্বর মধ্যরাতে জেদ্দা বিমান বন্দরে পৌঁছার পর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৮ দিনের মধ্যে একবারও চিঠি লেখার কথা কেন মনে জাগলো না তা বিস্ময়কর। মক্কা-মদীনার আকর্ষণ ও আবেগ আমাকে আর সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছিলো।

পাকিস্তানে কোথায় থাকবো

ঢাকা যেতে পারলাম না। আপাতত পশ্চিম-পাকিস্তানেই থাকতে হচ্ছে। কতদিন থাকতে হবে তা অনিশ্চিত। লাহোরে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস। শূরা বা কর্মপরিষদের বৈঠকে আসলে সেখানকার মেহমানখানায় থাকি। তাই সেখানেই চলে যাবো ভাবছি। আমীরে জামায়াতের সাথে পরামর্শ করেই ফায়সালা করতে হবে।

হঠাৎ খেয়াল হলো যে, রাওয়ালপিণ্ডিতে জনাব নূরুল আমীনের পরামর্শ নেওয়া যাক। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বাইরে যে দু'জন বিজয়ী হয়েছেন, তিনি তাদের একজন। অপরজন পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা ত্রিদিব রায়। নূরুল আমীন সাহেবের কথায়ই আমি ২ ডিসেম্বর ঢাকা যাওয়া মুলতবি করি। তা না হলে আমি ২ তারিখেই ঢাকা পৌঁছে যেতাম। নূরুল আমীন সাহেবের সাথে ফোনে কথা বললাম। তিনি আমাকে সরাসরি ইসলামাবাদ যেতে বললেন। জানা গেলো যে, পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের যারা পশ্চিম-পাকিস্তানে আছেন, তাদের জন্য ইসলাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ কথা লাহোরে মাওলানা মওদূদীকে অবহিত করলে তিনি খুশি হলেন এবং ইসলামাবাদ যেতে বললেন।

পরদিন ১২ ডিসেম্বর করাচী থেকে বিমানযোগে ইসলামাবাদ গেলাম। গভর্নমেন্ট হোস্টেলে পৌঁছে জানলাম যে, এক সিটবিশিষ্ট এক কামরা আমার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের নেতা হিসেবে জনাব নূরুল আমীনের চেষ্টায়ই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গেলো।

জনাব নূরুল আমীন একটি সরকারি বাড়িতে ছিলেন। তার দল পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির (পিডিপি) সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মাহমুদ আলীর জন্যও একটি বাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছে। হোস্টেলে যাদেরকে পেলাম তাদের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের সেক্রেটারি জনাব শফীকুল ইসলাম এডভোকেট ও রাজশাহীর মুসলিম লীগ নেতা জসীমউদ্দিন আহমদ, চাঁদপুরের পিডিপি নেতা এডভোকেট দলিলুর রহমান, আওয়ামী মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফেনীর নেতা জনাব আবদুল জব্বার খদ্দর, নেযামে ইসলাম পার্টির নেতা নেত্রকোনার মাওলানা মনযুরুল হক ও চাঁদপুরের মাওলানা আবদুল হক। জামায়াতে ইসলামীর তিনজনকে হোস্টেলে পেলাম, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, পাবনার মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ও রাজশাহীর এডভোকেট আফাজুদ্দীন আহমদ। অন্যান্য দলের আরও কয়েকজন ছিলেন, যাদের নাম ভুলে গেছি।

পিআইএ'র যে বিমানটি ৩ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে করাচী যাওয়ার পথে কলম্বো বিমানবন্দরে অবস্থান করছিলো এবং জেদ্দার পরিবর্তে তেহরান যেয়ে আশ্রয় নিয়েছিলো, ঐ বিমানটিও ১১ তারিখে যুদ্ধবিরতির সুযোগে যাত্রীদেরকে করাচীতে রেখে তেহরান ফিরে যায়। ঐ বিমানে উপরিউক্ত নেতাদের কয়েকজনও ছিলেন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও আমি একই সাথে ২২ নভেম্বর জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে এসেছিলাম। মাওলানা আব্দুস্ সুব্হান ও এডভোকেট আফাজুদ্দীন আমাদের পরে এসেছিলেন। জামায়াতের আমরা চারজনই গভর্নমেন্ট হোস্টেলে ছিলাম। ২/৩ মাস পর মাওলানা আবদুর রহীম করাচীতে চলে যান। সেখানে তিনি বরিশালের জনাব মুহাম্মদ মুসলিমের বাসায় থাকতেন। মুসলিম সাহেব ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি লেদার টেকনোলজির লোক। সরকারি চাকরি করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও দেশে ফিরে আসেননি। তিনি বেশ কয়েক বছর আগে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি দেশে আসলে আমার সাথে অবশ্যই দেখা করেন। আমার সাথেও তার দীর্ঘ ঘনিষ্ঠ পরিচয়। আমার ঘটকালির মাধ্যমেই তার বড় মেয়ের বিয়ে হয়।

পূর্ব-পাকিস্তানের খবর

জেদ্দা থেকে ৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর করাচী পৌছার পর থেকে ঢাকার সঠিক খবরের জন্য হন্যে হয়েও স্পষ্টভাবে জানতে না পেরে অস্থির হয়ে গেলাম। পাকিস্তান রেডিও অস্পষ্ট খবর সরবরাহ করছিলো। বিবিসির ভূমিকা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও সে খবরের উপরই নির্ভর করতে বাধ্য হলাম। ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত যতটুকু খবর করাচীতে জামায়াতের দায়িত্বশীলদের কাছ থেকে জানতে পারলাম তাতে জানা গেলো যে, ৩ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় সামরিক ও বিমান-বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় সরাসরি যুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। এতোদিন তারা পেছনে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করছিলো। তারা বুঝতে পারলো যে, পাকিস্তান

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নেপথ্যে থেকে মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এতে যে দীর্ঘ বিলম্ব হবে তার ব্যয়ভার বহন করা ভারত সরকারের জন্য বিরাট বোঝা। তাই পূর্ব-পাকিস্তানকে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে 'মহান উদ্দেশ্যে' ভারত সরকার ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে, তা অল্প সময়ে সফল করতে হলে সরাসরি প্রকাশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

জানতে পারলাম যে, ৬ ও ৭ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান-বাহিনী গভর্নর হাউজে বোমাবর্ষণ করে। আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি গভর্নর ও মন্ত্রীদেরকে ঐ সময়কার হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে (বর্তমানে যেখানে হোটেল শেরাটন অবস্থিত) নিয়ে আশ্রয় দিয়েছে। ভারতের সেনাপ্রধান মানেক শ-এর পক্ষ থেকে পূর্বাঞ্চল কমান্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিখ জেনারেল আরোরা রেডিও, টিভি ছাড়াও বিমান থেকে বিজ্ঞাপন ছিটিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাচ্ছে। সেনাবাহিনী স্থলযুদ্ধ মুকাবিলা করতে পারে। কিন্তু ভারতীয় বিমান-বাহিনীর মুকাবিলায় পাকিস্তান বিমান-বাহিনী ময়দানে না থাকায় পাক বাহিনী সীমান্ত এলাকা থেকে ঢাকার দিকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা

আইয়ূব খানের প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে আমরা জানতাম যে, তাঁর নেতৃত্বে সশস্ত্র বাহিনীসমূহের দায়িত্বশীলগণ বিশ্বাস করতেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানকে ভারতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পূর্ব-পাকিস্তানে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তারা এ ধারণায় ছিলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তান সাড়ে তিন দিক থেকে ভারত দ্বারা ঘেরাও থাকার কারণে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতের বিরাট সামরিক শক্তিকে প্রতিহত করা অসম্ভব। তাই ভারত যদি কোন সময় পূর্ব-পাকিস্তান দখলের উদ্দেশ্যে হামলা করে তাহলে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে দিল্লি আক্রমণের মাধ্যমেই তা প্রতিরোধ করতে হবে। তাদের এ ভ্রান্ত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দলই দাবি করে এসেছে যে, পূর্ব-পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার দিক দিয়েও স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। আইয়ূব খাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লীগ ও আইয়ূব সরকার এ কথায় মোটেই কান দেয়নি। আইয়ূব খাঁর স্বৈরশাসন ১০ বছর দীর্ঘ ছিলো। এ সময় পূর্ব-পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অগ্রসর করার জন্য যা কিছু করেছেন, প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে কিছুই করলেন না।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে যখন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী, পূর্ব-পাকিস্তান দখলের জন্য প্রকাশ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তখন পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে দিল্লী আক্রমণ করা হলো না কেন? ইয়াহইয়া খান ১৯৭০-এর নির্বাচনের পর ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করে নির্বাচনী ফলাফলকে নস্যাৎ করে দিলেন এবং সামরিক শক্তির অপপ্রয়োগ করে জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলেন। পাকিস্তানের চিরদুশমন ভারত মহাসুযোগ পেয়ে গেলো। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করার ফলে ইয়াহইয়া খান দিল্লি আক্রমণ করার নৈতিক

ও রাজনৈতিক ভিত্তিই ধ্বংস করে দিলেন। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলে ভারত পূর্ব-পাকিস্তানে হামলা করার সুযোগই পেতো না। এমন সুযোগ ছাড়া হামলা করলে দিল্লি আক্রমণের হিম্মত করা সম্ভব হতো।

১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর

৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর করাচী থেকে ইসলামাবাদ পৌছার পর থেকে রাতদিন কেবল বিবিসি'র খবরের অপেক্ষায় থাকতাম। খবর আসতে থাকলো যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বিমান-বাহিনীর যৌথ আক্রমণে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বিভিন্ন জেলা থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে ঢাকা সেনানিবাসে সমবেত হচ্ছে এবং মুক্তিবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের প্রকাশ্য সহযোগী হওয়ায় আমেরিকা ও চীনের কূটনৈতিক সমর্থন পাকিস্তানের পক্ষেই ছিলো। পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এ গুজব ব্যাপক ছিলো যে, আমেরিকার ৭ম নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের দিকে এগিয়ে আসছে। এর কোন ভিত্তি ছিলো না। এটা নিছক সান্ত্বনা লাভের ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

ঐ সময় জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলছিলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করে জাতিসংঘে ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। ভুট্টো সাহেব জাঁদরেল বক্তা। জাতিসংঘের অধিবেশনে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে কঠোর বক্তব্য রাখলেন। তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ, বিশেষ করে রুশবিরোধী দেশসমূহ পাকিস্তানের পক্ষে এবং ভারতের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালনে এগিয়ে এলো। এ পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পোলান্ড এক আপস প্রস্তাব উত্থাপন করে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির উপর গুরুত্ব দিলো। ঐ পরিস্থিতিতে এ প্রস্তাবে ভারতের পক্ষে সম্মত হওয়া মোটেই স্বাভাবিক ছিলো না। এ প্রস্তাব পাকিস্তানের জন্য তেমন সম্মানজনক না হলেও ভারতীয় বাহিনীর নিকট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মতো অপমান থেকে রক্ষা পাওয়া যেতো। পোলান্ড প্রস্তাব করেছিলো যে, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি হোক। জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া হোক এবং পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করা হোক।

ভুট্টো মহাবীরের ভূমিকায় অভিনয় করে জাতিসংঘের অধিবেশনে বিশ্বের সকল দেশের প্রতিনিধিদের সামনে উক্ত প্রস্তাবের কাগজ ছিঁড়ে ফেলে ঘোষণা করেন যে, আমরা হাজার বছর লড়বো, তবুও পরাজয় স্বীকার করবো না। এ প্রস্তাব সম্পর্কে ভারতের কোন মন্তব্য করার প্রয়োজন রইলো না। পূর্ব-পাকিস্তানে যুদ্ধের প্রকৃত অবস্থা ভুট্টোর অজানা থাকার কথা নয়। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যেখানে তখন যুদ্ধ না করে সবখান থেকে পিছিয়ে আসছে। তাই পোলান্ডের প্রস্তাবকে বীরত্বের সাথে নাচক করা রীতিমতো নাটকীয় অভিনয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ নিশ্চিত করে ভুট্টো পাকিস্তানের কোন্ কল্যাণ বয়ে

আনলেন? হয়তো ভুট্টোর পাকিস্তানের বাদশাহ হবার বাসনা পূরণকে ত্বরান্বিত করার জন্যই এ ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন মনে করলেন। উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হলে ভুট্টোর পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন হতে কয়েক মাস বিলম্ব হয়ে যেতো।

আমরা ইসলামাবাদে চরম সংবাদের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুনে চলেছি। ভারতীয় বাহিনীর হাতে ঢাকার পতন নিশ্চিত মনে হতে লাগলো। আমরা আশঙ্কা বোধ করছিলাম যে, সশস্ত্র মুক্তিবাহিনী ঢাকায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাবে, আইন-শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে, গণ-লুটতরাজ চলবে এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চরমভাবে নির্যাতিত হবে। ভারতীয় বাহিনীর পক্ষে আইন-শৃঙ্খলা বহাল করতে বেশ সময় লেগে যাবে।

১৬ ডিসেম্বর

মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে সক্ষম হয়েছে, বিশ্বকে এ ধারণা দেবার যদি ইন্দিরা গান্ধীর সিদ্ধান্ত থাকতো তাহলে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীর নিকট পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণের ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উপ-মহাদেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম এ গৌরব অর্জন করতে চাইলেন যে, প্রায় একলাখ মুসলিম বাহিনী ভারতীয় হিন্দু ও শিখ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে।

ঢাকার বিখ্যাত রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জে. আরোরা নামক শিখ জেনারেলের নিকট পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলের অধিনায়ক লে. জে. আমীর মুহাম্মদ খান নিয়াযীকে আত্মসমর্পণ করিয়ে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করা হলো। এর মাধ্যমে ইন্দিরা গান্ধী এ কথাই প্রমাণ করতে চাইলেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করেনি, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীই পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে পূর্ব-পাকিস্তানকে জয় করে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জনগণকে উপহার দিলেন।

ভারতীয় পার্লামেন্টে ইন্দিরা গান্ধীর বিজয় ভাষণ

ইসলামাবাদ হোস্টেলে থাকাকালে আমি অল ইন্ডিয়া রেডিও-র খবরও শুনতাম। তাতে ঘোষণা ছিলো যে, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে অমুক সময় যে ভাষণ দেবেন তা সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

আমি বিশেষ গুরুত্বের সাথে ঐ ভাষণ শুনলাম। প্রতিবেশী দুশমন রাষ্ট্রকে জয় করার মহা আনন্দ প্রকাশ তো খুবই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু তাঁর ভাষণের একটি বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে বলে আমার মনে হলো। তাঁর ভাষণের ঐ অংশটুকু তাঁরই ভাষায় উল্লেখ করছি। "To day Two Nation theory is drowned in the Bay of Bangal" (আজ বঙ্গোপসাগরে দ্বিজাতি তত্ত্বকে ডুবিয়ে দেওয়া হলো)।

তিনি পরম তৃপ্তির সাথে এ ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন, "যে টু নেশন থিওরীর ভিত্তিতে তাঁদের ভারত মাতাকে ১৯৪৭ সালে বিভক্ত করা হয়েছিলো ঐ থিওরী বাংলাদেশের জনগণই পরিত্যাগ করেছে। মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে

কোন রাষ্ট্র টিকতে পারে না। তাই ভারতকে একটি ভ্রান্ত থিওরীর ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয়েছিলো, যা সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হলো।"

ইন্দিরা গান্ধীর ঐ বক্তব্যের জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি যা সঠিক মনে করেছেন তা-ই বলেছেন। কিন্তু অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় যে, আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ইন্দিরা গান্ধীর ঐ বক্তব্য জোরেশোরে প্রচার করেন। তাদের কি এ সহজ কথাটি বুঝারও যোগ্যতা নেই যে, ১৯৪৭-এ যদি ভারত বিভক্ত না হতো তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির জন্মলাভই সম্ভব হতো না। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যদি মুসলিম জাতি মেনে নিতো তাহলে বর্তমান বাংলাদেশ অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রের একটি প্রদেশও (বা অঙ্গরাজ্য) হতো না, বেঙ্গল প্রদেশের অংশে পরিণত হতো।

আওয়ামী লীগের আদর্শিক অধঃপতন

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান কায়েম হলে স্বাভাবিক কারণেই মুসলিম লীগ ক্ষমতাসীন হয়। পূর্বাঞ্চল প্রাদেশিক সরকার পরিচালকের অগণতান্ত্রিক আচরণের দরুন গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী একটি বিরোধী রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য যারা উদ্যোগ নেন, তারা সবাই পাকিস্তান আন্দোলনে নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা দলের নামকরণ করেন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'। 'আওয়াম' শব্দটি আরবী। এর বাংলা হলো জনগণ। তাদের বক্তব্য ছিলো যে, মুসলামানদের একমাত্র জনপ্রিয় মুসলিম লীগ দলটির নেতৃত্ব খাজা, নওয়াব ও তাদের দোসরদের হাতে থাকায় তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই জনগণের পক্ষ থেকে মুসলিম লীগের নেতৃত্ব দেবার জন্যই আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম।

এ দলের প্রথম সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন এবং জনাব মাহমুদ আলী প্রাদেশিক সেক্রেটারি ছিলেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সেক্রেটারি ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ব-বঙ্গের প্রধান সংগঠক বিপ্লবী ইসলামী যুবনেতা শামসুল হক। জনাব তাজুদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলামের মতো ছাত্ররা ঐ শামসুল হকের নেতৃত্বেরই আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। আমিও তাঁরই একজন ছাত্রকর্মী ছিলাম।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী ও মাওলানা আতহার আলীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয় ও মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হয়। প্রথমে শেরে বাংলার নেতৃত্বে প্রাদেশিক সরকার কায়েম হয়। পরে যুক্তফ্রন্ট থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদে ৭২ জন অমুসলিম সদস্যদের হাতে ব্যালেন্স অব পাওয়ার এসে যায়। আওয়ামী মুসলিম লীগ অমুসলিমদের সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় যেতে চাইলে তারা তিনটি শর্ত আরোপ করে ঃ

১. দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে দলকে অসাম্প্রদায়িক করতে হবে।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে দলের আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

৩. পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিকে দলের নির্বাচনী নীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

মাওলানা ভাসানীর মতো নেতাও বামপন্থিদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে গেলেন এবং তাঁরই সভাপতিত্বে ১৯৫৫ সালে টাঙ্গাইল জেলার কাগমারী নামক স্থানে সম্মেলন করে ঐ তিনটি শর্ত মেনে নিলেন। ক্ষমতার লোভে যারা এমন নির্লজ্জভাবে আদর্শ ত্যাগ করতে পারেন তাঁরা ক্ষমতার স্বার্থে দেশকে সকল দিক দিয়েই বিপন্ন করার যোগ্যতাও রাখেন।

১৯৭১ সালে ইয়াহইয়া-ভুট্টোর ষড়যন্ত্রের দরুন যে সঙ্কট সৃষ্টি হলো, তখন আওয়ামী লীগ যদি শুধু জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের দোহাই দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতো তাহলে মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হতাম। সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের কোন প্রয়োজন ছিলো না। এ সব শ্লোগান না থাকলে ইসলামপন্থিরাও শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করে স্বাধীনতার ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিতো। তখন প্রাদেশিক সরকার শেখ মুজিবের নির্দেশেই চলছিলো। ৭১-এর মার্চের প্রথম দিকে ইয়াহইয়ার সামরিক শক্তি এমন ছিলো না যে, স্বাধীনতার ঘোষণা রোধ করতে পারে। শেখ মুজিব স্বাধীনতা চাননি বলেই ঘোষণা দেননি। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের আদর্শিক অধঃপতন এখন আরো নিম্নগামী।

১২৪.

১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করায় ঐ দিনটি স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের বিজয় দিবস হিসেবে ইতিহাসে স্থান পেলো। বিভিন্ন কারণে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি তারাও এ দিনটিকে 'বিজয় দিবস' হিসেবে পালন করে। বাংলাদেশী জনগণের জন্য এ দিনটি আনন্দের ও গর্বের দিবস হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আছে।

আওয়ামী লীগ ও বাম-দলগুলোর অতি উৎসাহীরা স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য হিসেবে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' ও 'সমাজতন্ত্র' নির্ধারণ করায় এ দুটো সুস্পষ্ট ইসলামী বিরোধী মতবাদকে যারা সমর্থন করতে পারে না তারা মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়নি। ভারত সরকারের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণামে দিল্লীর আধিপত্যের আশঙ্কায় ইসলামপন্থি ছাড়াও অন্য যারা অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিলো তারাও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পর থেকে কোন ভারত সরকারই সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করেনি। ভারত বিভাগকে তারা কখনো মেনে নিতে পারেনি। যারা ধারণা করেছিলো যে, স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে ভারত বন্ধুর

মতো আচরণ করবে তারাও গত ৩১ বছরে হতাশ হয়েছে। এ কারণেই এ দেশবাসী ভারতকে বন্ধু হিসেবে গণ্য করে না।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, আওয়ামী লীগ ভারতকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে এখানো প্রকাশ্যে স্বীকার করে। অথচ জনগণ এ কথা বিশ্বাস করে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা কোন সময় বিপন্ন হলে ভারতের দ্বারাই হবে। জনগণ দেখতে পাচ্ছে যে, যেসব মহল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি, তারাই বাংলাদেশকে ভারতের আধিপত্য থেকে রক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ও সোচ্চার। ভারতের আগ্রাসন থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার হেফাযতের জন্য তারাই জীবন দিতে প্রস্তুত।

১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে জনগণ আওয়ামী লীগ রচিত শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে উৎখাত করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ ঐ কুফরী মতবাদকে নির্লজ্জের মতো আঁকড়ে ধরে আছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নামে যারা বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে 'বিসমিল্লাহ' উৎখাতের দাবি জানাচ্ছে, এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পর্যন্ত বিপন্ন করার হুমকি দিচ্ছে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায়ই যে তারা এতো বড় ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে, তা সচেতন দেশবাসীর নিকট সুস্পষ্ট।

আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষের একটি রাজনৈতিক ভুলের কারণে ৯৬ সালে এ দলটি ক্ষমতাসীন হয়ে জনগণের নিকট ইসলামের দুশমন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। আর গত নির্বাচনের পরে বিদেশে বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকা পালন করে এ দলটি জনগণের নিকট কতটা ঘৃণিত হচ্ছে তা ভবিষ্যতে টের পাবে।

১৬ ডিসেম্বর আমার অনুভূতি

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর ইয়াহইয়া খানের ভ্রান্ত নীতি, ভুট্টোর ক্ষমতা লিপ্সা, ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেটের মাধ্যমে নাকচ করার অপচেষ্টা, ৭১-এর ২৫ মার্চ থেকে জনগণের সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আচরণে ৬ সেপ্টেম্বরে এক সুধী সমাবেশে আমি পাকিস্তানের অখণ্ডতা সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করি। ইতঃপূর্বে ঐ সমাবেশ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

তাই বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বাধীন পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে আমি নিশ্চিত ছিলাম। ডিসেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত ফায়সালা হয়ে যাবে তা ধারণা করিনি বলে মনের দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলাম না। মুক্তিযুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হলে অনেক লোক ক্ষয় তো হতোই, দেশে উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ থাকায় দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়তো।

একটি বিষয়ে আমি অত্যন্ত পেরেশানী বোধ করলাম। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করার কারণে কার্যত দেশে কোন সরকারই ছিলো না। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে রাজধানীতেও দ্রুত আইন-শৃঙ্খলা বহাল করা কিছুতেই সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় ঢাকা শহরেও কট্টর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ও সমাজতন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালাতে পারে। ঢাকার বাইরে সারাদেশে তো

তাদের আরও দাপট চলবে। এ অরাজক পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলনের সক্রিয় সবাই তাদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়বে। তাই আল্লাহর দরবারে কাতরভাবে ধরনা দিতে থাকলাম, যাতে তিনি তাঁর দীনের খাদিমদেরকে হেফাযত করেন।

যে কোন আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি কোন বিপর্যয়ের পরও বেঁচে থাকে তাহলে তাদের প্রচেষ্টায় আবার আন্দোলন গড়ে তোলা যায়। ১৮৩১ সালে বালাকোটের ময়দানে মুজাহিদ আন্দোলনের প্রধান দুই নেতা সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী ও মাওলানা ইসমাইলসহ প্রথম কাতারের সবাই শহীদ হয়ে যাওয়ায় ঐ আন্দোলন অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়নি। তাই যে কোন আন্দোলনের অস্তিত্ব নেতৃস্থানীয়দের উপরই নির্ভর করে। এ কারণেই আমি এতো পেরেশান হলাম। এ অনুভূতি নিয়ে আমি ভেতরের কামরায় একটানা কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়ায় নিবিষ্ট হয়ে গেলাম। কেউ দেখা করতে এসে দরজায় নক করলে আমি বের হয়ে কাউকে বসতে না দিয়েই দু'এক কথা বলে বিদায় করে দিতাম।

বিখ্যাত মাসিক উর্দু ডাইজেস্টের এডিটর জনাব আলতাফ হোসাইন কুরাইশী এলেন। তাঁকে বসতে দিতে বাধ্য হলাম। তিনি আমার প্রতিক্রিয়া জানতে এসেছিলেন। বললাম, "উপমহাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম হিন্দু ও শিখ বাহিনীর নিকট প্রায় এক লাখ সশস্ত্র বাহিনী আত্মসমর্পণ করলো। হাজার বছরের ইতিহাসে এতো বড় ঘটনা কখনো ঘটেনি। ইংরেজ আমলেও (১৮৩১) মুজাহিদ বাহিনী শিখদের নিকট আত্মসমর্পণ করেনি। তারা শহীদ হয়েছেন। ইয়াহইয়া-ভুট্টো ষড়যন্ত্র করে পূর্ব-পাকিস্তানের উপর মুক্তিযুদ্ধ চাপিয়ে দিলেন এবং বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দিয়ে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিলেন। সেনাবাহিনী এমন চরিত্রের পরিচয় দিতে পারেনি, যাতে জনগণের মন জয় করা যায় এবং আল্লাহর সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়। সেনাবাহিনীর উপর এটা অবশ্যই আল্লাহর গযব। পাকিস্তান ভেঙে যাবার জন্য ইয়াহইয়া-ভুট্টোই প্রধানত দায়ী। ৭০-এর নির্বাচনে বিজয়ী পূর্ব-পাকিস্তানের অবিসংবাদিত জননেতা স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাক বাহিনীর হাতে ধরা দিতেন না। টু মেজরিটি পার্টির অগণতান্ত্রিক প্রবক্তা মি. ভুট্টোই ক্ষমতার নেশায় ইয়াহইয়ার সাথে ষড়যন্ত্র করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম রাষ্ট্রটিকে বিভক্ত করলেন।"

দেশের খবর না পাওয়ার অস্থিরতা

রাজধানী ঢাকার কোন খবরও বিবিসি ছাড়া অন্য কোন সোর্সে জানার উপায় ছিলো না। জানা গেলো, ঢাকাসহ সারাদেশে আনন্দ-উল্লাসের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সকল র‍্যাংকের কর্মকর্তাসহ ৯৩ হাজার সৈনিক ক্যান্টনমেন্টে বন্দি অবস্থায় আছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্র এবং সচিবালয়সহ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে পাহারারত আছে। মুক্তিযোদ্ধারা যাদেরকে তাদের বিরোধী মনে করছে তাদেরকে তালাশ করে করে হত্যা করছে।

এ খবরে তো উদ্বিগ্ন হওয়ারই কথা। আমি এটাকে অস্বাভাবিকও মনে করিনি। আইন-শৃঙ্খলা বহাল না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় ঘটনা চলতে থাকার আশঙ্কাই বোধ করছিলাম।

১৮ ডিসেম্বর পূর্ব-পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগের সেক্রেটারি, আমার আপন চাচা জনাব শফীকুল ইসলাম আমাকে জানালেন যে, ইসলামাবাদে ব্রিটিশ হাইকমিশনের সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন। ঢাকাস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনের মাধ্যমে তাঁর ও আমার পরিবারের খোঁজ-খবর নেবার জন্য তাকে অনুরোধ করলে তিনি তা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। দু'দিন পরই খবর পাওয়া গেলো যে, তারা বাড়ি থেকে অন্যত্র নিরাপদেই আছে। খবরের বিবরণ থেকে বুঝা গেলো যে, সঠিক খবরই যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছে।

ঢাকার মগবাজারে আমাদের উভয়ের বাড়ি প্রায় পাশাপাশিই। আশে পাশে যাদের বাড়ি আছে তাদের কাছ থেকেই খবর নিয়েছে। আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি, আব্বা, আম্মা, স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য তেমন কোন পেরেশানী বোধ করিনি। আমার ধারণা ছিলো যে, আমি ঢাকায় না থাকায় হয়তো বাড়িতে তারা যাবে না। আর গেলেও মহল্লাবাসীরা ভালো ভূমিকাই পালন করবে। কারণ মহল্লাবাসীরা জানে যে, আমি সেনাবাহিনীর অন্যায় আচরণ থেকে সব ধরনের মানুষকেই রক্ষা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। যাহোক, পরিবারের সবাই নিরাপদে আছে জেনে আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। আমার চাচা নিজের উদ্যোগেই এ চেষ্টা করায় তাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আমার মগজে এ জাতীয় ভাবনা আসেনি।

ইয়াহইয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ

জনাব নূরুল আমীন সাহেবের উদ্যোগে ইসলামাবাদে অবস্থানরত পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের ইয়াহইয়া খানের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। পিডিবি'র মহাসচিব জনাব মাহমুদ আলীর নেতৃত্বে আমরা ১২/১৩ জন ডেলিগেশনে ছিলাম। আমাদের মুখপাত্র হিসেবে মাহমুদ আলী সাহেব কথা বললেন। পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় আমরা যারা পশ্চিম-পাকিস্তানে আটকা পড়লাম তাদের ব্যাপারে সরকারের চিন্তাভাবনা কী তা জানাই উদ্দেশ্য ছিলো। ইয়াহইয়া বললেন, "আপনারা ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে আছেন। আপাতত আর কোন করণীয় নেই। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। শীগগীরই ভুট্টো সাহেব জাতিসংঘের অধিবেশন থেকে ফিরে এসে ক্ষমতাসীন হবেন। তাঁর সরকারই আপনাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে।

বুঝা গেলো যে, তিনি প্রেসিডেন্ট থাকার যে লোভে ভুট্টোর সাথে আঁতাত করে শেখ মুজিবের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে ব্যর্থ হলেন, পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার পর জনগণের মধ্যে যে চরম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তাতে অবিলম্বে গদি ছেড়ে 'কেঁদে বাঁচা' ছাড়া তার কোন উপায় নেই। কিছু বলার জন্য নিশপিশ বোধ করছিলাম। যত কথা মনে কিলবিল করছিলো সব তো বলতে পারলাম না।

সাথী সবাই নাস্তা করছেন। আমি শুধু এটুকু বললাম, "Mr. Bhutto has scuceded in his bid to capture power and you are destined to preside over the disinlegration of Pakistan" (মি. ভুট্টো তার ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় সফল

হলেন। আর আপনার নেতৃত্বে পাকিস্তান বিভক্ত হওয়াই আপনার ভাগ্যে লেখা ছিলো।) আমার পাশে বসা জনাব আবদুল জাব্বার খদ্দর আমার হাত চেপে ধরে কানে কানে বললেন যে, এ সব বলে লাভ নেই। উপস্থিত আর সবাই যেন হতবাক হয়ে একবার ইয়াহইয়া খানের দিকে ও একবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন। একেবারে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিলো। পরিবেশটাই যেন বিব্রতকর হয়ে গেলো। ইয়াহইয়া খান কিছুই বললেন না। তার এডিসি বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন এবং ইয়াহইয়া খান 'থ্যাংক ইউ' বলে চলে গেলেন। আমাদের ডেলিগেশনের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। কারো কারো চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেলেও মুখ খুলে কিছু বললেন না। বেশির ভাগ লোকই মনের ঝাল সামান্য মিটলো বলে হয়তো বোধ করলেন।

পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও পূর্ব-পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংবাদে জনগণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান রেডিও টেলিভিশন ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে জনগণকে সঠিক খবর পরিবেশন না করায় হঠাৎ করে ভারতের সেনাবাহিনীর ঢাকা বিজয়ের খবরে তারা একদিকে চরম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ বের হয়। তারা ইয়াহইয়া খানের বিরুদ্ধে শ্লোগান দেয়। 'হায় পূর্ব-পাকিস্তান' বলে বিলাপ করে কাঁদতে থাকে। পেশোয়ারে ইয়াহইয়া খানের বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

এ প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি পাঞ্জাবে হয়। সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবের লোকসংখ্যাই বেশি। পশ্চিম-পাকিস্তানের ৪ টি প্রদেশের মধ্যে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি পাঞ্জাবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের অপমান বোধ পাঞ্জাবের জনগণের মধ্যেই বেশি হওয়া স্বাভাবিক। তখনো দেশে সামরিক শাসন চলছে। তবুও জনগণের তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শনে সরকার কোনরূপ বিধি-নিষেধ আরোপ করতে সাহস পায়নি।

সশস্ত্র বাহিনীতে প্রতিক্রিয়া সম্বলিত একটি বই

১৬ ডিসেম্বরে আমি ইসলামাবাদে ছিলাম বলে জনগণের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে তা সরাসরি দেখার সুযোগ পেয়েছি। পত্রিকা থেকেও তা স্পষ্ট বুঝা গেছে। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীতে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া বাইরে থেকে টের পাওয়ার কথা নয়।

সেদিন (১৮ জুলাই, ২০০৩) আমার বড় ছেলে মামূন আমাকে এমন একটি বই দিলো, যাতে ৭১ সালের এতো বিস্তারিত তথ্য রয়েছে, যা আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। এ বইটি থেকেই সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিক্রিয়া জানা গেলো। বইটির লেখক ব্রিগেডিয়ার জাফর ইকবাল চৌধুরী। তিনি ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ৭০ সালের মার্চ পর্যন্ত কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে ছিলেন। এক বছর নোয়াখালী জেলার মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন।

৩৬০ পৃষ্ঠার উর্দু ভাষায় লেখা বইটির নামের বাংলা অনুবাদ 'স্মৃতির ধুনানি'। তুলা

যেমন ধুনকর ধুনানি করে খণ্ডে খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করে, তেমনি লেখক তাঁর স্মৃতি ধুনানি করেছেন বলে এ শিরোনামে ইঙ্গিত দিলেন। তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে জানিয়েছেন যে, ছাত্র জীবনে পাকিস্তান আন্দোলনে ছাত্রনেতার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই বইটিতে পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সালে ভুট্টোর পতন ও পরবর্তীতে তাঁর ফাঁসি পর্যন্ত বহু তথ্য তুলে ধরেছেন।

বইটির প্রচ্ছদে বর্তমান পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মানচিত্র বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিয়েছেন। মানচিত্রের উপরে পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবাল ও পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদে আযম জিন্নাহর ফটো রয়েছে। পাকিস্তানের মানচিত্রের ভেতরে প্রথম প্রধানমন্ত্রী নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খান, মাওলানা মওদূদী, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও জেনারেল জিয়াউল হকের ছবি, আর বাংলাদেশের মানচিত্রের ভেতরে শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের ফটো শোভা পাচ্ছে।

এ মূল্যবান ও তথ্যবহুল বইটি ২০০০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ২০০১ সালে প্রকাশিত ২য় সংস্করণের একটি কপিই আমার কাছে পৌঁছেছে। বইটিতে ৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেলো। পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এর জনগণের প্রতি তাঁর গভীর দরদ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়। তাই ইয়াহইয়া খানের ভ্রান্তনীতি ও সেনাবাহিনীর আচরণের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

আমার বড় ছেলে মামূন গত জুন মাসে (২০০৩) সরকারি সফরে পাকিস্তান গিয়েছিলো। লাহোরে বইটির লেখকের সাথে পরিচয় হয়। লেখক বইটিতে মামূনের নাম লিখে তাকে উপহার দেন। তিনি আমাকে সালাম পৌঁছাতে বলেন। জুলাই মাসের মাঝামাঝি সে ভারত সফরে আসে। দিল্লি থেকে ১৭ তারিখ বিকালে ঢাকা এসে ১৯ তারিখ সকালে কোলকাতা চলে যায়। উক্ত বইটি সে আমাকে দিয়ে গেলো।

মামূন জেদ্দাস্থ ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে 'কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট' পদবি নিয়ে কর্মরত। উক্ত ব্যাংক মুসলিম সংখ্যালঘু ২০ টি দেশের দুই থেকে আড়াইশ' মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চ শিক্ষার জন্য স্কলারশিপ দেয়। এ ছাত্র-ছাত্রীরা পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশে বিশেষকরে মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ লেখাপড়া করে। চাকরি জীবনে স্কলারশিপের টাকা সহজ কিস্তিতে ফেরত দেবার ওয়াদা নেওয়া হয়, যাতে এ তহবিল ফুরিয়ে না যায়। এ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলামী ট্রেনিং দেবার দায়িত্ব মামূন পালন করে। এ উদ্দেশ্যে তাকে প্রতি বছর ব্যাপক সফর করতে হয়। বৃত্তিপাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে বিশ্বাস, চিন্তা, মনন, চরিত্র ও জযবায় খাঁটি মুসলিম হয়ে গড়ে উঠে এবং কর্ম জীবনে খাঁটি মুসলিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সে উদ্দেশ্যেই তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স রয়েছে। মামূনকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হয়।

এভাবে ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক মুসলিম উম্মাহর বিরাট খিদমত করছে।

অবশ্য এ সুবিধা মুসলিম প্রধান দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা ভোগ করার সুযোগ পায় না। অমুসলিম দেশের মুসলিমদের জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিক্রিয়া

১৬ ডিসেম্বর ঢাকা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর চরম অপমানজনক আত্মসমর্পণের প্রতিক্রিয়ায় পাকিস্তানের সেনাকেন্দ্র রাওয়ালপিণ্ডিতে যে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় তা ঐ বইটি থেকেই আমি পয়লা জানতে পারলাম। গুজব হিসেবে কিছু কথা আগে শুনেছি বটে; কিন্তু সঠিক ও নির্ভরযোগ্য খবর ঐ বইটিতে যা পেলাম তা-ই এখানে উল্লেখ করছি।

৩ ডিসেম্বর ভারতীয় বিমান-বাহিনী ঢাকা বিমান বন্দরে বোমা ফেলার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই সেনাবাহিনীর সবাই ধারণা করেছিলো যে, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে ভারতের উপর হামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। পশ্চিম থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা করার যে ধারণা সশস্ত্রবাহিনীকে দেওয়া আছে এর ফলেই দিল্লিতে হামলা করা উচিত বলে সেনাবাহিনীর মধ্যে চর্চা হতে লাগলো।

প্রকৃতপক্ষে ২১ নভেম্বর থেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের দীর্ঘ সীমান্তের বিভিন্ন জেলায় ভারতীয় বাহিনী সরাসরি হামলা শুরু করে। এ খবর রাওয়ালপিণ্ডিতে পৌঁছলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভারতের উপর হামলার জন্য মানসিক প্রস্তুতি স্পষ্ট বুঝা যায়। লাহোর সেনা ছাউনি থেকে বাইরে ভারত সীমান্ত পর্যন্ত মোর্চা খননের কাজও শুরু হয়ে যায়। সর্বত্রই সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনের পূর্ণ জযবা দেখা যায়।

জেনারেল হেড কোয়ার্টার (GHQ) থেকে চীফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল গুল হামান, ভাইস চীফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল আনওয়ার কুরাইশী এবং ডাইরেক্টর মিলিটারি অপারেশন ব্রিগেডিয়ার রিয়ায খান ২২ নভেম্বর থেকে বার বার চাপ দেওয়ার পর সুপ্রিম কমান্ডার ইয়াহইয়া খান অনেক গড়িমসি করে ২৯ নভেম্বর জানালেন যে, ৩ ডিসেম্বর হামলা করা হবে। ততদিনে ভারতীয় বাহিনী রাজধানী ঢাকার কাছে পৌঁছে গেছে এবং ৩ ডিসেম্বরই ঢাকা বিমান বন্দরে হামলা করে পূর্ব-পাকিস্তানের বিমান-বাহিনীকে পঙ্গু করে দেয়।

৩ ডিসেম্বর পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে ভারতের উপর বড় ধরনের হামলার জন্য জেনারেল টিক্কা খানের স্ট্রাইক ফোর্স প্রস্তুত ছিলো। শুধু নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলো। তারা চাচ্ছিলেন যে, আক্রমণের নির্দেশ পেলেই তীব্র হামলা করা হবে। তাদের আরও দাবি ছিলো যে, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানে হামলার তীব্র প্রতিবাদ করা হোক, যাতে জাতিসংঘ ভারত ও পাকিস্তানের উপর যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেয়। এভাবে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর হবে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের অপমান থেকে রক্ষা পাবে।

ইয়াহইয়া খানও এটাই চেয়েছিলেন। আমার সাথে নভেম্বরের শেষ দিকে যখন সাক্ষাৎ

হয় তখন তিনি রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছিলেন। তখন স্পষ্ট করে বলেননি যে কী ধরনের চেষ্টা করছিলেন। এখন উক্ত বই থেকে বুঝতে পারলাম। মি. ভুট্টো এটা হতে দিলেন না। পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর ড. এএম মালিক এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খান ইয়াহইয়া খানের অনুমতি নিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আবেদন জানিয়েছিলেন মীমাংসা করার জন্য। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মি. ভুট্টো এ যুক্তি দেখিয়ে তা বাতিল করে দিলেন যে, প্রাদেশিক সরকারের কোন দায়িত্বশীলের জাতিসংঘের নিকট সরাসরি আবেদন জানাবার কোন ইখতিয়ার নেই।

১২৫.

১৯৭১-এর শেষ পরিস্থিতি

১৯৭১-এর শেষ কয়েক মাসের অবস্থা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তাতে তথ্য-উপাত্তের অভাবে যা সঠিকভাবে পরিবেশন করতে পারিনি তা ব্রিগেডিয়ার জাফর ইকবাল চৌধুরীর বই থেকে জানতে পেরে কতক তথ্য পেশ করছি।

'৭১-এর অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান ঘেরাও করে ফেলে। অথচ এতোবড় খবরটি আমরা তখনো জানতে পারিনি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান জেনারেল নিয়াজি নিশ্চয়ই জানতেন। কিন্তু আমার মনে হয় গভর্নর ড. মালেক ও তার বেসামরিক সরকার জানতেন না। তারা জানলে অবশ্যই আমাদের কানেও এতোবড় খবরটা আসতো।

২১ নভেম্বর থেকেই বিভিন্ন জেলার সীমান্তের ভেতরে ভারতীয় বাহিনীর প্রবেশ করা শুরু হয়। আমি ২২ নভেম্বর জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্ম-পরিষদের বৈঠকে যোগদানের জন্য লাহোর রওয়ানা হই। কিন্তু এ বিষয়ে তখন আমার কিছুই জানা ছিলো না।

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী এ সম্পর্কে এতো বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন, যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি না। তিনি বিবরণ দিয়েছেন, কোন্ জেলায় কবে কত পরিমাণ সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে ভারতীয় বাহিনী প্রবেশ করেছে এবং কোন্ তারিখে কোন্ জেলা থেকে পাকিস্তানি বাহিনী পশ্চাৎপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে। ঢাকার নিকটবর্তী কোন্ কোন্ এলাকায় হেলিকপ্টার থেকে ছত্রীসেনা অবতরণ করেছে এবং কিভাবে মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে রাজধানী ঘেরাও করতে সক্ষম হয়েছে, তাও উল্লেখ করেছেন।

ব্রিগেডিয়ার চৌধুরী পশ্চিম-পাকিস্তানে সশস্ত্র বাহিনীর এমন সব তথ্য পরিবেশন করেছেন, যা আমাদের জানার কথা নয়। তিনি লিখেছেন যে, জিএইচ কিউতে ২১ নভেম্বরই এ খবর পৌঁছে গেলো যে, ভারতীয় বাহিনী পূর্ব-পাকিস্তানের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে। এর এমন ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো যে, রাওয়ালপিণ্ডির সেনানিবাসে সকল অফিসার নিজ নিজ র‍্যাংক থেকে উর্ধ্বতন র‍্যাংকের অফিসারদের নিকট দাবি

জানাতে লাগলো যে, স্থায়ী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য এখনি পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে ভারতের উপর সর্বাত্মক হামলা করা প্রয়োজন। এ দাবি একদিন পরই চীফ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল গুল হাসান পর্যন্ত পৌছে গেলো। স্ট্রাইক ফোর্সের কমান্ড্যান্ট জেনালের টিক্কা খান সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় প্রস্তুত রইলেন। সেনাপ্রধান জেনারেল আঃ হামীদ সর্বাধিনায়ক ইয়াহইয়া খানের গোচরে এ দাবির কথা জানালেন। পূর্ণ এক সপ্তাহ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগে ইয়াহইয়া খান ২৯ নভেম্বর জানালেন যে, ৩ ডিসেম্বর হামলা করার তারিখ ধার্য করা গেলো। সেনা কর্মকর্তারা এতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে বিলম্ব করায় বিক্ষুব্ধ হতে থাকলো।

৩ ডিসেম্বর ঢাকা বিমান বন্দরে বোমা ফেলে ভারতীয় বিমান-বাহিনী পাকিস্তান বিমান-বাহিনীকে পঙ্গু করে দেবার খবর পাওয়ার পর ইয়াহইয়া খান ঐ সিদ্ধান্ত মুলতবি করে দেন।

সর্বাধিনায়ক ইয়াহইয়া খান ও সেনাপ্রধান জেনারেল আবদুল হামীদ ইস্টার্ন কমান্ডার জেনারেল নিয়াজির কাছ থেকে প্রতিদিন একাধিকবার পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে থাকেন। কিন্তু তারা প্রকৃত অবস্থা সশস্ত্রবাহিনীকে জানাতে সাহস পাননি। তারা বুঝতে পারলেন যে, পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আরও সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র পাঠানো সম্ভব নয় এবং ভারতীয় বিমান-বাহিনীকে প্রতিহত করার সাধ্যও নেই। তাদের আশঙ্কা হলো যে, পশ্চিমের রণাঙ্গনে ব্যাপক যুদ্ধ শুরু করলেও পূর্ব-পাকিস্তানকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তদুপরি পশ্চিম-পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই জাতিসংঘের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের পথ তালাশ করা ছাড়া কোন বিকল্প উপায় নেই। এ উদ্দেশ্যেই মি. ভুট্টোকে চীনে পাঠানো হলো। মি. ভুট্টো এ মিথ্যা ধারণা পত্রিকার মাধ্যমে দিলেন যে, চীন পাকিস্তানের পক্ষে এগিয়ে আসবে।

পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর নেতৃত্বে বিভেদ

ব্রিগেডিয়ার জাফর ইকবাল চৌধুরীর বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, ইয়াহইয়া খানের সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ সশস্ত্রবাহিনীর নেতৃত্বে বিভেদ। চীফ অব জেনালের স্টাফ জেনারেল গুলহাসান ও এয়ার মার্শাল রহীম খানের সাথে মি. ভুট্টোর গভীর যোগসাজশ ছিলো। তারা পূর্ব-পাকিস্তানকে রক্ষা করা অসম্ভব মনে করতেন এবং ভারত যে সুবিধাজনক পর্যায়ে পৌছে গেছে তাতে কোন রাজনৈতিক সমাধানে ভারতকে কিছুতেই রাজি করানো সম্ভব হবে না বলেও বিশ্বাস করতেন। এ অবস্থায় পশ্চিমে রণাঙ্গন সৃষ্টি করে পশ্চিম-পাকিস্তানকেই বিপন্ন করা হবে।

ইয়াহইয়া খানের আশা ছিলো যে, জাতিসংঘের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানই একমাত্র বিকল্প। কিন্তু সেনা কর্তাদের মধ্যে চিন্তার বিভিন্নতার কারণে কোন সিদ্ধান্ত নেবার হিম্মত পাচ্ছিলেন না।

এর ফলে ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্বে নিয়োজিত জেনারেল নিয়াজি স্বাভাবিকভাবেই অসহায় অবস্থায় পতিত হন।

৩ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের ব্রিগেডিয়ার চৌধুরীর তথ্য ঃ ৩ ডিসেম্বর ঢাকা বিমান বন্দরে প্রাথমিক বোমাবর্ষণের পর ৬ ডিসেম্বর সম্পূর্ণ বিমান-বন্দরই ধ্বংস করা হয়। ৭ ডিসেম্বর গভর্নর ড. মালেক টেলেক্সের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খানকে জানান যে, যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোন বিদেশী শক্তি হস্তক্ষেপ না করে তাহলে কোন উপায় নেই।

৮ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট গভর্নরকে জানান যে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মীমাংসার প্রচেষ্টা চলছে।

৯ ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজি জিএইচ কিউকে জানান যে, ঢাকা বিমান-বন্দর ধ্বংস করায় আমাদের বিমান বেকার পড়ে আছে। সড়ক যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। দুশমনরা জলপথও অচল করে ফেলেছে। জনগণ আমাদের সম্পূর্ণ বিরোধী হয়ে গেছে। গত ২০ দিনের অবিরাম যুদ্ধে আমাদের বাহিনী শারীরিক দিক দিয়ে একেবারেই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

গভর্নর প্রেসিডেন্টকে আবার যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রস্তাব পাঠান। রাত এগারোটায় প্রেসিডেন্ট গভর্নরকে জানান যে, জেনারেল নিয়াজির সাথে পরামর্শ করে পরিস্থিতি অনুযায়ী যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার ইখতিয়ার দেওয়া গেলো। প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া জেনারেল নিয়াজিকেও নির্দেশ দেন, যেন গভর্নরের সিদ্ধান্ত মেনে নেন। তাকে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস করার পরামর্শও দেন, যাতে তা দুশমনদের হস্তগত না হয়।

১০ ডিসেম্বরেই গভর্নর মালিক জেনারেল নিয়াজির সম্মতি নিয়ে জাতিসংঘের নিকট আবেদন জানান, যাতে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করা হয়।

জেনারেল ফরমান আলী খান এ আবেদন ঢাকাস্থ জাতিসংঘ প্রতিনিধি এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল মি. পল মার্ক হেনরীর নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

ওদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে মিস্টার ভুট্টো ১১ ডিসেম্বর নিউইয়র্ক পৌঁছেন। জাতিসংঘের পাকিস্তানের প্রতিনিধি মি. আগা শাহী বিমানবন্দরে মি. ভুট্টোর হাতে দুটো সরকারি ফরমান তুলে দেন। একটায় গভর্নরের আবেদনপত্র। অপরটি যে কোন মূল্যে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করার নির্দেশ।

মি. ভুট্টো এ দুটো কাগজ পাঠ করতেই তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলে তার রাজনৈতিক মৃত্যুর আশঙ্কা করেন। তিনি অবিলম্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়ার সাথে ফোনে যোগাযোগ করে তার নির্দেশ প্রত্যাহার করাতে সক্ষম হন।

এদিকে ১৩ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায় ঢাকার গভর্নর হাউজে ভারতীয় বিমান-বাহিনী ব্যাপক গোলাবর্ষণ করলে গভর্নর মালেক পদত্যাগ করে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রেডক্রস গভর্নর, মন্ত্রীগণ, চীফ সেক্রেটারি ও উচ্চপদস্থ পশ্চিম-পাকিস্তানি অফিসারদেরকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে।

১৪ ডিসেম্বর রাশিয়ার সম্মতি নিয়ে পোল্যান্ড যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমাধানের

প্রস্তাব জাতিসংঘে পেশ করে। মি. ভুট্টো বীরত্বের সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়ে ওয়াক আউট করেন।

১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় জেনারেল নিয়াজি ভারতীয় জেনারেল অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আর ইয়াহইয়া খান পশ্চিমাঞ্চলে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার হাস্যকর ঘোষণা দেন। কিন্তু ১৮ ডিসেম্বর ভারত সরকার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালে মহাবীর ইয়াহইয়া খান সুবোধ বালকের মতো রাজি হয়ে যান।

পশ্চিম-পাকিস্তানে সর্বত্র, এমনকি রাওয়ালপিণ্ডিতে পর্যন্ত জনগণ ক্ষোভ ও ঘৃণায় ফেটে পড়ে এবং কারফিউ উপেক্ষা করে লাখ লাখ লোক মিছিল করে। বহু জায়গায় মদের দোকানে হামলা করা হয়। জেনারেলরা গাদ্দারী করেছে বলে জনগণ বিশ্বাস করে এবং ইয়াহইয়ার পদত্যাগ দাবি করে।

১৮ থেকে ২০ ডিসেম্বর

রাওয়ালপিণ্ডির GHO-এর লেকচার হলে ১৮ ডিসেম্বর সেনাপ্রধান জেনারেল আবদুল হামীদ সেনা কর্মকর্তাদের সমাবেশে ইয়াহইয়া খানকে সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে বর্তমান পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালনের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে নাজেহাল হন। সকল র‍্যাঙ্কের সেনা অফিসাররা প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে। সেনাবাহিনীর চরম অপমানের জন্য ইয়াহইয়া খানকে দায়ী করে নিন্দা জানায়। সেনাপ্রধান কোন রকমে ইজ্জত নিয়ে পালাতে বাধ্য হন। অফিসাররা সোচ্চার দাবি জানায় যে, ইয়াহইয়া খান এবং তার সাথে আরও যারা দায়ী তাদের সবাইকে পদত্যাগ করতে হবে।

চীপ অব জেনারেল স্টাফ জেনারেল গুল হাসান ও বিমান-বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল রহীম খান ভুট্টোর সাথে যোগসাজশে ছিলেন। তারা সেনা অফিসারদের বিক্ষোভে সমর্থন যোগান এবং ইয়াহইয়াকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে মি. ভুট্টোর ক্ষমতা দখলকে নিশ্চিত করতে সক্ষম হন। জেনারেল পীরজাদাও ইয়াহইয়ার সঙ্গ ত্যাগ করে জেনারেল গুল হাসানের সাথী হয়ে যান।

এভাবে ১৮ ডিসেম্বরেই ভুট্টোর ক্ষমতায় আরোহণের বাধা অপসারিত হয়। জাতিসংঘে মহাবীর ভুট্টো হাজার বছর যুদ্ধ করার ঘোষণা দিয়ে নিউইয়র্কে ইসলামাবাদ থেকে সুখবরের অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। এয়ার মার্শাল রহীম খান থেকে সুখবর পেয়ে মি. ভুট্টো ১৯ তারিখেই রোমে পৌছেন। অবিলম্বে মি. ভুট্টোকে ইসলামাবাদ পৌছাবার জন্য রহীম খান বিশেষ বিমান পাঠান।

২০ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহইয়া খান মি. ভুট্টোকে চীফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগ করেন এবং প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ করেন। মি. ভুট্টো প্রেসিডেন্টের পদও দখল করেন। '৭০-এর নির্বাচনে মি. ভুট্টো পশ্চিম-পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে জনগণের অবিসংবাদিত নেতার মর্যাদা লাভ করেন। তাই তিনি ইচ্ছা করলে সামরিক আইন প্রশাসক না হয়ে ইয়াহইয়া খানকে প্রেসিডেন্ট পদে রেখে পার্লামেন্টের অধিবেশন ডেকে বেসামরিক সরকার প্রধান হতে পারতেন। কিন্তু মি.

ভুট্টো মেজাজের দিক দিয়ে একনায়ক হওয়ায় প্রধান সামরিক শাসনকর্তা হিসেবে এককভাবে এমন কতক সিদ্ধান্ত নিলেন, যা তার ক্ষমতাকে সর্বদিক দিয়ে নিষ্কণ্টক করতে পারে। বিশ্বের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র বেসামরিক ব্যক্তি, যিনি চীপ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

সামরিক শাসক মি. ভুট্টো

২০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সামরিক শাসক হিসেবে রেডিও ও টিভিতে একটানা দেড় ঘণ্টা বক্তৃতা করলেন। আমি তখন লাহোরে। বক্তৃতা শুনে আমার স্পষ্ট মনে হলো যে, তা লিখিত তৈরি বক্তৃতা নয়। জনসভায় বক্তৃতা করলে যে ধরনের বক্তব্য পেশ করা হয়, ঠিক তেমনি মনে হলো। তিনি জাঁদরেল বক্তা হিসেবে খ্যাত। এক বিষয়ে বলতে গিয়ে অন্য বিষয়ও এসে গেছে। একই প্রসঙ্গের কথা একাধিকবার বলেছেন। লিখিত বক্তৃতা এ রকম হতে পারে না। ঝানু বক্তা হিসেবে তিনি কয়েকবারই আবেগপ্রবণ হয়ে জনগণের হৃদয় স্পর্শ করার চেষ্টা করেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য মায়াকান্নার অত্যন্ত সফল অভিনয় করতে বিস্ময়কর পারদর্শিতার পরিচয় দিলেন। ভারতীয় বাহিনীর নিকট পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের কারণে সশস্ত্রবাহিনী ও জনগণের অন্তর যে গভীরভাবে আহত হয়েছে তা উপলব্ধি করে মলম লাগাবার ব্যর্থ চেষ্টাও করলেন।

স্বৈরাশাসক আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠ দোসর হিসেবে তার দশ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ছাপ তার বক্তৃতায় অবশ্যই ছিলো। তাই তিনি সামরিক ও বেসামরিক সকল বিভাগ, সব ধরনের পেশা এবং সর্বস্তরের জনগণকে সম্বোধন করে অনেক কথা বলেছেন।

প্রায় এক বছর তার সামরিক শাসনকালে আমি পাকিস্তানেই ছিলাম। ক্ষমতাসীন হয়েই তিনি ইয়াহইয়ার সমর্থক উচ্চপদস্থ সকল সামরিক ও বেসামরিক অফিসারদেরকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিলেন। সামরিক শাসক হিসেবে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিলো। তিনি জেনারেল গুল হাসানকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করলেন এবং এয়ার মার্শাল রহীম খানকে বিমান-বাহিনী প্রধান হিসেবে বহাল রাখলেন। পার্লামেন্টের অধিবেশন ডাকার আগে তিনি বহু বিষয়ে এককভাবে এমন সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করলেন, যা এ নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছাড়া করা সম্ভব হতো না। পরে তিনি পার্লামেন্টের অনুমোদন আদায় করে তার সব সিদ্ধান্তকে বহাল রাখতে সক্ষম হন।

দুটো বড় সমস্যা

ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে ভালোভাবেই দিন কাটছিলো বটে; কিন্তু দুটো সমস্যায় পেরেশানীবোধ করলাম। দেশে কী ঘটছে, সে বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দিলো। দ্বিতীয় সমস্যা হলো ঢাকায় পরিবার-পরিজনদের সাথে যোগাযোগের কোন পথই পাচ্ছিলাম না। আমি কোথায়, কী অবস্থায় আছি, তা আব্বা-আম্মাকে জানাতে না পেরে খুবই অস্বস্তিবোধ করছিলাম।

যা জানা জরুরি বোধ হয় তা না জানা পর্যন্ত কেমন অস্থিরতা ও অস্বস্তি ভোগ

করতে হয় এর অভিজ্ঞতা সবারই আছে। জানার বিষয়টি যত গুরুত্বপূর্ণ সে অনুপাতেই অস্থিরতা বোধ হয়। আমি যে অবস্থায় ছিলাম এবং যে দুটো বিষয়ে জানার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম এর গুরুত্ব সুস্পষ্ট।

বাংলাদেশের সাথে সরাসরি যোগাযোগের কোন উপায়ই ছিলো না। তাই বিকল্প পথ তালাশ করতে হলো। লন্ডনে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের সাথে জড়িত পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানিদের একমাত্র সংগঠন ছিলো 'ইসলামিক মিশন ইউ. কে.।' সিলেটের জনাব মুহাম্মদ আবদুস সালাম উক্ত মিশনের অন্যতম দায়িত্বশীল ছিলেন। তার ছাত্র জীবন থেকেই আমার সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। তার সহযোগিতায় ইসলামাবাদ থেকে ঢাকায় চিঠির আদান-প্রদান সম্ভব হয়। আমি আবদুস সালাম সাহেবের ঠিকানায় চিঠি পাঠাতাম। আর তিনি লন্ডন থেকে সে চিঠি ঢাকা পাঠাতেন। ঢাকা থেকে আমার স্ত্রী তার ঠিকানায় চিঠি পাঠালে তিনি তা ইসলামাবাদে পাঠাতেন। এভাবে আমার চিঠির জওয়াব পেতে এক মাস লেগে যেতো।

নেযামে ইসলাম পার্টির দু'জন নেতার পরিবারের সাথে যোগাযোগের জন্য এ পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। জনাব আবদুস সালাম ঢাকা ও ইসলামাবাদে চিঠি পুনরায় ডাকে দিতে ব্রিটেনের ডাক টিকেট বাবদ যা খরচ হতো তা তিনিই বহন করতেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বহন করতেন, না সংগঠন থেকে ব্যবস্থা করতেন তা আমার জানা নেই। দীর্ঘ আট মাস পর্যন্ত আবদুস সালাম সাহেব এ বিরাট খিদমত আঞ্জাম দেন।

আমি ৭২ সালের নভেম্বরে পাকিস্তান থেকে হজ্জ উপলক্ষে সৌদী আরব গেলে সেখান থেকে অবশ্য ঢাকায় সরাসরি চিঠি পাঠাতাম। কিন্তু অন্য যাদের চিঠি লন্ডনের মারফতে পাঠাতে হতো তারা আরও এক বছর আবদুস সালাম সাহেব থেকে এ খিদমত নিতে বাধ্য হয়েছেন।

পরিবারের সাথে যোগাযোগ সমস্যার সমাধান তো এভাবে হয়ে গেলো। কিন্তু দেশের খবর, জামায়াতের দায়িত্বশীলদের খবর এবং সারাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত ছাত্র ও অছাত্র সক্রিয়দের খবর যোগাড়ের ব্যবস্থা না হওয়ায় বড় পেরেশানী রয়েই গেলো। পারিবারিক চিঠিতে দেশের খবর সামান্য পেলেও সংগঠনের কোন খবর পাচ্ছিলাম না।

রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নৈতিকতা ও মানবিকতার ধার ধারে না। যুদ্ধ বন্দিদের সাথে আচরণের ব্যাপারে জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যে নীতিমালা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে আমেরিকা আফগান যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে ঐ চুক্তিরও পরওয়া করে না। জাতি সংঘের এ সাধ্য নেই যে, ঐ চুক্তি পালনে আমেরিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

১৬ ডিসেম্বরের পর মুক্তিযোদ্ধারা ও আওয়ামী লীগের লোকেরা যে ইসলামী আন্দোলনের সকল সক্রিয় লোকদের উপর রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে এ আশঙ্কার কারণেই আমি দেশের খবরের জন্য চরম অস্থিরতা বোধ করছিলাম। আমি তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম যে, যদি কোন রকমে ঢাকায় কিছু টাকা পাঠাতে

পারতাম তাহলে অন্তত কেউ বিভিন্ন জেলা সফর করে দীনী ভাইদের খোঁজ-খবর নিতে পারতেন। সব দায়িত্বশীলগণ যে কী চরম পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলেন তা অনুমান করে খুবই পেরেশান বোধ করছিলাম। জামায়াতের রিলিফ ফান্ড থেকে কিছু টাকা চাইলেই মাওলানা মওদূদী দিতে চান বলে কেন্দ্রীয় বাইতুল মাল সেক্রেটারি জনাব ফকীর হোসাইন আমাকে জানালেন। আমি উৎসাহিত হয়ে টাকা পাঠাবার উপায় খুঁজতে শুরু করলাম। কিভাবে ঢাকায় টাকা পাঠানো যেতে পারে ভেবে কূল-কিনারা করতে পারলাম না। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের এক কর্মকর্তা জনাব আবদুস সুবহান জামায়াতের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইসলামাবাদে সরকারি বাসায় থাকতেন। তিনি ঢাকা জেলার লোক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তিনি ইসলামাবাদেই চাকরি করতে থাকেন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন।

ঐ আবদুস সুবহান সাহেব আমাকে বললেন যে, তার পরিচিত দিল্লিওয়ালা এক ব্যবসায়ী ইসলামাবাদে আটকা পড়ে গেছেন। ঢাকা থেকে তিনি টাকা আনাতে চান। আপনি যদি তাকে টাকা দিতে পারেন তাহলে তিনি ঢাকায় আপনার লোকের হাতে টাকা পৌঁছাতে পারবেন। আমি তো এমন সুযোগই তালাশ করছিলাম। তাই আমি সাদরে এ প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। ঢাকায় আমার আব্বার নিকট টাকা পৌঁছাতে বললাম। ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিলাম। বললাম যে, তিনি যে অংকের টাকা পৌঁছাবেন, এখানে আমি তা আপনার মাধ্যমেই তাকে দেবো। তবে আব্বার হাতে টাকা পৌঁছেছে এ খবর পাওয়ার পরই আমি এখানে টাকা দেবো। ১৫ দিন পর আমার স্ত্রীর চিঠির সাথে আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামেরও চিঠি লন্ডন হয়ে আমার হাতে পৌঁছলো। তাতে আমার ভাই জানালো, "পঁচিশ হাজার টাকা একজন লোক আব্বার কাছে দিয়ে গেছেন। আপনি সংগঠনের দায়িত্বশীলের হাতে টাকা পাঠাতে চান বলে আগেই জানিয়েছেন এবং দায়িত্বশীল কোন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হতো না যদি আগে থেকেই মাস্টার শফীকুল্লাহ সাহেব আব্বার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। আব্বা টাকা পাওয়ার পরপরই মাস্টার সাহেব দেখা করতে আসলে তার হাতে টাকা দিয়ে দিয়েছেন।

মাস্টার সাহেব টাকা হাতে পেয়ে অভিভূত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে গিয়ে মন্তব্য করলেন যে, "যেখান থেকে সরাসরি চিঠি পর্যন্ত আসতে পারে না, সেখান থেকে টাকা পৌঁছে গেলো। আলহামদুলিল্লাহ।" এ চিঠি পাওয়ার পর আমি আবদুস সুবহান সাহেবের মাধ্যমে ঐ দিল্লিওয়ালার হাতে টাকা পৌঁছাই।

এভাবে সংগঠনের সাথে যোগাযোগ সূচনা হয় এবং লন্ডনের পথে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান শুরু হয়। ইতঃপূর্বে উড়ো খবর পেয়েছিলাম যে, আমার সাথে যিনি পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক সেক্রেটারি ছিলেন সেই আবদুল খালেক সাহেব এবং ঢাকা শহর সেক্রেটারি জনাব গোলাম সারওয়ার নিহত হয়েছেন। এ গুজব শোনার দু'মাস পর খবরটি মিথ্যা বলে জানতে পারলাম। এপ্রিল মাস থেকে কিছু কিছু খবর চিঠির মাধ্যমে পাওয়া শুরু হয়।

১২৬.

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন

১৯৭২ সালের মার্চ মাসে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার অধিবেশন হয়। পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এটাই ছিলো প্রথম অধিবেশন। মজলিসে শূরাতে পূর্ব-পাকিস্তানের ৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। ঘটনাক্রমে আমি ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম ওখানে উপস্থিত থাকায় আমীরে জামায়াত আমাদেরকেও হাজির হতে দাওয়াত দিলেন।

আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদীর সভাপতিত্বে বৈঠক শুরু হলো। উদ্বোধনী ভাষণেই তিনি পূর্ব-পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার কারণ বিশ্লেষণ করলেন। এ বিষয়ে তার দীর্ঘ বক্তব্যের সারকথা নিম্নরূপ ঃ

পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য ১০ কোটি ভারতীয় মুসলমানদেরকে ডাক দিলেন। শ্লোগান ছিলো "পাকিস্তান কা মতলব কিয়া– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" এ ডাকে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সাড়া দিয়েছে বাঙালি মুসলমান ও ভারতের সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানরা।

নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি রাষ্ট্র কায়েম করতে চেয়েছেন এবং মুসলিম জাতির সমর্থনে তা কায়েম হয়েছে। তারা ইসলামের দোহাই দিয়ে সমর্থন আদায় করলেও ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রটি গড়ার কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করেননি। ফলে ইসলামের নামে কায়েম করা রাষ্ট্রটি তারাই পরিচালনা করেন, যারা বংশে ভারত উপমহাদেশের লোক হলেও মন-মগজ ও চরিত্রে ইংরেজই ছিলেন।

শাসকগণ ইংরেজদের শিক্ষাব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতিতেই গড়া থাকায় তারা ইসলামী আদর্শে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার যোগ্য ছিলেন না। ইসলামের বন্ধনই পূর্ববঙ্গের মুসলমান এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্তের মুসলমানদেরকে এক রাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত করেছিলো। শাসকগণ ইসলামের ঐ বন্ধনকে মযবুত করার পরিবর্তে অমুসলিম শাসকদের মতোই দেশ শাসন করতে থাকলেন।

পাকিস্তান মুসলিম জনগণের ভোটের মাধ্যমেই জন্মলাভ করে। কিন্তু তাদের নির্বাচিত নেতারা ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের গণদাবিকে দাবিয়ে রাখার হীন উদ্দেশ্যে জনগণের ভোটাধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিতে চেষ্টা করেন। এ অবস্থায় সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খান গণবিরোধী সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন জারি করার সুযোগ পেয়ে যান।

যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানের জন্ম দিলো এর লালন না করায় স্বাভাবিকভাবেই এলাকাভিত্তিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তা ঐ শূন্যস্থান পূরণ করে। এ সত্ত্বেও যদি জনগণের নির্বাচিত সরকারকে দেশ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে পূর্ব-পাকিস্তানে ভারত সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারতো না এবং

ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর নিকট এমন অপমানজনক পরাজয় বরণ করতে হতো না। এখনও যদি অবশিষ্ট পাকিস্তানের শাসকগণ মুসলিম জাতীয়তার চেতনার লালন করে দেশে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা না চালান, তাহলে পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচি ও পাঠান জাতীয়তা দেশকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে সক্ষম হবে।

আমীরে জামায়াতের উপরিউক্ত বক্তব্য এমন এক করুণ পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, মজলিসে শূরার সকল সদস্য অবশিষ্ট পাকিস্তানের নিরাপত্তার ব্যাপারেও উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন। মি. ভুট্টোর হাতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ কতটুকু নিরাপদ হবে এ বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অবশেষে মাওলানা জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে দৃঢ়তার সাথে ব্যাপকভাবে জনগণের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেশবাসীকে ইসলামের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

মাওলানা মওদূদী ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন

উদ্বোধনী ভাষণের পরপরই মাওলানা আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দেন যে, '৭০ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শূরার অধিবেশনে তিনি এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিলো যে, জাতীয় নির্বাচনে দলীয় প্রধানকে সারাদেশে ব্যাপকভাবে নির্বাচনী অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা কিছুতেই এর অনুকূল নয়। তাই নতুন কোন আমীরের উপর দায়িত্ব না দিলে জামায়াত অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু মজলিসে সূরা আবেগতাড়িত হয়ে মাওলানার প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। এতে জামায়াতের যে ক্ষতি হয়েছে সে কথা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

এরপর তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন যে, তাফহীমুল কুরআনের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা, সীরাতে সারওয়ারে আলমের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আমীরে জামায়াতের বিরাট দায়িত্ব থেকে অবসর না দিলে এ দুটো কাজ অপূর্ণ থেকে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া স্বাস্থ্যগত কারণেও তাঁকে দায়িত্বমুক্ত করা জরুরি বলে তিনি মজলিসে শূরাকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য পরামর্শ দিলেন।

আমীরে জামায়াতের এ বক্তব্যের পর তেমন কোন আলোচনা ছাড়াই শূরা সদস্যগণ মাওলানাকে অব্যাহতি দেবার জন্য মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত বলে বুঝা গেলো। তাই মাওলানার বক্তব্যের পর সবাইকে নিশ্চুপ দেখে তিনি জানতে চাইলেন, "আপনারা কি আমাকে অব্যাহতি দিতে সম্মত আছেন?" সবাই একসাথে সম্মতিসূচক আওয়াজ দিলে তিনি আলহামদুলিল্লাহ বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। সবাই অনুভব করলেন যে, মাওলানার অসুস্থতার কারণে তাফহীম ও সীরাতের কাজটি সম্পন্ন করার জন্য ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবার সিদ্ধান্তটি খুবই সঠিক হয়েছে।

আমীরে জামায়াতের নির্বাচন পদ্ধতি

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা আমীর। তিনি

যতবার জেলে গিয়েছেন কারারুদ্ধ থাকাকালে ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে অন্য কেউ দায়িত্ব পালন করেছেন। যতবার নির্বাচন হয়েছে প্রতিবারই তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। হয়তো কোন রুকন তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভোটই দেননি।

মাওলানা ইমারতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেবার পর আগের মতোই আমীরে জামায়াতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা, না নতুন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এ প্রশ্নের সৃষ্টি হলো। এ পর্যন্ত যে নিয়মে নির্বাচন হয়েছে তা অত্যন্ত সহজ। রুকনগণের নিকট ব্যালট পেপার বিলি করার পর তাদের ভোট সংগ্রহ করে গণনা করে ফলাফল ঘোষণা করা হতো। জামায়াতের কোন পর্যায়েই নির্বাচনে প্রার্থিতা নেই, কেউ প্রার্থী হয় না। ভোট গণনার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট যার নামে পড়ে নির্বাচন কমিশন তাকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন।

মজলিসে শূরার বৈঠকে এ বিষয়ের অবতারণা কে করেছিলেন তা স্মরণ নেই। তিনি প্রশ্ন তুললেন যে, মাওলানা মওদূদীর পর জামায়াতের আমীর পদের জন্য কে সবচেয়ে বেশি যোগ্য তা বিবেচনা করা সারাদেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রুকনদের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। বিশেষ করে মহিলা রুকনদের জন্য এটা আরও কঠিন ব্যাপার। মাওলানা মওদূদীর যোগ্যতা সম্পর্কে সবাই অবহিত। মাওলানার অব্যাহতি নেওয়ার পর ভোটাররা এ পদের জন্য কাকে ভোট দেবেন এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য কোন ধারণা দেওয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

এ প্রশ্নটির গুরুত্ব সবাই উপলব্ধি করলেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ শূরার সামনে আসতে থাকলো। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে আমীর নির্বাচনের জন্য নতুন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। সে পদ্ধতিটি হলো ঃ

নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তিনজনের একটা প্যানেল গঠন করবে। শূরার সদস্যগণ প্রত্যেক তিন জনের নাম প্রস্তাব করবেন। যাকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করবেন তাঁর নাম প্রথমে লিখবেন। এরপর দ্বিতীয় যোগ্য লোকের নাম ও সর্বশেষে তৃতীয় যোগ্য ব্যক্তির নাম। যোগ্যতম ব্যক্তি হিসেবে সর্বোচ্চ ভোট যিনি পাবেন প্যানেলে তাঁর নাম প্রথমে লেখা হবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোগ্য ব্যক্তির নাম পরপর থাকবে।

নির্বাচনী ব্যালটে নির্বাচন কমিশন এ ক্রম অনুযায়ীই তিনটি নাম মুদ্রিত করবে। তবে রুকন ভোটারদেরকে এ ইখতিয়ার দেওয়া হবে, আমীরে জামায়াত হিসেবে তারা এ তিনজনের যে কোন একজনকে অথবা এ তিনজনের বাইরে যে কোন রুকনকে ভোট দিতে পারবেন।

নির্বাচনের জন্য প্যানেল গঠন

উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শূরার সদস্যগণ প্যানেল নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ভোট দেন। ভোগ গণনার পর নির্বাচন কমিশনার নিম্নক্রম তিনজনের নাম ঘোষণা করেন ঃ

১. মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ, ২. প্রফেসর গোলাম আযম ও ৩. প্রফেসর খুরশীদ আহমদ।

এ প্যানেল ঘোষণার পর আমি বিস্মিত হয়ে বৈঠক শেষে শূরা সদস্যদের অনেকের সাথেই বললাম যে, আল্লাহ আমাকে যে ভূখণ্ডে পয়দা করেছেন আমি যদি সেখানে যেতে না-ও পারি তবুও বিদেশে থাকতে হলেও ঐ এলাকার ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাজ করবো। আমার পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি না। তাই প্যানেলে আমার নাম থাকা অর্থহীন।

পাকিস্তানে আমার ব্যাপক সফর

মজলিসে শূরার বৈঠকে চার প্রদেশের জামায়াত নেতৃবৃন্দ আমাকে তাদের এলাকায় সফর করার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন। রুকন ও কর্মী সম্মেলন এবং সুধী সমাবেশে আমাকে বক্তব্য রাখার ব্যবস্থা তাঁরা করতে চান। আমি তো বেকার অবস্থায়ই ছিলাম। তাই সানন্দে তাদের দাওয়াত কবুল করলাম।

আমি তিন প্রদেশে শুধু রাজধানীতে সফরে গিয়েছি। পেশোয়ার, কোয়েটা ও করাচীর বাইরে যেতে চাইনি। কিন্তু পাঞ্জাবে একমাত্র ডেরাগাযী খান জেলা ছাড়া সব জেলায়ই গিয়েছি। আমার ধারণা হলো যে, পূর্ব-পাকিস্তানকে হারাবার বেদনা পাঞ্জাবীদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। সব জায়গায়ই আমাকে দেখে অনেককে কাঁদতে দেখেছি। এটাও লক্ষ্য করেছি যে, একমাত্র পাঞ্জাবেই কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নেই। বাকি তিন প্রদেশেই তা সুস্পষ্ট দেখা গেছে। সীমান্ত গান্ধী উপাধিপ্রাপ্ত খান আবদুল গাফফার খানের পাখতুন আন্দোলনতো সীমান্ত প্রদেশকে পশতুভাষী আফগানিস্তানের সাথে একীভূত করার চক্রান্তই ছিলো। আর সিন্ধুর জি.এম. সাইয়েদ তো সিন্ধু জাতীয়তাবাদের শ্লোগান তুলে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টাই করেছেন। ভাষা ও এলাকাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্বাভাবিকভাবেই জঘন্য সঙ্কীর্ণতার জন্ম দেয়। আদর্শের কোন বালাই সেখানে থাকে না। সিন্ধু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মতে, সিন্ধু-বিজেতা মুহাম্মদ বিন কাসিম বিদেশী দখলদার দুশমন। আর রাজা দাহীর সিন্ধু জাতীয়তাবাদের হিরো। সিন্ধুর মতো বেলুচিস্তানে বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন জোরদার না হলেও সেখানে এর অস্তিত্ব সুস্পষ্টই ছিলো।

মি. ভুট্টো গোটা পাকিস্তানের হর্তাকর্তা না হলে সিন্ধুর বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হয়তো ঠেকানো কঠিন হতো। সিন্ধের নেতা ভুট্টো পাকিস্তানের বাদশাহ্ হওয়ায় ঐ আন্দোলন তেমন দানা বাঁধতে পারেনি।

আমার এ সফরে রুকন সম্মেলন, কর্মী সম্মেলন ও সুধী সমাবেশে বক্তব্য শেষে সর্বত্রই পূর্ব-পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া সম্পর্কে স্বাভাবিক কারণেই আমাকে প্রশ্ন করা হতো। আমি অত্যন্ত কষিয়ে জওয়াব দিতাম। বলতাম, "পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও সীমান্তের মুসলমানদের চেয়ে পাকিস্তান কায়েমে বাঙালি মুসলমানদের অবদান অনেক বেশি। পূর্ব-পাকিস্তানকে কেউ অস্ত্রবলে পাকিস্তানে শামিল করেনি। ইয়াহইয়া খান ৭০-এর নির্বাচনের পর মি. ভুট্টোর সাথে যোগসাজশ করে ক্ষমতার লোভে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেন। ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেট দিয়ে দমন করার অপচেষ্টার ফলেই পাকিস্তান দু'ভাগে

বিভক্ত হয়ে গেলো। পূর্ব-পাকিস্তান ইচ্ছা করে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তারা পূর্ব-পাকিস্তানকে অন্যায়ভাবে পাকিস্তান থেকে বের করে দিয়েছে।"

আমার এ জওয়াব শুনে ইয়াহইয়া ও ভুট্টোর বিরুদ্ধে শ্লোগান শুরু হয়ে যেতো।

ভারত কতটুকু দায়ী– এ প্রশ্নও করা হতো। এর জওয়াবে বলতাম যে, দুশমন হিসেবেই ভারত এতো বড় সুযোগ লুফে নিয়েছে। পাকিস্তানকে ভাঙবার এ মহাসুযোগ ইয়াহইয়া-ভুট্টোই সৃষ্টি করে দিলেন।

সুধী সমাবেশে আমি এ সাবধানবাণীও উচ্চারণ করতাম যে, ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পাকিস্তান ভেঙে গেলো। যদি একই ধারায় দেশ চলতে থাকে তাহলে বাকি পাকিস্তানও টিকবে কিনা বলা যায় না। কারণ পাকিস্তান কোন ভূখণ্ডের নাম ছিলো না। পাকিস্তান একটি আদর্শিক নাম। ঐ আদর্শই যদি না টিকে তাহলে পাকিস্তান কেমন করে টিকে থাকবে? ঐ আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে গড়ে তুলবার আন্দোলনই জামায়াতে ইসলামী। যারা পাকিস্তানকে মযবুত করতে চান তাদেরকে জামায়াতে যোগদান করার আহ্বান জানাই।

আমার ঐ সফর চলাকালেই আমীরে জামায়াতের নির্বাচনের জন্য রুকন সম্মেলনে ব্যালট বিতরণ হয়েছে। আমি রুকনগণকে বলেছি যে, ব্যালট পেপারে আমার নামও আছে। যদি কেউ আমাকে ভোট দেন তাহলে তাঁর ভোটটা কোন কাজে আসবে না। কারণ আমার কর্মস্থল এ দেশ নয়। আল্লাহ আমাকে যে দেশে পয়দা করেছেন, সে দেশে যদি যেতে নাও পারি তবুও যেখানেই থাকি ঐ দেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্যই আমি কাজ করতে চাই। এ কাজ এ দেশে থেকে করা সম্ভব হবে না। যেখান থেকেই সম্ভব হয়, সেখানেই চলে যেতে হবে। তাই কেউ আমাকে ভোট দেবেন না। এভাবেই আমি আমার বিরুদ্ধে নির্বাচনী অভিযান চালানো প্রয়োজন মনে করি।

আমার লন্ডন যাবার প্রচেষ্টা

সবদিক বিবেচনা করে এবং মাওলানা মওদূদীর সাথে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত লন্ডন যাওয়াই স্থির হয়। সেখান থেকে ঢাকায় যোগাযোগ করাও সহজ এবং খবরাখবর পাওয়াও সম্ভব। এর জন্য প্রথমেই পাসপোর্ট সংগ্রহ করা প্রয়োজন। ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীনের সাথে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো। আমি তাঁরই সহযোগিতায় আমাদের চারজনের পাসপোর্ট যোগাড় করলাম। পাসপোর্ট পাওয়ার পরপরই মাওলানা আবদুর রহীম করাচী চলে গেলেন। ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে আমি, মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ও এডভোকেট আফাযুদ্দীন রয়ে গেলাম।

ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক শাসক মি. ভুট্টো ফরমান ঘোষণা করলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানি যারা পাকিস্তানে রয়েছেন তারা প্রেসিডেন্টের অনমুতি ছাড়া পাকিস্তানের বাইরে যেতে পারবেন না। আমি প্রেসিডেন্টের বরাবরে লন্ডন যাবার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত লিখে ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীনের হাতে দিয়ে বললাম, "আমার দরখাস্তটি সরাসরি প্রেসিডেন্ট হাউজে ডাকযোগে পাঠালে কবে

এর জওয়াব আসবে তা অনিশ্চিত। তাই আপনার হাতে দিলাম, যাতে ফলাফল নিশ্চিতভাবে জানা যায়। কয়েকদিন পর তিনি ফোনে দেখা করতে বললেন। আশা, নিরাশার দোলায় দোল খেতে খেতেই গেলাম। তিনি মি. ভুট্টোর কথা উদ্ধৃত করে বললেন, "না কুই আয়েগা, না কুই জায়েগা।" পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কেউ আসতেও পারবে না এবং যারা এখানে আছে তারা কোথাও যেতেও পারবে না।

লন্ডন যাবার প্রচেষ্টা সফল হলো না। লন্ডনের মাধ্যমে ঢাকার সাথে পত্র যোগাযোগেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো।

পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসবাসের প্রস্তাব

জামায়াতের দায়িত্বশীল মহলে জানাজানি হয়ে গেলো যে, আমরা যারা ঘটনাক্রমে পাকিস্তানে রয়ে গিয়েছি, তাদেরকে সরকার অন্য কোথাও যেতে দিচ্ছে না। তাই আমাদেরকে বাধ্য হয়ে পাকিস্তানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে।

রহীম ইয়ার খান জেলার আমীর জনাব আশরাফ বাজওয়া মাওলানা আবদুস্ সুব্হান সাহেবকে অফার দিলেন, যেন তিনি ঐ জেলায় বসবাস করেন। তাকে বলা হলো যে, তাঁর এলাকায় যে পরিমাণ জমিজমা ছিলো এর দ্বিগুণ জমি তাঁকে দান করা হবে। তিনি তাঁর পরিবারকে নিয়ে আসলে তাদের বসবাসের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হবে। তাঁর মহব্বত ও আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হলাম। কিন্তু সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করার কোন চিন্তা-ভাবনা আমাদের মোটেই ছিলো না। মাওলানা আবদুস্ সুব্হান আবেগপূর্ণ ভাষায় শুকরিয়া জানালেন এবং দোয়া চাইলেন যেন দেশে ফিরে যাবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

জেনারেল (অব.) ওমরাও খান হঠাৎ একদিন ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে আমার রুমে হাজির হলেন। তিনি এক সময় পূর্ব-পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর জিওসি ছিলেন। ৭০-এর নির্বাচনে তিনি জামায়াতের নমিনী ছিলেন। বিনা খবরে তিনি সোজা আমার কামরায় ঢুকে পড়লেন? আমি ঘটনার আকস্মিকতায় একটু বিব্রত বোধ করলেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথেই সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। কোলাকুলি করার সময় তিনি কিছু সময় আঁকড়ে ধরে থাকলেন এবং আমাকে চুমু দিলেন।

জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি তেমন কোন ভূমিকা ছাড়াই আমার উদ্দেশ্যে বলে ফেললেন, "জানতে পারলাম যে, আপনাকে পাকিস্তানেই থাকতে হচ্ছে। সরকার বাইরে যেতে দিচ্ছে না। তাই লাহোরে আমার যে বাড়িটি ভাড়া দিয়ে রেখেছি তা আপনাকে গিফট হিসেবে দেবার প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয়েছি। আমার এ অফার কবুল করলে আমি অত্যন্ত খুশি হবো।"

আমি তাঁর মহব্বত ও আন্তরিকতার শুকরিয়া জানিয়ে কিছুটা হালকাভাবেই বললাম, "ভাই, আল্লাহ যদি কোন দিন ঢাকায় নিজের বাড়িতে থাকার সুযোগ দেন সে অপেক্ষায়ই থাকবো। আর কোথাও বাড়ির মালিক হবার ইচ্ছা নেই। তাছাড়া আমি যখনি সুযোগ পাই পাকিস্তান থেকে বাইরে চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

তিনি নিশ্চুপ বসে রইলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দুচোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। আমি বিব্রত হয়ে বললাম, "আপনার অফার গ্রহণ না করায় মনে এতো কষ্ট পাবেন বলে ধারণা করিনি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।" তিনি বললেন, "আপনার ন্যায় দীনের একজন খাদিম গৃহহীন অবস্থায় আছেন, এতেই আমি বেদনা বোধ করছি।" তাঁর এ আন্তরিক সহানুভূতি আমার অন্তর স্পর্শ করলো। আমি অনুভব করলাম যে, তিনি খুবই আন্তরিক বলেই চোখের পানিতে প্রমাণ দিলেন।

১২৭.

আযাদ-কাশ্মীর সফর

১৯৭২ সালের আগস্ট মাসের আযাদ-কাশ্মীরের প্রেসিডেন্ট সরদার আবদুল কাইয়ুম খান আমাদেরকে রাজধানী মুযাফফারাবাদ যাবার জন্য দাওয়াত দিলেন। পরে জানতে পারলাম যে, আযাদ-কাশ্মীর সরকারের চীফ সেক্রেটারি জনাব মাসীহুয্যামান সিএসপি সাহেবের উদ্যোগেই এ দাওয়াত এসেছে। তিনি ঢাকায় কর্মরত থাকাকালে নিপার (যার বর্তমান নাম পিএটিসি) চেয়ারম্যান ছিলেন। ডাইরেক্টর ছিলেন ক্যাপ্টেন আবদুর রব। নিপার হলরুমে ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে এক সেমিনারে ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি নূরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আবদুল মালেক (শহীদ) ও সংঘের সাইয়েদ মুহাম্মদ ইবরাহীম (পরে মেজর জেনারেল) বক্তৃতা করেন। চেয়ারম্যান সাহেব উর্দুভাষী ছিলেন। ঐ সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন বাংলাভাষী ডিরেক্টর ক্যাপ্টেন আবদুর রব। ঐ সেমিনারে আবদুল মালেকের বক্তৃতার টেপ রেকর্ড থেকে গত ১৫ আগস্ট (২০০৩) সাপ্তাহিক সোনার বাংলার 'শহীদ মালেক' সংখ্যায় ঐ বক্তব্যটি প্রকাশিত হয়। চেয়ারম্যান সাহেব ঐ রেকর্ড করা বক্তৃতা শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদস্থ কোন কোন কর্মকর্তাকে দিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন আবদুর রব রাজশাহী বিভাগের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। চাকরিতে থাকাকালেই বিভিন্ন ইসলামী জনসভায় আমার সহবক্তা ছিলেন। তিনি ইত্তেহাদুল উম্মাহ নামক ইসলামী ঐক্য সংগঠনের মজলিসে সাদারাতের সদস্য হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

মুসলিম লীগ নেতা হিসেবে জনাব শফিকুল ইসলামের নামেও দাওয়াত এলো। আমি, মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ও এডভোকেট আফাজুদ্দিন আহমদ মিলে সর্বমোট আমরা চারজন আমন্ত্রিত ছিলাম। মুযাফফারাবাদ থেকে একটা বড় জীপগাড়ি আমাদেরকে ইসলামাবাদ থেকে নিয়ে গেলো।

ইসলামাবাদ থেকেই পাহাড়ি এলাকা শুরু। সারা পথেই পাহাড়ি রাস্তা। দু'দিকেই সবুজের সমারোহ। 'ভূস্বর্গ কাশ্মীর' উপাধি নিরর্থক নয়। আমরা মুগ্ধ-বিস্ময়ে আল্লাহর খচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে এগিয়ে চললাম। আমাদের যেন আলাপ-আলোচনার কোন অবসরই ছিলো না। মাঝে মাঝে আফাজুদ্দিন সাহেব হা-হুতাশ করে বলতেন, "হায়রে আমরা এমন সুন্দর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়লাম।" তার এ বিলাপ আমাদের সৌন্দর্য পিপাসা আরও বাড়িয়ে দিলো।

আমাদের গাড়ি চীফ সেক্রেটারির অফিসে পৌঁছার সাথে সাথেই তিনি আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন এবং উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন। তিনি তার গাড়িতে উঠে আমাদের গাড়ির সামনে যেয়ে পেছনে পেছনে আসতে ইশারা করলেন। কয়েক মিনিট পরই আমরা সার্কিট হাউজে পৌঁছলাম। আমাদের জন্য বরাদ্দ কামরায় যেয়ে গোসল করে দুপুরের খাবারের জন্য প্রস্তুত হবার জন্য তিনি পরামর্শ দিলেন। চীফ সেক্রেটারি সাহেব আমাদেরকে নিয়ে অতি নিকটেই অবস্থিত মসজিদে যোহরের নামায আদায় করলেন। এর পরপরই তিনি আমাদেরকে খাবার টেবিলে নিয়ে গেলেন এবং আমাদের সাথেই খেলেন। আমরা তার অমায়িক ব্যবহার ও অতিথিপরায়ণতায় মুগ্ধ হলাম। টুপি পরিহিত খাটো আকারের স্বাস্থ্যবান মানুষটি আমাদেরকে অল্প সময়ের মধ্যেই আপন করে নিলেন।

খাবার সময় তিনি ঢাকায় কয়েক বছর কর্মরত থাকাকালীন স্মৃতিচারণ করে আফসোস করলেন যে, সেখানে আর যাবার সুযোগ রইলো না। খাবার পর তিনি আমাদেরকে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দিয়ে বলে গেলেন যে, তিনি আমাদের সাথেই আসরের নামায আদায় করবেন।

নামাযের পর তিনি আমাদের সাথে আলোচনায় বসলেন। তিনি কি কি কারণে বাঙালি মুসলমানদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন তা উল্লেখ করে জানালেন যে, ঐ ভালোবাসার টানেই আমাদেরকে এখানে আনা কর্তব্য মনে করেছেন। আমরা যে মানসিক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি তা উপলব্ধি করেই হয়তো তিনি আমাদেরকে মেহমান হিসেবে সমাদর করে খুশি করতে চেয়েছেন। আমাদেরকে কাশ্মীর দেখার সুযোগদান করায় আমরা সবাই আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম এবং তার আতিথেয়তায় আমরা অত্যন্ত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট বলে প্রকাশ করলাম। কাশ্মীরের সৌন্দর্যের প্রশংসা আমরা অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখার সুযোগ পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত বলে জানালাম।

কাশ্মীরে দেখার মতো যা যা আছে তা দেখাবেন বলে জানালেন এবং এর জন্য আমাদের সাথে পরামর্শ করে সময়সূচি প্রণয়ন করলেন। যেদিন পৌঁছলাম, এরপর মাঝখানে একদিন থেকে তৃতীয় দিন আমরা ইসলামাবাদ ফিরে গেলাম। এ সময়ের মধ্যে প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ, সচিবালয় দেখা, শহর ঘুরে দৃশ্য দেখার সকল কথা মনে নেই। তবে সরকারি ডিগ্রি কলেজের কথা বিশেষ কারণে সুস্পষ্ট মনে পড়ে। ডিগ্রি কলেজ একটিই মাত্র। তাই ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে একই কলেজে ভর্তি করেও শরীআতের সকল সীমা রক্ষা করা কিভাবে সম্ভব, এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। কলেজের গোটা ক্যাম্পাস দু'ভাগে বিভক্ত। কলেজে ছাত্রদের প্রবেশ পথ যেদিকে ছাত্রীদের প্রবেশ পথ এর বিপরীত দিকে। কলেজ প্রাঙ্গণের মাঝখানে উঁচু দেয়াল। ছাত্র ও ছাত্রীদের মেলামেশা দূরের কথা পরস্পরের দেখা হওয়ারও কোন সুযোগ নেই।

আমরা ক্লাসরুমে ঢুকে অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হলাম। ক্লাসরুমের মাঝখানে দেয়াল। দেয়ালের একপাশে ছাত্রদের জন্য আসন, অপর পাশে ছাত্রীদের জন্য

বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই শিক্ষক একসাথেই ক্লাস নেন। শিক্ষক ছাত্র ও ছাত্রীদেরকে অবশ্য দেখতে পান। কিন্তু ছাত্ররা ছাত্রীদেরকে দেখতে পায় না। এমন চমৎকার ব্যবস্থা কাশ্মীর ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। পাকিস্তানের ছাত্রীদের জন্য পৃথক কলেজ, এমনকি মেডিক্যাল কলেজেও আছে। কিন্তু একই কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ার ব্যবস্থা করেও কো-এডুকেশনের কুফল থেকে রক্ষা করার এমন চমৎকার কৌশল দেখে আমরা সবাই মুগ্ধ হলাম। আমি জানি না যে, এখনও এ পদ্ধতি সেখানে চালু আছে কিনা। ছাত্রীদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান করার সাধ্য না থাকলে এ ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া যায়।

রেডিও থেকে আমার বক্তৃতা

আমাকে অনুরোধ করা হয় যে, আযাদ-কাশ্মীরে ইসলামী আদর্শ কায়েমের যে প্রচেষ্টা চলছে এ বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে যেন রেডিওতে বক্তব্য রাখি। কাশ্মীরী ভাষা তো আমার জানা নেই। কিন্তু শিক্ষিত সবাই উর্দু বুঝতে সক্ষম বলে উর্দুতেই বলার পরামর্শ দিলেন। ভারত থেকে পৃথক স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে হলে ইসলামই যে একমাত্র রক্ষাকবচ সে কথার গুরুত্ব বুঝাবার চেষ্টা করলাম। মাত্র ১০ মিনিট বক্তৃতা করলাম। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও বললাম যে, পাকিস্তানে ইসলামী আদর্শ কায়েমের চেষ্টা না করায়ই পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো এবং ভারতের আধিপত্য সেখানে কায়েমের সুযোগ হলো।

প্রেসিডেন্টের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

আযাদ-কাশ্মীরের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে সরদার আবদুল কাইয়ুম খান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মাওলানা মওদূদীর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। সে সুবাদে লাহোরে মাওলানার বাসভবনেই তার সাথে আমার দেখা-পরিচয়। একবার এক বিশেষ উপলক্ষে রাওয়ালপিন্ডিতেও দেখা হয়। তিনি অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির লোক। সত্যিকার জননেতার গুণাবলিতে তিনি ভূষিত ছিলেন।

তার অফিসেই আমরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করি। আযাদ-কাশ্মীরে আসার জন্য আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়ায় তার শুকরিয়া জানাই। পাকিস্তান দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। ভারতীয় সেনানায়কের নিকট পাকিস্তানের সেনায়কের আত্মসমর্পণের জন্য অত্যন্ত বেদনাবোধ করেছেন বলে জানালেন। এ উপমহাদেশের ইতিহাসে এটা চরম কলঙ্কজনক ঘটনা বলে তিনি মন্তব্য করলেন। তিনি আযাদ-কাশ্মীরে ইসলামী আদর্শের বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন বলে আমরা মুবারকবাদ জানালাম। আর পাকিস্তানে তা করা হচ্ছে না বলে আফসোস করলাম

চীফ-সেক্রেটারির সাথে ইসলামাবাদে সাক্ষাৎ

আযাদ-কাশ্মীরের চীফ সেক্রেটারি সাহেব একবার এসে ইসলামাবাদ গভর্নমেন্ট হোস্টেলে উঠলেন। ফজরের নামাযের সময় মসজিদে দেখা। তাঁর লম্বা জামা ও দীর্ঘ দাড়ি থাকায় যিনি ইমামতি করেন তিনি তাঁকেই নামায পড়াবার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি সূরা সাজদাহ সহীভাবে তিলাওয়াত করে নামায সমাধা করলেন।

আমি তাঁর ইমামতিতে মুগ্ধ হলাম। একজন সিএসপি অফিসার এমন গুণের অধিকারী হতে পারেন এ অভিজ্ঞতা আমার ছিলো না।

নামাযের পর তিনি আমার কামরায় আসার জন্য সময় নির্ধারণ করলেন। যথাসময়ে আসলেন। তিনি বললেন, "আমি মাওলানা মওদূদীর অনেক বই পড়েছি। আধুনিক শিক্ষিত লোককে ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেবার মতো এমন চমৎকার বই এর আগে পাইনি। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান হিসেবে সঠিক ধারণা আলেম সমাজেরও কম। আমি তাবলীগ জামায়াতেও চিল্লা দিয়েছি। এ জামায়াতের চিল্লাপদ্ধতি আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার ধারণা যে, জামায়াতের লোকেরা যদি তাবলীগের চিল্লায় যান তাহলে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা তাবলীগের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারবেন। তারা ইসলামকে শুধু ধর্ম হিসেবেই বুঝেন। জামায়াতের কর্মীদের সুহবতে তারা জীবনবিধান হিসেবে ইসলামকে জানার সুযোগ পাবেন। আপনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পূর্বে তাবলীগ জামায়াতে চিল্লা দিয়েছেন বলে জানতে পেরে আপনার নিকট এ প্রস্তাব রাখলাম। ইসলাম সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপক ধারণা তাবলীগ জামায়াতের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারলে তাবলীগের সাথে সম্পর্কিত বিরাট সংখ্যক দীনদার লোক ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হতে পারে, এ ধারণাই আমাকে এ প্রস্তাব রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমার খুব দুঃখ বোধ হয় যে, ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও ব্যাপক ধারণা অনেক দীনদারের মধ্যেও নেই।"

আমি তাঁর আন্তরিকতা ও আবেগপূর্ণ বক্তব্যে দীন ইসলামের জন্য তাঁর ঐকান্তিক দরদ অনুভব করলাম। আল্লাহর এই মুখলিস বান্দার প্রতি আমার ভালোবাসা বেড়ে গেলো। আমি তাঁর জযবার প্রশংসা করে বললাম, "তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে অনেকে বিভিন্ন রকম মন্দ ধারণা পোষণ করে। এমনকি এটাকে ইসলাম বিরোধী কোন মহলের সুপরিকল্পিত কর্মসূচি বলেও কেউ কেউ মনে করে। তাবলীগ জামায়াতে দীর্ঘদিন যথাযথ দায়িত্বশীল থাকায় এ জামায়াত সম্পর্কে আমি যথাযথ ধারণা রাখি। তাই আমি জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পরও তাবলীগ জামায়াতকে ভালোবাসি। এর দ্বারা ইসলামের যেটুকু খিদমত হচ্ছে তা মূল্যবান বলে মনে করি। তাদের এ খিদমত সত্ত্বেও একটি কারণে ইসলামের ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে। যদি তাদের কথায় মানুষের মধ্যে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, তাবলীগ জামায়াতে দীনের যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হয় ততটুকুই পূর্ণ ইসলাম, তাহলে তা অত্যন্ত মারাত্মক ক্ষতির কারণ হবে। এটুকুকে 'নবীওয়ালা কাম' বলে ধারণা দেওয়া হলে অত্যন্ত ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে। আমি যখন তাবলীগে কাজ করেছি তখন এ ধরনের কথা বলতে শুনিনি।

নবীর দাওয়াত এটুকুতে সীমাবদ্ধ ছিলো না। সকল নবীর দাওয়াতেই বাতিল শক্তি বাধা দিয়েছে। হক দাওয়াতকে স্বাভাবিকভাবেই বাতিল সহ্য করতে পারে না। অথচ দুনিয়ার কোথাও তাবলীগের দাওয়াতের সাথে বাতিলের কোন সংঘর্ষ হয় না। জনসমর্থনের দিক দিয়ে তাবলীগ জামায়াত বিশ্বে সবচেয়ে বড় জামায়াত। অথচ এ জামায়াতের কেন্দ্র দিল্লিতে। ভারতের মতো মুসলিম ও ইসলাম বিদ্বেষী

দেশের বর্তমান হিন্দু সাম্প্রদায়িক সরকার পর্যন্ত তাবলীগের কাজকে তাদের জন্য ক্ষতিকর মনে করে না। এর কারণ, তাবলীগ জামায়াত শুধু একটি ধর্মীয় সংস্থা, ইকামাতে দীনের সংগঠন নয়।"

তাবলীগ জামায়াত সম্পর্কে আমার দীর্ঘ মন্তব্য শুনে চীফ সেক্রেটারি সাহেব আমার সাথে একমত হয়ে বললেন, "তিরিশের দশকে পাঞ্জাবের মিওয়াত নামক এলাকায় তাবলীগ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ইলইয়াস (র) এ কাজের সূচনা করেন। তখন ঐ এলাকায় অশিক্ষিত মুসলমানদের এমন অবস্থা ছিলো যে, তাদের জীবনে ইসলামের কিছুই ছিলো না। মাওলানা ইলইয়াস (র) এ কাজের মাধ্যমে তাদেরকে মুসলিম চেতনা দান করেন এবং ইসলামের এটুকু শিক্ষা তাদের মধ্যে চালু করেন।"

আমি বললাম, "ইংরেজের দীর্ঘ গোলামির যুগে মুসলিম জাতি যে নির্যাতন ও বিপর্যয়ের শিকার হয় তাতে ধর্ম হিসেবেও বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম টিকে থাকতে পারেনি। ১৮৬০-এর দশকে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানতুবী ও তাঁর সাথীদের প্রচেষ্টায় দেওবন্দে ইসলামী শিক্ষা-আন্দোলন শুরু না হলে এবং ওলামা বাহিনী সৃষ্টি না হলে সারা ভারতবর্ষে এতো মাদরাসা কায়েম হতো না। ইসলামের এ শিক্ষা আন্দোলনের ফলেই কুরআন ও হাদীসের চর্চা বেঁচে আছে। সরকারি সাহায্য ছাড়াই এ মাদরাসা শিক্ষা বিস্তারে আলেম সমাজের বিরাট কুরবানী রয়েছে। এ আন্দোলন গড়ে না উঠলে উপমহাদেশে ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না।

ইংরেজ শাসনামলে এ মাদরাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের কোন সুযোগ-সুবিধা ছিলো না। তাঁরা মসজিদ ও মাদরাসার খিদমত ও ওয়ায-নসীহত করেই জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হন। এ পরিস্থিতিতে তারা ইসলামের শুধু ধর্মীয় দিকটুকু বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। মসজিদ, মাদরাসা ও খানকার মাধ্যমে যেটুকু দীনের আলো বিতরণ করা হয়েছে এটুকু শিক্ষা থেকেও যারা বঞ্চিত তাদেরকে দীন-শিক্ষা দেবার জন্যই তাবলীগ জামায়াতের জন্ম। যারা মাদরাসা ও খানকায় যেতে পারলো না তারাই তাবলীগ জামায়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। তাবলীগের শিক্ষকগণের অনেকেই আলেম। এ জন্যই তাবলীগ জামায়াত নিজেকে 'চলতা-ফিরতা' (চলমান) মাদরাসা ও খানকাহ বলে থাকে।

এরপর চীফ সেক্রেটারি সাহেব তার প্রস্তাব সম্পর্কে আমার অভিমত জানতে চাইলেন। আমি তাকে এ বিষয়ে আমার ব্যর্থ প্রচেষ্টার কাহিনী শুনালাম। বললাম, যে ঢাকাস্থ কাকরাইল মসজিদে তাবলীগ জামায়াতে আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহকর্মীকে মাওলানা মওদূদীর ঈমানের হাকীকত, 'ইসলামের হাকীকত' ও 'নামায-রোযার হাকীকত' বই পড়তে দিলাম। এক সপ্তাহ পরে এ বইগুলো ফেরত নেবো এবং অন্য আরও বই দেবো বলে জানালাম। নির্দিষ্ট দিনে পেলাম। যাবার সাথে সাথেই সব বই আমাকে ফেরত দিলেন। বইগুলো কেমন লাগলো জানতে চাইলাম। সবাই একবাক্যে বললো যে, তারা কেউ কোন বইই পড়েননি। অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করে না পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, "এসব বই পড়া

মুরুব্বীদের মানা আছে।" জিজ্ঞেস করলাম, মুরুব্বীদের জিজ্ঞেস করলেন কেন? জওয়াবে বললেন, ইসলামী বই তাদের অনুমোদন নিয়েই পড়ার নিয়ম রয়েছে।

আমার জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর তাবলীগ জামায়াতের নেতৃবৃন্দের বিরূপ প্রতিক্রিয়া আমার জানা ছিলো। তাদের ধারণা যে, এসব বই পড়ে আমি গোমরাহ হয়ে গেছি। তাই আমার মতো আর কেউ যেন গোমরাহ না হয় সে উদ্দেশ্যেই মুরুব্বীদের অনুমোদনের বিধান চালু হয়েছে। পুরানো বন্ধুদেরকে শুধু এটুকু বলেই বিদায় হলাম, "অন্য বই পড়লেই যদি ঈমান বিপন্ন হবার ভয় থাকে তাহলে এতো দুর্বল ঈমান কেমন করে রক্ষা করবেন?"

চীফ সেক্রেটারি সাহেব বললেন, "এ পদ্ধতি তাদের জন্য উপযোগী নয় বলেই আমার প্রস্তাবটি ভিন্ন ধরনের।" আমি বললাম যে, চিল্লায় যারা যান তাদেরকে সর্ব সময়ই তাদের নির্দিষ্ট কর্মসূচিতে ব্যস্ত রাখে। যেখানে জামায়াতের লোক তাবলীগের চিল্লায় যেয়ে তাদের তালীমী নেসাবের বাইরে ইসলামের অন্য কোন শিক্ষা পরিবেশনের কোন সুযোগই পাবে না এ ধরনের চেষ্টা করতে গেলে দায়িত্বশীলরা কিছুতে তা করতে দেবে না।

আমি আরও জানালাম যে, আমি তাবলীগের দায়িত্বশীল থাকাকালে নামাযের হাকীকত সম্পর্কে বক্তব্য রাখায় অন্য এক দায়িত্বশীল আপত্তি তুললেন। তাবলীগ জামায়াতে শুধু ফাযায়েল আলোচনা হয়, হাকীকত আলোচনার কোন অনুমতি নেই। তার প্রস্তাব বাস্তবসম্মত নয় বলে মন্তব্য করার পর তিনি অত্যন্ত আফসোস করে বললেন, "তাবলীগ জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট এতো বিরাট সংখ্যক মুসলিম-মুসলমান ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যাচ্ছেন। আর ইকামাতে দীনের আন্দোলনও এ বিরাট শক্তির সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত থাকছে।"

আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, "আমি মনে করি যে, জামায়াতে ইসলামীর সাথে তাবলীগ জামায়াতের পারস্পরিক বিরোধিতার কোন কারণ নেই। জামায়াত আল্লাহর আইন কায়েম করার যোগ্য লোক তৈরি করার চেষ্টা করছে। তাবলীগ জামায়াত যাদেরকে তৈরি করছে তারা আল্লাহর আইন কায়েম হলে জোশের সাথে মেনে নেবেন। তাবলীগ জামায়াত দীনের মুজাহিদ না বানালেও, মানুষকে দীনদার তো বানাচ্ছে।

চীফ সেক্রেটারি সাহেবের সাথে ঐ সাক্ষাতের পর দু'মাস পরই আমি হজ্জের উদ্দেশ্যে চলে যাই। তাই তার সাথে আর দেখা হয়নি।

পাকিস্তান থেকে বের হবার ধান্দা

মাওলানা আবদুর রহীম আমাদের থেকে আলাদা হয়ে করাচী চলে যাবার পর তার সাথে যোগাযোগই ছিলো না। একবার করাচীতে জনাব মুসলিম আলীর বাসায় যেয়ে আমি দেখা করেছি। এডভোকেট আফাজুদ্দীন সাহেব সপরিবারে ইসলামাবাদে থাকায় তার পক্ষে পাকিস্তান থেকে বের হবার চিন্তা করা সম্ভব ছিলো না।

আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান মাওলানা মওদূদীর সাথে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নিলাম যে, হজ্জ উপলক্ষে পাকিস্তান তেকে বাইরে যাবার সুযোগ নিতে হবে।

যথাসময়ে আমরা হজ্জের জন্য সরকারি ফরমে দরখাস্ত দিলাম। অক্টোবর (৭২) সাল মাসেই সরকারি অনুমতি ও 'পিলগ্রীম পাস' পেয়ে গেলাম। পাসপোর্টের বদলে শুধু হজ্জের উদ্দেশ্যে এ পাস দেওয়া হতো। আমরা পাসপোর্ট ব্যবহার করলাম না, যাতে সরকার মনে করে যে, আমরা হজ্জ করে ফিরে আসবো। তাই অন্যান্য পাকিস্তানি হজ্জযাত্রীর মতোই আমরা 'পিলগ্রাম পাস' নিয়েই যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের স্টিমারে উঠার তারিখ পেলাম। সেকালে বিমানে যাবার প্রচলন ছিলো না। সব হজ্জযাত্রী জাহাজে জলপথেই যেতো। এ দেশ থেকে চট্টগ্রামে জাহাজে উঠতে হতো। ভারতবাসীরা বোম্বে থেকে এবং পাকিস্তানিরা করাচী থেকে জাহাজে আরোহণ করে জেদ্দা পৌঁছতেন।

করাচী থেকে জেদ্দা পৌঁছতে এক সপ্তাহ লাগার কথা। হজ্জ ও ওমরাহ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল জানার জন্য এ সময়টা সবচেয়ে উপযোগী। মক্কা শরীফ পৌঁছার জন্য মানসিক প্রস্তুতি ও আবেগ সৃষ্টির জন্য পথে এ সময়টা পাওয়ার প্রয়োজনীয়তা সবাই উপলব্ধি করতো। আজকাল বিমানে হঠাৎ করে উড়াল দিয়ে ফুড়ুৎ করে জেদ্দা পৌঁছলে ঐ সুযোগ পাওয়া যায় না। অবশ্য হাজী ক্যাম্পে কয়েকদিন থাকলে ঐ উদ্দেশ্য কিছুটা পূরণ হয়।

১২৮.

হজ্জের প্রস্তুতি

আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান স্বাভাবিক আবেগ উৎসাহ ও আনন্দের সাথে হজ্জে যাবার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিতে ব্যস্ত হলাম। নভেম্বর তৃতীয় সপ্তাহে (৭২ সাল) দু'জন এক সাথেই করাচী গেলাম। আমি যতবারই করাচী গিয়েছি, জামায়াতের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা আমাকে হোটেলে উঠতে দেননি। দীনী ভাইদের কারো বাড়িতেই থাকার সুবন্দোবস্ত করেছেন। এবার জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর অধ্যাপক আবদুল গফুর আহমদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো। এর আগেও একবার কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে ছিলাম।

হজ্জ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ভাইয়েরা আমাদের দু'জনকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো মুআল্লিম সম্পর্কে। যারাই হজ্জ করতে যান, তাদেরকে কোন মুআল্লিমের তত্ত্বাবধানেই থাকতে হয়। মক্কা ও মদীনায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, মিনা ও আরাফাতে নিয়ে যাওয়া, মিনায় তাঁবুতে কয়েকদিন অবস্থান ইত্যাদি মুআল্লিমরাই করে থাকে।

মাওলানা মওদূদী (র) যখন হজ্জে গেলেন, তখন মুআল্লিম আকীল আত্তাসের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এরপর থেকে পাকিস্তান থেকে জামায়াতের লোকেরা এই মুআল্লিমের কাছেই যেতেন। আমাদেরকেও তাঁরই তত্ত্বাবধানে হজ্জ করার পরামর্শ দিলেন। অবশ্য আকীল আত্তাস ৭২ সালের আগেই ইন্তিকাল করেছেন। মুআল্লিম

মারা গেলেও ফার্ম হিসেবে মূল মুআল্লিমের নামেই তাঁর সন্তানরা দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাই আমাদের সুটকেস ও বেডিং-এ আরবী ও ইংরেজিতে মুআল্লিম আকীল আত্তাসের নাম আর্টিস্ট দিয়ে লিখিয়ে নিলাম।

নির্দিষ্ট তারিখে আমরা দু'জন একসাথেই করাচী বন্দরে হজ্জের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট জাহাজে আরোহণ করার জন্য পৌঁছলাম। আমাদের মাল-সামান জাহাজে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনে পৌঁছাবার জন্য নিয়ে গেলো।

অন্যান্য সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর আমরা সর্বশেষ সরকারি অনুষ্ঠানের জন্য ইমিগ্রেশন কাউন্টারে পৌঁছলাম। আমরা লাইনে দাঁড়ালাম। সিরিয়াল অনুযায়ী মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হানের আমার আগে থাকায় তাঁরই পেছনে আমি দাঁড়ালাম। একে একে সারির সবাই পার হয়ে যেতে থাকলো। মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হানও পার হয়ে গেলেন। কিন্তু জানি না কি কারণে আমাকে লাইন থেকে সরিয়ে একটা চেয়ারে বসতে দেওয়া হলো। আমার পরে যারা লাইনে দাঁড়ানো ছিলেন তারাও যথারীতি পার হতে থাকলেন। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে কেন আটক করা হলো?" ইমিগ্রেশন অফিসার "আপনি বসুন, পরে বলবো" বলে জওয়াব দিলেন।

মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হান সাহেবকে অন্যান্য হজ্জ যাত্রীদের সাথে স্টিমারে নিয়ে যাওয়া হলো। আমার জন্য অপেক্ষা করা তাঁর সম্ভব ছিলো না। আমাকে কেন যেতে দেওয়া হলো না তা তিনি জেনে যেতে পারলেন না।

ঘণ্টাখানিক অপেক্ষা করে আমি ঐ অফিসারকে বললাম, "আমাকে এভাবে কেন বসিয়ে রাখলেন তা আমি জানতে চাই।" আমাকে তখন ইমিগ্রেশনের বড় কর্তার কামরায় নিয়ে গেলেন। আমাকে সসম্মানে ঐ কর্মকর্তা বসতে দিলেন এবং নাশতা পরিবেশন করলেন। আমার তখন নাশতা করার মতো মেজাজ ছিলো না। আমি বিরক্তির সাথে বললাম, "ব্যাপারটা কী? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে না কেন?"

তিনি বললেন, "আমরা উপর থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।" আমি বললাম, "আমাকে ইসলামাবাদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারির সাথে ফোনে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন। তিনি আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত। হয়তো সঠিক খবর জানতে পারবো।

ডেপুটি সেক্রেটারি (নামটা কিছুতেই যোগাড় হলো না) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে সিএসপি অফিসার হন। তিনি এক বিহারী পরিবারের সন্তান হলেও স্কুল-কলেজে বাংলা মাধ্যমেই পড়েছেন। ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্র সংগঠনে সক্রিয় ছিলেন। ইসলামাবাদে থাকাকালে আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হান তাঁর সরকারি বাসায় দাওয়াত খেয়েছি। ঢাকার স্মৃতিচারণ করে আফসোস করতেন যে, আর সেখানে যাবার উপায় রইলো না। স্বাভাবিকভাবেই বাল্য ও কৈশোর কাল যে আবহাওয়ায় কাটে তাতে অভ্যস্ত হবার কারণে ভিন্ন আবহাওয়ায় বসবাস করে তৃপ্তি

হয় না। যে এলাকায় ছোট থেকে বড় হয় সে মাটির সাথে আবেগময় সম্পর্ক গড়ে উঠে। এসব কথা তিনি আলোচনা করলেন। মনে পড়ে এক পর্যায়ে তিনি আবেগের সাথেই বললেন, "পুঁইশাক ও চিংড়ি মাছের চচ্চরি আমার খুবই প্রিয় ছিলো। এখানে তা কোথায় পাবো?"

যাহোক তাঁর সাথে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা তারা করছেন বলে দেখালেন বটে। কিন্তু কোন যোগাযোগ হলো না। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত ইমিগ্রেশনে পড়ে থাকার পর স্টিমার থেকে আমার মালামাল ফেরত এনে আমাকে জানালো যে, সরকার আমার উপর পাকিস্তানের বাইরে যাবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

টেলিফোনে করাচীস্থ জামায়াত অফিসে এ খবর জানালাম। অফিস সেক্রেটারি রজব আলী সাহেব এসে আমাকে নিয়ে গেলেন। আমাকে হজ্জে যেতে না দেবার খবরটা জামায়াত অফিস থেকে সকল পত্রিকায় পাঠানো হলো। পরের দিন করাচীর সকল সিন্ধি, ইংরেজি ও উর্দু দৈনিক বেশ গুরুত্বসহকারে খবরটা প্রকাশ করলো। ভুট্টো বিরোধী পত্রিকায় দুই বা তিন কলাম শিরোনামে খবরটি প্রকাশ পেলো। জামায়াতের দৈনিক জাসারাতে তো ব্যানার হেড ছিলো। হেডিং-এর ভাষা ছিলো, "কেয়া গোলাম আযম বাঙালি হ্যায় তো মুসলমান নেহী হ্যায়?" খুবই আক্রমণাত্মক ভাষায় খবরটি জামায়াত অফিস থেকে পরিবেশন করা হয়। পত্রিকায় সেভাবেই প্রকাশিত হয়।

এ খবরের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

এ খবর পত্রিকায় ফলাও হবার পরদিন পত্রিকায় এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো। মুসলিম লীগের দু'গ্রুপ কয়েকটি ইসলামী দল এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদমূলক বিবৃতি প্রকাশিত হলো। এর পরের দিন আরও বিবৃতি পত্রিকায় দেখা গেলো। করাচী ও লাহোরের কয়েকটি পত্রিকায় এ বিষয়ে তীব্র সমালোচনা করে সম্পাদকীয়ও লেখা হলো।

৪র্থ দিন ইসলামাবাদ থেকে হজ্জ ও আওকাফ মন্ত্রী মাওলানা কাওসার নিয়াজী আমার সাথে টেলিফোনে কথা বললেন। আমি যে বাড়িতে ছিলাম ঐ বাড়ির ফোনেই কথা হলো। তিনি বললেন, "আগামীকাল সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সাথে আপনার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনি আজ রাতের ফ্লাইটেই ইসলামাবাদ চলে আসুন। করাচীতে ইমিগ্রেশন আপনার সাথে যে আচরণ করেছে তাতে প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত দুঃখিত। তাই তিনি আপনার সাথে এ বিষয়ে সাক্ষাতে কথা বলতে চান।"

ফোনে আমি বললাম, "আজই রাতের ফ্লাইটে আমাকে যেতে বলছেন, অথচ টিকেট ও আসন পাওয়া যাবে কিনা জানি না।" তিনি বললেন, আপনি প্রস্তুত হয়ে এয়ারপোর্টে যান, আপনার জন্য সিট বুক করা আছে। আপনার টিকেটও কাউন্টারে গেলেই পাবেন। ইসলামাবাদে করাচী থেকে সরাসরি ফ্লাইট আগামীকাল দিনে নেই। মাগরিবের পরপরই প্রেসিডেন্টের সাথে আপনার সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট

করা হয়েছে। তাই আজ রাতেই আপনাকে আসতে হবে।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে জানতে চাইলাম যে, প্রেসিডেন্টের অফিসে সরাসরি চলে যাবো কিনা? তিনি আমাকে তাঁর ফোন নম্বর দিলেন এবং ইসলামাবাদে পরদিন সকাল ১০টায় যোগাযোগ করতে বললেন।

মাওলানা কাওসার নিয়াজী

মাওলানা কাওসার নিয়াজী আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের পূর্ব পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী লাহোর শহর শাখার আমীর ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ছিলেন। সে সুবাদে তাঁর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। একবার গ্রীষ্মকালে মজলিসে শূরার অধিবেশন ছিলো। অধিবেশন শেষে তিনি মোঘল আমলের বিখ্যাত শালিমার বাগে এক বিকালে এক বিনোদন অনুষ্ঠান করলেন। এতে ছাত্র-অছাত্র মিলে ৩০/৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন। আমাকে বিশেষ মেহমান হিসেবে নিয়ে গেলেন। এটা সম্ভবত ১৯৫৮ সালের জুন মাসের কথা। অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় 'দাওয়াতে আম'। উর্দুতে আম (আইন দিয়ে লিখলে) মানে সাধারণ। আম (আলিফ দিয়ে লিখলে) অর্থ হয় আম নামক ফল। এ ফলকে বাংলা, উর্দু, হিন্দি ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় আম-ই বলা হয়। 'দাওয়াতে আম' কথাটির মধ্যেও দ্ব্যর্থবোধক রসিকতা করা উদ্দেশ্য ছিলো। এটা একটা সাধারণ দাওয়াত এবং একই সাথে আম খাওয়ার দাওয়াত ছিলো। পাকিস্তানের সেরা মিষ্টি আম ঐ অনুষ্ঠানে সবাইকে প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানো হয়।

এ বিনোদন অনুষ্ঠানের পরিচালক ও মধ্যমণি ছিলেন মাওলানা কাওসার নিয়াজী। ঐ সময় তাঁর বয়স ৩৫ ও ৪০-এর মধ্যে। অত্যন্ত সুন্দর চেহারায় কুচকুচে কালো দাঁড়িতে দেখতে বেশ আকর্ষণীয় ছিলেন। তিনি কবিতা লিখতেন জানতেন। ঐ অনুষ্ঠানে তিনি সুমিষ্টকণ্ঠে নাত শুনালেন। গায়ক হিসেবে আমি তাকে জানতাম না। আরও কয়েকজন হামদ, নাত ও ইসলামী জযবার গান শুনালেন। আমাকে সবাই চাপ দিলেন বাংলা নাত শুনাবার জন্য। ইতঃপূর্বে এক ধারাবাহিক সংখ্যায় উল্লেখ করেছি যে, ছাত্রজীবনে কবি নজরুল রচিত ও প্রখ্যাত গায়ক আব্বাসুদ্দীনের কণ্ঠে দ্রুত বেশ কয়টি নাত আমি গাইতাম। কোন অনুষ্ঠানে কখনো শুনাইনি। ঘরোয়াভাবে গাইতাম। এমএ পরীক্ষার পর তাবলীগ জামায়াতের চিল্লায় লেগে গেলাম। গান গাওয়ার সুযোগও আর রইলো না, মনোভাবও বাকি থাকলো না।

ঐ অনুষ্ঠানে সবাই বাংলা নাতের নমুনা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি একটি নাতের কয়েকটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শুনালাম এবং উর্দুতে অনুবাদ করলাম। কবি নজরুলের ঐ নাতটি আমার খুব প্রিয় হলেও চর্চার অভাবে সবটুকু মুখস্থ না থাকায় অল্প একটু শুনালাম। নাতটির অনেক শব্দ তারা বাংলা শুনেই বুঝতে পারলেন।

নাতটির প্রথম পঙ্ক্তিটি উদ্ধৃত করছি ঃ

মুহাম্মদ নাম জঁপেছিলি বুলবুলি তুই আগে
তাই কিরে তোর কণ্ঠেরই গান এমন মধুর লাগে।

আমি কয়েকটি পঙ্ক্তি শুনিয়ে উর্দুতে অনুবাদ করার পর তারা সবাই সুর দিয়ে গেয়ে শুনাবার জন্য জোর আবদার জানালো। বহু বছর থেকে গাই না বলে হঠাৎ অনভ্যস্থ কণ্ঠে গাইতে অস্বীকার করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের দাবি মানতে বাধ্য হলাম। আমি বিস্মিত হলাম যে, তাদের একজন আমার সুর নকল করে প্রথম পঙ্ক্তিটি চমৎকারভাবে আমার চেয়ে অনেক মিষ্টি কণ্ঠে শুনিয়ে সবাইকে আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে দিলো।

কাওসার নিয়াজীর অধঃপতন

আইয়ূব খানের সামরিক শাসনামলে (১৯৫৮-৬২ পর্যন্ত) মাওলানা কাওসার নিয়াজী ওয়াযের পেশা গ্রহণ করেন। সুদর্শন ও সুকণ্ঠের অধিকারী হওয়ায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ওয়ায়েযে পরিণত হন। ১৯৬২ সালের জুন মাসে সামরিক শাসনের অবসানের সাথে সাথেই জামায়াতে ইসলামী সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু করে। মাওলানা কাওসার নিয়াজী লাহোর শহর জামায়াতের আমীর হিসেবে প্রকাশ্যে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হন। লাহোরের মতো বিরাট শহরের সাংগঠনিক দায়িত্ব যথাযথরূপে পালন করতে গেলে ওয়াযের দাওয়াত আগের মতো নেবার অবসর পাওয়া সম্ভব হতে পারে না। তাই সংগঠন তাঁকে ওয়াযে যাওয়া বন্ধ করার জন্য চাপ দিলো। তিনি ওয়ায বন্ধ করা সম্ভব নয়, কিছু কমাতে সম্মত বলে জানালেন। আগে তিনি সার্বক্ষণিক দায়িত্বশীল হিসেবে যে ভাতা পেতেন তাতে কোন রকমে সংসার চলতো। ওয়াযের পেশা তাঁর পারিবারিক জীবনে যে বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে তা ত্যাগ করে আবার আগের মতো ভাতায় চলা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। ওয়ায চালু থাকায় শহর-সংগঠনের দাবি অনুযায়ী সময় দেওয়াও সম্ভব হচ্ছিলো না। তাই তাঁকে শহরের আমীর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে প্রাদেশিক পর্যায়ে একটি পদ দেওয়া হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় যে, তিনি ওয়ায উপলক্ষে যেখানেই যান সেখানকার সংগঠনেও কিছু সময় দেবেন।

কিছুদিনের মধ্যেই অভিযোগ উঠলো যে, তিনি ওয়ায়েয হিসেবে যাতায়াত খরচ পাওয়া সত্ত্বেও সাংগঠনিক সফর করার সুবাদে একই জায়গার সংগঠন থেকেও যাতায়াত খরচ নেন। এ নিয়ে তার সাথে সংগঠনের মন কষাকষি চললো। জামায়াতের সাথে মানসিক দূরত্ব বাড়তে থাকে। পত্রিকায় তাঁর মুখ থেকে জামায়াতের সমালোচনামূলক মন্তব্যও প্রকাশ পেতে লাগলো। জামায়াতের দায়িত্বশীলদের ভাতার বিরুদ্ধেও তাঁর মন্তব্য পত্রিকায় এলো।

সম্ভবত ১৯৬৭ সালের কথা। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় তখন তিনি ছিলেন না। ইতঃপূর্বে তিনি লাহোর শহরের প্রতিনিধি হিসেবে শূরার সদস্য ছিলেন। সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির কারণে সূরার সদস্য পদও তখন ছিলো না। কেন্দ্রীয় শূরার অধিবেশনের পূর্বে কর্মপরিষদে মাওলানা কাওসার নিয়াজীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতার অভিযোগ উঠলো। পত্রিকায় প্রকাশিত জামায়াত সম্পর্কে তাঁর কতক মন্তব্য প্রকাশিত হবার দরুন তাঁকে জামায়াত থেকে বহিষ্কার করা প্রয়োজন

বলে মতামত এলো। আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী বললেন যে, বহিষ্কার না করে তাঁকে রুকনিয়াত থেকে অব্যাহতি নেবার পরামর্শ দিতে পারেন।

দু'দিন পর জামায়াতের কেন্দ্রীয় শূরার বৈঠক হয়। ঐ সময় মাওলানা নিয়াজী সংবাদ সম্মেলন ডেকে জামায়াতের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে জামায়াত থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিলেন। শূরা সদস্যগণ আমীরে জামায়াতের সমালোচনা করে বললেন যে, তাঁকে যথাসময়ে বহিষ্কার করা হলে এভাবে জামায়াতকে লাথি মেরে বের হতে পারতেন না। মাওলানা এর জওয়াবে বললেন, "আমি তো আজীবন মানুষকে জামায়াতে শামিল করার চেষ্টাই করে এসেছি। জামায়াত থেকে বহিষ্কার করতে আমার মন সায় দেয় না। তাই পদত্যাগ করাই আমি পছন্দ করি। কিন্তু কোন হতভাগা যদি রাজনৈতিক বাজারে তার মূল্যবৃদ্ধির কুমতলবে জামায়াতকে গালাগাল দেওয়া লাভজনক মনে করে তাহলে তাকে বহিষ্কার করার পরও তা করতে পারে।"

মি. ভুট্টো তখন আইয়ুব খান থেকে পৃথক হয়ে পিপলস পার্টি কায়েম করে ময়দানে লাফালাফি করছেন। তিনি নিয়াজীকে মহামূল্যবান মানিক হিসেবে সাদরে গ্রহণ করলেন। মাওলানা নিয়াজী ভুট্টোর দলে উচ্চ মর্যাদা পেলেন। মি. ভুট্টো তাঁকে সর্বত্র জনসভায় তাঁর বাহাদুর সাথী হিসেবে পেশ করেন। মাওলানা নিয়াজী এর প্রতিদানে জনসভা মাত করে ভুট্টোর প্রশংসা করতে গিয়ে তার কাব্য প্রতিভাকেও কাজে লাগান। ভুট্টোর গুণগান করতে গিয়ে তিনি কাব্যিক ভাষায় যা বলতেন, এর দু'একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। তিনি বলতেন, ভুট্টো এক মহাসমুদ্র, আমরা ঐ সমুদ্রের ঢেউ। ভুট্টো সুগন্ধি বিশাল এক ফুল, আমরা এর পাঁপড়ি।"

১৯৭০-এর নির্বাচনে ভুট্টোর মহাবিজয় হয়। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে যখন মি. ভুট্টো পাকিস্তানের বাদশাহ হন তখন মাওলানা নিয়াজীকে হজ্জ ও আওকাফ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন।

মাওলানা কাওসার নিয়াজী সম্পর্কে এতো দীর্ঘ আলোচনার মাধ্যমে আমি এ কথাই প্রমাণ করতে চাই যে, ইসলামী আন্দোলনে এতোটা অগ্রসর হওয়ার পরও দুনিয়ার লোভের খপ্পরে পড়লে কেমন মারাত্মক অধঃপতন হয়। জামায়াতে ইসলামীর মতো একটি আদর্শিক দলের নেতাও সম্পদের মোহে পড়ে এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলেন যে, ইসলামের দুশমন নেতাই তার আদর্শ মহাপুরুষ বলে গণ্য হয়ে গেলো।

যারা কোন আদর্শকে কায়েম করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালায় তারা আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোন কাজ করে না। বরং তাদেরকে জীবনভর শুধু ত্যাগ ও কুরবানীই দিতে হয়। আর যারা দুনিয়ার মোহে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠাকেই জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়। এ জাতীয় লোকদের অধঃপতনের কোন সীমা থাকে না। পতনের পর পতন হতেই থাকে। তাদের জীবনে আদর্শের আর কোন বালাই থাকে না। তার ইলমও তখন আর পতন ঠেকাতে পারে না। নিজকে কায়েম করার নেশায় যাকে পেয়ে বসে, সে কোন আদর্শ কায়েমেরই যোগ্য থাকে না। তার সকল যোগ্যতা, মেধা, শ্রম, সময়, আবেগ ইত্যাদি আত্মপ্রতিষ্ঠায়ই ব্যয় হয়ে যায়।

মি. ভুট্টোর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ গমন

মাওলানা কাওসার নিয়াজীর পরামর্শ মুতাবেক রাত সাড়ে ন'টায় করাচী বিমান বন্দরে পৌঁছলাম। ভেতরে ঢুকবার সাথে সাথেই বন্দরের একজন স্টাফ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি প্রফেসর গোলাম আযম?" আমি হ্যাঁ বলার সাথে সাথে তিনি আমাকে তাঁর সাথে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি টিকেট কাউন্টারে নিয়ে টিকেট আমাকে দিলেন। ভাড়ার টাকা দিতে চাইলে বললেন, টাকা দেওয়া লাগবে না। তিনি আমাকে বিমানে আমার আসনে বসিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। আমি তাকে আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম। আমি বেশ কৌতুক বোধ করলাম। আমি প্রেসিডেন্টের মেহমান হিসেবে ভিআইপি ট্রিটমেন্ট পেলাম।

ইসলামাবাদ বিমান-বন্দর থেকে বের হতেই জামায়াতের রাওয়ালপিণ্ডি শাখার সেক্রেটারি রাজা সাহেব (পুরো নাম স্মরণ করতে পারলাম না) আমার সুটকেসটা আমার হাত থেকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগুলেন। তিনি ৭১-এ বেশ কয়দিন ঢাকায় আমার বাড়িতে মেহমান ছিলেন বলে তাঁর সাথে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠে। গাড়ি আমার অতি পরিচিত জামায়াত অফিসে গিয়ে থামলো। রাজা সাহেব আমাকে মেহমান খানায় নিয়ে গেলেন।

আমার নাম ভুলবার রোগ

প্রসঙ্গক্রমে আমার নাম ভুলে থাকার ব্যাপারটা উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি। গত কয়েক বছর থেকে আমি লক্ষ্য করছি যে, আমার ঘনিষ্ঠজন, এমনকি নাতি-নাতনীদের নামও কোন কোন সময় মনে আসে না। দশ বছর থেকে সেলিম আমার কাজে-কর্মে সর্বক্ষণ সাথে আছে। তাকে নাম ধরে ডাকতে গিয়ে নামটা মনে না আসলে বেল টিপতে বাধ্য হই।

ডাক্তার তালুকদার নামে প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথকে কয়েক বছর আগে বললাম, "এটা কেমন কথা যে, আমার বক্তৃতার পয়েন্ট এবং কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি ঠিকমতোই মনে আসে। নোট ছাড়াই বক্তৃতা করতে পারি। অথচ কাছের লোকদের নামও ভুলে যাই।" তিনি হেসে বললেন, "হোমিওপ্যাথিক সাইন্স অনুযায়ী এটাও একটা বিশেষ রোগ। আপনি হোমিও চিকিৎসা নিন।" অবশ্য তার পরামর্শ গ্রহণ করে এখনও ঔষধ খাইনি।

'জীবনে যা দেখলাম' লিখতে গিয়ে যেসব লোকের কথা আলোচনায় আসে তাদের সবার নাম স্মরণে আসে না বলে বেশ বিব্রতবোধ করি। এ সত্ত্বেও ঐ রোগের চিকিৎসা করাচ্ছি না। কারণ আমি হামদর্দের ঔষধ খাচ্ছি গত এক বছর থেকে। 'হামদর্দ ল্যাবরেটরিজ (ওয়াকফ) বাংলাদেশ'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হাকীম মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ হারূন ভুঁইয়ার ছাত্র জীবন থেকে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ৭২ থেকে ৭৮ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশে ছিলাম না বলে যোগাযোগ না থাকলেও ৭৮-এর সেপ্টেম্বরে (রমাদানের শুরুতে) হামদর্দের বিখ্যাত শরবত 'রূহ আফজা' হাদিয়াস্বরূপ পেয়ে অভিভূত হলাম। প্রতিবছরই এ হাদিয়া নিয়মিত পাই।

তার সাথে পূর্ব সম্পর্ক পুনর্বহালে আমার কোন অবদান নেই, সকল কৃতিত্ব হাকীম সাহেবেরই প্রাপ্য।

গত বছর মাওলানা আবদুস শহীদ নাসীমের 'কুরআন শিক্ষা সোসাইটি'র এক অনুষ্ঠানে হামদর্দ মিলনায়তনে গেলাম। হাকীম সাহেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে আমাকে তিনি তাঁর অফিসে নিয়ে গেলেন। কয়েকজন ডাইরেক্টরের সাথে পরিচয় করালেন। হাকীম আবদুল মুনয়িম খানকে ডেকে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করালেন। আসবার সময় গাড়িতে অনেক ঔষধ তুলে দিলেন। হাকীম মুনয়িম কয়েকবার বাড়িতে এসে দেখে গেছেন। তার আন্তরিকতা ও ভক্তিশ্রদ্ধা আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তাকে 'তুমি' সম্বোধন করতে আমাকে বাধ্য করেছে। আমাকে আলট্রাসনোগ্রাফী করে দেখাতে বললেন এবং প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড এনলার্জড বলে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

১৯৯৪ সালে ইবনে সিনা হাসপাতালে ডা. আবদুল ওহাব আমার প্রোস্টেট এন্ড গ্ল্যান্ড অপারেশন করেন। ৭/৮ বছরের মধ্যে আবার সমস্যা হবার কথা নয়। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ইবনে সিনা ইমেজিং সেন্টারে আলট্রাসনো করে দেখা গেলো, কিছু এনলার্জড হয়েছে। ডা. আবুল মোকারেম পরামর্শ দিলেন যে, অল্প হলেও লেপারস্কপি করে বের করে ফেলাই ভালো। আমি হামদর্দের চিকিৎসায় আছি বলে তার পরামর্শ নিলাম না। হামদর্দের ঔষধে কেমন কাজ হয় তা পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিলো। এ বছর (২০০৩) মে মাসে ইবনে সিনায় আলট্রাসনো করে দেখা গেলো যে, প্রায় সেরে গেছে। খুব সামান্য বাকি আছে। যিনি আলট্রাসনো করলেন তাকে আগের রিপোর্ট দেখালাম এবং বললাম যে, আমি হামদর্দের ঔষধ ব্যবহার করছি। তিনি বললেন, তাহলে ঐ চিকিৎসাই চালু রাখুন, বাকিটাও তাহলে সেরে যাবে।

আমি ইবনে সিনা ট্রাস্ট ও হামদর্দ ওয়াকফের নিকট কৃতজ্ঞ। দুটোই ওয়াকফ লিল্লাহ প্রতিষ্ঠান। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী এ দুটোর মালিকানা ভোগ করে না। এ দুটো প্রতিষ্ঠানই সেবাধর্মী বলে স্বল্পমূল্যে অনেকের এবং বিনামূল্যে কিছু লোকের চিকিৎসা করে থাকে। গত ত্রিশ বছর থেকে আমি ইবনে সিনা থেকে বিনামূল্যে এ খিদমত পাচ্ছি। আর গত এক বছর থেকে হামদর্দের খিদমত ভোগ করছি একইভাবে। আল্লাহ পাক এ উভয় প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি সুনাম ও সুখ্যাতির সাথে মানুষের সেবা করে সকলের দোয়ার ভাগী হোক– এ দোয়াই করি। যারা টাকা-পয়সা খরচ করে চিকিৎসা নেয় তারাও তাদের কাছ থেকে সুচিকিৎসা পেয়ে দোয়া করে।

ডা. আবদুল ওহাব আমার অপারেশনের জন্য তার প্রাপ্য নেননি। তিনি আমার আগে মরহুম আব্বাস আলী খানের অপারেশনের টাকাও নেননি। টাকার বদলে দোয়া চাইলেন। এ মহব্বতের কোন বদলা দেওয়া যায় না। টাকা-পয়সা দিয়ে এর কোন প্রতিদান হয় না। আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করি ইবনে সিনা ও হামদর্দের পরিচালক ও সেখানে কর্মরত সবাইকে দুনিয়ার সকল কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতের সকল অকল্যাণ থেকে হেফাযত করুন।

হামদর্দের চিকিৎসার সাথে কখনো কখনো অন্য কোন সমস্যা হলে হোমিওপ্যাথিক ঔষধও ব্যবহার করি। গত ৪/৫ বছর থেকে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অডিটর জনাব আনসার আলী থেকে হোমিও চিকিৎসা নিচ্ছি। মরহুম জনাব আব্বাস আলী খান ও জনাব শামসুর রহমান তার চিকিৎসায় উপকৃত হয়ে আমাকে এ পরমর্শ দেন। আমি এবং আমার স্ত্রী তার চিকিৎসায় উপকার পাচ্ছি। অবশ্য তিনি পেশাদার ডাক্তারদের মতো ডাক্তারখানায় বসে চিকিৎসা করেন না। তিনি শুধু প্রেসক্রিপশন লিখে বা বলে দেন। বাজার থেকে ঔষধ কিনে নিতে হয়।

১২৯.

মি. ভুট্টোর সাথে সাক্ষাৎ

যে দিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে আমার সাক্ষাৎ করার কথা সেদিন সকাল ১০টায় হজ্জ ও আওকাফ মন্ত্রী মাওলানা কাওসার নিয়াজির পরামর্শ অনুযায়ী তার দেওয়া ফোনে যোগাযোগ করলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে, বিকাল ৫টায় রাওয়ালপিণ্ডি জামায়াতের অফিস থেকে আমাকে নেবার জন্য তিনি গাড়ি পাঠাবেন। গাড়ি প্রথমে নিয়াজি সাহেবের অফিসে আমাকে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে প্রেসিডেন্ট হাউজে যেতে হবে।

যথাসময়ে গাড়ি পৌঁছলো। আমি তৈরিই ছিলাম। গাড়ি থেকে অবতরণের সাথে সাথেই নিয়াজি সাহেব এগিয়ে এসে হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং আগের মতোই আবেগের সাথে উষ্ণ কোলাকুলি করলেন। ৪/৫ বছর পর দেখা। তিনি পুরাতন বন্ধুর মতোই ব্যবহার করলেন। তাঁর অফিসে পাশাপাশি আসনে আমাকে নিয়ে বসলেন এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক খোঁজ-খবর নিলেন। আমিও নিলাম।

এরপর তিনি আসল প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি আমাকে এ কথা বুঝাবার জন্য যতভাবে সম্ভব বললেন যে, আমাকে ইমিগ্রেশনে আটক করার জন্য প্রেসিডেন্ট সাহেব মোটেই দায়ী নন। তিনি এ ঘটনায় খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

আমি বললাম, "পূর্ব-পাকিস্তানের যারা পশ্চিম-পাকিস্তানে আছেন তারা কেউ কোথাও চলে যেতে পারবে না বলে প্রেসিডেন্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সে নির্দেশ অনুযায়ী যদি ইমিগ্রেশন এটা করে থাকে তাহলে তারা মাওলানা আবদুস্ সুব্হানকে আটকালেন কেন? তাই এ বিষয়টা আমার নিকট অস্পষ্ট।"

এরপর এ প্রসঙ্গে আলোচনা আর অগ্রসর হতে পারেনি। তবে আমি বুঝতে পারলাম যে, তাঁর মহান নেতা এর জন্য মোটেই দায়ী নন বলে যাতে আমি বিশ্বাস করি, সে উদ্দেশ্যেই তিনি চেষ্টা করলেন। মাগরিবের নামাযের পর তিনি আমাকে প্রেসিডেন্ট হাউজে যাবার জন্য সসম্মানে গাড়িতে উঠিয়ে দিলেন। প্রেসিডেন্ট হাউজের অভ্যর্থনা কক্ষের সামনে গাড়ি থামলে একজন এগিয়ে এসে আমাকে সালাম জানালেন এবং কক্ষে নিয়ে সোফায় আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করে বললেন, "একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রেসিডেন্টের সাথে আছেন। তিনি চলে গেলেই আপনাকে নিয়ে যাবো।"

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ কক্ষে মন্ত্রী মাহমুদ আলী পৌঁছলেন। জানা গেলো যে, আমার পরই প্রেসিডেন্টের সাথে তার সাক্ষাতের কথা। আগেও জনাব মাহমুদ আলীর কথা বিভিন্ন আলোচনায় এসেছে। পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির তিনি সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। এ দলটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব নূরুল আমীন। এ দলটি পূর্ব-পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিলো। পশ্চিমে কোন শাখা ছিলো না। মি. ভুট্টো ক্ষমতাসীন হবার পর জনাব নূরুল আমীন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং জনাব মাহমুদ আলী মন্ত্রী হন।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একসাথে অনেকদিন কাজ করায় তাঁর সাথে আমার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিলো। তাই আমাকে প্রেসিডেন্টের নিকট নিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত একান্তে বেশ কিছুক্ষণ কথা-বার্তা চলে। তিনি জানতে চাইলেন যে, হজ্জের পর পাকিস্তানে ফিরে আসবো কিনা। জওয়াবে বললাম, এখান থেকে দেশের সাথে যোগাযোগ করা যায় না। দেশে যে আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলাম সে আন্দোলনের জন্যই আজীবন কাজ করতে চাই। দেশে কবে যেতে পারবো বা আদৌ যাওয়া সম্ভব হবে কিনা জানি না। তাই আমি লন্ডন যেতে চাই যেখান থেকে দেশে যোগাযোগ সহজ। তাই পাকিস্তানে ফিরে আসতে চাই না।

আমি জানতে চাইলাম যে, তাঁর বাকি জীবনের পরিকল্পনা কী? তিনি স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত জানাতে পারলেন না। তিনি এখনও পাকিস্তানেই আছেন। আমার নাগরিকত্ব মামলায় সুপ্রিমকোর্ট যে ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে তাতে শেখ মুজিব নাগরিকত্ব বাতিলের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা বেআইনী হয়ে গেছে। ঐ নির্দেশের প্রথম কিস্তিতে যে ৩৯ জনকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিলো, সে তালিকায় তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ঐ নির্দেশ বেআইনী ঘোষিত হবার পর তিনি নিরাপদে দেশে ফিরে আসতে পারতেন। কিন্তু কেন এলেন না তা আমার জানা নেই।

যথাসময়ে আমাকে প্রেসিডেন্টের নিকট নিয়ে গেলেন। তিনি এগিয়ে এসে আমার সাথে হাত মেলালেন এবং মেহমানদের সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট আসনে বসালেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে সিংহাসনে তিনি বসেন, সেখান থেকে মেহমানদের আসন ঐ কক্ষেই সামান্য দূরে সাজানো রয়েছে। তিনি কাছেই আসন গ্রহণ করে সহাস্য বদনে বললেন, "আপনি হজ্জে যাচ্ছেন জেনে খুশি হলাম। আশা করি সেখানে যেয়ে আমাদের জন্য দোয়া করবেন।"

আমি বললাম, "আমাকে আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়ার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানাই। আপনার মতো মহাব্যস্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎপ্রার্থী কখনও হইনি। আপনিই মেহেরবানী করে এ সুযোগ দিলেন। ৭ দিন আগে করাচীতে ইমিগ্রেশন অফিস আমাকে স্টিমারে উঠতে বাধা না দিলে আপনার সাথে সাক্ষাতের এ সুযোগ পেতাম না। আমার জানতে ইচ্ছে হয় যে, আমাকে তারা আটকালো কেন?"

এ কথার কোন জওয়াব তিনি দিলেন না। চেহারায় বিব্রত বোধ করলেন বলে মনে

হলো। মুহূর্তেই তিনি অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। বললেন, "দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এটাই যে, বাংলাদেশ পৃথক একটি রাষ্ট্র হিসেবে জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করেছে। আমি বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্রদূত পাঠাতে চাই।"

পাকিস্তান ভাঙার জন্য আমি জেনারেল ইয়াহইয়া খানের চেয়েও মি. ভুট্টোকে বেশি দায়ী বলে মনে করি। তাই তিনি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করায় স্বাভাবিক কারণেই তাকে দু'কথা শুনিয়ে দেবার প্রবল ইচ্ছা বোধ করলাম। কিন্তু ঐ পরিবেশে নিজকে দমন করতে বাধ্য হলাম। কারণ ঐসব কথা তুললে অত্যন্ত অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে অথচ এর দ্বারা সামান্য কোন কল্যাণ লাভেরও সম্ভাবনা নেই।

যা হোক, আমি এ কথা বলেই বিদায় নিলাম যে, "আমি পাকিস্তানের সার্বিক কল্যাণ কামনা করি। যে মুসলিম জাতীয়তাবোধ ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তান কায়েম করেছিলো, সে চেতনা লালন না করায়-ই পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। দোয়া করি ঐ চেতনার অভাবে যেন অবশিষ্ট পাকিস্তানও বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়।" তিনি আবার দোয়া চেয়ে আমাকে বিদায় করলেন।

মাওলানা মওদূদীর সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ

হজ্জের জন্য রওয়ানা হবার আগে আমি ইতঃপূর্বে লাহোর যেয়ে মাওলানা মওদূদীর সাথে দেখা করে বিদায় নিয়েই করাচী গিয়েছিলাম। তবু মি. ভুট্টোর সাথে সাক্ষাতের পর মাওলানার সাথে আবার সাক্ষাৎ না করে করাচী যেতে পারলাম না। তাই পরদিনই লাহোর রওয়ানা হলাম। লাহোরেই জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিস। আমাকে হজ্জে যেতে বাধা দেওয়ায় পত্র-পত্রিকায় যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রেসিডেন্ট স্বয়ং আমাকে সাক্ষাতের জন্য দাওয়াত দিয়ে এনে হজ্জে যাবার জন্য অনুমতি দেওয়ায় জামায়াতের নেতৃবৃন্দ আমাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানালেন।

মি. ভুট্টোর সাথে আমার সাক্ষাতের খবর সরকারিভাবে পত্রিকায় দেওয়া হয়নি। না দেওয়াই স্বাভাবিক। জামায়াতের প্রচার বিভাগ থেকে পত্রিকায় এটুকু খবর জানানো হলো যে, প্রেসিডেন্ট অমুক তারিখে আমাকে দাওয়াত দিয়ে তার অফিসে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছেন এবং হজ্জে যেয়ে দোয়া করতে অনুরোধ করেছেন। এ খবরটুকু থেকে একথা বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয় যে, পত্রিকায় প্রকাশিত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কারণেই এ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বোধ করেছেন। করাচীর দৈনিক জাশারাত মি. ভুট্টোকে আমার সাথে এ সৌজন্য প্রদর্শনের জন্য মুবারকবাদ জানিয়ে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।

মাওলানা মওদূদীর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই লাহোর গেলাম। তাঁর সাথে একান্তে কথা বলার সময় তিনি মি. ভুট্টোর সাথে আমার সাক্ষাতের পূর্ণ বিবরণ শুনলেন। মি. ভুট্টো যে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিতে চান এ বিষয়ে মাওলানা মন্তব্য করেন, "পাকিস্তানি জনগণ পূর্ব-পাকিস্তানের সাথে কোন

রকম ঐক্য স্থাপনের দাবি তুলবার সুযোগ যেন অবশিষ্ট না থাকে সে জন্যই হয়তো তিনি অবিলম্বে স্বীকৃতি দিতে চান। একসময় তো স্বীকৃতি দিতেই হবে। তাড়াহুড়া করায় সমস্যা আছে।"

মি. ভুট্টোকে অবশিষ্ট পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে আমি যা বলে এসেছি তাতে মাওলানা সন্তোষ প্রকাশ করেন। আমি মাওলানার নিকট দোয়া চাইলাম, যেন হজ্জের পর লন্ডন পৌঁছতে পারি। বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে লন্ডন যাওয়াই যুক্তিপূর্ণ বলে ইতঃপূর্বে মাওলানার সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মাওলানা থেকে বিদায় নিলাম

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী শিক্ষার সুস্পষ্ট আলো মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী থেকেই পেয়েছি। তাঁর রচিত সাহিত্য থেকেই জানতে পেরেছি যে, ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের সকল দিকের জন্যই আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (স)-এর হাদীস পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ জ্ঞান দান করে। এর আগে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর ওয়ায ও রচিত সাহিত্য এবং তাবলীগ জামায়াত থেকে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ও অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম হিসেবেই জানতে পেরেছি। তমদ্দুন মজলিসের মাধ্যমে ধারণা পেয়েছি যে, ইসলাম শুধু ধর্ম নয়; পরিপূর্ণ জীবন বিধান। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য যোগ্য সাহিত্য পাইনি। আমি ১৯৫৪ সালে যখন জামায়াতে যোগদান করি, তখন মাওলানা মওদূদীর রচিত কুরআনের তাফসীর ও প্রধান প্রধান রচনা বাংলা ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হয়নি। তাই কঠোর পরিশ্রম করে এক বছরের মধ্যেই উর্দুভাষা শিখতে বাধ্য হই। মাওলানা মওদূদীর রচনা তাঁর লেখা মূল ভাষায় অধ্যয়ন করায় আমার প্রধান দীনী শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা জন্মে। ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে যে টেকনিক্যাল জ্ঞান প্রয়োজন, এর বাস্তব শিক্ষা তাঁর কাছেই পেয়েছি। এ শিক্ষা বই-কিতাব পড়ে পাওয়া যায় না। হাতে-কলমেই এসব শিখতে হয়।

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে শিক্ষা দেবার জন্য শুধু কিতাব পাঠানোকেই যথেষ্ট মনে করেননি। কিতাবের ভিত্তিতে বাস্তব শিক্ষা দেবার জন্য রাসূল পাঠানোও জরুরি মনে করেছেন। মাওলানা মওদূদী শুধু ইসলামী চিন্তাবিদই ছিলেন না, তিনি নিখুঁত ইসলামী সংগঠন গড়ার বিরাট দায়িত্বও পালন করেছেন। একই ব্যক্তি চিন্তাবিদ ও সংগঠক হওয়া ইতিহাসে বিরল। শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র) বিরাট চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি সংগঠন গড়েননি। মাওলানা আবুল কালাম আজাদও বড় চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের ডাকও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সংগঠকের ভূমিকা পালন করেননি।

এ কারণেই মাওলানা মওদূদীর প্রতি গভীর মহব্বত আমার অন্তর জুড়ে আছে। তাই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় অন্তরে যে প্রচণ্ড বেদনা বোধ করেছি তা স্বাভাবিকভাবে অশ্রুর আকারে প্রকাশ পেলো। মাওলানা আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। আমি বললাম, "এ পর্যন্ত যতবারই আপনার নিকট থেকে বিদায় নিয়েছি, ততোবারই জানতাম যে, এ বিদায় সাময়িক। বেঁচে থাকলে আবার দেখা হবে। কিন্তু এবার যে পরিস্থিতিতে বিদায় নিচ্ছি তাতে আবার কখনো জীবনে আপনার সাথে দেখা হবে কিনা তা একেবারেই অনিশ্চিত।" এ কথা বলার পর চোখের পানির সাথে সাথে কান্নার আওয়াজও বের হয়ে গেলো। তখন তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে এবং পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "এ দুনিয়া আর কয়দিনের। আল্লাহর দীনের কাজে মৃত্যু পর্যন্ত আত্মনিয়োগ করুন। আমরা যদি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে পারি এবং মাবুদ যদি আমাদেরকে জান্নাতের ভাগী করেন তাহলে সেখানে চিরকাল সাক্ষাৎ হবে।" এ কথায় সান্ত্বনা বোধ করলাম এবং তাঁর হাতে মহব্বতের চুমু খেয়ে বিদায় নিলাম। এরপর ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে মাওলানার সাথে লন্ডনে শেষ দেখা হয়। সে সম্পর্কে যথাসময়ে আলোচনা আসবে বলে আশা রাখি।

তিনি ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে ইন্তিকাল করেন। আমি তখন ঢাকায়। নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে তাঁর জানাযায় শরীক হতে না পারার বেদনা আজীবনই ভোগ করতে হবে। এমনকি এ পর্যন্ত তাঁর কবর যিয়ারতের সুযোগও পেলাম না।

মাওলানা থেকে বিদায় নিয়ে করাচী চলে গেলাম। সেখানে যেয়ে জানতে পারলাম যে, হজ্জ যাত্রীদেরকে নিয়ে পরবর্তী স্টিমার ৫ দিন পর রওয়ানা হবে। আমার পূর্ব-প্রস্তুতি থাকায় কোন সমস্যাই ছিলো না। স্টিমারে আসন সংগ্রহ করাই শুধু বাকি ছিলো। একদিনের মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো।

স্টিমারে আরোহণ

স্টিমারে উঠে দোতলায় আমার আসনে পৌঁছলাম। আসন মানে শুধু বসার স্থান নয়, শোবার ছোট খাট। জানতে পারলাম যে, এ জাহাজটি পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় জাহাজ। এক সাথে দু'হাজার হজ্জ যাত্রী নিয়ে জেদ্দাহ যাচ্ছে। জাহাজটি তিনতলা বিশিষ্ট। নিচের তলাটি পানির ভেতরে। যেখান থেকে আকাশ দেখা যায় না। আয়নায় সমুদ্রের পানি দেখা যায়। দু'তলা খোলা জায়গা বলে সমুদ্রের উপরিভাগও দেখা যায়। এ অংশটি পানির উপর। তে'তলা তো আরও উপরে। দু'তলায়ই হজ্জ যাত্রীর সংখ্যা বেশি।

নিচের তলায় যাত্রীদের পেশাব, পায়খানা ও ওযূ-গোসলের জায়গা। জামাআতে নামায আদায় করার জন্য সেখানে এমন একটি প্রশস্ত জায়গা আছে, যেখানে কয়েকশ' লোক এক সাথে জামাআতে নামায পড়তে পারে। নিচতলায় হজ্জ যাত্রীদের কারো আসন রাখা হয়নি।

সকাল আটটা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত যাত্রীরা জাহাজে আরোহণ করার আরও দু'ঘণ্টা পর মাইকে ঘোষণা করা হলো যে, এখনই জাহাজ রওয়ানা দিচ্ছে। মাইকে

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক বারবার উচ্চারিত হচ্ছিলো। ইহরাম পরা অবস্থায় সবাই না থাকলেও আবেগের সাথে সকলেই তালবিয়া উচ্চারণ করতে থাকলেন। অধিকাংশ হজ্জযাত্রী যথাস্থানে পৌঁছার পর ইহরাম বাঁধেন।

আসরের নামাযের পর স্টিমারের একজন ক্রু আমার কাছে এসে বললেন, ক্যাপটেন সাহেব তাঁর কেবিনে আপনাকে চায়ের দাওয়াত দিয়েছেন। আমার সাথে চলুন। আমি বিস্মিত হলেও তার সাথে চললাম। জাহাজের সম্মুখভাবে তে'তলার উপর চারতলায় ক্যাপটেনের কেবিন। সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম। উর্দী পরা ৩৫-৪০ বছর বয়সের এক যুবক এগিয়ে এসে "হ্যালো প্রফেসার সাহেব" বলে আমাকে অভ্যর্থনা করে তাঁর প্রশস্ত কেবিনে এক চেয়ারে বসালেন। আমার চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ দেখে তিনি বুঝলেন যে, পূর্বের কোন পরিচয় নেই বলে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করছি।

তিনি বললেন, "আমাকে আপনার চেনার কথা নয়। জামায়াতে ইসলামীর নেতা হিসেবে আপনার নাম সব শিক্ষিত লোকই জানে। পত্রিকায় আপনার নাম বহুবার দেখেছি। আমি ছাত্র জীবনে ইসলামী জমিয়তে তালাবার সদস্য ছিলাম। ম্যারিন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ১৩ বছর যাবত কর্মরত। আমি জাশারাত পত্রিকার নিয়মিত পাঠক। আজই পত্রিকায় দেখলাম যে, আপনি এ জাহাজেই হজ্জে যাচ্ছেন। আগের স্টিমারে আপনাকে উঠতে দেওয়া হয়নি বলে পত্র-পত্রিকায় যে খবরাদি প্রকাশিত হয়েছে তাও আমি দেখেছি। ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে আপনার কিছু খিদমত করা আমি কর্তব্য মনে করি। তাই হজ্জ যাত্রীদের তালিকা থেকে আপনার আসন নম্বর যোগাড় করে আপনাকে পেলাম।"

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললাম, "১৯৪৮ সালে মাওলানা মওদূদী ইসলামী জমিয়তে তালাবা কায়েম করার এ সুফল দেখলাম যে, এ স্টিমারের ক্যাপটেন ইসলামী আন্দোলনের একজন সৈনিক। ঐ ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে যারা গড়ে উঠে, তারা যে ময়দানেই কর্মরত থাকুক, তারা আল্লাহর সৈনিকের ভূমিকা পালনেরই যোগ্য হয়। ইসলামী ছাত্র সংগঠন আল্লাহর এক খাস রহমত। এ জাহাজের দু'হাজার হজ্জ যাত্রীর খিদমত তো আপনিই করছেন। আমার আলাদা কোন খিদমতের প্রয়োজন নেই।"

তিনি বললেন, "আপনার জন্য বিশেষ খিদমত করার সুযোগ আমার রয়েছে। নিচ তলায় এ জাহাজের ক্রুদের জন্য কেবিন আছে। ভাগ্যক্রমে একটা কেবিল খালি আছে। আপনাকে আমি ঐ কেবিনে স্থানান্তর করতে চাই। হজ্জ যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে থাকলে আপনার কষ্ট হবে। পেশাব-পায়খানা ও ওযূ-গোসলের জন্য লাইনে দাঁড়াতে হবে এবং অপেক্ষায় সময় নষ্ট হবে। কেবিনে থাকলে এ অসুবিধা ভোগ করতে হবে না।" এমন অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত সুবিধার কথা শুনে রীতিমতো অভিভূত হলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে তাঁর খিদমত নেবার জন্য সম্মতি দিলাম।

সন্ধ্যার আগেই কেবিনে পৌঁছলাম। নিচেই জামাআতে নামাযের জায়গা থাকায় বেশ আরামই হলো। উপরে নিচে উঠা-নামার ঝামেলা থেকে বাঁচলাম। কেবিনে একা

থাকায় অত্যন্ত নিরিবিলিতে হজ্জ সংক্রান্ত বই-পুস্তক পড়াশুনা করা, দোয়াসমূহ মুখস্থ করা, তাহাজ্জুদ পড়া ও আল্লাহর দরবারে ধরনা দেবার মহাসুযোগ পেয়ে গেলাম।

কিন্তু এতো সুযোগ-সুবিধা সত্ত্বেও উপরে খোলা আকাশ ও সমুদ্রের বাতাস এবং ঢেউ-এর দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে গেলাম। দু'বার উপরে যেতে হলো মাইকে হজ্জ সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য। রোজই হজ্জযাত্রীদেরকে প্রয়োজনীয় মাসলা-মাসাইল শেখাবার জন্য তাদের মধ্যে যারা আলিম, তাদেরকে মাইকে ওয়াজ করার জন্য ক্যাপটেনের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করা হতো। আমাকেও দু'দিন আলোচনা করার দায়িত্ব দেওয়ায় উপরে যেতে হলো। সেখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্য ও উন্মুক্ত আকাশ দেখে এতো তৃপ্তিবোধ হলো, যা কেবিনে পাওয়ার কোন উপায় নেই। এতে একটা তত্ত্বকথা বুঝে আসলো।

দুনিয়াতে শুধু সুবিধা বা শুধু অসুবিধা পাওয়া যায় না। সুবিধা ও অসুবিধা মিলেই দুনিয়ার জীবন। "ইন্না মাআল উসরি ইউসরান।" অর্থাৎ নিশ্চয়ই দুঃখের সাথেই সুখ মিলে আছে। সুখ ও দুঃখকে দুনিয়ার জীবনে আলাদা করার উপায় নেই। বিবাহিত জীবনে সুখ ও দুঃখ এক সাথেই মিশে আছে। অবিবাহিত জীবনে সুখের লেশও নেই। হয়তো দুঃখ কম থাকতে পারে। কিন্তু বিবাহিত জীবনের সুখ পেতে হলে এর দুঃখকেও বরণ করে নিতে হবে।

অবশ্য আখিরাতে দুঃখ ও সুখ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। যারা বেহেশতে যাবে তারা শুধু সুখই পাবে। সেখানে দুঃখের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আর দোযখে শুধুই দুঃখ। দুঃখ ছাড়া সেখানে আর কিছুই নেই। মানুষ যা চায় তা না পেলেই দুঃখ বোধ করে। বেহেশতে যা চায়, তা-ই পাবে। এমনকি কামনা করলেই কাম্য বস্তু হাজির হয়ে যাবে। তাই বেহেশতে কোন অভাবই থাকবে না। তাই দুঃখ সেখানে নেই। বেহেশতে শুধু অভাবেরই অভাব আছে, আর কিছুরই অভাব নেই। আর দোযখে শুধু তাই আছে, যা বেহেশতে নেই। অর্থাৎ দোযখে শুধু অভাব ও দুঃখই আছে। দোযখীরা পিপাসায় (পানির অভাব) যখন পানি চাইবে, তখন এমন ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে, যা পিপাসা শতগুণ বাড়িয়ে দেবে। সেখানে অভাব বাড়তেই থাকবে– তাই দুঃখই দুঃখ। এ দুঃখ কমার কোন সম্ভাবনা নেই।

১৩০.

স্টিমারে ৭ দিন

মক্কা শরীফে পৌছার আগে স্টিমারে এ কয়টা দিন সহীহভাবে হজ্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় ইলম হাসিল করার সুযোগ পাওয়া গেলো, বিমানে কয়েক ঘণ্টায় পৌছে গেলে এ সুযোগ পাওয়া যায় না।

হজ্জযাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই বয়স্ক ও অশিক্ষিত। কিছু সংখ্যক বয়োবৃদ্ধ। শিক্ষিতদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষিতের সংখ্যাই বেশি ছিলো। বেশ কিছু সংখ্যক

আলিম ছিলেন। মাইকে কয়েকবার ১ ঘণ্টা করে হজ্জের মাসআলা-মাসাইল শেখাবার জন্য আলিম বক্তাদেরকে কাজে লাগানো হতো। দীন ইসলাম সম্পর্কে আলিমগণ ওয়াযও করতেন।

জাহাজে তাবলীগ জামায়াতের ভাইদের তৎপরতা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। পাঁচ ওয়াক্ত জামাআতে নামাযের পর হজ্জ যাত্রীদেরকে তালীম দেবার জন্য প্রত্যেকে ৮/১০ জনকে নিয়ে গোল হয়ে বসতেন। শিক্ষিতদের তুলনায় অশিক্ষিতরাই তালিমে বেশি সংখ্যায় বসতে দেখেছি। তাদেরকে কালেমা তাইয়েবা শুদ্ধ উচ্চারণ করা এবং নামাযে যা কিছু পড়তে হয় তা সহীহভাবে পড়া শেখাবার চমৎকার ব্যবস্থা তারা করতেন।

বয়ান করার সময় তাবলীগের ৬ উসূল আলোচনা করে লোকদেরকে হজ্জ থেকে দেশে ফেরার পর তাবলীগ জামায়াতে সময় দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

তাবলীগী ভাইয়েরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তালীম দেবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতেন। এ কাজটি করা না হলে হজ্জ করা সত্ত্বেও হাজীদের অনেকেই শুদ্ধ উচ্চারণে ও সঠিক নিয়মে নামায পড়তেও অক্ষম থেকে যেতেন, হজ্জের মাসআলা-মাসাইল ও দোয়া ইত্যাদি শেখাবার জন্যও তারা চেষ্টা করতেন। তাদের এ প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

স্টিমারে আমার প্রথম বক্তৃতা

মাইকে আমাকে দু'দিন বক্তব্য রাখতে হয়েছে। বলাবাহুল্য, আমাকে উর্দু ভাষায়ই বলতে হয়েছে। প্রথম দিন যা বলেছি, এর সারকথা নিম্নরূপ ঃ

কালেমায়ে তাইয়েবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" এমন কোন মন্ত্র নয় যে, না বুঝে উচ্চারণ করলেই বেহেশতে যেতে পারবে। কালেমা মানে কথা। অর্থহীন আওয়াজকে কথা বলা যায় না। তাই কালেমায়ে তাইয়েবার অর্থ বুঝা জরুরি। আসলে কালেমায়ে তাইয়েবার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে দুটো ওয়াদা করা হয়।

১. আমি জীবনে সব কিছু আল্লাহর হুকুম মতো করবো এবং আল্লাহর হুকুমের বিপরীত আর কারো হুকুম মানবো না।

২. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর হুকুম যেভাবে পালন করেছেন, আমি একমাত্র তাঁরই তরীকা অনুযায়ী আল্লাহর হুকুম পালন করবো। ঐ তরীকা (নিয়ম) ছাড়া অন্য কারো তরীকা গ্রহণ করবো না।

যে এ ভাবে বুঝে শুনে কালেমায়ে তাইয়েবা উচ্চারণ করে তাকে এ দুটো ওয়াদা অনুযায়ী চলবার যোগ্য হওয়ার জন্যই আল্লাহ তাআলা পাঁচ ওয়াক্ত জামাআতে নামায আদায় করা ও রমাদান মাসে রোযা রাখার হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহর এ দুটো হুকুম ঠিক মতো পালন করলে কালেমার ওয়াদা অনুযায়ী সবকিছু করার অভ্যাস হয়।

যারা ধনী তাদের জন্য নামায ও রোযা মোটেই যথেষ্ট নয়। কারণ টাকা-পয়সা বেশি থাকলে গোনাহ করার ক্ষমতা বাড়ে। তাই গোনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখার যোগ্য হবার জন্য ধনীদেরকে যাকাত আদায় করা ও হজ্জ করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। টাকা-পয়সা হারাম পথে দুনিয়া ভোগ করার দিকে টেনে নিয়ে যায়।

উপরিউক্ত বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে বুঝাবার জন্য মাওলানা মওদূদীর ঈমান, ইসলাম, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জের হাকীকত সিরিজের বইগুলোর উল্লেখ করে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে বুঝাবার চেষ্টা করেছি যে, কিভাবে নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত কালেমার দুটি ওয়াদা পালনের যোগ্য বানায়।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

দ্বিতীয় বক্তৃতাটিতে আগাগোড়াই হজ্জকে কেন্দ্র করে আলোচনা করেছি। হজ্জ জীবনে একবারই করা সম্ভব হয়। খুব কম লোকই বার বার হজ্জ করতে পারে। তাই অভ্যাসের অভাবে হজ্জে ভুলত্রুটি হবার আশঙ্কা থাকে। জীবনের প্রথম হজ্জটি যাতে মকবুল হজ্জ হয় সে উদ্দেশ্যে হজ্জ সংক্রান্ত মাসআলা-মাসাইল ভালোভাবে আয়ত্ত করার জন্য পরামর্শ দিলাম। মাসআলা-মাসাইল শেখাই যথেষ্ট নয়। হজ্জের উদ্দেশ্য কী এবং হজ্জ ধনীদেরকে কী শিক্ষা দেয়, সে বিষয়ে মাওলানা মওদূদীর হজ্জের হাকীকত বইটি পড়ার পরামর্শ দিলাম ও ঐ বইটির আলোকে আলোচনা করলাম। হজ্জের শিক্ষা সম্পর্কে বললাম।

১. ধনীরা বিলাসিতা করে থাকে। হজ্জ উপলক্ষে অনেক দৈহিক কষ্ট সহ্য করার মাধ্যমে বিলাসিতা ত্যাগ করার শিক্ষা দেওয়া হয়।

২. হজ্জের সময় সেলাইবিহীন দু'টুকরা কাপড় পরে খালি মাথায় মক্কা, মিনা ও আরাফাতে আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে সব কিছু করতে হয়। রাজা-বাদশা, শাসক, বড় কর্তা ও ধনে বড় লোকের মধ্যে এ মনোভাব শিক্ষা দেয় যে, ধন ও মানের অহংকার অর্থহীন। সবাইকে ইহরামের মতোই দু'টুকরো কাপড়ে মুড়ে কবরে রাখা হবে।

৩. হজ্জের পর বাকি জীবন এ দুটো শিক্ষা মনে রেখে চলার জন্য হজ্জ ধনীকে উদ্বুদ্ধ করে।

সবশেষে বললাম যে, অনেকেই হজ্জ করার পর নিজের নামে হাজী বা আলহাজ্জ লিখে এবং মুখেও বলে। হজ্জ একটি খালেস ইবাদত। নামায পড়ে কেউ নিজের নামের সাথে নামাযী লিখে না। নামাযের মতোই হজ্জ একটি বড় ইবাদত। অন্য লোক হাজী সাব বলে ডাকতে পারে। নিজের নাম বলার সময় হাজী বলা মোটেই উচিত নয়। এতে হজ্জের সওয়াব নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ইয়ালামলামে ইহরাম বাঁধা

হজ্জের বা ওমরার উদ্দেশ্যে যারা মক্কা শরীফ যান তাদেরকে সেলাইবিহনী একজোড়া কাপড় পরে ইহরাম বাঁধতে হয়। এটা অবশ্য শুধু পুরুষদের জন্য।

হারাম শব্দ থেকে ইহরাম শব্দ তৈরি হয়েছে। ইহরাম অবস্থায় কতক হালাল কাজও হারাম ও মাকরূহ হয়ে যায়।

যারা মক্কা শরীফের পূর্বদিকের দেশ থেকে যায় তাদেরকে ইয়ালামলাম নামক জায়গায় ইহরামের পোশাক পরতে হয়। এ পোশাক ছাড়া ঐ জায়গা অতিক্রম করা নিষেধ। জাহাজের ক্যাপ্টেনের পক্ষ থেকে মাইকে যথাসময়ে ঘোষণা দেওয়া হলো যে, হজ্জযাত্রীগণ যেন ইহরাম বাঁধার জন্য প্রস্তুত থাকেন। ইয়ালামলাম পৌঁছার আগেই ইহরামের পোশাক পরতে পরামর্শ দেওয়া হয়। ঐ স্থানে পৌঁছার সাথে সাথে মাইকে বার বার "লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক" উচ্চারণ করে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, আমরা ইয়ালামলাম পৌঁছে গেছি। দু'হাজার হজ্জযাত্রী এক সাথে জোরে জোরে লাব্বাইক উচ্চারণ করায় এমন এক আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি হলো, যা সবার অন্তর স্পর্শ করলো।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত হজ্জযাত্রীদেরকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার আগেই ইহরাম বাঁধতে হয়। পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে আগতদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ সব স্থানকে 'মীকাত' বলা হয়। পূর্বদিক থেকে যারা যায় তাদের মীকাত হলো ইয়ালামলাম।

যারা বিমানে যায় তারা বিমানে উঠার আগেই ইহরাম বেঁধে নেয়। কারণ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিমান জেদ্দায় পৌঁছে যায়। আর বিমান চলাকালে পোশাক বদল করা কঠিন। তাছাড়া ইহরামের কাপড় পরার আগে দু'রাকাআত নামাযও পড়তে হয়। স্টিমারে গেলে মীকাতে পৌঁছার আগে বেশ কয়দিন ইহরাম অবস্থায় থাকা কষ্টকর। তাই মীকাতের কাছাকাছি পৌঁছেই ইহরাম বাঁধা হয়।

জেদ্দা বন্দরে অবতরণ

ইহরাম বাঁধার পর তৃতীয় দিন স্টিমার জেদ্দা সমুদ্র বন্দরে পৌঁছে। ইমিগ্রেশনের ঝামেলায় অনেক সময় লেগে যায়। হজ্জযাত্রীগণকে বিভিন্ন মুআল্লিমের জিম্মায় তুলে দেওয়া হয়। আমার মুআল্লিম আকীল আত্তাসের লোকেরা তাদের জিম্মায় দেওয়া হজ্জযাত্রীদেরকে নিয়ে একটি বিরাট বাসে উঠালেন। ইমিগ্রেশন অফিসার আমাদের পিলগ্রিম পাস (ট্রেভেল ডকুমেন্ট, যা পাসপোর্টের স্থলাভিষিক্ত) সরাসরি মুআল্লিমের লোকের হাতে তুলে দিলেন। আমরা এখন তাদের জিম্মায়।

বাসে বসে উপলব্ধি করলাম যে, স্টিমারে ক্যাপ্টেনের কারণে যে বিশেষ সুবিধা ভোগ করেছি এখন আর সে সুযোগ নেই। জেদ্দাহ বন্দরে পৌঁছার পর ক্যাপ্টেন সাহেব আমাকে যেভাবে বিদায় জানালেন এবং দোয়ার জন্য দরখাস্ত করলেন, সে কথা স্মরণ করলাম। মুআল্লিমের কাছে ভালো ব্যবহার পাবো কিনা আল্লাহ পাকই জানেন।

বাস মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার পর ঠিক এক বছর আগে (১৯৭১ এর ৪ ডিসেম্বর) এ পথেই মাওলানা আবদুল আযীয শারকীর সাথে সফরকালের

অভিজ্ঞতা কাজে লাগালাম। তিনি আমাকে যা কিছু শিক্ষা দিয়েছিলেন তা প্রয়োগ করলাম। সাথের হজ্জযাত্রীদেরকেও শেখাবার চেষ্টা করলাম। সবাই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমার পরামর্শ অনুযায়ী যেখানে যা পড়া দরকার আমার সাথে পড়লেন। আমরা একই মুআল্লিমের অধীনে হলেও স্টিমারে আমার সাথে তাদের পরিচয় হয়নি। আমার পরিচয় পেয়ে তারা চিনতে পারলেন যে, আমিই দু'বার জাহাজে বক্তৃতা করেছি। তখন আরও আগ্রহের সাথে আমার কথা শুনতে লাগলেন। যেখানে যা করণীয় আমার সাথে তারাও করতে থাকলেন। তাদের আগ্রহ দেখে আমিও উৎসাহের সাথে যা কিছু শেখানো দরকার তা শেখালাম।

মক্কায় মুআল্লিমের আস্তানায়

বাস মক্কা শরীফে মিসফালা মহল্লায় যেয়ে থামলো। মুআল্লিম মরহুম আকীল আত্তাসের বড় ছেলে আবদুল্লাহ আত্তাসের সাথে পরিচয় হলো। তিনি ইংরেজি বলতে পারেন বলে আমার ভাষা সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো না। আমি লক্ষ্য করলাম যে, পাকিস্তানি হাজীদের সাথে তিনি ভাঙা ভাঙা উর্দুও বলতে পারেন। বহুদিন থেকে পাকিস্তানিদের মুআল্লিমগিরি করতে করতে উর্দু মোটামুটি বুঝেন এবং কাজ চালাবার মতো বলতেও পারেন।

থাকার জায়গা বরাদ্দ পেয়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলাম। এ মুআল্লিমের জিম্মায় আগে যেসব হাজী পৌঁছেছেন তাদের সাথে দেখা হলো। দেখা গেলো যে, তাদের মধ্যে বেশি সংখ্যক হাজীই পাকিস্তানি। মাওলানা আবদুস্ সুব্হান তো আমার আগেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমাকে যে বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছে এর কাছেই তিনি অন্য এক বাড়িতে ছিলেন। তিনি একই মুআল্লিমের অধীন।

কয়েকদিন পর হারাম শরীফে এমন একজন পাকিস্তানির সাথে পরিচয় হলো, যিনি জামায়াতে ইসলামীর কর্মী। কাবা শরীফের দক্ষিণ দিকে দোতলায় আযান দেবার জায়গা। নিচে থেকে আয়নার দেওয়ালের ভেতর দিয়ে দোতলায় মুয়ায্যিন সাহেবকে আযান দেবার সময় দেখা যায়। আযানখানার নিচে জামাআতের লোকেরা ইশার নামাযের পর সমবেত হয়। সেখানেই ঐ কর্মীর সাথে দেখা হয়ে গেলো। তিনি যিয়াদ হাসপাতালে নিম্নপদের কর্মচারী। মাসজিদুল হারামের মালিক আবদুল আযীয গেটের অতি নিকটে ঐ যিয়াদ হাসপাতাল অবস্থিত ছিল। বর্তমানে মসজিদের সেহেন (আঙিনা) হাসপাতাল ছাড়িয়ে অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় সে হাসপাতাল অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

মুআল্লিমের তত্ত্বাবধানে আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান যেখানে ছিলাম, সেখান থেকে ৫ ওয়াক্ত হারাম শরীফে নামাযে হাজির হতে কষ্ট হতো। জায়গাটি একটু দূরে হওয়ায় আসা-যাওয়ার সময় প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে পড়তে হতো। এ কথা জেনে জামায়াতের ঐ কর্মী আমাদেরকে যিয়াদ হাসপাতালের দোতলায় একটি খালি জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করেন। হারাম শরীফের অতি কাছে বলে আমরা খুশি হয়ে

সেখানে পৌঁছে গেলাম। সেখানে টয়লেট ও ওযূ করা যায় বলে থাকায় তেমন সমস্যা নেই। একটু কষ্ট হলেও পাক করা সম্ভব। আর বাজারে অল্প দামে রুটি ও ভাজা আস্ত মুরগি পাওয়া যায়। কয়েক রকম রুটি ও ভুনা গোশত কিনে খাওয়ার প্রয়োজন মিটানো যায়।

যিয়াদ হাসপাতালে যাবার ২/১দিন পরই দুবাই থেকে ব্যারিস্টার কুরবান আলী হজ্জের উদ্দেশ্যে আসলেন। হারাম শরীফেই দেখা হলে তাকে সাথে করে নিয়ে এলাম। তিনি ব্যারিস্টারি পড়ার সময় লন্ডনে নিজের খরচের জন্য রেস্টুরেন্টে চাকরি করতে হতো বলে পাক করতে জানতেন। দেশী পদ্ধতিতে পাক করা সালুন দিয়ে ভাত খাওয়ার মজাই আলাদা। প্রতিদিন না হলেও প্রায়ই তিনি পাক করে আমাদের রসনা তৃপ্ত করতেন। স্কাউটে থাকাকালে আমি পাক করা ভালোই শিখেছিলাম। রংপুর কলেজে শিক্ষকতা করার সময় কাজের ছেলেকে পাক করা শিখিয়ে কাজ চালাতাম। তবে পাক করার ঝামেলা আমার মোটেই ভালো লাগতো না। বাধ্য হয়েই পাক করতাম। তাই মক্কা শরীফে আমি পাক করতে চেষ্টাও করিনি। বিয়ে করার পর ডিম ভাজার মতো সহজ কাজও কোন দিন করিনি। কাজের লোক পাওয়া যায় না বলে ইংল্যান্ডে আমার ছেলেদের কেউ কেউ স্ত্রীকে পাকে সাহায্য করতে বাধ্য হয়। আমার বড় ছেলের ঘরের নাতীরাও পাক করে খায়, যখন ওদের মা জেদ্দায় আমার বড় ছেলের ওখানে থাকে।

বাংলাদেশ থেকে আগত হাজী

১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন বিজয়ী হয়। মাত্র একমাস পরই হজ্জের সময় ছিলো। নতুন রাষ্ট্র হঠাৎ এতো অল্প সময়ে হজ্জযাত্রীদেরকে হজ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেনি বলে ঐ বছর এ দেশ থেকে কোন হজ্জযাত্রীই যেতে পারেনি।

১৯৭২ সালে চট্টগ্রাম থেকে স্টিমারে যারা হজ্জে গিয়েছেন তাদের অনেকের সাথেই মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। সৌদী আরব '৭৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় ঢাকায় সৌদী দূতাবাস ছিলো না। তাই ঐ ক'বছর বাংলাদেশ সরকার মিসরীয় দূতাবাসের সহায়তায় হজ্জযাত্রীদেরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছে।

ঐ সময় জামায়াতে ইসলামীসহ সকল ইসলামী দল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেনি এমন সকল রাজনৈতিক দলই বেআইনী ছিলো। আদর্শবাদী দল হিসেবে জামায়াত আইনের পরওয়া না করে '৭২ সালের জুন মাসেই আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থায় সাংগঠনিক কাঠামো দাঁড় করায়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের সময়ও জামায়াত অপ্রকাশ্যে সুসংগঠিত ছিলো। '৭২ সালের পরিবেশ ও পরিস্থিতি ঐ সময়কার তুলনায় অনেক বেশি কঠিন, প্রতিকূল ও বিপদসংকুল ছিলো। এ সত্ত্বেও ইসলামী আন্দোলনের কাজ কোন অবস্থায় বন্ধ থাকতে দেওয়া চলে না। ঈমানের

দাবি পূরণ করতে হলে চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সাধ্যমতো আল্লাহর পথে দায়িত্ব পালন করতেই হবে। ইসলামী আন্দোলনের সচেতন কর্মী এ কাজকে সব ফরযের বড় ফরয মনে করে বলেই কারাগারে থাকলেও যথাসাধ্য এ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে থাকে।

১৯৭২ সালের চরম বিরূপ পরিবেশেও ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ কয়েকজনের উদ্যোগে নতুন করে সংগঠন শুরু করা হয় এবং ঢাকা শহরের আমীর মাওলানা নূরুল ইসলাম (কুতুব)-কে হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় পাঠানো হয়। আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, জেলা পর্যায় পর্যন্ত জামায়াতের দায়িত্বশীলদের খবর, সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ও মুজিব সরকার সম্পর্কে জনগণের মনোভাব ইত্যাদি বিস্তারিত জানার সুযোগ পেয়ে আমি রীতিমতো উৎসাহ-উদ্দীপনা বোধ করলাম। '৭১-এর নভেম্বর থেকে '৭২-এর অক্টোবর পর্যন্ত পূর্ণ এক বছর যেসব খবরা-খবর ও তথ্য জানার জন্য পিপাসার্ত ছিলাম তা মাওলানা নূরুল ইসলামের সাথে দীর্ঘদিন বৈঠকে একান্তে জানতে থাকলাম।

জানা গেলো যে, শেখ মুজিবের ব্যাপক জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতির ফলে জনগণ হতাশায় ভুগছে। মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় ও দাপট দেখিয়ে একশ্রেণীর লোক সন্ত্রাসী ভূমিকা পালন করছে। শেখ মুজিব মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট থেকে অস্ত্র উদ্ধারের চেষ্টায় সামান্যই সফল হতে পেরেছেন। ঐ অস্ত্র সন্ত্রাসের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। চালসহ বেঁচে থাকার মতো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবে দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতিতে জনগণের অস্থিরতা চরমে পৌঁছেছে। ফলে শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

আরও জানা গেলো যে, ১৬ ডিসেম্বরের পর ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র ও সক্রিয় যুবকদের অনেকেই নির্মমভাবে নির্যাতিত ও নিহত হয়েছেন। আত্মগোপন করতে সামান্য বিলম্বের কারণেই এটা হয়েছে। যারা যথাসময়ে এলাকা থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছেন তারা আল্লাহর রহমতে রক্ষা পেয়েছেন। এ কথা জেনে আল্লাহ তাআলার প্রতি গভীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম যে, প্রাদেশিক পর্যায়ের সকল দায়িত্বশীল এবং জেলা পর্যায়ে খুলনা জেলার সেক্রেটারি মাওলানা হাতেম রাশেদী ছাড়া আর সবাইকে আল্লাহ তাআলা হেফাযত করেছেন। আগত হাজীদের মধ্যে আমার সরাসরি পরিচিত একজনকেই পেলাম। তিনি আমার ছাত্র জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হাফেয ফয়েয মুহাম্মদ। তার বাড়ি বর্তমান শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানায় হলেও তিনি ব্যবসা উপলক্ষে ঝালকাঠি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। পাকিস্তান আমলে জামায়াতের সাংগঠনিক সফরে যে কয়বার ঝালকাঠি গিয়েছি সব বারই তার বাড়িতে মেহমান হয়েছি। তাকে পেয়ে একান্ত আপনজন হিসেবে দেশের অবস্থা জানতে চাইলাম। তিনি সর্বসাধারণের দুরবস্থার করুণ বিবরণ দিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, মানুষ বেঁচে আছে কেমন করে? তিনি আবেগপ্রবণ মানুষ

ছিলেন। তার চোখে পানি এসে গেলো। বললেন, বেঁচে আছে বলা যায় না। সচ্ছল লোকেরাও দুবেলা প্রয়োজন পরিমাণ খাদ্য যোগাড় করতে পারছে না।

১৯৭৮ সালে আমি বাংলাদেশে আশার পরপরই আমার এই বন্ধুটি আমার প্রথম বেহাই হলেন। তার দ্বিতীয় কন্যা উম্মে সালমা মুন্নির সাথে আমার বড় ছেলে মামূনের বিয়ে হয়।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক উদ্যোগ

১৯৪১ সালে অবিভক্ত ভারতে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' কায়েম হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে পাকিস্তান এলাকায় বসবাসকারী রুকনগণ 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান' নামে পৃথক সংগঠন শুরু করেন। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এ এলাকায় বসবাসকারী রুকনগণের পক্ষ থেকে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নামে নতুন করে সংগঠন কায়েমের উদ্যোগ নেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য প্রকাশ্যে কোন সম্মেলন ডেকে তা করার কোন পরিবেশ ছিলো না। তাই গোপনেই এর উদ্যোগ নিতে বাধ্য হতে হয়। এ সম্পর্কে মক্কা শরীফে মাওলানা নূরুল ইসলাম থেকে যতটুকু জেনেছিলাম তা সব মনে না থাকায় এ বিষয়ে মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ, প্রাদেশিক অফিসের সাবেক অফিস সহকারী জনাব আমীনুর রহমান মঞ্জু, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, অধ্যাপক নাযির আহমদ ও জনাব মকবুল আহমদ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর নিরাপত্তার প্রয়োজনেই জামায়াতের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। জামায়াতের প্রাদেশিক কোন দায়িত্বে ছিলেন এমন কোন একজনের পক্ষেই নতুন করে সংগঠন চালু করার উদ্যোগ নিলে সঠিক হয়। কিন্তু এমন ব্যক্তি হওয়া প্রয়োজন যিনি ঢাকা শহরে প্রকাশ্যে চলাফেরা করলে জামায়াতের বাইরের কোন লোক চিনবে না।

জামায়াতের প্রাদেশিক সেক্রেটারি জনাব আবদুল খালেক জয়েন্ট সেক্রেটারি ও শ্রম-বিভাগের সেক্রেটারি মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ এ উদ্যোগ নেবার অবস্থায় ছিলেন না। '৭১ সালের শেষ দিকে মোমেনশাহী জেলার আমীর মাওলানা আবদুল জাব্বারকে প্রাদেশিক সাংগঠনিক সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য ঢাকায় আনা হয়। তিনি ঢাকায় মোটেই পরিচিত ছিলেন না। একমাত্র তার পক্ষেই এ উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো।

মাওলানা আবদুল জাব্বার শারীরিক আকারে ছোটখাটো হলেও মনের দিক দিয়ে অত্যন্ত সাহসী ও বিপ্লবী; সংগঠন শুরু করার জন্য তিনিই উদ্যোগ নিলেন। প্রথমে তিনি যাদেরকে সাথে পেলেন তারা হলেন, ঢাকা শহর জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারি মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রাদেশিক অফিসের সহকারী জনাব আমীনুর

রহমান মঞ্জু এবং চাষীকল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি ডা. ময়েযুর রাহমান। মাস্টার শফীকুল্লাহ কাকরাইল মসজিদে তাবলীগ জামায়াতের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিলেন। আমীনুর রহমান মঞ্জু তার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। এভাবেই জামায়াতে ইসলামীর পুনর্গঠনের সূচনা হয়।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর জন্য আমার করণীয়

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি মাওলানা নূরুল ইসলাম থেকে যা কিছু জানার ছিলো তা সংগ্রহ করার পর তার মাধ্যমে আমার করণীয় সম্পর্কে কতক প্রস্তাব পেশ করলাম ঃ

১. প্রত্যেক বছর হজ্জ উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের এক বা একাধিক প্রতিনিধিকে মক্কা শরীফে পাঠানো প্রয়োজন। আমি এ সুযোগে তাদের নিকট থেকে দেশের পরিস্থিতি ও সংগঠনের অবস্থা অবগত হতে চাই।

২. আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষে বিদেশে থেকে যা কিছু করা সম্ভব তা করার ইখতিয়ার চাই।

৩. হজ্জের পর আমি লন্ডনে পৌঁছাবার চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে দেশের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা সহজ হয়।

মাওলানা নূরুল ইসলাম আমার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্য নিয়েই হজ্জে এলেন। আমাদের একত্র মিলিত হওয়া ও পরামর্শ করার জন্য আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। তিনি আমার প্রস্তাবগুলো জামায়াতের দায়িত্বশীলগণের নিকট পৌঁছাবার দায়িত্ব নিলেন।

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সমাপ্ত হবার পর মাওলানা নূরুল ইসলাম ঢাকায় ফিরে গেলেন। মাওলানা আবদুস্ সুব্হান পাকিস্তানে চলে গেলেন। আমি লন্ডন যাবার জন্য উপায় তালাশে লেগে গেলাম।

সমাপ্ত

কামিয়াব প্রকাশন। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।